আন্তর্জাতিক ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতা

ডঃ কালীপদ মালাকার
এম. এ. (ট্রিপল), পি. এইচ. ডি (ক্যাল)

মণ্ডল বুক হাউস ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
ডিসেম্বর ১৯৬৬

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক
অর্থানুকূল্যে গ্রন্থকার
ও শ্রীসুনীল মণ্ডল
কর্তৃক মণ্ডল বুক হাউস,
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদপট ঃ
শ্রীগণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
ইম্প্রেশন্ হাউস

ব্লক ঃ
মডার্ন প্রসেস

মুদ্রণ ঃ
নিউ নিরালা প্রেস
৪ কৈলাশ মুখার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৬,
বাণীমুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলি-৯ এবং আরও একটি প্রেস।

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় পিতামাতার

করকমলে—

অভিমত

● ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীপদ মালাকারের লেখা একখানি সুন্দর বাংলা বই পড়লাম। ডঃ মালাকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের তিনটি শাখা যেমন (১) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা (২) আধুনিক ইতিহাস এবং (৩) ইসলামিক ইতিহাস ও সভ্যতায় এম. এ. হওয়ায় আমি মনে করি, আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাস-সম্পর্কিত যে-কোনও বিষয়ে লেখার সম্যক যোগ্যতার অধিকারী তিনি। এই বইখানি লিখে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যকে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছেন। এর মাধ্যমে, তিনি বিভেদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব মিলের সংকেত প্রদর্শিত করেছেন। এই বইয়ে তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের জীবন ধর্ম ও সংস্কৃতির সাধারণ পটভূমিকায় একটি সাবলীল ভাবধারার সত্যকার ও সহজবোধ্য রূপ দানে প্রয়াসী হয়েছেন। এই বইয়ে আমাদের জাতীয় এবং ঐতিহাসিক মূল কথার একটি চিরন্তন ও সুগভীর ভাবধারা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, এবং দেখানো হয়েছে যে, বিদেশ থেকে আগত ধর্ম ও সংস্কৃতি আমাদের সাধারণ জীবনে মুখ্যতঃ ভাসা ভাসা ভাবে উপরের স্তরেই অবস্থান করে রয়েছে। কিন্তু বাংলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণা প্রেরণা প্রকৃতি প্রবৃত্তি যা জাতীয় মজ্জায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তা এখনও জীবন্ত রয়েছে। এ বিষয়ে লেখক এই বইয়ে বহু খাঁটি ঐতিহাসিক ও অপরাপর দৃষ্টান্তের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সাধারণ বাঙালীর কাছে তাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য হিসেবেই পেশ করা হয়েছে। লেখক তাঁর বক্তব্যকে বিশেষ করে প্রাণবন্ত ও সহজবোধ্য করার আকাঙ্ক্ষায় কতকগুলি ছবি প্রকাশিত করেছেন। এই ছবিগুলি নিঃসন্দেহে বইখানির মূল্য অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এরূপ একখানি বই, এঁর অভীষ্ট উদ্দেশ্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত করেছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের সকল শ্রেণী ও ধর্মের লোকেদের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় সংহতি এই বই আনতে সাহায্য করবে, যা হচ্ছে আমাদের ভারতের জাতীয় সরকারের অভীষ্ট ভাবধারা ও ঘোষিত আদর্শ।

ডঃ মালাকার ধর্মান্তরিত মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের মধ্যে হিন্দু সংস্কার ও

আচার আচরণের উপর এক মৌলিক ও মূল্যবান বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, ডঃ মালাকার তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ও একনিষ্ঠ অধ্যয়ন এবং ঐকান্তিক প্রেরণার দ্বারা এই সকল মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে আমাদের সমগ্র জনগণের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ সংস্কৃতিকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সার্থক প্রয়াস করেছেন। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ বিষয়টি যেন জাতির কাছে তাঁর নিজের পাণ্ডিত্যের দান এবং এই দান আমাদের জাতীয় সংহতি বর্দ্ধনে একটি প্রকৃষ্ট পথ। এই হেতু ডাক্তার মালাকারের লেখা এই বইখানি জনসাধারণের কাছে ভাল ভাবে প্রচার লাভের উপযুক্ত বলে আমি মনে করি।

● ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীপদ মালাকার রচিত এই গ্রন্থখানি পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। আলোচ্য বিষয়টি দেশের বর্তমান অবস্থায় একটি গুরুতর সমস্যা।

প্রচলিত নানা মত ও বুলির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বিষয়টি ধীরভাবে চিন্তা করা উচিত। গ্রন্থখানি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

● অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু

ডঃ কালীপদ মালাকারের লেখা এই বইখানির পাণ্ডুলিপি পড়িয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। ইহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়টিও অতি যোগ্যতার সহিত বাছাই করা হইয়াছে।

বিগত প্রায় ২৫।২৬ বৎসর যাবৎ বিশেষ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথায় গরমিল কোথায় বিরোধ এই বিষয়ের প্রতিই জনসাধারণের দৃষ্টি রাজনীতিক ও আর্থিক কারণে সমধিক নিবদ্ধ ছিল। অথচ বহু শতাব্দী একত্র বসবাসের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে বা সামাজিক আচার ব্যবহারে যে সকল সমতার সেতু রচিত হইয়াছিল তাহা কদাচিৎ কেহ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

লেখক ডক্টর কালীপদ মালাকার নানা বিষয়ে পারদর্শী। তিনি সার্থকভাবে

সেই সকল বিষয় প্রয়োগ করিয়া মিলনের সূত্রের প্রতি সকলের চেতনাকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বর্তমান ভারতে ধনবৈষম্য ও রাজনীতিক ক্ষমতার অধিকার লইয়া যে দ্বন্দ্ব তাহা সাম্প্রদায়িক বিরোধের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা তিনি স্পষ্টভাবে সঠিক বলিয়াছেন। ভারত সরকার একদিকে যেমন মূল কারণের নিরাকরণ করিতে প্রয়াসী, অন্য পক্ষে তেমনই জনসাধারণের কর্তব্য যে, স্বার্থান্বেষীগণের প্ররোচনায় তাঁহারা যেন মিলনের কথা বিস্মৃত হইয়া বিরোধের বিষয়ে চিন্তা না করেন। এই অমূল্য উপদেশ লেখক সহজ সরল ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন।

এরূপ শিক্ষাপূর্ণ একটি পাণ্ডুলিপি পুস্তকাকারে বহুল পরিমাণে প্রকাশ ও প্রচারের যোগ্য বলে মনে করি।

●সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ভারতীয় সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতি। এতে ধর্ম, দর্শনভাবনা এবং জনগোষ্ঠির বেঁচে থাকার ভঙ্গী ওতপ্রোত মিলেমিশে আছে। এ দেশের যে কোন মানুষের সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা থেকে সকাল অব্দি জীবনযাপনের ছন্দ, চিন্তাভাবনার ধারা এবং আচার-আচরণের মধ্যে কেউ যদি তন্নতন্ন সমীক্ষা করেন, তাহলেই ব্যাপারটা ধরা পড়বে। ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। সামাজিক ক্ষেত্রে মিশ্র সংস্কৃতির চেহারাটা আরও বেশি করে চোখে পড়ার কথা। সেই জটিল মিশ্রনকে আমরা বলছি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য।

কিন্তু এই মিশ্রসংস্কৃতির আরও একটা দিক আছে। সেটা সমন্বয়ের। এটা একটা আলাদা ধারা। রাষ্ট্রনীতি তথা রাজনীতির নিরন্তর ঝড়ো হাওয়া ভারতীয় সমাজে নড়াচড়া ও তালগোল পাকিয়ে যাওয়া ব্যাপার ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু অসংখ্য ডালপালাওয়ালা গাছের ওপরকার আলোড়ন নীচে কমই পৌঁছয়। সেখানে কাণ্ড একটাই। তা স্থির এবং তার শেকড়বাকড় খুব শক্ত। সংস্কৃতি সমন্বয়ের বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ নীচের তলায় অর্থাৎ সাধারণ মানুষজনের মধ্যে গিয়ে পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে।

ডঃ কালীপদ মালাকার যুগে যুগে ভারতীয় সমাজের সেই বিচিত্র সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারাটি অশেষ প্রযত্নে তুলে ধরেছেন। এ একটা মহৎকাজ। টুকরো-টুকরো ভাবে অনেকে এমন চেষ্টা করেছেন অবশ্য ; কিন্তু ডঃ মালাকার যা করেছেন,

তাতে একটি সমগ্রতা তথা সম্পূর্ণতায় উত্তরণের ব্যাপার ঘটেছে। তিনি এক বিশাল দৈত্যের খাটুনি খেটেছেন বলা যায়। নৃতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ইতিহাস এবং সমকাল ঘেঁটে ভারতীয় সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারাটির গভীরতর উন্মোচন ঘটিয়েছেন। জাতীয় সংহতির সপক্ষে এ এক সাধু প্রয়াস।

জাতীয় সংহতি চাই বলে চিৎকার করলেই সংহতি আসবে না। সেই সংহতির ভিত্তি নিছক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও টিকে থাকার কথা নয়। তাকে দিতে হবে আরও শক্ত বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদের প্রচুর মালমশলা রয়েছে ভারতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক সঞ্চয়কক্ষে। শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই উপাদানগুলো ঐতিহ্যের সিন্দুকে দলিল দস্তাবেজের মতো অব্যবহার্য হয়ে পড়ে রয়েছে। ডঃ মালাকার তাকে উদ্ধার করলেন।

কিন্তু তাঁর এই গ্রন্থটিতে পণ্ডিতম্মন্য বুদ্ধিজীবীর উৎকট ভাববিলাস নেই। দেশের সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী যেমন তাঁর বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারবেন, তেমনি চিন্তাবিদরাও নিজেদের চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপক পেয়ে যাবেন। তাঁর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত হরাইজেন্টাল, কিন্তু গতিটি ভার্টিকাল। দেশকেন্দ্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে উদ্বর্তন ঘটাবার এই মহতী প্রচেষ্টা আজকের ঘুনধরা বিচ্ছিন্নতা-বিলাসী এলিট কুলের মগজের ময়লা পরিষ্কার করুক।

আর একটা কথা। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের শ্লোগান নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই গ্রন্থে সেই কাম্য মিলনের বাস্তব সূত্রগুলো ডঃ মালাকার যে ভাবে পরিস্ফুট করেছেন, তা প্রশংসাজনক। ঐক্যের পথে পা বাড়াতে হলে কোন কোন ঐতিহাসিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান দরকার হবে, তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। আমাদের আত্মবিস্মৃতির বন্ধ দরজায় মুহুর্মুহু আঘাত করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটি যত বেশি প্রচারিত হবে, তত মঙ্গল।

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় সাধারণ জনজীবনে যে সংস্কৃতিসমন্বয় লক্ষ্য করেছি —আউল বাউল সহজিয়া সম্প্রদায় পল্লীর চারণ কবি গায়ক শিল্পী এবং চাষীমজুরের জীবনে যে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক আর স্বতস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক ঐক্য দেখে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েছি, তা ডঃ মালাকারের এই বইয়েই প্রতিফলিত।

জাতীয় সংহতি আন্দোলনের শক্তি যোগাতে এমন একটি উজ্জ্বল প্রদীপের দরকার ছিল।

পূর্বাভাষ

জাতীয় ঐক্য ও সংহতির নিদর্শনস্বরূপ বিশ্ব তথা ভারতের বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক, সভ্যতা সম্পর্কীয়, সাংস্কৃতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাগত ধর্মীয় ও সামাজিক মিল ও ঐক্যবোধের সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারক, সাধক, শাসক, সভাসদ, ঐতিহাসিক, পর্যটক, মণীষী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, দেশপ্রেমিক, সাধারণ লোক ও ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা তুলে ধরাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।

নিগ্রোয়েড, মঙ্গোলয়েড, ককেশয়েড অস্ট্রালয়েড, প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, আমেরিকান ইণ্ডিয়ান, দ্রাভিডিয়ান প্রভৃতি নানা জাতি এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, জোরাষ্ট্রিয়ান, ইসলাম, তাও ও শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বাস এই বিশ্বে। বিচিত্র তাঁদের দৈহিক গড়ন, ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম-বিশ্বাস। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটা মিল ও ঐক্যবোধ অতি প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটি বৃহৎ অংশ, সুতরাং ভারতবাসীদের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতি, জাতি, ধর্ম ও ভাষাগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে একটা গভীর একাত্মবোধ অতি প্রাচীন কাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে, যার ফলে এক মূলগত ঐক্য গড়ে উঠেছে। ভারত প্রাকৃতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও 'ভারতবর্ষ'—এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল এক ভারতভূমির কথাই সকলের মনে জেগে ওঠে।

জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদের বৈষম্য ভারতবাসীদের ঐক্যবোধে চির ধরাতে পারেনি। বরং অন্তরের এক গভীর ঐক্যবোধ ভারতবাসীদের একসূত্রে গ্রথিত করে এক মহামিলন ঘটিয়েছে। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়—

> "নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
> বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

অনার্য অর্থাৎ নেগ্রিটো, প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতীয় লোকেরাই ভারতের আদিবাসী। তাঁদের সভ্যতা সংস্কৃতিই হল ভারতের আদি

সভ্যতা ও সংস্কৃতি যার সঙ্গে পরবর্তীকালে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে সৃষ্টি হয়—ভারতীয় আর্য সভ্যতা। এবং সিন্ধুনদের তীরে বসবাসকারী অনার্য ও আর্য সকল জাতিই হিন্দু এবং তাঁদের সভ্যতা হিন্দুসভ্যতা রূপে পরিচিত হয়। সিন্ধু বা দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শনের সঙ্গে মেসোপোটেমিয়া, সুমের, ক্রীটদ্বীপ ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের একটা অসাধারণ মিল আছে। এই গ্রন্থে ভারতজনও ভারতের আদি সংস্কৃতির সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন জাতি ও তাঁদের আদি সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর্যদের পরে শক, হুন, তাতার, অসীরীয় ও গ্রীক সভ্যতার ঢেউ এসে মিলিত হয় আর্য সভ্যতায়। এর পরে আবির্ভূত হয় ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতা যা হিন্দু সভ্যতাকে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়। প্রথমে এখানে যে সকল মুসলমান আক্রমণকারী আসেন তাঁরা প্রায় সকলেই এখানে থেকে যান এবং এখানকার জনসাধারণের সঙ্গে অতি সহজেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের অনেকেই এদেশের মহিলাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। ধর্মে মুসলমান হলেও এখানকার তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার অনেক কিছুই তাঁরা গ্রহণ করেন এবং আর্য ও অপরাপর বিদেশীদের মতো তাঁরাও ক্রমে ভারতের অধিবাসীরূপেই বসবাস করতে শুরু করেন; ফলে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির রূপান্তর ঘটে, এবং ক্রমে তা এক নবরূপ গ্রহণ করতে শুরু করে।

সবশেষে বণিকের বেশে আসেন ইংরেজগণ। ভারতের মাটিতে এই বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয়-রাজদণ্ড রূপে। অবশ্য ইংরেজগণ শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তবে ভারতের দর্শন, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ইংরেজদের অবদানে অনেকটা পুষ্ট হয়। মুসলমানগণ যেমন অনেক হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন অনুরূপভাবে ইংরেজগণও এদেশের অনেককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। আবার অনেক মুসলমান এবং খ্রীষ্টানও হিন্দুধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

মানব সভ্যতা বিকাশের প্রধান সহায়ক হল ভাষা। এই গ্রন্থে ভারতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব দেখানো হয়েছে।

বিভেদের মাঝে ঐক্য স্থাপনে বিশ্বাসী এই ভারতবাসীগণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে প্রয়াস করে আসছেন। মৌর্য ও

গুপ্ত সম্রাটগণ ভারতের বিভিন্ন অংশ জয় করে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রাচীনকালে সম্রাট, রাজাধিরাজ, একরাট প্রভৃতি উপাধি ধারণ এবং রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি দিগ্বিজয়মূলক যজ্ঞাদি সম্পাদনের মাধ্যমে একচ্ছত্র ও অখণ্ড সাম্রাজ্য এবং ভৌগোলিক ঐক্য স্থাপনের আদর্শ পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে মুসলমান সম্রাটগণের শাসনকালেও ভারতে ঐক্যবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের দৃষ্টান্ত রয়েছে, ইংরেজ আমলেও সমগ্র ভারতে এক শাসন ব্যবস্থা ও এক রাষ্ট্রভাষা প্রচলন করা হয়েছিল। এ সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে—একই ধরনের শাসন ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ ও সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে একটি প্রধান ভাষা চালু থাকা উচিত যা জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ় করে। পক্ষান্তরে প্রাদেশিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষা দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিঘ্নিত করে। কাজেই দেশের ঐক্য ও সংহতির জন্য সমগ্র দেশে প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে একটি প্রধান ভাষা এবং একই ধরনের শাসন ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতবর্ষ বহু জাতি ও ধর্মের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধু প্রদেশের মহেনজোদড়োর মাটি খুঁড়ে যে সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, আর্যপূর্ব যুগ হতেই ভারতবর্ষে একটি উৎকৃষ্ট ধরনের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল এবং ভারতবর্ষ যে বিশ্বের আদি ধর্মবিশ্বাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং ভারতবর্ষ থেকেই যে তা বিশ্বের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে সে সম্পর্কে বহু বিদেশী যাঁরা ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মতবাদ এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এবং ভারতের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশের ধর্মবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির মধ্যে মিল এবং ঐক্যবোধ দেখানোর উদ্দেশ্যে।

ধর্মই মানব ইতিহাসের সবচেয়ে পুরানো ও সমবেত প্রচেষ্টার ফল। ধর্ম-বিশ্বাস একদিকে যেমন মানুষের দুর্বলতা, অন্ধবিশ্বাস, নৃশংসতা ও কুসংস্কারের সঙ্গে অপরদিকে তেমনি আধ্যাত্মিকতা, উদারতা, মানবপ্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। একদল স্বার্থান্বেষী লোক ধর্মকে আশ্রয় করেই যুদ্ধবিগ্রহ করেছে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। পরমত অসহিষ্ণু হয়ে অগণিত মানব-মানবীকে পুড়িয়ে মেরেছে, লুঠতরাজ চালিয়েছে ও জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করেছে। বিঘ্নিত করেছে জাতীয় সংহতি ও ঐক্যবোধকে। আর ধর্মান্ধলোকগুলি উক্ত স্বার্থান্বেষী লোকদের অমানবিক, অধার্মিক ও অসামাজিক কাজে ইন্ধন জুগিয়ে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। আবার এই ধর্ম প্রচারের মাধ্যমেই বুদ্ধদেব, যীশু, হজরত, নানক, চৈতন্য, অশোক ও আকবর প্রমুখ মহামানব ও সম্রাটগণ বিশ্বে মানব-প্রেম প্রচার করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়েছেন সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে।

সকল ধর্মই মানুষকে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভালবাসতে বলেছে এবং সকল ধর্ম মতের মধ্যেই রয়েছে একটা অসাধারণ মিল ও ঐক্যবোধ। কাজেই বিভিন্ন ধর্মমত, ধর্মগ্রন্থগুলির শিক্ষা ও ধর্মগুরুদের জীবনাদর্শ না জানলে ধর্মান্ধতা কাটে না। এবং তা না কাটলে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে স্থায়ী ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে না।

সকল ধর্মের লোকই এক ভগবানকে বিভিন্ন নামে আরাধনা করেন। ভগবানকে কেউ বলেন আল্লাহ, কেউ বা গড্ এবং কেউ বা বলেন ঈশ্বর। যেমন কোনো পুকুর হতে হিন্দুগণ পান করেন জল, মুসলমানেরা পান করেন পানী, আর খ্রীষ্টানগণ ওয়াটার। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে একই তরল পদার্থ বিভিন্ন নামে পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে থাকেন। সেইরূপ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা একই ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডেকে তাঁদের মনের ভক্তি জানান। এক ভগবানকে ইহুদীরা বলেন জিহোভা, পার্শীরা বলেন অহুর-মজদা, খ্রীষ্টানরা বলেন গড, মুসলমানরা বলেন আল্লাহ। এই গ্রন্থে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে একটা অসাধারণ মিল ও ঐক্যবোধ রয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ-গুলি যেমন রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, মনুসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষদ, বেদ, ত্রিপিটক, জেন্দ-আবেস্তা, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতির শিক্ষা যে মূলতঃ এক এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু যেমন রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, তীর্থঙ্কর মহাবীর, বুদ্ধ, কনফুসিয়াস যীশু, হজরত, জোরাষ্টার, শঙ্করাচার্য, গুরু নানক, রামকৃষ্ণ প্রমুখের চরিতে যে একটা অসাধারণ মিল আছে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মের প্রবর্তক এবং ধর্মবেত্তাগণের জীবনাদর্শ থেকে সত্যধর্ম ও

মানবপ্রেমের কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও উপদেশাবলী এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম যেমন—হিন্দু, জৈন বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জরাথুস্ত্রিয়ান, ইসলাম, কনফুসিয়াস, তাও ও শিখ প্রভৃতির মূল কথা, যেমন—জীবসেবা, জীবেপ্রেম, একেশ্বরবাদ, পিতামাতায় শ্রদ্ধা ও সত্যের জয় ইত্যাদির সঙ্গে কতিপয় মহামানব যেমন—কবীর, নানক, চৈতন্য হরিদাস, রামকৃষ্ণ প্রমুখের ধর্মীয় বিভেদ ঘোচানোর প্রয়াস, হিন্দু ও হিন্দুধর্মের স্বরূপ এবং হিন্দু, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মে দানশীলতার মাহাত্ম্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

এই বইয়ে কিছু কিছু জনশিক্ষামূলক প্রচলিত জনশ্রুতি ও পৌরাণিক কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে এবং তাছাড়াও এমন কোনো কোনো ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে হয়তো সঠিক প্রমাণ নেই। আশা করা যাচ্ছে—এই ঘটনাগুলো অনেক ধর্মের লোকের বিশেষ করে যাঁরা এই সকল ঘটনার সঙ্গে পরিচিত নন তাঁদের কাছে কিছুটা জ্ঞাতব্য হবে। এতে সমাবেশ করা হয়েছে—বিভিন্ন ধর্মের অনেক শাসক ও মণীষীর জীবনের সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম-পরায়ণতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষবিচার, সর্ব ধর্মে শ্রদ্ধা, মানবতাবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবোধ, সত্যসন্ধ মানসিকতা, ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে যোগ্য লোককে যোগ্য স্থান দেওয়া ও গুণীজনের সমাদর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রীতি প্রভৃতি সম্পর্কীয় অনেক দৃষ্টান্ত। এ সকলের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক বা ঐক্যের দিকটাও তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। এবং স্মৃতিচারণ বা তুলনার জন্য কোনো কোনো উদ্ধৃতি বা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কোনো কোনো অধ্যায়ে।

ইতিহাসের পাতা যুগের পর যুগ বহন করে চলেছে—বিজেতার জয়োল্লাস, বিজিতের কান্নার রোল, পরাধীনতার গ্লানিময় অধ্যায় ও স্বাধীনতার আনন্দ। এতেই রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং ধর্মান্ধতার গ্লানিময় অধ্যায়। এই ইতিহাসই বহন করে চলেছে—অশোকের প্রেমের মাধ্যমে মানব মন জয়ের আকাঙ্ক্ষা, ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব, চৈতন্যদেবের মানবপ্রেম আবার নেপোলিয়নের বিশ্বগ্রাসী জিগীষা। তবে হিন্দু-মুসলমানদের একই সূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা ভারতের আজকের নয়। এ চেষ্টা ভারতের বহু দিনের। এবং সে সম্পর্কে অনেক দৃষ্টান্তই এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

অবশ্য ইতিহাস যে পুরোপুরি নিরপেক্ষ একথাই বা কি জোর করে বলতে পারা

যায়? কারণ অনেক হিন্দু ঐতিহাসিক হিন্দু রাজাদের দোষত্রুটি ঢেকে তাঁদের প্রশংসা করেছেন, আবার অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক মুসলমান শাসকগণের দোষ ঢেকে তাঁদের গুণগান করেছেন। তবে সকলেই যে তা করেছেন এমন নয়। অনেক ঐতিহাসিকের লেখা থেকে বহু নিরপেক্ষ মতবাদও পাওয়া গেছে। যাহোক, কোন মুসলমান শাসক কত হিন্দুর ওপর বা কোন হিন্দু শাসক কত মুসলমানের ওপর অত্যাচার করেছেন—তা তুলে না ধরে, কে কত ধর্মনিরপেক্ষ ও পরধর্মসহনশীল ছিলেন—সেই তথ্যই ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির নিদর্শন রূপে এই গ্রন্থে তুলে ধরাব জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হয়েছে।

বহু ভাষা ও নানা ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসিক, শিখ ও আদিবাসীদের নানা ধর্মবিশ্বাস পাশাপাশি বিদ্যমান। ধর্মের বিভিন্নতা ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্যস্থাপনের পথে কখনও বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়েও অপরাপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেননি। অনুরূপভাবে সম্রাট হর্ষবর্ধন আজন্ম কৌলিক দেবতা শিবের উপাসক হয়েও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সম্রাট আকবর এবং আরও অনেক মুসলমান শাসক ইসলাম ধর্ম ছাড়াও অপরাপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। শিবাজী হিন্দু হয়েও মুসলমান ধর্মের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং ওই সকল সম্রাট ও শাসকের কার্যকলাপই প্রকৃতপক্ষে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

মুসলমান শাসকেরা মুসলমান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে সকল হিন্দু-ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন সেগুলিকে বিশেষভাবে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে তাঁদের ধর্মীয় সহনশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে। মুসলমান সম্রাট ও সুলতানগণের শাসনকালে মুসলমানগণের সঙ্গে হিন্দুগণের নিয়োগ ও হিন্দুধর্মীয় সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা ধর্মীয় সহনশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচায়ক হওয়ায় এই গ্রন্থে সেই দিকটাই বিশেষ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী না হলেও সাংস্কৃতিক ঐক্য কিন্তু কোনো বিশেষ বিশেস সময় বা জায়গা ছাড়া প্রায় চিরদিন এবং সর্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। কোনো কোনো সময়ে তা সাময়িকভাবে ব্যাহত বা পরিবর্তিত হলেও মূলধারা কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতো সমাজদেহের সর্বত্রই প্রবহমান ছিল। বিভিন্ন

সময়ে বিদেশী ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি তাকে আঘাত হানলেও একেবারে নির্মূল করে দিতে সক্ষম হয়নি। বরং অনেক বিদেশীই তাঁদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে অনেক ক্ষেত্রে আত্মস্থ করে নিয়ে ভারতীয় সমাজদেহে বিলীন হয়ে গেছেন। তাঁদের আর কোনো পৃথক সত্তা নেই। যাঁরা তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পৃথক করে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাও কিন্তু পুরোপুরি সক্ষম হননি। ফলে এক মিশ্র ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে যা বিভিন্ন জাতির মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি করে তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাঁধন গড়ে তুলেছে সকলের অলক্ষ্যে। জন্ম নিয়েছে সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ঘোচানোর চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ধর্মের বহু সাধক ও নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়। ফলে বহু হিন্দু হয়েছেন মুসলমান গুরুর শিষ্য, মুসলমান হয়েছেন হিন্দুগুরুর শিষ্য। অনেক হিন্দু গ্রহণ করেছেন খ্রীষ্টধর্ম, আবার অনেক খ্রীষ্টানও হিন্দুধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। চলেছে ধর্মান্তরীকরণ ও ধর্মগ্রহণ। বিদেশ হতে নানা জাতি তাঁদের যে পৃথক পৃথক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এসেছেন তা কালক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

গ্রাম বাংলায় বয়ে চলেছে হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের এক মিশ্র ধর্মবিশ্বাস সংস্কৃতি বা মিলিত সাধনার ধারা। যার ফলশ্রুতি হিসেবে হিন্দু এবং বহু মুসলমান ও খ্রীষ্টানের কাছে পূজো পেয়ে আসছেন—বাবাঠাকুর, দক্ষিণ রায়, পঞ্চানন ঠাকুর, শীতলা, মনসা, সত্যনারায়ণ, সত্যপীর, গাজাপীর, ওলাইচণ্ডী, ওলাইবিবি, সাতবোন বিবি প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবী ও পীর। এই মিলিত সাধনার মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছে— গ্রাম বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা, সংস্কৃতি ও গভীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এ ছাড়া বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চলেছে বহুকাল ধরে।

জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা বলে শুধু চেঁচালেই চলবে না। এ সকলের যে প্রধান শত্রু জাতিভেদ, ধর্মভেদ ও শ্রেণীভেদ তা প্রথমে দূর করতে হবে। হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সর্বপ্রকার বিভেদ ও কুসংস্কারকে এই প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা থেকে সর্বপ্রথম দূর করতে হবে। শুধু কথাই নয়, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে সকল বিভেদ ও কুসংস্কারকে ঘৃণা করতে হবে। তাই এই গ্রন্থে যে সকল হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক, মণীষী, কবি, সাহিত্যিক, বিদেশী পর্যটক ও সাধক যাঁরা কথায় ও কাজের মাধ্যমে জাতিভেদ,

শ্রেণীভেদ, ধর্মভেদ দূর করার চেষ্টা করেছেন এবং এক ধর্মের লোক হয়ে অপর ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছেন ও অপর ধর্মের লোকদের ভালবেসেছেন তাঁদের জাতি-ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ পরপর তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

জোটনিরপেক্ষতার মানে কোনো জোটেই না থাকা। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার মানে কোনো ধর্মকেই না-মানা নয়। এর মানে—সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া অর্থাৎ ধর্মীয় সহনশীলতা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম থাকবে ব্যক্তিগত চিন্তা-ধারার মধ্যে নিবদ্ধ এবং রাষ্ট্রচিন্তার বাইরে। রাষ্ট্র কোনক্রমেই ধর্মভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। এই পুস্তকে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক মিলের দিকটা বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া এতে যুগে যুগে সহনশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতারও একটা পরিচয় মিলবে, যা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মূল্যবোধকে বাড়িয়ে তুলেছে। ভারতীয়দের যে এক মহানজাতিতে পরিণত করা অসম্ভব নয়—এ রূঢ় সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভারতের অনেক খ্যাতনামা শাসক ও মহাপুরুষ। সর্বধর্মের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি অতিশয় সদয় আচরণ, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রতি অসীম সহানুভূতি, শত্রুর প্রতি সহৃদয় ব্যবহার, আত্মসংযমের গভীর ক্ষমতা, সত্য ও সুন্দরের প্রতি চির আগ্রহ, আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ—এই সকল গুণই প্রকৃতপক্ষে অনেক হিন্দু-মুসলমান শাসক ও মহাপুরুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে।

অনেক মুসলমান শাসক হিন্দু-মুসলমানদের সমান অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্বদানের মাধ্যমেই গড়ে তুলেছিলেন এক অভিনব মহাভারত যা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইসলাম ভারতধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল। পরবর্তী কালে ইংরেজ আমলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভারতপথিক মৌলভী রাজা রামমোহন রায়, মৌলানা গিরিশচন্দ্র সেন প্রমুখ আরও অনেক মহাপুরুষ, যাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব ক্ষুদ্র ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক অন্ধতা এবং জাতিগত বিভেদকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। তাঁরা বুঝেছিলেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

এই গ্রন্থে কয়েকজন খ্যাতনামা কবির কবিতার কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যেগুলোর সর্বক্ষেত্রে বাংলা মানে না লিখে কিছুটা সমধর্মী অর্থ দেওয়া হয়েছে। আশা করি পাঠকগণ এজন্য ভুল বুঝবেন না। এছাড়া প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ

করে ভারতের সংবিধান যে, ভারতে বসবাসকারী সকল শ্রেণীর নাগরিককে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধে ও মর্যাদা ভোগের অধিকার দিয়েছে সে সম্পর্কে অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কেও কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতের অনেক মুসলমানের ধারণা—তাঁদের সকলেরই পূর্বপুরুষ আরবদেশ থেকে এদেশে এসেছেন। তাই তাঁদের দৃষ্টি থাকে আরব দেশের দিকে যা ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির অন্তরায়। অথচ তাঁদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ যে ভারতেরই আদিবাসী এবং ভারতের সংস্কৃতি, সভ্যতা যে তাঁদের অবদানে পুষ্ট এবং ভারতের গৌরব যে তাঁদের গৌরব সে সম্পর্কে অনেক খ্যাতনামা মুসলমান সন্তানের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে যাতে ভারতে বসবাসকারী সকল ভারতীয় মুসলমান সন্তানের মন থেকে বিজাতীয় মনোভাব দূরীভূত হয় সেই উদ্দেশ্যে। এছাড়া এখানে জাতিভেদ ও হিন্দু মুসলমান বিভেদ দূরীকরণের জন্য ভারতের খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ ও দেশপ্রেমিকদের মতবাদ এবং ভারত-সৈনিকদের ধর্মনিরপেক্ষতাবোধও তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ভারত বিভেদের মাঝে ঐক্য-স্থাপন, বিশ্বজনীনতা ও মানবতাবোধ, সর্বধর্মসমন্বয়বাদ ও পরাধীনতার প্রতি ঘৃণা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির চেষ্টার সঙ্গে যেভাবে উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা দেখিয়ে চলেছে তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির নিদর্শন হিসেবে।

উল্লেখ্য, এখন থেকে কয়েক বছর আগে যখন এই গ্রন্থখানি ছাপা শুরু হয় তখন কাগজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ও ঘন ঘন লোড শেডিং হওয়ায় কেবল যে যথাসময়ে পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তাই নয়, প্রেস এক বা দুয়ের অধিক প্রুফ দিতে চাহত না এবং লোড-শেডিং-এর ফলে প্রুফ-এর ভুলগুলোও যথাযথভাবে সংশোধন করত না, ফলে কিছু ছাপার ভুল থেকে গেছে—যার জন্য প্রেসও পালটাতে হয়েছে। আশা করি, পাঠকগণ নিজগুণে তা ক্ষমা করবেন এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার সৌভাগ্য হলে ওই সকল ছাপার ও অনিচ্ছাকৃত ভুল শোধরাবার চেষ্টা করা হবে। যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমি বেশী ঋণী। কারণ তাঁর "ভারত সংস্কৃতি" নামক অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ থেকে

নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক ও বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বা সংস্কৃত ভাষার বিশ্বজনীনতা ও ভাষার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের অনেক বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখ যাঁরা এই গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি অথবা গ্রন্থখানি পড়ে অভিমত জানিয়েছেন আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থখানি যতটা সম্ভব সহজ ও সাবলীল ভাষায় লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি যদি ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় বিন্দুমাত্রও কাজে লাগে তাহলে আমার প্রচেষ্টা কিছুটা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিনীত—

ডঃ কালীপদ মালাকার

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

অবাধে ধর্মসাধনার মুক্তভূমি—এই ভারতভূমি

—যাঁদের কাছে হিন্দু মুসলমানে বিভেদ নাই-



শ্রীচৈতন্য

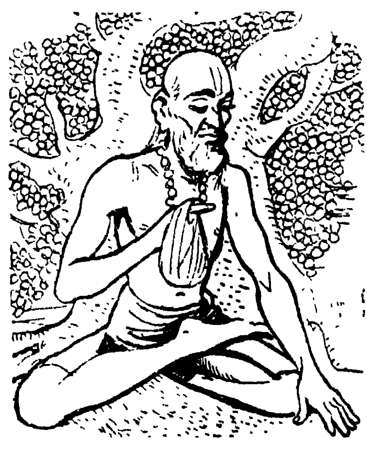


গুরুনানক

-মুসলমান হয়েও যাঁরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন—



কবীর



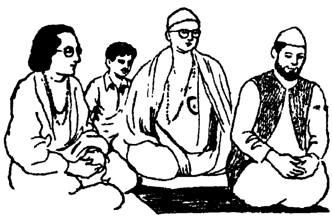
হরিদাস

—মহা-আলিঙ্গন—

হিন্দুগুরুর
(শ্রীচৈতন্তের)



মুসলমান শিষ্য
(সাধক হরিদাস)



হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও জৈন ধর্মের মিলিত সাধনা



বিধান সভার লবিতে বিজয়া ও ঈদের কোলাকুলি অর্থাৎ সেই একই প্রথা



একটি মুসলমান পরিবার যার পূর্বপুরুষ হিন্দু থেকে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন



একটি খ্রীষ্টান পরিবার যার পূর্বপুরুষ স্বেচ্ছায় হিন্দু থেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন

—যাঁরা খ্রীষ্টধর্ম থেকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন-



যে সাহেব খ্রীষ্টান বৈষ্ণব হলেন

—যাঁরা হিন্দু থেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেন—



গোপাল গবামি ও আমানত (রমানাথ) গবামি

—যাঁরা হিন্দু থেকে খ্রীষ্টান হলেন—



যে সকল হিন্দু স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টান হয়ে মন্দির ভেঙ্গে গীর্জা গড়লেন (পেছনে গীর্জাঘর সামনে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ
অবাধে ধর্মসাধনার মুক্তভূমি—এই ভারত ভূমিতে।

—হিন্দু মুসলমান বিবাহ-



কবি নজরুল ইসলাম ও তাঁর পত্নী প্রমীলা নজরুল (সেন)

—পোশাক আর গোঁফ-দাড়ি নিয়ে লড়াই করা মূর্খদের কাজ—

(১) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে—"কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গোঁফ-দাড়ি কামানো দাঙ্গায় হত খাযক মিয়াকে হিন্দু মনে করিয়া 'বলহরি হরি বোল' বলিয়া শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া গেল এবং কতকগুলি মুসলমান ছেলে গুলি খাইয়া হত দাড়িওয়ালা সদানন্দ বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে পড়িতে কবর দিতে লইয়া গেল।

মন্দির মসজিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।"
—কবি নজরুল (রুদ্রমঙ্গল)



হিন্দু মুসলমান মুসলমান হিন্দু

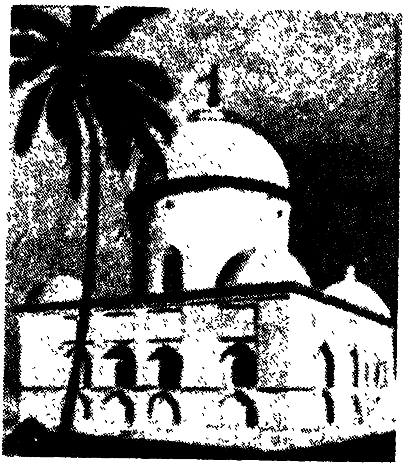
(২) "মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর লাজ গজিয়েছে, ওদেরমাথার ওপর, ওদের সারামুখে। ওরা মারছে নেঙ্গোটিকে, মারছে টিকিকে, দাড়িকে। বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই?"

—নজরুল (রুদ্রমঙ্গল)

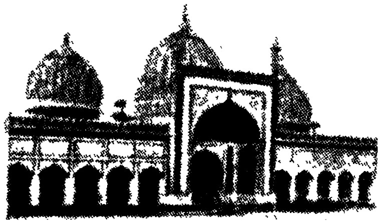
(৩)

ওপরের গোঁফ-দাড়ি বিহীন পাঞ্জাবীপরা একজন হিন্দুর পাশে অনুরূপ বেশে একজন মুসলমান দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে গোঁফ-দাড়িওয়ালা লুঙ্গিপরা একজন মুসলমানের পাশে অনুরূপ বেশে একজন হিন্দু দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁদের মধ্যে কে হিন্দু, কে মুসলমান না বলে দিলে চেনবার উপায় নেই। অথচ এই পোশাক ও গোঁফ-দাড়ি দেখে দাঙ্গাবাজরা ধরে নেয় কে হিন্দু, কে মুসলমান! তাই কবি নজরুল বলেছেন—বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই?

জল্পেশ মন্দির



জমা মসজিদ



কে বলে বিভেদ আছে, মসজিদে মন্দিরে।
একই মিল আছে তাদেব বাইরেব আকারে।
ভেতরে পূজিত হন সেই একই ঈশ্বব,
ভক্তি মার্গে সবই এক নহে কেহ পর।

—পোশাক ও গোঁফ-দাড়িতে যাঁরা অভিন্ন—



ব্রহ্মজ্ঞ কবি রবীন্দ্রনাথ



বেদজ্ঞ পণ্ডিত আচায শহিদুল্লাহ

—একের ধর্মানুষ্ঠানে অন্যের যোগদান—



মুসলমানগণের পবিত্র ঈদ উপলক্ষে ময়দানে বিশাল নমাজ সমাবেশে

হিন্দু মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণদান

—প্রাচ্য দেশে ভারত-ধর্ম—



থাইল্যাণ্ডে দুর্গোৎসবে চীনা ও থাই রমণীরা দেবীবিগ্রহের সম্মুখে—দেবীকে প্রণাম জানাচ্ছেন

(আনন্দবাজার পত্রিকা—১৫-১০-৭৩)

—এক ধর্মের লোক হয়ে অন্য ধর্মের লোকের ধর্মসাধনায় সাহায্য করার ও অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানে যোগদানের দৃষ্টান্ত—



শিল্পী মুসলমান হয়েও হিন্দুপ্রতিমা গড়ছেন



পূজামণ্ডপে একজন মুসলমান দুর্গাপূজোর প্রসাদ খাচ্ছেন

ধর্মসমন্বয়



ভারতে ধর্মসমন্বয়ের একখানি তৈলচিত্র (শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

—লৌকিক দেব-দেবী ও পীর—

যে সকল লৌকিক দেবদেবী ও পীর হিন্দু এবং বহু মুসলমান ও খ্রীষ্টানের কাছে পূজা পেয়ে থাকেন।



শীতলা



মনসা



দক্ষিণ রায়





বাবাঠাকুর

পঞ্চানন ঠাকুর





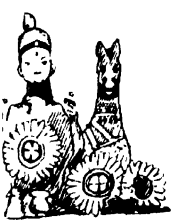


সাতবোন বিবি

বনবিবি

সত্যপীর









বিবিমা

মানিক পীর

ওলাই বিবি

গাজী সাহেব বা পীর সাহেব

॥ এক ॥

বিচিত্র এই দেশ ভারতবর্ষ! এখানে যেমন প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য, তেমন বৈচিত্র্য রয়েছে এর জনসমষ্টি, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতিতে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই গড়ে উঠেছে একটি অসাধারণ ঐক্যবোধ। বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য সম্ভব—ভারতবর্ষ যুগের পর যুগ তার এক অতি উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

এখানে হিন্দু বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান, পারসিক, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক আপন আপন ধর্মের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একত্র বসবাস করছেন। আদিম জাতির নিজস্ব ধর্মমতও এখানে প্রচলিত আছে। এই ধর্মের বিভিন্নতা কখনও ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় হয়নি। অশোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়েও অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নি। অনুরূপভাবে আকবর মুসলমান হয়েও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার, আচরণে এক বিচিত্র মানব গোষ্ঠীর সমাবেশ এক ভারতবর্ষেই দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ চিরকালই বিভেদের মাঝে ঐক্য স্থাপনে বিশেষ আগ্রহশীল। তাই এদেশের লোকদের ভাষা, ধর্মবিশ্বাস ও আচার আচরণের মধ্যে বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক শান্ত ঐক্যবোধ চির বিরাজমান। ভারতে যে মূলগত ঐক্য বিদ্যমান তা হল—বহুর মধ্যে একেকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা এবং বিভিন্নতার মাঝে নিজের ঐক্যকে আবিষ্কার করা। এই উপমহাদেশের একটি মাত্র নাম 'ভারতবর্ষ'ও এদেশের ঐক্যের সহায়ক হয়েছে। কারণ 'ভারতবর্ষ' এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমির কথাই সকলের মনে জেগে উঠে। এছাড়া ভারত ইতিহাসের অতি প্রাচীন যুগ হতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নৃপতিগণের মধ্যেও ঐক্য সাধনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

২

ভারতের মৌলিক ঐক্যের পরিচয় পেতে হলে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যও লক্ষনীয়। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ অন্যান্য দেশ হতে পৃথক। বিভিন্ন সময়ে নানা বৈদেশিক শক্তি ভারত জয় করে এদেশে রাজ্য স্থাপন করেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা ভারত সংস্কৃতি বা আত্মাচেতনাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করেন নি। তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে তার পুষ্ট-পোষণ ও পুষ্টি সাধন করেছেন। ভারতে ঐক্য স্থাপনে এটাও একটা উল্লেখযোগ্য অবদান যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো দেশে দেখতে পাওয়া যায় না।

ভারত যে ঐক্যের সাধনায় ব্রতী তা কিন্তু শুধুমাত্র বাইরের বা ভাবের ঐক্য নয়, সে ঐক্য নিহিত রয়েছে তার বিচিত্র কর্মযোগের মধ্যে। তাই ভারত এগিয়ে চলেছে কর্মচেতনার এক সম্মিলিত শক্তি নিয়ে শান্তি ও মানব প্রেমের এক চিরভাস্বর পতাকা উত্তোলন করে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শুধু স্বদেশেরই নয় সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের সকল মানুষের মঙ্গল ও উন্নতি সাধনও ভারতের একান্ত কামনা।

ভারতবর্ষ প্রথমে ছিল এক। পরে হল দুই—ভারত ও পাকিস্তান। তারপর হল তিন—ভারত, পা কস্তান ও বাংলা দেশ। এখানে প্রথমে অখণ্ড ভারতের কথা বলা হয়েছে। তারপর তার খণ্ডিত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এবং খণ্ডিত অবস্থায়ও ভারত তার অখণ্ডিত অবস্থার সর্বধর্মসমন্বয় ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসার সুমহান ঐতিহ্যটি বজায় রেখে চলেছে।

॥ ২ ॥

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অতিপ্রাচীন। সেই প্রাচীনত্বই ভারতকে দিয়েছে অপরিসীম ধৈর্য, অসাধারণ স্নিগ্ধতা ও আত্মসমীক্ষার এক অপূর্ব ক্ষমতা। আবার ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতা যুগ যুগান্ত ধরে প্রবহমান, তাই তা চির নবীন। হাজার হাজার বছরের পুরাতন পথরেখা ধরে ভারত আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে। এবং এই চলার পথে কত না প্রাকৃতিক দুর্যোগ বয়ে গেছে এর বুকের উপর দিয়ে। নানা জাতি ও স্বার্থের সংঘাত ঘটেছে যুগের পর যুগ। তবুও ভারত অনাদি অনন্তকাল ধরে বিভেদের মাঝে ঐক্য স্থাপনের সেই সুমহান ঐতিহ্যের শিখাটি চির অনির্বাণ রেখেছে। ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী, মুসলমান, খ্রীষ্টান

সাধক ও মনীষীবৃন্দ সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রয়াস করেছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদার মানবিকতা অর্থাৎ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসার আদর্শ শিখিয়েছেন। জাতীয় জীবনে দিয়েছেন বিশ্বজনীনতার ছাপ। সমাজতন্ত্রের মৌলিক চিন্তাধারা ভারতবর্ষের কাছে আজ নতুন নয়। ভারতবর্ষের মাটিতেই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করা হয়েছিল মানবজাতির সামগ্রিক মঙ্গলচিন্তা, ঐক্যবোধ ও একাত্মতা। ভারতই প্রথম মানুষকে অমৃতের সন্তানরূপে কল্পনা করেছে। এবং মানবতাকে ভারত অখণ্ডভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছে।

॥ ৩ ॥

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য জাতির চরিত্র গঠনের সহায়ক। এই বৈশিষ্ট্য দেশের জনসমষ্টির দৈহিক গঠন, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস ও অর্থনীতির উপরও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের রূপান্তর ঘটায়। তাই ভারতীয়দের সঙ্গে বিশ্বের সকল মানবগোষ্ঠীর আকৃতি, ভাষা, সভ্যতা, কৃষ্টি ও ধর্ম বিষয়ে উদার মানবিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ তুলে ধরার আগে ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সংক্ষেপ কিছু আলোচনা করা যাক।

ভারতবর্ষের তিনদিকে নীল সমুদ্র, উত্তরে তুষার-শুভ্র হিমালয়, মাঝখানে সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা বিশাল সমতলভূমি—যেখানে আপন গতিতে বয়ে চলেছে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, এবং অন্যান্য নদনদী। এছাড়া ও রয়েছে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চল। এখানকার ধোঁয়াটে পাহাড়, শাল পিয়ালের গহন বন উপবন, নদনদী, সবুজ মাঠ, সাগর উপসাগর এবং মাথার উপরের অনন্ত নীল আকাশ দেখে মনে হয় এটি যেন প্রকৃতি দেবীর হাতে গড়া একটি মনোরম স্বপ্নপুরী। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এ-কে ভুবনমনোমোহিনী বলেছেন। এবং এই সে দেশ যে দেশ বঙ্কিম-কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত সৃষ্টির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

প্রাকৃতিক লীলানিকেতন এই ভারতভূমিতে বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই। এখানে বিভিন্ন ঋতুতে দেখতে পাওয়া যায় প্রকৃতির বিভিন্নরূপ। এদেশে কোথাও বেশি শীত, কোথাও বেশি গরম, কোথাও না-গরম না-শীত কোথাও পাহাড়, কোথাও মরুভূমি, কোথা ও সাগর, কোথা বা আবার

শ্বাপদ-সংকুল বনানী ও জনবহুল লোকালয়। শুধু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নয়, প্রাকৃতিক সম্পদও এখানে কম নেই। এমন শস্য খুব কমই আছে যা এদেশের মাটিতে হয় না। সৌন্দর্য মণ্ডিত এদেশের ভাইয়ে ভাইয়ে অকৃপণ ভালবাসা, মায়ের বুকভরা অপার স্নেহ দেখলে সত্যই অবাক হতে হয়। এমন দেশ পৃথিবীতে বিরল। তাই এই দেশকে উপলক্ষ্য করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন--

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির রূপান্তরে হিমালয় পর্বতমালার ও ভারত মহাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতীয় হিন্দুগণ হিমালয়কে দেবতাদের লীলাভূমি ও আবাসস্থল বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা দেবাদিদেব মহাদেব এই হিমালয়েই অধিষ্ঠান করেন। অতি প্রাচীন কালে হিমালয় ভারতীয়দের চিন্তা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মে যতটা প্রভাব বিস্তার করেছে পৃথিবীর অন্য কোনো পর্বত অন্য কোনো দেশ ও জাতির জীবনকে ততটা প্রভাবিত করতে পারেনি। এই হিমালয় তার বিরাট বেষ্টনী দ্বারা এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ হতে ভারতকে অখণ্ড অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং একে দিয়েছে নিরাপত্তা ও স্বাতন্ত্র্য। ফলে প্রাচীন যুগে ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা স্বীয় বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠেছিল। এছাড়া এই চির তুষারাবৃত হিমালয় হতে নদনদী বহির্গত হয়ে দেশকে করে তুলেছে শস্য শ্যামলা। এবং এই হিমালয় ভারতের উত্তরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান থেকে যেমন এক দিকে অখণ্ড ভারতকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রয়াস করেছে, আবার অপরদিকে মৌসুমী বায়ুকে বাধাদান করে দেশকে করে তুলেছে বর্ষণসিক্ত। কাজেই হিমালয়ের অবদান পুষ্ট ভারত কখনও তার মহিমার কথা ভুলতে পারে না। ভারতের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব গিরিপথ দিয়েই পারসিক, গ্রীক, মঙ্গোল ও তিব্বতীরা ভারতভূমিতে আগমন করে ভারতীয় সভ্যতাও সংস্কৃতিকে পুষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। বহিরাগত জাতি-গুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতে এলেও ভারতের জলবায়ু ও পরিবেশ সে বৈশিষ্ট্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে দিয়েছে। ফলে কোনো জাতির পক্ষেই জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ততটা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে

ভারতীয়রা আবার ভারতের বাইরে গিয়ে তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করেছেন অতি প্রাচীন কাল থেকেই। ফলে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অবিরাম মিলন ও মিশ্রণ এবং আঞ্চলিক পরিবেশের প্রভাবে ভারতে বহু জাতি, ধর্ম ও ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। এবং ভারতবাসী এক মহান জাতিতে পরিণত হয়েছেন।

হিমালয়ের মতো ভারত মহাসাগরও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গঠন এবং বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। ভারতের তিন দিকে যে সাগর রয়েছে তা যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ভারতীয়গণকে সমুদ্রপথে বহির্জগতের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্য ও সংস্কৃতির আদান প্রদানে সাহায্য করেছে, তেমন বৈদিক যুগেও যে আর্যগণ সেই পথেই বাইরের সঙ্গে বাণিজ্য ও সংস্কৃতির আদান প্রদান করেছেন তার ও দৃষ্টান্ত মেলে ঋগ্বেদে।

অতি প্রাচীন কালে চীন, শ্যাম, বর্মা, কম্বোজ, সুমাত্রা, বোর্নিও, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় এই বাণিজ্য সূত্র ধরেই ভারতীয়রা পরে ওই সব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তাই ওই সকল দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ও নিদর্শন আজও বিদ্যমান। হিমালয় ও সমুদ্র উভয়েই ভারতকে করে তুলেছে শস্য-শ্যামলা। হিমালয় যেমন উত্তর দিক হতে আগত শুষ্ক বায়ুকে বাধা দিয়ে ভারত ভূমিকে রেখেছে সরস করে, তেমনি সমুদ্রও সজল বায়ু প্রবাহ দিয়ে তাকে করেছে বর্ষণ সিক্ত।

বিশ্বের বিস্ময় এই ভারতবর্ষ। এখনকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের কথা শুনে যুগ যুগ ধরে বহু জাতি ও উপজাতি তাঁদের সভ্যতা, ভাষা ও ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে এখানে এসেছেন। কোথাওতাঁরা প্রথম পরিচয়েই পরস্পরকে আঘাত হেনেছেন, আবার কোথাও গোড়া থেকেই মিলনের সুরে মেতে উঠেছেন।এবং বহুকাল পাশাপাশি বসবাস করতে করতে একসঙ্গে মিশে গিয়ে এক ভারতবাসী রূপেই পরিচিত হয়েছেন। মোটের ওপর বহু জাতি ও উপজাতি এক অজানা ডাকে দলে দলে এসে ভারত-জনসমুদ্রে মিশে গেছেন। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।"

ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কারও গায়ের রং তামাটে, কারও শ্যামবর্ণ, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ বা মাঝারি গড়নের, কারও দেহে লোম এবং গালপাট্টা দাড়ি, কেউ বা লোমহীন, কারও চুল ঢেউ খেলানো, কারও কোঁকড়ানো, কারও চুল খাড়া, কারও নাক চেপটা, কারও মাঝারি ধরণের, কারও বা খাঁড়া নাক, কারও ঠোঁট পুরু, কারও বা সরু—এইভাবে ভারতীয়দের দৈহিক গড়নেও রয়েছে এক অপূর্ব বৈচিত্র্যের লক্ষণ।

দৈহিক গড়ন, গায়ের রং, মাথা ও চুলের ধরণ অনুসারে পৃথিবীর জনসাধারণকে প্রধাণতঃ তিনটি বৃহত্তম ভাগে বা জাতিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—(ক) যাদের গায়ের রং কালো, চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু, নাক চেপটা, এবং দেহে স্বল্প লোম, মাথা লম্বা থেকে মধ্যমাকৃতির, চেহারা খুব বেঁটে থেকে লম্বা—তাদেরকে বলা হয় নিগ্রোয়েড; (খ) যাদের গায়ের রং পীতাভ, চুল খাড়া, ঠোঁট মাঝারি ও পুরু, মাথা মাঝারি থেকে চওড়া, চোখ ছোট, চোখের পাতা দিয়ে চোখ প্রায় ঢাকা, চেহারা মাঝারি-বেঁটে থেকে লম্বা এবং দেহে লোম অল্প বা নেই তাদেরকে বলা হয় মঙ্গোলয়েড আর (গ) যাদের গায়ের রং লালচে-ফরসা ও চেহারা মাঝারি থেকে বেশির ভাগ লম্বা, গায়ে লোম, নাক লম্বা ও সরু, মাথা লম্বা থেকে চওড়া, চুল খাড়া থেকে ঢেউ তোলা, ঠোঁট সরু থেকে মাঝারি, এবং গালপাট্টা দাড়ি তাদের বলা হয় ককেশয়েড। এছাড়াও আছে অস্ট্রালয়েড, দ্রাভিডিয়ান এবং আমেরিকান ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর লোক। অস্ট্রালয়েড এবং দ্রাভিডিয়ান—এই দু'শ্রেণীর লোকের দৈহিক গড়নের মধ্যে বিশেষ মিল আছে। যেমন—এই উভয় শ্রেণীর লোকদেরই গায়ের রং কালো, চুল ঢেউ তোলা অথবা কোঁকড়ানো মাথা সাধারণতঃ লম্বা, ঠোঁট মাঝারি থেকে পুরু এবং উচ্চতা বেঁটে থেকে মাঝারি। অস্ট্রালয়েডদের দেহে লোম বেশি এবং দ্রাভিডিয়ানদের দেহে লোম কম সিংহলের ভেদ্দাগণের দৈহিক গড়নের সঙ্গে এদের মিল আছে। অবশ্য ভেদ্দাগণ বেঁটে চেহারার। অস্ট্রালয়েড, দ্রাভিডিয়ান ও ভেদ্দাগণকে আদিম ককেশয়েডও

বলা হয়। কারণ এদের দৈহিক গড়নে ককেশয়েড ও নিগ্রয়েডগণের দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত ভাগগুলির যা-যা বৈশিষ্ট্য তা প্রায় সবই ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্মীয় এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান। মোটের ওপর ভারতীয়রা একটি মিশ্র জাতি। কাজেই ধর্ম ও শ্রেণী বিভাগ দিয়ে ভারতীয়দের বৃহত্তম জাতীয় বিশুদ্ধতা খুব একটা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

ভারতীয়দের দৈহিক বৈচিত্র্যের কারণ—ভারতের মাটিতে যে জনসমষ্টি বসবাস করছেন তাঁদের মধ্যে জাতিগত ভাবে রয়েছে বহু জনগোষ্ঠীর অবাধ মিশ্রণ। তাই ভারতবর্ষের জনসমষ্টির জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

অতি প্রাচীন কাল হতে আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হুন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি জাতি এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে এসে ভারতীয় জন সমুদ্রে মিশে গেছেন। পরে তাঁরা সকলে মিলে ভারতবাসী নামে এক মহান জাতিতে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের আজ আর পৃথকভাবে চিনবার উপায় নেই।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—'অত্যন্ত গৌরবর্ণের পারসী, অথবা কাশ্মীরী, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবী ও খুব বেঁটে চেহারাও কালো রংয়ের সাঁওতাল প্রভৃতি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর কতকগুলি চূড়ান্ত প্রতীক বাদ দিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ হতে সাধারণ ভারতবাসীর কয়েকজনের কানের মাকড়ী, লম্বা চুল, গালপাট্টা, উড়ে খোঁপা, লম্বা টিকি, ফোঁটা বা বিভূতির চিহ্ন ও মুসলমানী কায়দায় ছাঁটা গোঁফ প্রভৃতি প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক প্রতীক চিহ্ন বাদ দিয়ে একই ধরনের পোশাক পরিয়ে দিলে কোন প্রদেশের বা কোন সম্প্রদায়ের লোক তা বলা কঠিন হবে। অনুরূপভাবে ইংরেজী পোশাকপরা সাধারণ ভারতীয়কে বাংলায়, বাংলার বাইরে এমনকি ভারতের বাইরে দেখলেও কোন প্রদেশের লোক তা বলা কঠিন হয়।' পৃথিবীতে এমন জাতি নেই যাদের

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কিছু না কিছু ভারতীয়দের মধ্যে নেই। ভারতীয়রা যে এক মিশ্রজাতি—এ তারই ফলশ্রুতি। ডঃ স্মিথ যথার্থই বলেছেন—'ভারতবর্ষ একটি নৃতত্ত্বের যাদুঘর। শুধু তা-ই নয় ভারতের ভাষা, ধর্ম-বিশ্বাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ভারতে বসবাসকারী সকল জাতি ও ধর্মীয় জন গোষ্ঠীর অবদান-পুষ্ট।

ধর্মীয় প্রাচীর দিয়ে মানুষে মানুষে যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে তা অতি তুচ্ছ। ভারত-জনের অর্থাৎ ভারতের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ও আদিবাসী ধর্মে বিশ্বাসী জনসাধারণের আসল পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করলে তা অতি সহজেই অনুমেয় হবে। এছাড়া আজ যাঁরা আর্য বলে গর্ব বোধ করেন এবং যাঁরা অনার্য বলে আর্য চোখে অবহেলিত হন—এদুয়ের সভ্যতার আদি ইতিহাস আলোচনা করলে অতি সহজেই বোঝা যাবে—উক্ত গর্ববোধ ও অবহেলা—দু-ই মূলাহীন। কারণ স্মরণাতীত কাল হতে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে কারও অবদান কম নয়। এবং আধুনিক সভ্যতা ও ধর্ম বিশ্বাস আর্য ও অনার্য এ উভয়েরই অবদান পুষ্ট।

॥ ৫ ॥

নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকগণের মতে এখন হতে পাঁচ-ছ হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ আর্যদের ভারতে আগমনের আগে ভারতের প্রথম এবং প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল নেগ্রিটো জাতি। এরা বেশির ভাগ অরণ্য সমূহে বিশেষ করে সামুদ্রিক উপকূল অঞ্চলে বাস করত এবং পশু ও মাছ শিকার করত। শিকার লব্ধ মাংস বৃক্ষমূল ও মৎস্যই এদের আহার ছিল। কৃষিকাজ ছিল এদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। এই শ্রেণীর লোকদের সভ্যতা বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো জাতি, আন্দামান, নিকোবরের আদিবাসিন্দা ও আসামের আদিবাসীদের মধ্যে তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। এই নেগ্রিটো জাতির পরবর্তীরা হল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড শ্রেণীর লোক। নৃতাত্ত্বিকগণের মতে এরা ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম অধিবাসী। দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্যভারত, সিংহল এবং অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের আদিবাসীদের মধ্যে এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

এদের পরবর্তীরা হল অস্ট্রিক শ্রেণীর লোক, যাদের নিষাদ বলা হয়। আজকের সাঁওতাল, কোল, ভীল ও মুণ্ডারা যে ভাষা ব্যবহার করেন তা অস্ট্রিকভাষা। ভারতের গ্রামীণ সভ্যতার বনিয়াদ এই নিষাদদের হাতে গড়া। তারা কৃষিকাজ জানত। নৌকো ও তুলাবস্ত্র তৈরি করতে পারত, এবং বড় বড় নৌকো করে নদী ও সাগর পার হত। অস্ট্রিকগণ মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল—মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা পাহাড়ে, গাছে বা অন্য জীব-জন্তুর ভিতরে আশ্রয় নেয়। এছাড়া তারা মৃতকে মাঝে মাঝে আহার দান করত। এরা মৃতদেহকে বৃক্ষ-সমাধি দিত অর্থাৎ কাপড়ে বা বল্কলে জড়িয়ে মৃতদেহকে বৃক্ষের উপর রেখে দিত। যা এখনও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। আবার মৃতদেহ সমাধি দিয়ে তার উপর প্রস্তর খণ্ড দাঁড় করে পুঁতে রাখার প্রচলনও এদের মধ্যে ছিল যা মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে দেখা যায়। অস্ট্রিকদের আত্মায় বিশ্বাস ও মৃতের উদ্দেশ্যে আহার দানের ধারণাই পরবর্তীকালে হিন্দুদের মধ্যে যথাক্রমে পুনর্জন্মবাদ ও শ্রাদ্ধের ধারণা জন্মায়। ধর্মানুষ্ঠানে বা সমাজিক জীবনে পান-সুপারি, হলুদ, সিঁদুর, কলা, ধান প্রভৃতির ব্যবহার অস্ট্রিক জাতির দান বা প্রভাবের ফল বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন। মোটের ওপর হিন্দুদের পূজাপদ্ধতি, বিবাহ ও শ্রাদ্ধের নানা অনুষ্ঠান অস্ট্রিকদের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত। অস্ট্রিকভাষী জনগণই উত্তর ভারতের সমতল অংশে হিন্দু জনসাধারণে রূপান্তরিত হয়ে অস্ট্রিকত্ব বর্জন করেছে।

ভারতে অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে নেগ্রিটোদের মিশ্রন হয়েছে। উত্তর-ভারতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রধানত অস্ট্রিক জাতির লোকই বাস করত। তারা সেখানে একটি কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলে। গঙ্গানামটি অস্ট্রিক ভাষা থেকেই এসেছে বলে ভাষাবিদগণ মনে করেন। ভারত সভ্যতার মৌলিক ভিত্তি হল—কৃষিমূলক সংস্কৃতি এবং তা অস্ট্রিকগণেরই অবদান। এই অস্ট্রকগণের সঙ্গে নেগ্রিটো এবং পরবর্তীকালে দ্রাবিড় ও আর্যদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলেই হিন্দু-জাতির সৃষ্টি হয়। মোটের ওপর আর্য, অনার্য, নেগ্রিটো, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গণ মিশে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব হতে বিহার ও বঙ্গদেশ পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু শব্দটি প্রকৃত পক্ষে ইরানীদের দেওয়া। তদানীন্তন কালে সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে বাসবাসকারী সকল জনতাকেই হিন্দু বলা হত। যাহোক, অনার্যগণ বৈদিক ধর্ম ও হোম-যজ্ঞাদি ও ব্রাহ্মণগণের

শিক্ষা দীক্ষা অনেকাংশে মেনে নিলেন। পক্ষান্তরে অনার্য ধর্মও মরল না এবং তাদের ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম-বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান আর্যরাও অনেকাংশে গ্রহণ করলেন। এইভাবে আর্য অনার্যদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সভ্যতা মিলিত হয়েই হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও সভ্যতার সৃষ্টি হল। মোটের ওপর হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা, আর্য-অনার্যদের একটি মিশ্র ধর্ম ও সভ্যতা।

কেউ কেউ মনে করেন অস্ট্রিকগণ ইন্দোচীন ও বর্মা হতে উত্তর পূর্বপথ দিয়ে আসামের উপত্যকাভূমি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। আবার কারও মতে এরা পশ্চিম এশিয়া—সম্ভবত এশিয়া-মাইনর হতে ভারতে আসেন। এঁরা যে ভাষায় কথা বলত তা থেকেই কোল ও খাসিয়া ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। অস্ট্রিকদের গায়ের রং ছিল পীতাভ এবং দেখতে ছিল কতকটা মোঙ্গল জাতির মতো। এদের বিভিন্ন শাখা দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। এদের কয়েকটি শাখা ইন্দোচীনে, মালয়, দ্বীপময় ভারতের নানাস্থানে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতের গঙ্গার উপত্যকাভূমি, দক্ষিণ ভারতে ও হিমাচল ভূমিতেও এরা বসবাস করত। এদের একটি শাখা দক্ষিণে গিয়ে সেখানকার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত ও কিছু পরিবর্তিত হয়ে মালয় বা ইন্দোনেশীয় জাতি, প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে আরও মিশ্রণের ফলে মেলানেসীয় ও পলিনেসীয় জাতিতে পরিণত হয়। এদের যে শাখাগুলি ইন্দোচীনে রয়ে যায় তাদেরই উত্তর পুরুষ হল—দক্ষিণ বর্মা, শ্যামের মোন বা তালেঙ কাম্বোজের খমের এবং ব্রহ্ম, শ্যাম ও ফরাসী প্রভৃতি ইন্দোচীনের কতকগুলি অর্ধবর্বর জাতি। এদের একটি শাখা নিকবর দ্বীপে ও উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতবর্ষে খুব সম্ভবত নেগ্রিটোদের সঙ্গে অস্ট্রিকদের মিশ্রণ ঘটে। সেই সংমিশ্রণের ফলেই কোল বা মুণ্ডা জাতির উৎপত্তি হয়।

ভারতের অস্ট্রিকগণের সকল শাখাই যে কৃষি করত বা সুসভ্য ছিল তা নয়। এদের, কতকগুলি শাখা আবার বনে জঙ্গলে নেগ্রিটোর মতো শিকার করে বেড়াত। এই অরণ্যবাসী নিম্নশ্রেণীর অস্ট্রিকগণকেই নিষাদ বলা হত। এদেরই বংশধর হল আধুনিক কোল জাতির নানা শাখা, যেমন—সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা, ভূমিজ, হো, শবর, ও কুর্কু প্রভৃতি।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ভারতের হিন্দু মুসলমান জনতার মধ্যে আজকে নিষাদগণই একটি প্রধান উপাদান। একদিকে

অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদড়োর মাটি খুঁড়ে আর্য-পূর্ব যুগের জাতির এক বিরাট নগর সভ্যতা আবিষ্কৃত হল। এই সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন ইরান, মেসোপোতামিয়া, এশিয়া-মাইনর ও পূর্ব ভূমধ্য-সাগরের ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশের সঙ্গে এক অপূর্ব মিল খুজে পাওয়া গেল। ফলে ঐতিহাসিকগণ যে আর্য পূর্ব জাতি ভারতের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তাদের সঙ্গে ভারতের পশ্চিম দেশের প্রাক-আর্য যুগের আদিবাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করলেন। মিশর, ও মেসোপোতামিয়ার সমকালীন সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার মিল আছে। কারণ নগরজীবন, চিত্রলিপি, কুমোরের চাকা, পোড়ামাটির ইট, তামা ও ব্রোঞ্জের পাত্র ইত্যাদি উক্ত তিন সভ্যতারই বৈশিষ্ট্য। কেউ কেউ অনুমান করেন সুমের ও সিন্ধু সভ্যতার উৎস একই। সুমেরের সঙ্গে সিন্ধু দেশের সংস্কৃতিও বাণিজ্যের আদান প্রদানও ছিল বলে অনুমিত হয়।

ঐতিহাসিক পণ্ডিত ও নৃতাত্বিকগণ নানা দিক থেকে বিচার করে এরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আদিম দ্রাবিড় জাতিই ভারতের সুপ্রাচীন ও প্রাক আর্য যুগের সভ্যতার স্রষ্টা। অস্টিকদের পরবর্তী ধাপের লোক হল দ্রাবিড় জাতি। নৃতাত্বিকগণ মনে করেন দ্রাবিড়েরা অধিকাংশই নাগ অর্থাৎ সর্প পূজক জাতি হতে সৃষ্ট। গ্রীয়ার্সন বলেছেন—দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে অতি প্রাচীন-কালে সুদূর প্রাচ্য-ভারতের মন-খেমের জাতির মিশ্রণ ঘটেছে। রিচার্ডসণ বলেছেন—এদের মূলে নিগ্রয়েড মিশ্রিত মেলানেশীয় জাতির রক্ত আছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর মাটি খুঁড়ে যে নগর সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে তা এই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর হাতে গড়া সভ্যতারই নিদর্শন। কেউ কেউ মনে করেন দ্রাবিড়গণ ভারতবর্ষ হতেই তাদের নগর সভ্যতা পশ্চিম দিকে বহন করে নিয়ে যায়। কারণ ওই সকল দেশের প্রাচীন সভ্যতায় যে সকল চিত্রলিপি পাওয়া গেছে তার চেয়ে ভারতের সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত লিপি প্রাচীনতর বলে অনুমিত হয়েছে। তবে ভাষাতত্ত্ব থেকে অনেকে মনে করেন দ্রাবিড়গণ পশ্চিম অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে ভারতে এসেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব তিনশত বছর আগে ক্রীট দ্বীপে, প্রাচীন গ্রীকে, লিসিয়া বা লুকিয়া প্রভৃতি এশিয়া-মাইনরের দক্ষিণ অঞ্চলে আদি দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল। এদের জাতীয় নাম ছিল সম্ভবতঃ দৃমিল অথবা দৃম্মিঝ। পরবর্তীকালে

লিসিয়া বা লুকিয়ার লোকেরা এই নাম তৃম্মিলি রূপে লিখত। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এই নাম তের্মিলাই রূপে লিখে গেছেন। এই জনগোষ্ঠীর লোকেরাই আর্যদের আগমনের পূর্বে কোনো এক সময়ে ইরাক, ইরান, বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান হয়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে এসে বসবাস সুরু করে এবং সেখানে নগর সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করে। এর পর তারা তাদের ভাষা ও সভ্যতা নিয়ে রাজপুতনা মহারাষ্ট্র হয়ে দক্ষিণভারতে প্রসার লাভ করে। এদের অনেক দল আবার গাঙ্গেয় উপত্যকায়ও বসবাস সুরু করে। এই মানব গোষ্ঠীর লোকেরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতেই নৌকো তৈরি পদ্ধতি ও পুরুষ প্রকৃতির পূজা নিয়ে আসে। এবং এদের পুরুষ প্রকৃতি পূজাই পরবর্তীকালে শিব ও উমার পূজা স্বরূপ পৌরাণিক ধর্ম সৃষ্টি হয়। শিব ও গৌরী মিশরে পরিবর্তিত হয়ে অসিরিস ও আইসিস নামে পূজিত হয়েছে। শিব সংস্কৃতির ভারতীয় ধারাই প্রথমে নিকট প্রাচ্যে, গ্রীসে ও পরে মিশরে আনীত হয় বলে পণ্ডিতগণ ধারণা করেন। এই জাতীয় লোকদের আর্যেরা প্রথমে দ্রমিল বা দ্রমিড় অথবা দ্রবিড় রূপে অভিহিত করে। পরবর্তীকালে পালি ও সিংহলী ভাষায় এই দ্রমিল নাম দমিল রূপে দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের পরে প্রথম সহস্রকে এই নামই তমিল ভাষায় তমিঝ বা তমিল রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় যেমন দ্রাবিড় ভাষা এসেছে অনুরূপভাবে দ্রাবিড় ভাষায় ও সংস্কৃত বা আর্য শব্দ এসেছে। আর্যরাই প্রথমে এদেশে ঘোড়ার আমদানী করেছিল। কিন্তু আর্য ভাষার শব্দ অশ্ব ক্রমে তাদের ভাষায় সীমিত হয়ে অনার্য দ্রাবিড় শব্দ ঘোটক রূপে আর্য ভাষায় গৃহীত হল। আবার এই ঘোটক শব্দই আধুনিক আর্যভাষায় ঘোড়ারূপে বিদ্যমান।

ভারতীয় সভ্যতা পত্তনের প্রাথমিক ইতিহাস সন্ধানে সচেষ্ট হয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ আদি দ্রাবিড় ও আদি আর্যদের সংঘাত, মিলন ও মিশ্রণের অনেক ইতিহাসই স্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে ভারতসভ্যতা পত্তনে দ্রাবিড়দের অবদান আর্যদের চেয়ে অনেকাংশে বেশি।

ভারতের পশ্চিমাংশে এবং দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়গণ অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। এবং উত্তরপূর্ব ভারতে ও এদের বসতি বিস্তার হয়েছিল। আর অস্ট্রিকগণ উত্তর পূর্বে ও গাঙ্গেয় উপত্যকার কতকাংশে প্রবল ছিল। দ্রাবিড়গণ

অস্ট্রিকদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করত। ফলে নানাদিক দিয়ে ভারতের সর্বত্রই অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের মধ্যে খুব মিলন ও মিশ্রণ ঘটেছিল।

অস্ট্রিকদের সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক, আদিম ও গ্রামীণ। আর দ্রাবিড়দের সভ্যতা ছিল নগর ভিত্তিক। তবে দ্রাবিড়রাও চাষবাস করতে পারত। গম ও যবের চাষ এরাই প্রথমে এদেশে প্রচলন করেছিল বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানে ছোটনাগপুরে দ্রাবিড় জাতীয় ওঁরাও ও অস্ট্রিক জাতীয় মুণ্ডারা পাশাপাশি বসবাস করছে। প্রাচীনকালে উত্তর ভারতে ও বঙ্গদেশেও অনুরূপভাবে বসবাস করত। গাঙ্গেয় উপত্যকাতেই এই দুজাতের লোকের মধ্যে বেশি মিশ্রণ হয়। তবে দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে এবং তামিল দেশে দ্রাবিড়দের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। মোটেরওপর দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকদের চেয়ে অনেকাংশেই বেশি সভ্য ছিল। এরা বড় বড় নগর নির্মাণ করেছিল। এছাড়া হিন্দু সভ্যতার অনেক উপকরণই দ্রাবিড়দের কাছ থেকে নেওয়া।

ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যেই প্রথমে শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনা প্রচলিত ছিল। এছাড়া যোগ সাধনার মূলতত্ত্ব ও দ্রাবিড়দের মধ্যেই প্রথমে উদ্ভূত হয় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। অস্ট্রিকরা গরু পালতে জানত না। কিন্তু দ্রাবিড়রা আর্যদের মত গোপালন করত।

মোটের ওপর আর্যদের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ভারতে যে একটি উঁচুদরের সভ্যতার পত্তন হয়েছিল এরূপ ধারণা আগে অনেকেরই ছিল না। মহেনঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার মাটি খনন করেই তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দু সভ্যতার অনেক বেদ-বিরোধী ও বৈদিক জগৎ বহির্ভূত উপাদান দ্রাবিড়দের দান বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভারত সংস্কৃতি' হতে দ্রাবিড় সভ্যতার কিছু পরিচয় এখানে সংক্ষেপেতুলে ধরা হল—'দ্রাবিড়দের রাজা থাকতেন, রাজারা সুরক্ষিত বাটীতে বাস করতেন, তাঁরা প্রদেশের উপর রাজত্ব করতেন। তাঁদের কবি অথবা চারণ থাকতেন। উৎসবের দিনে কবিরা কবিতা গান করতেন। দ্রাবিড়েরা লিখন কার্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল। লেখনী দিয়ে তালপত্রে তারা লিখন-কার্য করত। কতকগুলি লিখিত তাল-পত্র দিয়ে তারা বই তৈরি করত। নানা দেবতার পূজা তাদের মধ্যে

থাকলেও এরা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা এক ঈশ্বরেরও পূজা করত—সেই ঈশ্বরের নাম ছিল রাজা। এই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তারা রাজপ্রাসাদ বা মন্দির বানাত। তাদের মধ্যে লোক ব্যবহার ও আইন-কানুন ছিল। কিন্তু বিচারপতি বা ব্যবহারজীবীর কথা পাওয়া যায় না। ধাতুর মধ্যে তারা সোনা, রূপা, তামা এবং লোহার ব্যবহার জানত। কিন্তু টিন, শীশা ও দস্তার ব্যবহার তাদের জানা ছিল না। বুধ ও শনি ব্যতীত অন্য দিনগুলির নামকরণ তারা করেছিল। তাদের নগর ছিল। নানাপ্রকারের নৌকো, এমনকি জাহাজে করে তারা সাগর-গমন করত। কৃষিকার্যে তারা বিশেষ দক্ষ ছিল এবং তারা যুযুৎসু জাতি ছিল। যুদ্ধে ধনু, শর, বর্শা তরবারী প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করত। সূতা-কাটা, কাপড়-বোনা, কাপড় রঙকরা হাঁড়ীকুড়ী গড়া প্রভৃতি সাধারণ অনেকগুলি বৃত্তি তাদেব মধ্যে প্রচলিত ছিল।'

দক্ষিণ ভারতের ভাষা, সভ্যতা ও জনসমষ্টিতে দ্রাবিড় জাতির সভ্যতার নিদর্শন আজও বিদ্যমান। দ্রাবিড়দের স্বতন্ত্র সভ্যতার এক অনপনেয় নিদর্শন স্বরূপ তামিল ভাষা তার এক বিরাট সাহিত্য নিয়ে দক্ষিণ ভারতে বিদ্যমান।

দ্রাবিড়দের পরবর্তী ধাপের লোক যারা ভারতে এল তারা হল আর্য। প্রথমে দাস বা দস্যু নামক দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে আর্যদের যে বেশ সংগ্রাম করতে হয়েছিল তার ইঙ্গিত বেদেও আছে। জানা গেছে সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে দ্রাবিড়গণ দক্ষিণ ভারতে চলে যায়, আর আর্যগণ উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করে। এবার এই আর্যদের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে।

আর্যরা যে ভারতের বাইরের কোনো দেশ হতে এসেছিলেন এরূপ একটি প্রমাণও বেদে পাওয়া যায়নি। বরং ঋগ্বেদে আছে—আর্যরা কতিপয় যজ্ঞহীন গোষ্ঠীকে ভারতের বাইরে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক অবিনাশ চন্দ্র দাস 'ঋগ্বেদিক ইণ্ডিয়াতে' দেখিয়েছেন আর্যদের আদি-বাসস্থান ছিল উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে কাবুল উপত্যকা এবং পূর্বে সরস্বতী এবং মধ্যে সপ্তসিন্ধু বিধৌত বিভাগ। আর্য সংস্কৃতি ভারতের সরস্বতী নদীর তীরে সৃষ্ট হয়ে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং প্রাচীনকালে ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণই কেবল নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দিতেন। পারসিকেরা নিজেদের অইর্য বলতেন। এবং পারস্য সম্রাট দারায়ুস তাঁর বিহিস্থান শিলালিপিতে নিজেকে

অইর্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। নানা প্রকার ধর্মশাস্ত্র বর্ণিত-জনশ্রুতি হতেও জানা যায়—আর্যগণ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমা অতিক্রম করে হিমালয়ের অপরদিকে ইরান, শক, বহ্লীক প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

আর্যরা ভারতবর্ষ থেকে যে বাইরে গিয়েছিলেন তার স্বপক্ষে সেরূপ কোনো জোরালো বড় প্রমাণ নেই। তবে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যাবিলোন, এশিয়া-মাইনর অঞ্চলের যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ভারতের প্রাচীন ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

অবশ্য আর্যরা যে ভারতের বাইরে থেকে এদেশে এসেছেন সে সম্পর্কে ও নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন—এখন হতে চার হাজার বছর পূর্বে এশিয়ায় আদি আর্যজাতি বাস করত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোনো কারণে আর্যদের সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় তারা অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার সন্ধানে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া তাদের একটি শাখা চলে যায় ইউরোপে সেখানে তারা রুশ, গ্রীস, ইতালী, জারমানী ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বসবাস শুরু করে। সুতরাং ওই সকল দেশের শ্লাব. গ্রীক, ইতালীয়, টিউটন, কেলট প্রভৃতি জাতির লোকেরাও প্রাচীন আর্যদেরই বংশধর। আর্যদের একটি শাখা মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণে পারস্য দেশে যায় এবং আর একটি শাখা চলে আসে ভারতবর্ষে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার বলছেন যে, ভারতীয়, গ্রীক. পারসিক. রোমান, জার্মান এবং কেল্ট জাতির পূর্ব-পুরুষগণ মূলতঃ যে এক সঙ্গে বসবাস করতেন তা তাদের ভাষা পাঠে জানা গেছে। সংস্কৃতে পিতৃ ও মাতৃ, পারসিক পিদর ও মদর, ইংরেজী ভাষার ফাদার ও মাদার এবং ল্যাটিন ভাষার প্যাটার ও ম্যাটার এর দ্বারা একই পিতা মাতাকে বোঝায়। এতে প্রমাণিত হয়—ওই সকল জাতির পূর্ব পুরুষেরা একই জায়গায় বাস করতেন। ম্যাক্সমূলারের মতে আর্যদের প্রধান শাখা উত্তর ও পশ্চিম দিকে গিয়েছিলেন। ইউরোপের আর্যগণ কাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়ে এশিয়া-মাইনরের ভেতর দিয়ে গ্রীস ও ইতালি দেশে পেঁাছে ছিলেন এবং তাঁদেরই একটি শাখা উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

কেউ কেউ এরূপ ধারণাও পোষণ করেন যে, এখন হতে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক তিন সহস্র বছর আগে মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের

কোনো অংশে অথবা রুশ দেশে উরাল পর্বতমালার দক্ষিনের সমতল স্থানে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যজাতির উৎপত্তি হয়েছে। এবং ওইস্থানই আর্যদের আদি পিতৃভূমি ছিল। আবার অনেকে মনে করেন—ভারতবর্ষে আসবার আগে আর্যরা মেসোপোতামিয়ায় আসে। উত্তর দিক থেকে ককেসস্ পর্বত পেরিয়ে অথবা উত্তর গ্রীসে ম্যাসিডন ও থ্রেশিয়া এবং কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে এশিয়া মাইনরের উত্তর ভাগ হয়ে তারা দলে দলে প্রথমে মেসোপোতামিয়ায় আসেন। সেখানে বাবিল ও আসুরীয় প্রভৃতি কয়েকটি সুসভ্য জাতি বাস করতেন। এরা তাঁদের সংস্পর্শে আসে। এই নবাগত মানবগোষ্ঠীর কতকগুলি গোত্র ঐ সব অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। কোথাও কোথাও তারা স্থানীয় লোকদের জয় করে তাদের রাজা বনে বসেন এবং গৌরবময় স্থান করে নিতে সমর্থ হন। এঁদেরই একটি দল ব্যাবিলোন দখল করে সেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে রাজত্ব করেন. এই আর্যদের যেসব দল ওই সকল দেশে রয়ে যান তাঁরা কালক্রমে ওই স্থানের লোকদের সঙ্গে মিশেগিয়ে তাদের ভাষা গ্রহণ করে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রায় হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য এদের রাজা বা প্রধান এবং দেবদেবতার দু'চারটেনাম একবারে না মুছে গিয়ে ওই সকল স্থানের লোকদের ভাষার মধ্যে রক্ষিত হয়ে আছে। এঁরা ওই স্থানে প্রথমে ঘোড়া আনেন এবং তাঁরা যে ভাষা বলতেন তা বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাচীন ইরানীয় ভাষার জননী। কারণ এই আদি আর্যদেরই কতকগুলি দল পূর্বে পারস্য দেশে ও ভারতবর্ষে এসে বসতিস্থাপন করেন। এঁরা ভারতবর্ষে তাঁদের ধর্ম ও দেবতাবাদ ও কিছু কিছু মন্ত্র বা সূক্ত নিয়ে আসেন, কিন্তু ঐ সংস্কৃতি তাঁদের নিজস্ব হলেও তার মধ্যে বাবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম এশিয়ার অপরাপর সভ্য জাতির যথেষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই আদি আর্যগণ মেসোপোতামিয়া ও ইরানে নিজেদের দেবতাদের বিষয়ে যে সকল স্তোত্র রচনা করলেন সেই সব কিছু কিছু ভারতবর্ষে নিয়ে এলেন। ওই সব স্তোত্র এর কিছু কিছু ব্যাস ঋষি লিখিত বেদ সংহিতায় সংগৃহীত হয়ে আছে।

যে সকল দল বা গোত্র মেসোপোতামিয়ায় বাস করলেন না তারা পরে পূর্ব দিকে এলেন এবং তাঁরাই প্রকৃত পক্ষে ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যগণের পূর্ব পুরুষ।

পশু´ বা পার্শ্ব বা পার্স´, পার্থব, শক ও মদ প্রভৃতি আর্যগোত্রগণ পারস্য দেশে রয়ে গেলেন। কুরু, শিবি, মদ্র, দ্রুহ্য, ত্রিৎসু, পুরু ও ভৃগু, প্রভৃতি নানা গোত্র চলেএলেন ভারতে। এই সময়ে ভারতে এবং ইরানে বিশেষ করে পূর্ব ইরানে

একই শ্রেণীর অনার্য জাতি বাস করতেন যাঁদের আর্যরা দাস বা দস্যু নামেও অভিহিত করেছেন! সম্ভবতঃ এঁরাই ছিলেন সিন্ধু ও সুমের সভ্যতার জনক। আর্যদের সঙ্গে এই দাস বা দস্যুদের যে সংঘর্ষ ঘটেছিল তার কিছু কিছু পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে অথবা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। পরে এই আর্যদের সঙ্গেই অনার্যদের মিলন ও মিশ্রণ ঘটে। ফলে উভয় ধর্মবিশ্বাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে এক অভূতপূর্ব আদান প্রদান ঘটে। আর্যরা অনার্যদের অনেক কিছুই নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে গ্রহণ করে নেন।

যাহোক, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে আর্যরা নিজেদের দেশে আদিম অবস্থায় যে খুব সুসভ্য ছিলেন তার পাথুরে প্রমাণ কিছুই নেই যেমন আর্যপূর্ব জাতিদের আছে। মাত্র হাজার দুই বছরের আগেকার ইতিহাস, মহাকাব্য আর পুরাণ গ্রন্থ গুলি ছাড়া আর্য সভ্যতার প্রাচীন সাক্ষ্য আর কিছুই নেই। অথচ মিশর, ব্যাবিলোন, আসিরিয়া, এশিয়া-মাইনর, ক্রিট দ্বীপে তিন চার এমনকি পাঁচ হাজার বছরের ও জিনিস পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার মাটি খুঁড়ে যে নগর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তাও চার পাঁচ হাজার বছর আগেকার। এসকল সভ্যতাই আর্য-প্রাক জাতির অর্থাৎ আর্যদের ভাষায় যারা অনার্য তাদেরই হাতে গড়া সভ্যতা। এগুলির সঙ্গে আর্যদের কোনোই সম্পর্ক নেই।

আদিম অবস্থায় আর্যরা যখন কিছু কিছু চাষবাস ও মেষ চারণ বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন তখন কিন্তু অন্যত্র কতকগুলি সভ্যতা, গড়ে উঠেছিল। ওইগুলি হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বছরেরও আগের সভ্যতা, যেমন—মিশর, ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার সভ্যতা। এছাড়া ও হচ্ছে এশিয়া-মাইনর ও পূর্ব গ্রীসের সভ্যতা। জ্ঞান-বিজ্ঞান, বড় বড় অট্টালিকা, দেবমন্দির, ভাস্কর্য ও মূর্তিশিল্প, শিলালিপি ও মৃৎ বা মৃন্ময়লিপি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিজয় বার্তা প্রভৃতিকে ভিত্তি করেই এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। অথচ আদি আর্যদের এসকল কিছুই ছিল না।

মেসোপোটেমিয়া ও মিশরের লোকেরাই প্রথমে গরু ও গাধার পোষ মানায়, এবং অনেকে মনে করেন—আদিম আর্যরা ঘোড়ার ব্যবহার জানলেও গোপালন প্রকৃতপক্ষে মেসোপোটেমিয়া থেকেই তাঁদের মধ্যে প্রচলিত হয়। মেসোপোটেমিয়ার সুমের-জাতির ভাষার মূল থেকেই আদিম আর্য শব্দ বা

সংস্কৃত 'গৌ, গো' শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে ঘোড়া ছিল রুষদেশের বন্য পশু। আর্যরাই প্রথমে ঘোড়াকে পোষ মানান এবং ঘোড়ার পিঠে চড়েন। কখনও বা দু'ঘোড়ায় টানা দু'চাকার গাড়ী বা রথে চড়ে অল্পদিনে দূর পথ অতিক্রম করতেন। মিশর, আসিরীয়-বাবিলন, এশিয়া-মাইনর আর গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় আর্যরা পার্থিব সভ্যতায় অর্ধবর্বর হলেও তাঁরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত সুসংবদ্ধ, কর্মক্ষম ও ভাবনা শক্তিতে বলবান এবং আত্মবোধযুক্ত। তাই উক্ত স্থানগুলির তদানীন্তন সুসভ্য অধিবাসীরা আর্যদের অগ্রগতি ব্যহত করতে পারেন নি। আদি আর্যরা দেবতা পূজা করতেন না। হোমই ছিল তাঁদের বিশেষ উপাসনা রীতি। এই আর্যদের ধারণা ছিল দেবতারা আকাশে থাকেন, তাঁদের দূত বা মুখপাত্র হল অগ্নি। আর্যরা বেদী তৈরী করে তাতে কাঠের আগুন জেলে ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, পূষা, অগ্নি, অশ্বিদ্বয়, উষা, মরুদগণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে দুধ, ঘি, মাংস, যবের রুটী, সোমরস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আহুতি দিতেন। দেবতারা আগুনের মাধ্যমে ওই সব জিনিস পেয়ে খুশী হতেন। এবং যিনি হোম করতেন তাঁকে দেবতারা প্রচুর শস্য, পুত্রসন্তান, অশ্ব ও স্বর্ণদান করতেন।

মোটের ওপর আর্যদের জীবন ছিল যজ্ঞময়। অগ্নি আর ইন্দ্র ছিলেন বেদের দুই মুখ্য দেবতা। অগ্নি দেবতাদের মুখ এবং এই অগ্নিমুখেই দেবতারা যজ্ঞ গ্রহণ করেন। ভারতীয় আর্য ঋষিগণ অরণি সংঘর্ষে অগ্নি স্থাপন করতেন। এবং এ প্রথা প্রাচীন ব্যাবিলোনীয়, জরথুষ্ট্রীয় ও হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর এই অগ্নি রক্ষার জন্যই অগ্নিহোত্র। মিশরীয়দের প্রতি মন্দিরে অগ্নি রক্ষা করা হত। এবং পারসিক, গ্রীক ও ল্যাটিন জাতি সকলের মধ্যে অগ্নি রক্ষার প্রচলন ছিল। রোমের ভেষ্টার মন্দিরেও অগ্নিকে চির-প্রজ্জ্বলিত রাখার ব্যবস্থা ছিল। অগ্নি পূজাই আর্যজাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে আর্যদের সকল শাখায় যেমন—ল্যাটিন, শ্লাভ, পারসিক, লিথুনীয়, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় অগ্নির উল্লেখ আছে। প্রত্যেক গ্রীক গৃহস্থের ঘরে অগ্নি রক্ষিত হত এবং অগ্নির পূজা হত।

আর্যদের মধ্যে ইষ্টযাগ ও পশুযাগ প্রচলিত ছিল। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ইষ্টযাগ অনুষ্ঠিত হত। পশুযাগে পশুকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হত। এই যাগের দেবতা ছিলেন ইন্দ্র ও অগ্নি। প্রাচীন কালে ইরানীদের মধ্যে সোমযাগ প্রচলিত ছিল। আবেস্তাশাস্ত্রেও সোমের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

গ্রীকদের আখ্যায়িকায় আছে—দেবরাজ জিউসের জন্য ঈগলপাখী মধু

এনেছিল। জার্মানদের উপাখ্যানে ছিল দেবরাজ অধীন (Odhin) ঈগলরূপ ধারণ করে মধু এনেছিলেন। এই মধুরই অপর নাম সোম। সোম কেবল বেদবাদীদের প্রধান দেবতা নহেন। সোম সমস্ত আর্যজাতিরই অতি প্রধান ও প্রাচীন দেবতা। এবং সোমযাগ আর্য সংস্কৃতির অতি প্রাচীনতম জাতীয় অনুষ্ঠান। দই, দুধ, ঘি, এবং রুটি (পুরোডাশ) বা পিষ্টক (পীঠে) প্রভৃতি আহুতি দিয়ে যে যজ্ঞ সম্পন্ন হত তাকে হবির্যজ্ঞ বলা হত। কিন্তু সোমরস বা মধু আহুতি দিয়ে যে যজ্ঞ করা হত তাকে সোমযজ্ঞ বলা হত। এই যজ্ঞ ভারতবর্ষে আর্যদের মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হলেও সোমযাগের সূচনা ভারতে হয়নি। এবং এটি ভারতের কাছে একটি বৈদেশিক অনুষ্ঠান। কারণ সোমলতা ভারতের দ্রব্য নয়, বা ভারতে সৃষ্টিও হয় না। বেদমন্ত্র হতে জানা গেছে—সোমলতা পারস্য, গান্ধার প্রভৃতি স্থানে পার্বত্য অঞ্চলে জন্মে। প্রাচীনকালে পারস্য দেশে সোমযজ্ঞের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। অথর্ববেদে গোপথ ব্রাহ্মণে আছে—ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষিই প্রথমে সোমযজ্ঞ প্রচলন করেন। এখানে উল্লেখ্য—সোমলতা ভারতের নয় তা বলা চলে না। কারণ গান্ধার, আফগানিস্থান, চিত্রল, হিন্দুকুশ, পামীর প্রভৃতি আর্য সংস্কৃতির পীঠস্থান। বৈদেশিকগণ এ স্থানগুলিকেও ভারতীয়দের বাসস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। এ সকল স্থানের ভাষাও বৈদিকভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক গ্রীয়ার্সন বলেছেন—এখানেই বেদ রচিত হয়েছে এবং পারসিকগণ পৃথক হওয়ার আগে এই স্থানে বাস করতেন। তাই পারসিকও বৈদিক সংস্কৃতি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

আর্যদের মধ্যে বলিদান যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। এই অনুষ্ঠানের জন্য জাতদন্ত, নীরোগ, পুষ্ট এবং অবিকৃতাঙ্গ একটি মাত্র ছাগ যজ্ঞস্থলে এনে ঋত্বিকেরা উচ্চৈস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং আধুনিক বলিদান প্রথায় পশুটিকে হত্যা না করে ওটিকে মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে বধ করতেন। এবং যে কোনো লোক একাজ করতে পারতেন। বলি দেওয়া ছাগটির দেহের বিশেষ কতকগুলি অংশ বাদ দিয়ে সামিত্র নামক অগ্নিকুণ্ডে পাক করে তা মন্ত্র ও গানের মাধ্যমে আহুতি দেওয়া হত। এই হোমের নাম অগ্নিষ্টোমীয় পশুযাগ।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণাবিভাগ ক্রমে দ্বাদশ শত গাভীর অভাবে শত গাভী এবং সুবর্ণ বস্ত্র, অশ্ব, গর্দভ, মেষ, ছাগ, অন্ন, যব, মাসকলাই প্রভৃতির প্রয়োজন হত। হিন্দুগণ মনে করেন—মুসলমানগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এককোপে পশু বধ

না করে নিষ্ঠুরভাবে পুচিয়ে পুচিয়ে কাটেন। কিন্তু হিন্দুদের পূর্বপুরুষ আর্যগণও বলিদান কালে যজ্ঞের পশুকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতেন।

পারসিকদের দেবার্চ্চনা সম্বন্ধে হেরোডোটাস লিখেছেন—পারসিকগণ গ্রীকদের মতো দেবদেবীকে মানুষের মতো স্বভাবসম্পন্ন মনে করেন না। তাই তাঁরা দেবতাদের কোনো মূর্ত্তি গড়েন না, বা মন্দিরও নির্মাণ করেন না। এই কারণে দেবতাদের পূজা দিতে হলে তারা উঁচু পাহাড়ের চূঁড়ায় আরোহণ করেন। পারসিকগণ তারা, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, জল ও বায়ুকে পূজা দেন। এসকলকে তাঁরা প্রাচীনকাল হতে পূজা করে আসছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁরা আসিরীয়দের নিকট থেকে শিখে উরেনিয়া দেবীর পূজা আরম্ভ করেন। এই দেবীকে আসিরীয়গণ মীলিটা নামে এবং আরবীয়রা একে আলিটা নামে পূজা করতেন। আর পারসিকেরা এই দেবতার নাম দিয়েছেন মিত্র। এর উদ্দেশ্য দেওয়া বলির পশুটিকে নিয়ে এসে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হয়, তারপর যজমান দেবতার নাম উচ্চারণ করে তাঁর করুণা ভিক্ষা করেন। তাঁকে নিজের সঙ্গে রাজাও সকল দেশবাসীর মঙ্গল প্রার্থনা করতে হয়। এরপর বলির পশু টুকরো টুকরো করে কেটে তার মাংস রান্না করে নরম তৃণের উপর রাখা হয়। এবং একজন ম্যাগি বা পুরোহিত এসে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এরপর যজমান মাংস নিয়ে যান। রাস্তায় দেখা হলে এদের রীতি হল—পস্পরকে মুখ চুম্বন করা ও গুরুজনকে দেখলে সাস্টাঙ্গে প্রণাম করা। সুমেরর মন্দির ও ব্যাবিলনেও যজ্ঞ এবং বলিদান প্রথা ছিল।

মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বেদ ও পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা উভয়েই স্বীকৃত হয়েছে। হিন্দুদের মত পার্শী সমাজেও যজ্ঞানুষ্ঠান, পুরোহিত ও উপনয়ন প্রথা চালু আছে। এ ছাড়া বেদ যেমন ঋক্, যজু, শ্যাম ও অথর্ব এই চারভাগে বিভক্ত, সেরূপ আবেস্তাও যস্ন, যস্ত, বিশ্বরতু ও বিদৈব দাত এই চারভাগে বিভক্ত। বেদে যেমন চারবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র রয়েছে তেমন আবেস্তায়ও প্রায় একই অর্থবাহক চারবর্ণের উল্লেখ আছে। তা হল—(১) অথর্ব, অর্থাৎ [illegible] (২) রথেষ্টৈন অর্থাৎ যোদ্ধা (৩) ভস্ত্রীরোস্নি অর্থাৎ কৃ[illegible] এবং [illegible]টম অর্থাৎ শ্রমজীবী। আর্য সমাজে যেরূপ ব্রাহ্মণ [illegible] ও বৈশ্যগণ উপবীত ধারণে অধিকারী সেরূপ প্রাচীন পারসিকগণের [illegible] প্রথমোক্ত তিনবর্ণ অর্থাৎ অথর্ব, রথেষ্টৈন এবং ভস্ত্রীরেস্তির। উপবীত গ্রহণ [illegible]

পারসিকগন দাড়ি রাখতেন এবং ভারতীয়গণের মধ্যেও দাড়ি রাখার প্রথা ছিল। ব্যাবিলনীয়ও মিশরীয়দের মধ্যে সুন্নত করার প্রথা ছিল। আরব ও ইহুদী জাতির মূলধর্ম শাস্ত্র—ওল্ড টেষ্টামেণ্ট। এই পুস্তকে লিখিত ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ হলেন মোজেস। ইনিই হলেন এই দুজাতির ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ। এবং এঁরই আদেশে ইহুদী ও মুসলমানদের ধর্মাচরণের সঙ্গে সুন্নত অত্যাবশ্যকভাবে জড়িত হয়। জানা গেছে—আরব জাতির পূর্ববর্তী স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন যাযাবর ও অনুন্নত আমুররগণ। এঁরা হিট্টাইট ও সুমেরীয় সংস্পর্শে সুসভ্য হয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আক্কাদ ও আসীরীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন। আরবদের পরবর্তী যাযাবর জাতি হলেন ইহুদী। এঁরাও ফিনিসীয় ও হিট্টাইটদের মধ্যে মিলে যান এবং এঁদের জাতিগত দেবতা ছিলেন ইহোভা।

আর্যদের কাছে পূজার রীতি প্রচলিত ছিল না। প্রতিমা পূজা, দেব প্রতীকের পায়ে বা উদ্দেশ্যে ফুল, পাতা, চন্দন, সিঁদুর প্রভৃতি দেওয়া, চাল ও ফলমূলের নৈবেদ্য এবংবলিদানের পর পশুর মুণ্ড বা পাত্রে করে তার রক্ত নিবেদন করা প্রভৃতির কিছুই আর্য বা বৈদিক রীতি নয়। এছাড়া পূজা শব্দটিও প্রকৃতপক্ষে দ্রাবিড় ভাষার মূল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। এই অনার্য দেবদেবী ও তাঁদের পূজানুষ্ঠান আর্য সমাজে প্রবিষ্ট হয়। অনার্যদের দেবতা যেমন—শিব, উমা, বিষ্ণুও অনুরূপভাবে আর্যদের দেবতার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যান। শুধু তাই নয় অনার্যদের বৃক্ষ-দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, নাগ এবং দৈবশক্তির বিকাশরূপে পশু পক্ষীর প্রতীকের মাধ্যমে পূজা প্রভৃতিও এসে যায় আর্য ধর্মবিশ্বাসে।

ঐতিহাসিকগণ রামায়ণের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার না করলেও তাঁরা স্বীকার করেন—রামায়ণে ও অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানে কিছু ঐতিহাসিকত্ব আছে। তাই মহাভারতের পাত্রপাত্রী আর্যপূর্ব যুগের মানুষ। এবং মহাভারতের মূল আখ্যান অনার্য রাজাদের নিয়ে লিখিত। কিন্তু পরবর্তী কালে অনার্য-আর্য মিশ্রণের ফলে এবং তাদের ভাষা আর্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আখ্যানভাগের পরিবর্তন হয় এবং তা শেষে সংস্কৃত-মহাভারতে রূপান্তরিত হয় এবং অবশেষে তা অনার্য-আর্য জাতি মিশ্রণের মাধ্যমে সৃষ্ট হিন্দুজাতির কাছে এক সাধারণ সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়ও আর্যদের পরবর্তীরা হল ভোট-চীন জাতির লোক। য়াঙৎসেকিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থলে ভোট-চীন জাতির পিতৃভূমি ছিল। এরা

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের দিকে আসে। এবং প্রথমে হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে ভোট বা তিব্বত হতে এদের কতকগুলি শাখা ভারতে আসে। এবং কতকগুলি শাখা আসামের ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা দিয়ে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে প্রবেশ করে। চীন দেশে এই জাতির এক বিরাট সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ভারতে তাদের কোনোপ্রকার বড় রকমের সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। এরা বাংলাদেশে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতা মেনে নিয়ে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বাংলার বাঙ্গালীদের মধ্যে মিশে গিয়েছে। তবে উত্তর পূর্ব ভারতের কোথাও কোথাও তাদের পৃথক সত্বাও বর্তমান আছে।

বহুকাল পাশাপাশি অঞ্চলে বসবাসের ফলে নিগ্রো জাতীয় লোকদের সঙ্গে অস্ট্রিক অর্থাৎ নিষাদ, দ্রাবিড় ও আর্যগণের মধ্যে শুধু যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটে তাই নয়, তাদের মধ্যে রক্তের মিশ্রন ও ঘটতে থাকে। ক্রমে দ্রাবিড় সভ্যতার অনেক কিছুই আর্যরা গ্রহণ করেন। বর্ণ ও গোষ্ঠী বিভক্ত সমাজের ধারণা, পূজার উপচারে পুষ্পের ব্যবহার ইত্যাদি আর্যরা দ্রাবিড়দের কাছ থেকে পেয়েছেন বলেই জানা গেছে। শুধু তাই নয় দ্রাবিড়দের ধর্ম বিশ্বাসও আর্য ভাণ্ডারে অবলীলাক্রমে গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে মাতৃ ও লিঙ্গ পূজার ধারণা দ্রাবিড়দের কাছ থেকে নেওয়া। পক্ষান্তরে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর লোকেরাই প্রথমে মাতৃভূমির বন্য ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে রথ বা গাড়ী টানিয়ে দ্রুত গমনাগমনের জন্য ব্যবহার করেছেন এবং প্রাচীন সভ্য জগৎকে ঘোড়ার ব্যবহার শিখিয়েছেন। এছাড়া রামায়ণ ও মহাভারতে আর্য নয় এমন মানব গোষ্ঠীর চরিত্রও স্থান পেয়েছে।

এভাবেই বিশ্ব তথা ভারতীয় ইতিহাসে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রধারা সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছে। এই ইতিহাসে মুসলমান ও ইংরেজদের আবির্ভূত হওয়ার আগে মঙ্গোলয়েড নামক এক জাতি পূর্ব ও উত্তর ভারতের পার্বত্য-অঞ্চলগুলিতে আবির্ভূত হন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁদেরকেই কিরাত নামে অভিহিত করা হয়েছে। এঁরা নিজেদের বৈচিত্র্য রক্ষা করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আপনাদের স্থান করে নিয়েছেন এবং নিজেদের ভাষা সম্পূর্ণ না ভুলে সংস্কৃত ভাষা ও ঐতিহ্যের ভাগীদার হয়েছেন এই কিরাত জাতি।

ভারতে নানা জাতি, নানা ধর্মের লোক যুগের পর যুগ এক সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করছেন। রকমারি তাঁদের মুখের ভাষা, বিচিত্র তাঁদের পোশাক, নানাবিধ তাঁদের খাদ্য। কেউ বা বাঙালী, কেউ বিহারী, কেউ উড়িয়া, কেউ অসমীয়া, কেউ গুজরাটী, কেউ মারাঠী, কেউ তামিল, কেউ পাঞ্জাবী, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ জৈন, কেউ খ্রীষ্টান, কেউবা মুসলমান প্রভৃতি। কিন্তু তাঁদের সকলে এক জাতি এবং সকলের একটি বিশ্বজোড়া পরিচয় আছে, তা হল —সকলেই ভারতবাসী—ভারতমায়ের সন্তান। এবং ভারতের অধিবাসীদের সবরকম বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটা অদ্ভুত মিলও পরিলক্ষিত হয়।

এই মিল যে ভারতের শুধু অধিবাসীদের মধ্যে আছে তাই নয়, মিল আছে তার নদ-নদী, ও সাগরের মধ্যেও, যেমন—এলাহাবাদের নিকট ত্রিবেণী-সঙ্গমে এসে মিলেছে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এবং দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা যেখানে ভারতের শেষ মাটি, যার পরে শুধু জল আর জল, সাগর আর সাগর সেখানে সশব্দে এসে মিলেছে পূর্বদিক থেকে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ দিক থেকে আরব সাগর। এখানে যেন তারা একে অপরকে আলিঙ্গন করছে। এক কথায় এটি একটি সাগর-সঙ্গম। বৈচিত্র্যময়ী এই ভারভূমি সব দিক দিয়েই যেন একটা মিলন ভূমি।

নদ-নদী, খাল, নালা প্রভৃতির জল বক্ষে ধারণ করে সাগর এক বিশাল জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সাগরে এলে বোঝার উপায় নেই কোন টুকু নদীর জল এবং কোনটুকু নালার জল। সে জলময়। কোনো বিশেষ জলের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব নেই। সব জল তার কাছে সমান। সকল জলকেই সে নিজের বুকে আশ্রয় দিয়েছে, তাই সে এত উদার, এত বৃহৎ! তার মধ্যে নেই ছোট-বড়র ভেদাভেদ।

সাগর সমান ঔদার্য নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মহামহামানব মানব জাতির ঊর্ধ্বে তাঁদের আসন করে নিয়েছেন। তাঁদের চোখে ছোট-বড়র স্থান নেই, নেই মানুষে মানুষে বা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের ভেদাভেদ। তাঁদের কাছে সকলেই সমান। তাই বুদ্ধদেব, নানক, রামানন্দ, শ্রীচৈতন্য, কবীর, নামদেব, দাদু, আকবর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন,

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ সকলকে সমান চোখে দেখেছেন। দেখতে বলেছেন।

ভারতের ধর্ম হল—সকল ধর্মের লোককে ভালবাসা, আপন জনের মতো বিপদে তাদের আশ্রয় দেওয়া। তাই ভারত যুগ যুগ ধরে সকল ধর্মাবলম্বী মানুষকে বুকে টেনে নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার এক মহান জয়গান গেয়ে চলেছে। অন্য দেশের লোকদের জাতিধর্মনির্বিশেষে বিপদে আশ্রয় দেওয়ার মতো ঔদার্য ভারতের নতুন নয়। আরবীয়েরা ইরান জয় করে যখন জরথুস্ত্র প্রবর্তিত মজদীয় ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে আরম্ভ করলেন, তখন মজদীয় ধর্মে আস্থাশীল একদল লোক তাঁদের জন্মভূমি ত্যাগ করে নৌ-পথে ভারতে চলে আসেন। এখানে তাঁরা মজদীয় ধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। পারস্য দেশ থেকে আসার জন্য তাঁদেরকে বলা হয় পার্শী। ভারতীয় পার্শী সম্প্রদায় এখন আর বিদেশী নন। তাঁরা ভারতে এখন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। স্যার জামসেদজী টাটা, দাদাভাই নৌরজী প্রমুখ পার্শী মণীষীবৃন্দ জ্ঞান ও গুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন এবং ভারতের গৌরব।

সুদূর অতীতে রোমীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাচীন ইহুদী সম্প্রদায়ের অনেকেই যখন ভারতে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন, তখনও ভারত তাঁদের সকলকে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে আজও তাঁরা নিজেদের ধর্ম অক্ষুন্ন রেখে বসবাস করছেন। আবার এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলাদেশে জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়ার সামরিক জুন্‌তা যখন লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা ও মন্দির, গীর্জা মসজিদ ধ্বংস করে চলেছিল তখন অনেক মুসলমানও দলে দলে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টানদের সঙ্গে ভারতের বুকে ছুটে এসেছিলেন আশ্রয়ের সন্ধানে শরণার্থী হয়ে। কারণ তাঁরা জানতেন ভারত তাঁদের আশ্রয় দেবেই। দিয়েছেও।

জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে ভালবাসাই ভারতের ধর্ম। তাই স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম মহাসভায় ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সকল ধর্মের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধার কথা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন। তিনি ভারতের সর্বধর্ম সমন্বয়ের শাশ্বত বাণীর কথা উল্লেখ করে সকল ধর্মের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটুক—এই ইচ্ছেই প্রকাশ করেছিলেন।

॥ দুই ॥

বিশ্বের সমগ্র মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার কয়েকটি যোগসূত্র আছে, তা হল—মানুষের দৈহিক গড়ন, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি। এছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মাধ্যমেও প্রাচীন সভ্যতাগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। এর দ্বারাই সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সুমের সভ্যতা এবং প্রাচীন ইরান, মেসোপোটেমিয়া, এশিয়া-মাইনর ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ক্রীট প্রভৃতি দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে ভারতের আর্য-পূর্ব কালের সভ্যতার এক অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া গেছে।

ভারতীয়দের সঙ্গে বহির্ভারতের জনগোষ্ঠীর দৈহিক গড়ন, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পর্কের বিষয়ে আগেই সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে। এবার ভাষা ব্যবহারের দিক দিয়ে ভারতের তথা বহির্ভারতের বিভিন্ন অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের ভাষাগত যোগসূত্রের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু তুলে ধরা যাক।

মানব সভ্যতা বিকাশের প্রধান সহায়ক হল ভাষা। আদি মানব গোষ্ঠীর অশোধিত অথবা অসংস্কৃত ভাষাই ক্রমপরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে বর্তমানের উন্নত শ্রেণীর বিভিন্ন ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—আদিম অসভ্য মানুষ হতেই ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান উন্নত শ্রেণীর মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। যাহোক, এশিয়া খণ্ডের তিনটি সুসভ্য জাতির তিনটি প্রধান ভাষা—সংস্কৃত, প্রাচীন ইরানী ও আর্মাণী। এছাড়া ল্যাটিন, প্রাচীন শ্লাব, আলবানীয়, কেল্‌টীয়, টিউটনীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির ভাষাগুলি এক অধুনা-লুপ্ত আদি আর্যভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে—তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতেই ভারতে চারটি বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষার প্রচলন দেখা যায়। যেমন—(১) অস্ট্রিক গোষ্ঠী, (২) দ্রাবিড় গোষ্ঠী, (৩) ভোট-চীন গোষ্ঠী ও (৪) আর্য-গোষ্ঠী। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার অধীনে আসে বর্মার মোন বা তালৈঙ, এবং পালোঙ, ওয়া প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা; আসামের খাসিয়া এবং তার সঙ্গে ভারতের কোল বা মুণ্ডা শ্রেণীর ভাষাবলী—সাঁওতালী, মুণ্ডারী,

হো, কোরওয়া, খাড়িয়া, কুর্কু, জুয়াঙ, ও শবর। উত্তর ভারতের গঙ্গাতটে, বাংলাদেশে, ওড়িশায় এবং মধ্যভারতের কিছুটা অংশে অস্ট্রিক-ভাষী লোকেরা বেশি বসবাস করতেন। কেউ কেউ মনে করেন—অস্ট্রিকভাষী জাতি তাঁদের ভাষা নিয়ে উত্তর ইন্দোচীন হতে আসামের পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন তাঁরা ভারতের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে প্রবেশ করেছেন। ভারতের এই অস্ট্রিক ভাষাবলীর সমশ্রেণীক ভাষাকে ভারতের বাইরে বলা হয়—কম্বোজের খ্‌মের, মালাই যবদ্বীপীয় প্রভৃতি দ্বীপময় ভারতের ভাষা এবং মেলানেসীয় ও পলিনেসীয় দ্বীপাবলীর ভাষা সকল।

প্রাচীন দ্রাবিড়দের সভ্যতা সম্পর্কে জানার একমাত্র উপায় হল দ্রাবিড় ভাষা যার মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার যোগ সূত্র স্থাপন করা সম্ভব। ভাষাতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন—আর্যভাষার পূর্বে বেলুচিস্থান ও সিন্ধু প্রদেশে দ্রাবিড়ভাষা প্রচলিত ছিল। এক কালে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতেও দ্রাবিড় ভাষীরা বাস করতেন। উত্তর ভারতে দ্রাবিড়ও অস্ট্রিক ভাষীদের সঙ্গেই আর্যদের যেমন সংঘর্ষ হয়েছিল আবার মিল ও হয়েছিল। ফলে বেদের ভাষায় দ্রাবিড় ও কোল হতে কতকগুলি শব্দ গৃহীত হয়েছে। এতে অনেক দ্রাবিড়-মূল বৈদিক শব্দ যেমন—অরণি, কণি, কলা, কাল, কিতব, নানা, নীল, পুষ্প, পূজন, ফল, বিল, বীজ, রাত্রি, অটবী, আড়ম্বর, খড়্‌গ, তণ্ডুল প্রভৃতি। আর্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির উদ্ভব ও প্রসার প্রাচীনকালে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব হতে জাত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা থেকে আর্যপূর্ব সভ্যতার যে নিদর্শন মেলে আর্যদের প্রাচীন সভ্যতার সেরূপ কোনো পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আর্য ভাষার বাংলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও গুজরাটী প্রভৃতির সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের যেরূপ নিদর্শন পাওয়া গেছে দ্রাবিড় ভাষার সেরূপ কোনো সুপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

তামিল, তেলেগু ও কানাড়ী প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাগুলির মূল স্বরূপ সুপ্রাচীন নিদর্শন নেই। দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ তামিল ভাষা তার বিরাট সাহিত্য নিয়ে দক্ষিণভারতে বিদ্যমান। দক্ষিণ ভারতের তামিল, কানাড়ী, তুলু, মালয়ালম, তোডা ও কোটা ভাষা মধ্য ভারতের তেলেগু, কোলামী, খন্দ, গোণ্ড, ওঁরাও, মালপাহাড়ী এবং পশ্চিমের ব্রাহুই ভাষা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠিরই বিভিন্ন শাখা।

সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দের মূল দ্রাবিড় ভাষা-জাত বলে ভাষাতত্ত্ববিদগণ মনে করেন।

হিমালয়ের সানুদেশ অর্থাৎ কাশ্মীর, নেপাল, আসাম ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত-অঞ্চলে এবং ব্রহ্মদেশে ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত আছে। বৈদিক যুগে প্রচলিত প্রাচীন আর্য জাতির ভাষা হতে উৎপন্ন বাংলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী ও সিন্ধী প্রভৃতি আধুনিক আর্য ভাষাবলী বর্তমানে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কতকাংশে প্রচলিত।

বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে এরূপ মন্তব্য করেন যে, পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে সংস্কৃতই শ্রেষ্ঠ ভাষা। গণিতশাস্ত্র যেরূপ জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ, সেরূপ সংস্কৃত ভাষাও বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। অধ্যাপক বোপ মন্তব্য করেছেন—গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা অপেক্ষা ও সংস্কৃত ভাষা পূর্ণাঙ্গ, অপেক্ষাকৃত ভাবব্যঞ্জক, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও শব্দ চাতুর্যময়। সমালোচক শ্রেজল বলেছেন—সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বলেই ওই ভাষার নাম সংস্কৃত। সার উইলিয়াম হাণ্টার বলেছেন যে, ইউরোপীয়গণের ভাষা বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তখন হতে যখন তাঁরা সংস্কৃত ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছেন। মিঃ পোকক বলেছেন—গ্রীক ভাষা সংস্কৃত ভাষা হতে সৃষ্ট। অধ্যাপক হীরেনের মতে সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন জেন্দ ভাষার অঙ্গীভূত। মুনেডুবোর বলেছেন— আধুনিক ইউরোপের ভাষা সংস্কৃত ভাষার অঙ্গীভূত। ডাঃ ব্যালান্টাইন মন্তব্য করেছেন—সংস্কৃত হতেই সকল এরিয়ান বা ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। এই মতের সমর্থনে অধ্যাপক বোপ বলেছেন—এককালে সংস্কৃত ভাষাই পৃথিবীর একমাত্র ভাষা ছিল। ভারতবর্ষই আর্যগণের আদি বাসস্থান—কার্জন সাহেবের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে মিঃ মুইর বলেছেন—আর্যগণ কখনই পশ্চিম প্রদেশ হতে ভারতে প্রবেশ করেননি। বরং অন্যান্য দেশের সভ্যজাতিরা ভারতীয় আর্যগণের বংশ হতেই উৎপন্ন হয়েছে বলে প্রমান পাওয়া যায় (ভারতবর্ষ, ২য় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়া)। তবে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দই মূলে দ্রাবিড়-ভাষা-জাত। ভাষার দিক দিয়ে সিন্ধু ও সুমের সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এই দুই সভ্যতার উৎস একই বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। ওই সম্পর্ক ধরেই বৈদিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। সিন্ধু সভ্যতার চিত্রলিপির ধারা বহন করেই সুমেরীয়, এলামীয়, ক্রীটীয়, ও হিট্টাইট চিত্রলিপির সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাহ্মী অক্ষর সিন্ধু অক্ষর থেকেই সৃষ্টি

হয়েছে। কারণ সম্প্রতি-প্রাপ্ত শীলমোহরে ও ব্রাহ্মীর সঙ্গে সিন্ধু লিপির অনেক মিল দেখা গেছে। আবার এই ব্রাহ্মী অক্ষর বৈদিক অক্ষরের নিদর্শন। অধ্যাপক ল্যাঙ্গডনের মতে মহেঞ্জোদড়োর অক্ষর হতেই ব্রাহ্মী অক্ষরের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই উভয় শ্রেণীর অক্ষরের মধ্যে অনেক মিল আছে। সিন্ধু সভ্যতার লিপির চিহ্ন প্রাচীন হিট্টাইট জাতির শব্দবাচক হিরোগ্লিফিক লিপি মালার মতো।

আর্যদের আগমনের পূর্বে সমগ্র উত্তর ভারতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা প্রচলিত ছিল। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন—এই তিন বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষা একদিকে আর আর্যভাষা এক দিকে। উত্তর ভারতে আর্য ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত প্রাকৃত, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি প্রবল হলেও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অনার্য অর্থাৎ তেলেগু, তামিল, মালয়ালম ও কানাড়ী প্রভৃতি এখনও দক্ষিণ ভারতে এক বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান।

অস্ট্রিক ভাষী লোকেরা উত্তরভারতে অর্থাৎ গঙ্গাতট, ওড়িশা, বাংলাদেশ এবং মধ্য ভারতের কতকাংশে অধিক সংখ্যায় বসবাস করত। দ্রাবিড়ভাষী লোকেরা উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রবল ছিল। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে এরা একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিদ্যমান। অবশ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা, বাংলাদেশ ও ওড়িশায়ও যে দ্রাবিড় জাতিরা বসবাস করত না তা নয়। তবে তারা ওই সকল স্থানে আস্ট্রিকদের মতো অত প্রবল ছিল না। ভোট-চীন ভাষী লোকেরাই ভারতে সর্বশেষে আগমন করে। এরা নেপাল, উত্তর-পূর্ব বঙ্গ ও আসামে বসতি বিস্তার করে উত্তর বঙ্গের লোকেদের মধ্যে এরা মিশে গেলে ও নেপাল ভোটান আসামের বহুস্থানে এই ভোট-চীন ভাষীরা তাদের পৃথক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিদ্যমান আছে।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক আর্য ভাষাগুলিতে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকভাষার ছাপ অতি সুস্পষ্ট ভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরা নিজেদের ভাষায় নদ-নদী, পাহাড়পর্বত ও গ্রামের নামকরণ করত। সেই সকল নামই উত্তর কালে ঈষৎ পরিবর্তিত করে সংস্কৃতে রূপ দেওয়া হয়েছে। কোথাও বা বিকৃত হয়ে অর্থহীন নামে পরিণত হয়েছে, যেমন—ভোট-ব্রহ্ম ভাষার তিস্তাং হতে তিস্তা ও ত্রিস্রোতাঃ, কোল ভাষার কব-দাক্ হতে কপোতাক্ষ ও দামু-দাক্ হতে দামোদর। বিকৃত অনার্য নাম—প্রাচীন বাংলার—আউহাগড্ডি

বখট বা বহড, মোড়ালন্দী এবং আধুনিক বাংলার বালুটে, মুডুন্দী চুচুঁড়া, বগুড়া ইত্যাদি। বাংলা দেশে আর্য ভাষা প্রচলিত হওয়ার আগে বিস্তৃত বাংলাদেশ জুড়ে আড়াই হাজার বছর আগে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরাই বসবাস করত।

ভিলমোশ্ হেভেশি নামক একজন হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত আস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট-চীন এবং আর্যভাষা গোষ্ঠীর লোক ছাড়াও আর একটি ভাষাগোষ্ঠীর লোকের ভারতে আগমনের কথা বলেছেন। এঁর মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে উরাল-আলতাই শ্রেণীর একটি ভাষা ভারতে আনা হয়েছিল। একদিকে তুর্কী, মঙ্গোল, মাঞ্চু, অপরদিকে মজর বা হাঙ্গেরীয়, ফিন্‌ল্যাণ্ডের ফিন্ এস্তোনিয়ার এস্ত্, ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের লাপ্ এবং রুশদেশের ওস্ত্যাক, ভোগুল্, চেরেমিস প্রভৃতি ভাষাগুলি এই উরাল-আলতাই শ্রেণীর ভাষার মধ্যে পড়ে। হেভেশির এই মত এখনও প্রামাণসাপেক্ষ। তবে এটা প্রমাণসহ হলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতের সঙ্গে উত্তর এশিয়ার যে একটি জাতি ও ভাষাগত যোগসূত্র ছিল তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে।

এবার ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা একটু আলোচনা করা যাক।

ভারতবর্ষে আসার আগে আর্যরা মেসোপোটেমিয়া হয়ে আসেন। এঁরা যে ভাষায় কথা বলতেন তা বৈদিক আর প্রাচীন ইরানীয়—এ দু-ভাষারই জননী। এঁরা যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতে আসেন তা থেকেই ভারতে বৈদিক ধর্ম ও দেবলোক সৃষ্টি হয়। এই আর্যরাই প্রকৃতপক্ষে বেদ-পূর্ব আর্য। এঁরা মেসোপোটেমিয়া ও ইরানে যে সকল স্তোত্র রচনা করেন তারই কিছু কিছু ভারতবর্ষ পর্যন্ত আসে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ অথবা পঞ্চদশ শতকে যে সব স্তোত্র রচিত হয় তা দশ কিংবা ন-শতকের দিকে লিখিত হয়ে ভারতবর্ষে ব্যাসঋষির দ্বারা বেদ-সংহিতায় সংগৃহীত হয়। তাই বেদপূর্ব যুগের আর্যদের কতকগুলি নাম আর শব্দ যেগুলি ব্যাবিলোনীয় ও এশিয়া-মাইনরের ভাষায় গৃহীত সেগুলি বৈদিক ভাষায়ও রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন—সূরিয়স—বেদপূর্ব আর্যভাষায় সূরিয়ঃ, বৈদিক 'সূর্যঃ'; মরুত্তাস—বেদপূর্ব মরুতস, বৈদিক 'মরুতঃ'; দকস, নক্ষত্রদের পিতা= ভারতীয় 'দক্ষ' ২৭ নক্ষত্রের পিতা; ইন্দর=বৈদিক 'ইন্দ্র'; মিত্র=বৈদিক 'মিত্র' নাসত্তিয়=বৈদিক 'নাসত্য'; উরুয়ণ বা অরুণ=বৈদিক 'বরুণ'; ইন্দরুত=বেদপূর্ব

ইন্দরউত, ইন্দ্রউত=বৈদিক 'ইন্দ্রোত' সতিয়=বৈদিক ; 'সত্য' ; সুবন্ধু=বৈদিক 'সুবন্ধু' ; সুমিত্ত, সুমিত্তরাস=বৈদিক 'সুমিত্র' ; তুর্বযু=সংস্কৃত 'তুর্বসু', বৈদিক 'তুর্বশ'; মরিয়=বৈদিক 'মর্য', যোদ্ধা (বৈদিক শব্দ, অর্থ বীর বা মানুষ) ; তপস্=‘তপঃ’ (উত্তাপ) ; আইক=প্রাগ্‌বৈদিক আইক, বৈদিক 'এক' ; তেরা='ত্রি, ত্রয়' ; পাঞ্জা='পঞ্চ' ; সত্ত='সপ্ত' ; নভ=নব ; তপসস্ ='তপস্' ; ওয়র্তন্ন='বর্তন' ; ওয়সন্ন='বসন' (অবস্থান অর্থে) ইত্যাদি একপ বৈদিক ভাষার সাক্ষাৎ জননী-স্থানীয় ভাষা যে প্রাচীন আর্যরা ব্যবহার করতেন তাঁদের পরিচয় মেলে আনুমানিক দু থেকে দেড়হাজার খ্রীষ্টপূর্ব বছরে মেসোপোটেমিয়া ও এশিয়া-মাইনরে। এছাড়া এ সকল শব্দ বা নাম হতে অনুমান করা যায়—ভারতবর্ষে প্রচলিত হওয়ার আগে সংস্কৃত ভাষা ভারত-ইরানীয় ভাষায় কিরূপে বিদ্যমান ছিল। আর্যরা ইরাক অঞ্চলে প্রথমে ঘোড়া এনেছিলেন। ঘোড়াকে শেখানোর সময় তাঁরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করতেন তার অনেকগুলো অসুর-বাবিল লেখের মধ্যে রয়েছে। শব্দগুলি দেখলে এটা সহজেই অনুমান করা যায়—ওগুলি প্রাক-সংস্কৃত শব্দ বা সংস্কৃত শব্দের পূর্ব অবস্থা, যেমন—ঘোড়াকে মাঠে একবার দৌড় করাবার জন্য বলতেন আইক-ওয়া-র্তন অর্থাৎ সংস্কৃত 'এক-বর্তন'। অনুরূপভাবে তিনবার দৌড় করাতে বলতেন তেরা-ওয়ার্‌তন=তের (= তর বা ত্রি)-বর্তন। সেরূপ পাঞ্জা ওয়ার্‌তন=পঞ্চ-বর্তন ; সত্ত-ওয়ার্‌তন=সত্ত (সপ্ত শব্দের বিকৃত রূপ)-বর্তন ; নওয়া-ওয়ার্‌তন= নব-বর্তন। ঘোড়াকে থামানোর জন্য যে শব্দ ব্যবহার করতেন তা হল—ওয়সন=বসন।

প্রাচীন ভারতীয় ও ইরানীয় সভ্যতার মধ্যে অনেক মিল আছে। মিল আছে বেদের ভাব ও ভাষার সঙ্গে আবেস্তার ভাব ও ভাষার। বেদের যজ্ঞ, মন্ত্র, মিত্র, অসুর, সোম ও সবন প্রভৃতি শব্দ আবেস্তায় যথাক্রমে যসন মনথ্র, মিথ্র, অহুর, হওম ও হবন রূপ গ্রহণ করেছে। এ সকল দিক থেকেই পণ্ডিতেরা মনে করেন—ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যেরা সুপ্রাচীনকালে একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। এঁদের দৈহিক গড়ন লম্বা, গায়ের রং ফর্সা, চুল ঢেউ খেলানো এবং গালপাট্টা দাড়ি। এ ছাড়া আর্যশব্দ থেকেই ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইরান শব্দ এসেছে। যেমন—আর্য > অরিয় > এরিয়ান > ইরান। আর্যদের এরিয়ান এবং পার্শীদের ইরানীয়ান বলা হয়।

আর্যদের ঋগ্বেদের সঙ্গে পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার ভাষাগত বহু সাদৃশ্য দেখে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, বৈদিক আর্য এবং ইরানীয় অইর্যগণ (আবেস্তীয় আর্য-শব্দের প্রতিরূপ হচ্ছে অইর্য এবং প্রাচীন পারসিক ভাষায় আর্যকে অরিয় বলা হয়) এককালে একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। এঁদের ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীর লোক বলা হয়। সংস্কৃত আর্য, সিন্ধু, অসুর, সুরা, সত্য, সখা, ক্রতু, ভূমি, হস্ত, অহি, ক্ষত্র, অশ্ব, মাস, রথ প্রভৃতি শব্দ আবেস্তায় যথাক্রমে অইর্য, হিন্দু, অহুরো, হুরা, হৈথ্যো, হখ, খ্রতু, বুমি, জস্তো, অজি, ক্ষথ্র, অস্পো, মাঙ্‌হ, রথো প্রভৃতি রূপ পরিগ্রহ করেছে। এছাড়া কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ও আবেস্তায় প্রায় একইরূপে দেখা যায় যেমন—গাথা-গাথা, বিশ্‌-বিস্‌, যজ্‌-যজ্‌ ইত্যাদি।

সংস্কৃত, আবেস্তীয় ও প্রাচীন পারসিক প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী, জারমান, আইরিশ, ফরাসী, ইতালী, রুশ, চেথ প্রভৃতি ভাষার মধ্যে নানাপ্রকার মিল দেখে মনে হয় এসকল ভাষা অতি প্রাচীন কালে কোনো একটি বিশেষ লোক-গোষ্ঠীর ভাষা ছিল। এবং তাদেরকেই পরবর্তীকালে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীরূপে গণ্য করা হয়েছে।

ভাষাগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে, ইন্দা-ইউরোপীয় জনগণের একাংশ হচ্ছেন ইন্দো-ইরানীয় এবং এই ইন্দো-ইরানীয় জনগোষ্ঠীর আর একটি অংশ ইন্দো-এরিয়ান বা ভারতীয় আর্য নামে পরিচিত।

আর্যগণ ভারতবর্ষে এসে প্রথমে উত্তর পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। ওই সময়ে ভারতে অস্ট্রিক অর্থাৎ কোল ও মোন-খেমর ভাষী লোক এবং দ্রাবিড় জাতীয় জনগোষ্ঠী বসবাস করতেন। নবাগত আর্যগণ ছিলেন যাযাবর ও কৃষিজীবী প্রকৃতির। তাঁরা অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, চিন্তাশীল ও দুর্ধর্ষ হলেও গ্রামীণ ও নাগরিক সভ্যতায় পেছিয়ে ছিলেন। কিন্তু তখন ভারতের অস্ট্রিকগণ মুখ্যতঃ গ্রামীণ এবং দ্রাবিড়গণ নাগরিক সভ্যতায় উন্নত ছিলেন। পাঞ্জাবে নবাগত আর্যদের অধিক সংখ্যায় বসতি বিস্তারের কারণ—ওই স্থানটি ইরানের পাশেই অবস্থিত ছিল এবং তখন ইরানের ব্যাপক অর্থে পারস্য, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানকে বোঝাত। যাহোক, আর্যগণ পাঞ্জাব হতে প্রথমে পূর্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ও পরে সিন্ধু প্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের দিকে বসতি বিস্তার করেন। ফলে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়

ও আর্যদের মধ্যে মিলন ও মিশ্রন ঘটে। তাঁদের ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটে এবং ফলে সৃষ্টি হয় একটি মিশ্রজাতি যাদের হিন্দু বলা হয়।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মশায়ের 'ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, নিখিল ভারত জুড়ে আর্য ও অনার্য উভয় জাতীয় লোকের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বসেছে।

শুধু তা-ই নয় এভাষা ভারতের বাইরেও প্রসার লাভ ক'রে বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের সভ্যতা, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানে সহায়ক হয়েছিল। মুখ্যতঃ ব্যবসায় সূত্রে স্থলপথে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ ভারতের আশ-পাশের দেশসমূহে যাতায়াত আরম্ভ করেন। ভারতে হিন্দু সভ্যতা বিশিষ্ট রূপ গ্রহনের পূর্ব হ'তেই ভারতীয় অনার্য অর্থাৎ অস্ট্রিকজাতীয় জনগন স্থল ও জল পথে ব্রহ্মদেশ; মালয় উপদ্বীপও যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপময় ভারতের দ্বীপপুঞ্জে এবং শ্যাম ও কম্বোজে যাতায়াত করতেন। ওই সকল স্থানে অস্ট্রিক জাতীয় লোকদের বসবাসও ছিল এবং তাঁদের সঙ্গে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সংযোগ অক্ষুন্ন ছিল। পরবর্তীকালে উত্তরভারত ভাষায় ও সংস্কৃতিতে আর্য হলেও উক্ত যোগসূত্র ছিন্ন না হয়ে বরং দৃঢ় হয়েছে। খ্রীষ্ট জন্মের কয়েকশত বছর পূর্ব হতেই আর্যদের সংস্কৃত ভাষা একদিকে যেমন পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ইরান ও মধ্য এশিয়ার আর্যজাতিদের মধ্যে ইরানী শাখার পার্থব ও পহ্লব, সুগ্দ বা সোগ্দীয়, কুস্তন বা খোতনের আধিবাসীদের মধ্যে ও তাদের উত্তরে ঋষিক বা তুষার বা তোখারীয় জাতির মধ্যে প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করে যেভাবে প্রসার লাভ করেছিল ঠিক সেইভাবেই ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ব্রহ্মদেশে, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা বা কোচীনচীন, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মাদুরা, বলিদ্বীপ, বোর্নিও এবং সুদূর ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়। ফলে ওই সকল দেশের ভাষা ভারতের দ্রাবিড় ভাষার মতোই সংস্কৃত ভাষার ছায়ায় এসে একত্রিত হয়।

দক্ষিণ ও মধ্য ব্রহ্মের অস্ট্রিক মোন্ জাতি-মধ্য ও পরে উত্তর ব্রহ্মের ভোট-চীন জাতির ভোট ব্রহ্ম শাখার ম্রন-মা বা বর্মী জাতি, দক্ষিণ শ্যাম মোন্ ও পরে উত্তর শ্যামের চীন-ভোট জাতির শ্যাম-চীন শাখার থাই অথবা শ্যামী, কম্বোজের খেমর জাতি, চম্পা বা কোচীন-চীনের চাম জাতিএবং মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার মালয়

জাতির মধ্যে ও যবদ্বীপ, মাদুরা, বলিদ্বীপ, বোর্ণিও ও সুদূর ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য ভাষাও তার স্থান করে নেয়। ফলে ওই সকল দেশের স্থানীয় ভাষাগুলি ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলির মতোই সংস্কৃত ভাষার ছত্রছায়াতলে একত্রিত হয়।

এইভাবে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং তার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা প্রসারের দরুন খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব ও পরের কয়েক শতকের মধ্যেই একদিকে কাসপিয়ান হ্রদ ও সিন্-কিয়াঙ্ বা চীনা-তুর্কীস্থান হতে আরম্ভ করে পূর্ব-ইরাণ ও আফগানি-স্থানের ভেতর দিয়ে সমগ্র ভারত ও লঙ্কা দ্বীপকে ধরে একভাগ. অপরদিকে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, দক্ষিণ-ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক প্রভৃতি এবং বোর্ণিও, সেলেবেস্ ও ফিলিপ্পীন নিয়ে এক বৃহত্তর ভারত গড়ে ওঠে। এই বৃহত্তর বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লোকেরা ধর্মে ও সভ্যতায় ভারতীয় হয়ে ওঠেন এবং সংস্কৃত ভাষা তাঁদের মধ্যে এক বিশেষ স্থান করে বসে বা সাদরে গৃহীত হয়। ওই সময় উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো লিখিত ভাষা ছিল না। ফলে ভারত হতে সংগৃহীত বর্ণমালাতেই তাঁদের ভাষাসমূহ প্রথম লিখিত হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে তাঁদের ভাষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষের মতো তাঁদের রাজারা সংস্কৃত ভাষায় নিজেদের অনুশাসন উৎকীর্ণ করান। মোটের ওপর উক্ত স্থানগুলির জনসাধারণের ভাষাসাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শে পুষ্ট হওয়াতে এবং ভারতীয় অক্ষরে তাঁদের ভাষা লিপিবদ্ধ হওয়াতে এই সকল ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করেছে এবং শুদ্ধ সংস্কৃত ও বিকৃত সংস্কৃত শব্দের সম্ভারে ওই সকল ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে। মধ্য-এশিয়ার খোতনী ও তোখারী ভাষা আধুনিক বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়া-লম্ ও তামিল ভাষাগুলির মতোই উচ্চভাবের প্রায় শব্দই আবশ্যক মতো সংস্কৃত হতেই গ্রহণ করত। অবশ্য সমৃদ্ধ পহ্লবী ভাষার ভগিনী সুগ্দ বা শুলিক ভাষা সংস্কৃত হতে শব্দ ধার করার রীতি ততটা গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে মোন্ ও খেমের ভাষা, চম্পার চাম ভাষা, বর্মী ও শ্যামী ভাষাদ্বয়, মালাই ভাষা, বিশেষ করে যবদ্বীপীয় সুন্দা-ভাষা, মদুরী ও বলিদ্বীপীয় ভাষা নিজেদের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করে অপরাপর ভারতীয় ভাষাগুলির স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে সিংহলী ভাষা ভারতের আর্যভাষা-

গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। গুজরাট হতে যে প্রাকৃত ভাষা খ্রীষ্ট জন্মের কয়েকশত বছর আগে সিংহলে নেওয়া হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে সিংহলী ভাষায় পরিণত হয়ে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগ সাধন করে বিদ্যমান রয়েছে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সেরিন্দিয়া বা চীন-ভারত অর্থাৎ বর্তমানের সোভিয়েট, মধ্য-এশিয়া ও সিন্-কিয়াঙ্ বা চীনা-তুর্কীস্থান ; ইন্দিয়া-মিনোর (ইণ্ডিয়া-মাইনর) বা লঘু-ভারত বা অগ্রভারত অর্থাৎ বর্তমানের আফগানিস্থান ; ইন্দোচীন বা ভারত-চীন অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ এবং ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময়-ভারত নিয়ে এশিয়া মহাদেশের এক বিশাল অংশের প্রায় সকল পণ্ডিত বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ভাষা জানতেন এবং বুঝতেন। ওই সময়ে একজন যবদ্বীপীয় ও মধ্য-এশিয়ার একজন তোখারী ভিক্ষু সংস্কৃতের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করতে পারতেন এবং তাঁদের আলাপ আলোচনায় ক্বচিৎ একজন চীনা ভিক্ষুও যোগদান করতে পারতেন।

চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান এবং তোঙ-কিঙ্ ও আনাম প্রভৃতি দেশে স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই দেশগুলি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও ভারতীয় রীতিনীতি ওসকল দেশের জনজীবনের ওপরে সম্পূর্ণরূপে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ফলে চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, তোঙ্-কিঙ্ ও আনামকে নিয়ে একসঙ্গে 'বৃহত্তর ভারত' বলা না গেলেও জাপান, কোরিয়া, চোঙ্-কিঙ্ ও আনামকে মোটামুটি, 'বৃহত্তর চীন' বলা চলে।

প্রথমে মধ্যএশিয়ার খোতন ও তুষার বা তোখারী রাজ্যের মাধ্যমে চীনে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করলেও পরবর্তীকালে ভারতের সঙ্গে চীনের সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। তখন ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক ও ধর্মগুরুগণ ভারত হতে মধ্য এশিয়ার স্থলপথ ধরে ও জলপথে যবদ্বীপ হয়ে চীনে যেতে আরম্ভ করেন। অপর-দিকে চীন হতেও উত্তরের স্থলপথ ও দক্ষিণের জলপথ দিয়ে বৌদ্ধ শ্রমণ ও তীর্থ যাত্রীগণ ভারতে আসতে শুরু করেন। যে সকল ভারতীয় ধর্মগুরু, পণ্ডিত ও প্রচারক চীন দেশে গিয়ে তাঁদেরকে সংস্কৃতভাষা শিখিয়েছিলেন ও চীনাভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মধ্য-এশিয়ার তুষার জাতীয় পণ্ডিত কুমারজীব ও দক্ষিণ-ভারতের যোগী বোধি-ধর্মের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমারজীবের পিতা ছিলেন কাশ্মীরীয় এবং মাতা জীবা ছিলেন তুষার দেশের

কুচী নগরীর রাজ কুমারী। পিতা ও মাতার নাম মিলিয়ে পুত্রের নাম হয় কুমারজীব। এঁদের নাম ও জীবনী চীনদেশের বহুস্থলেই রক্ষিত আছে। শুধু ভারতীয় পণ্ডিত ও ধর্ম প্রচারকগণই যে চীনদেশে গিয়েছিলেন তাই নয়, চীন-দেশ হতেও অনেক পণ্ডিত ও পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন (সংস্কৃত নাম মোক্ষ-দেব), হিউয়েন্‌-ৎসাঙ্‌ (মহাযান-দেব) এবং য়ী-ৎসিঙ্‌ (পরমার্থ-দেব)-এর নাম বিশেষভাবে পরিচিত। জাপান, তোঙ্‌-কিঙ্‌ ও আনামে চীনা অনুবাদের প্রচার হয়। কারণ ওই সকল দেশের সভ্যতা মুখ্যতঃ চীনের সভ্যতারই নিদর্শন। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে চীনারা সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতেন এবং এর ফলশ্রুতি স্বরূপ কতকগুলি সংস্কৃত-চীনা অভিধান প্রনীত হয়েছিল। এবং ওই অভিধানগুলির সাহায্যেই কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংস্কৃত পাঠ করার প্রয়াস চালাতেন। এছাড়া ভারতীয়রাও চীনা ভাষার চর্চা করতেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি ভোট বা তিব্বতীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। একজন ভোট পণ্ডিত ভারতবর্ষে এসে প্রাচীন কাশ্মীরী লিপির আধারে ভোট বা তিব্বতী লিপি গঠন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র সংস্কৃত হতে ভোটভাষায় অনুবাদ করা হতে থাকে এবং অনেক সংস্কৃত গ্রন্থও ভোট ভাষায় অনূদিত হয়।

চীনারা সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্দ চীনাতে অনূদিত করেন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাচীন চীনারা বুদ্ধ শব্দটিকে বুধ্‌রূপে গ্রহণ করেন। চীনাতে যে কয়েকটি সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়েছে সেগুলির আধুনিক উচ্চারণে প্রায়ই বিকার দেখা যায়। যেমন, ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণ=প্রাচীন চীনা উচ্চারণে ব্রম্‌ বা বম্‌ এবং বর্তমানে বলা হয় ফান্‌, জাপানীরা বলেন বোন্‌ বা বোঙ্‌ ; সংঘ=স্যাঙ্‌ ; অমিতবুদ্ধ (অমিতাভ)=‘ও-মি-তো-ফু’ ; ব্রাহ্মণ=প্রাচীন চীনায় ‘বা-লা (বা রা)-মন্‌=আধুনিক পো-লো-ম্যান্‌ ; ধ্যান (প্রাকৃত ঝাণ)=আধুনিক উচ্চারণে ছান্‌ ইত্যাদি। অবশ্য এরূপ সংস্কৃত শব্দ অতি অল্প। তবে চীনাদের চেয়ে জাপানীরা বরং পরে আরও সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করেছেন ও করছেন।

চীনা হতে হাজার হাজার শব্দ জাপান, কোরিয়া ও তোঙ্‌-কিঙ্‌-এর ভাষায় গৃহীত হয়েছে। চীন হতে গৃহীত ভারতীয় (সংস্কৃত) শব্দ অথবা শব্দানুবাদ এই তিন ভাষায় আগত এই সমস্ত চীনা শব্দেরই অন্তর্ভুক্ত। জাপানীরা নতুন করে বৌদ্ধধর্ম চর্চা এবং সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করার দরুন কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সরাসরি জাপানী ভাষায় এসে গেছে। জাপানে দেবনাগরী অক্ষরে প্রাচীন

বৌদ্ধ শাস্ত্র মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া প্রধান প্রধান উপনিষদ্ ও ভগবদ্‌-গীতারও অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু যতটা সম্ভব সংস্কৃত নামগুলির প্রাচীন চীনা অনুবাদই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ধৃতরাষ্ট্র=জি-কোকু=যিনি রাজাকে ধারণ করেন—চীনাতে তি-কুও। আধুনিক জাপানীতে প্রচলিত কতগুলি নতুন ও প্রাচীনকালে আগত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত হল—বুদ্ধ=প্রাচীন চীনায় বুধ্, 'ভ্যুৎ' এবং তা হতে প্রাচীন জাপানীতে 'বুতু' আধুনিক জাপানীতে—উচ্চারণে বুৎস্থ এবং লেখায় 'বু-তু'; ব্রাহ্মণ=বারামোঙ্; বসিষ্ঠ=বাশী; যম=য়েমা, দুন্দুভি=প্রাচীন জাপানীতে তুদুমি, আধুনিকে ৎসুদজুমি. সূত্র=সুতারা; বোধি=বোদাই; সঙ্ঘারাম=গারাঙ্; ভিক্ষু, ভিক্ষুণী=বিকু, বিকুনি; বেদ=বিদা, মণ্ডল=মান্দারা, মাদারা; সমাধি=সাম্মাই; শ্রমণ=শামোঙ; পুণ্ডরীক=ফুন্দারিকে ইত্যাদি। এসকল শব্দের বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পর্কীয়।

মালাই ভাষা দ্বীপময় ভারতে বহুল প্রচলিত। মালাই জাতির লোকেরা ক্রমশঃ মুসলমান হয়ে গেছেন। তাঁরা এখন প্রাচীন কালের মতো সংস্কৃত হতে শব্দ গ্রহণ করেন না এবং তাঁদের মধ্যে সংস্কৃত চর্চাও আর নেই। তাঁরা বর্তমানে আরবী, ফারসী, ইংরেজী ও ওলন্দাজ ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে থাকেন। তথাপি মালাই ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়। এই ভাষায় আমি অর্থে যে সায়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা সংস্কৃত সহায় শব্দের বিকার। মালাই ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হল—যেমন, অংকার=অহংকার, আন্তারা =অন্তর, আতাউ=অথবা, বাহাসা, বাসা=ভাষা, ব্যাক্তি=ভক্তি, বুদি= বুদ্ধি, বুমি=ভূমি, চাহায়া=ছায়া, চেক্রাবালা=দিক্‌চক্রবাল, চিন্তামানি= চিন্তামণি, দক্‌সিনা=দক্ষিণ দিক, দেন্দা=দণ্ড, গেণ্টা=ঘণ্টা, হার্গা=অর্ঘ, হাস্তা=হস্ত, জেন্তেরা=যন্ত্র, জেল্‌মা=জন্ম, কারনা=কারণ, কের্জা=কার্য মাহা=মহান্, মাংসা=মাংস, মেলাতি=মালতীফুল, নাদি=নাড়ী, নামা= নাম, পাপা=পাপ, পুত্তেরী=পুত্রী, রাজকুমারী, রূপা=রূপ, সাক্‌সী=সাক্ষী, সাক্‌তি=শক্তি, সেগেরা=শীঘ্র, সেম্পুর্‌না=সম্পূর্ণ, সেমুখা=সমূহ, সেঞ্জাতা =সংজাত, সুর্গা=স্বর্গ, উপায়া=উপায়, পথ ইত্যাদি।

ইন্দোচীনের মোন্ ও খেমর এবং বর্মী ও শ্যামী ভাষায়ও সংস্কৃত শব্দের প্রভাব রয়েছে। দ্বীপময় ভারতের মতো এ অঞ্চলেও ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম

জনগণের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজারা সংস্কৃত নাম ব্যবহার করতেন, দেশ ব্রাহ্মণের আদর্শে পরিচালিত হত এবং রাজাদের অনুশাসনও সংস্কৃতে হত। মোন্ ও খেম্‌র ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দ আছে তা প্রায়ই সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত অবস্থায় আছে। প্রাচীন মোন্ ভাষায় গৃহীত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ এখানে দেওয়া হল। আধুনিক মোন্ ভাষায় এগুলি আরও বিকৃত হয়েছে; যেমন—কাল= কাল্,শাস্ত্র=সাস্, আরাধনা=রাধনা, প্রতিসন্ধি=পতিসন্, শীল=সীল্, ইন্দ্র= ইন্, উদ্যান=উদ্যা, ব্রাহ্মণ=বুংনঃ, মনুষ্য=মনিস্, নারদ=নার্, ধর্ম=ধর্, মাণিক্য=মানিক্, রত্ন, রতন=রৎ, নগর=নগির, আধুনিক মোন্ নাগোও, দোষ=দোস্, অভিষেক=বিসেক্, শঙ্খ=সং, প্রভৃতি। কম্বোজের প্রচলিত খেম্‌র ভাষায় গৃহীত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—যেমন, ইন্দ্র=ইন্ এইন্, অংশ=অং, দেবতা=তেপ্দা, পুরুষ=প্রোস্, বংশ=বং, লোভ= লোপ্, শাসন (ধর্ম অর্থে)=সাস্, স্বর্গ=স্বর্, বাক্= পেআক্, নগর= অঙ্কর, কাব্য=কাপ্, শ্বেতচ্ছত্র=শ্বেতছৎ এবং পালি অস্সম (আশ্রম)= অসম্ ইত্যাদি।

শ্যামদেশের লোকেরা জাতিতে বা রক্তে চীনাদের জ্ঞাতি হলেও ধর্মবিশ্বাসে ও সভ্যতায় তাঁরা ভারতীয়দেরই সমগোত্রীয়। এদেশের সমস্ত কাজে ভারতের ছাপ ও সংস্কৃতভাষার প্রভাব বিদ্যমান। কম্বোজের খেম্‌র জাতির বেলাতেও ঠিক একই অবস্থা। ভৌগোলিক নাম বর্মা হতে কাম্বোদিয়া পর্যন্ত অধিকাংশ নামই সংস্কৃত হতে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্মীদের প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকার নাম সূর্য (পালি সূরিয়, বর্মী উচ্চারণে থুয়িয়া); সেখানকার জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের গালোন অর্থাৎ গরুড় নামে অভিহিত করে থাকেন। শ্যামী বা থাই জাতির রাজারা সংস্কৃত নাম গ্রহণ করেন—যেমন, আনন্দমহীদল, প্রজাধিপক্, বজ্রায়ুধ, মহামুকুট ইত্যাদি এবং এখানকার রাজবংশের নাম মহাচক্রী বংশ। এছাড়া রাজ্যের নানা বিভাগের নামও সংস্কৃত হতে গৃহীত, যেমন—রথচারণ-প্রত্যক্ষ=রেল বিভাগের ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, বারিসীমাধ্যক্ষ=জলসেচ বিভাগের পরিদর্শক, রাজার খাস বিভাগের কর্মচারীর খেতাব হল—বিজিত-রাজভৃত্যাধিকার ইত্যাদি। এছাড়া বহু সাধারণ জিনিসের নামও সংস্কৃতে রাখা হয়, যেমন—অকাশযান (উচ্চারণে আগাৎ-ছান্)=বিমান বা হাওয়াই জাহাজ, দূরশব্দ (থোরো-সাপ্)=টেলিফোন, শতাংশ (সিতাঙ্)=সেণ্ট নামে মুদ্রা।

অরণ্য প্রদেশকে আরাঞ্-পাথেং, ব্রজপুরীকে ফেচাবুরী এবং রাজপুরীকে রাৎবুরী রূপে উচ্চারণ করা হয়।

যাভা দ্বীপের লোকেরা পরবর্তীকালে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁদের মধ্যে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির ছাপ এখনও বিদ্যমান। এখানকার অধিকাংশ লোকই অবতার-বাদে বিশ্বাসী। এখনও রামায়ণ মহাভারতের গল্প গ্রামে ও সহরে অভিনীত হয় এবং এ-দুটি মহাকাব্য সেখানকার অনেকেরই জীবন ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে থাকে। তাঁরা অর্জুনকে আদর্শ বীর বলে মনে করেন, এবং বালক বালিকাদের সংস্কৃত নাম রাখেন, যেমন—সুকর্ণ, সুব্রত, শ্রী, সুতম, সুজন, সুধর্ম, আর্য সুপ্রাজ্ঞ, কুসুম বর্দ্ধন, শাস্ত্রবিদগ্ধ ইত্যাদি। সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা ডাচ ভাষায় লিখিত গীতা পাঠ করেন এবং গীতার আদর্শে জীবন গঠনে সচেষ্ট হন। এঁরা স্বামী বিবেকানন্দর জীবনীও পাঠ করেন।

আর্যদের একটি শাখা থাকেন ইরাণে, একটি আসেন ভারতে আর একটি দল পূর্বদিকে গিয়ে মধ্য-এশিয়ায় বাস করতে থাকেন। এবং যাঁরা মধ্য-এশিয়ায় যান তাঁদেরই উত্তর-পুরুষদের পরবর্তীকালে উত্তর সিন্-কিয়াঙে অর্থাৎ চীন-তুর্কীস্থানে তোখারীয় জাতিরূপে দেখা যায়। তাঁদেরকে ঋষিক বা তুষার নামে অভিহিত করা হত। প্রাচীনকালে ভারতীয়দের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার এই তোখারীয় জাতির পরিচয় ছিল বলে জানা গেছে। তাই বোধ হয়—প্রাচীন মধ্য-এশিয়ার তোখারী ও খোতনী ভাষা সংস্কৃতের মতো আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই ভাষায় ভারতীয় লিপি ব্যবহৃত হত, সেজন্য ওতে সংস্কৃত শব্দের প্রভাব ছিল। খোতনের পূর্বদিকে ক্রোরৈন রাজ্যে ও খোতনে ভারতীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করায় তাঁদের উত্তর পশ্চিমে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। এবং রাজকীয় দলিল পত্রে খরোষ্ঠী বর্ণমালায় লিখিত প্রাকৃত ভাষার পরিচয় মেলে খ্রীষ্ট জন্মের পূর্বের ও পরের কয়েক শতক ধরে। কিন্তু পরবর্তীকালে তুর্কীভাষী লোকদের প্রসারের ফলে মধ্য-এশিয়ার তোখারী, খোতনী ও প্রাকৃত—এই তিনটি আর্যভাষার বিলোপ ঘটে। বর্তমানে প্রাচীন নগর সমূহের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত ওই সব ভাষায় লিখিত কাগজ পত্রে ওই সকল অঞ্চলে ভারতীয় ভাষা ও সভ্যতা বিস্তারের খবর পাওয়া যায় মাত্র।

তিব্বত মধ্য-এশিয়ার অংশ হওয়া সত্ত্বেও তিব্বতী ভাষা চীনা ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং এটা অনার্য ভোট-চীন গোষ্ঠীর ভাষা। তিব্বতীরা চীনাদের মতো

সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ না করে ওই সকল শব্দসমূহের তিব্বতী অনুবাদই ব্যবহার করতে থাকেন। এবং বড় বড় সংস্কৃত বই পুরোপুরি নিজেদের শব্দ দ্বারা অনুবাদ করেন। এই জন্য চীনাদের মতো ওঁদের মধ্যেও ভারতীয় নামসমূহ আত্মগোপন করে আছে। তিব্বতীরা ভাব নিয়েছেন কিন্তু ভাষা নেননি। তাই বুদ্ধকে এঁরা অনুবাদ করলেন সঙ্-স্-র্গ্যস অর্থাৎ 'জাগ্রত (=বুদ্ধ) রাজা'। যেমন, চীনারা রবীন্দ্রনাথকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করলেন চূ-চেন্-তান্ (চূ অর্থাৎ 'থিয়েন্-চূ' = সিন্ধু-দেশ, অর্থাৎ ভারতবর্ষ ; তান্ অর্থাৎ সূর্যোদয় বা প্রভাতসূর্য = রবি : চেন্ অর্থাৎ বজ্র, বজ্রের দেবতা = ইন্দ্র) । যাহোক, এত করেও তিব্বতীরা যে সংস্কৃত ভাষার মোহে পড়েছিলেন তার প্রমাণ—তিব্বতীদের পূজায় সংস্কৃত মন্ত্র কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। 'ওঁ মণি পদ্মে হুং' মন্ত্রটিকে তিব্বতী-বৌদ্ধদের জাতীয় মন্ত্র বলা চলে, কারণ এটি সকলেই সব জায়গায় ব্যবহার করেন। মোঙ্গল ও তুর্করা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তুর্করা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন এবং মোঙ্গলদের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম বজায় থাকে। তবে এঁরা তিব্বতীদের কাছ থেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন বলে সংস্কৃতের চেয়ে তিব্বতীয় ভাষার প্রভাবই তাঁদের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়। তুর্কীদের প্রাচীন ভাষাতে দুচারটি সংস্কৃত শব্দ দেখতে পাওয়া যায়। তুর্কীদের ভাষায় আসা দুটি সংস্কৃত শব্দ পারস্যদেশ ঘুরে ফারসী শব্দরূপে ভারতে আবার ফিরে এসেছে। এরূপ একটি সংস্কৃত শব্দ 'ভগধর' ভাগ্যবান বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও পরে বীরপুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তুর্কীতে এটি বগদির্, বগাদির্ প্রভৃতি বিকার ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ইরাণে এটি বহাদুর শব্দে পরিণত হয়। বাংলা ভাষায় ফারসী হতে এ শব্দটিকে 'বাহাদুর' রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এককালে মধ্য, উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং দ্বীপময় ভারতে সংস্কৃত ভাষা যেভাবে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বাহনরূপে প্রচারিত হয়েছিল এবং দ্বীপময় ভারত, ইন্দোচীন ও সিন্-কিয়াঙ্ এ ওই ভাষা যেভাবে প্রায় দেবভাষায় পরিণত হয়েছিল, ইরাণে কিন্তু সেভাবে সংস্কৃতের প্রসার ঘটেনি। সংস্কৃতের মাতৃস্থানীয় ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্যভাষা প্রথমটায় উত্তর-ইরাকে ও এশিয়া-মাইনরের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে তা স্থানীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

গ্রীকসম্রাট আলেক্সান্দরের অধীনে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং গ্রীক রাজারা কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে,

বাহ্লীকে এবং ইরাণে রাজত্ব করেন। এই সময় গ্রীক ও ভারতীয় ভাষার মধ্যে আদানপ্রদান চলেছিল। এবং কিছু কিছু গ্রীক শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃতে আসে। অনুরূপভাবে কিছু কিছু সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ গ্রীক ভাষায় গৃহীত হয়। যেমন—মুষ্ক=কস্তুরী, গ্রীকে মোসখোস, শর্করা=গ্রীকে সাক্‌খারোন্‌=প্রাকৃত সক্কর', কটুকফল=গ্রীকে কাকওফ্লোন=প্রাকৃতে কড়অফল; ব্রাহ্মণ=গ্রীকে ব্রাগ্‌মানেস প্রভৃতি।

খ্রীষ্ট জন্মের পরের প্রথম সহস্রক পর্যন্ত ভারত ও ইরাণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ছিল। এর পরে মুসলমান যুগে ফারসী ও আধুনিক পারসীক ভাষা, তুর্কী ও ইরাণী বিজেতাদের সরকারী ও সাংস্কৃতিক ভাষা হিসেবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফারসী ভাষা উত্তর ভারতের ভাষাসমূহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু খ্রীষ্ট জন্মের পরের প্রথম সহস্রকে এবং তার পরেও সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক ভারতীয় ভাষার শব্দ বিশেষ করে যেসব ভারতীয় বস্তু ভারতের পশ্চিমে রপ্তানী হত সেগুলির নাম ফারসীতে গৃহীত হয়েছে। ফারসীতে আনা ভারতীয় অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের নাম, যেমন—শকর্‌=শর্করা, কির্‌বাস্‌=কার্পাস, বুৎ=মূর্তি, বুদ্ধ-মূর্তি, নারগীল=নারকেল, শমন=শ্রমণ, বৌদ্ধ পুরোহিত, বরহ্‌মন=ব্রাহ্মণ, সমন্দর্‌=সমুদ্র, লক্‌=লাক্ষা, চত্‌রঙ্গ্‌=চতুরঙ্গ, শাঘল=শৃগাল ইত্যাদি। আবার আরবীতে এরূপ দু'চারটি শব্দ এসেছে যেমন, নারজীল=ফারসী নারগীল্‌=নারকেল, শকর=শর্করা, কাফ্‌র=কর্পূর, সন্দল=চন্দন ইত্যাদি। গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-বিদ্যা প্রসারের মাধ্যমে ভারত মধ্যযুগে ইরাণ ও আরবের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে ভারতীয় সংস্কৃত পুস্তকসমূহ পহ্লবী ও আরবী ভাষায় অনূদিত হলেও ভারতীয় শব্দ তেমনভাবে পহ্লবী ও আরবী ভাষায় প্রবেশ-লাভে সক্ষম হয়নি। অবশ্য কিছু কিছু ভারতীয় নাম বিকৃত অবস্থায় আরবী ও ফারসীতে স্থান পেয়েছে। যেমন, করটক-দমনক, পহ্লবীতে কললগ্‌-দমনগ্‌, আরবীতে কলিলহ্‌-দিম্‌নহ্‌, বিদ্যাপতি=বিদ্‌পয়্‌, সিদ্ধান্ত=সিন্দ্‌হিন্দ্‌ ইত্যাদি।

খ্রীষ্টীয় নবম শতকের পরে ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্ব আংশিকভাবে সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করলেও সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলী আরবী ও ফারসী ভাষায় গৃহীত হয়নি। পক্ষান্তরে আরবী ভাষা বাইরের শব্দ সিরীয়, ফারসী (পহ্লবী) ও য়ূনানী (গ্রীক) হতে প্রচুর শব্দ গ্রহণ করেছে। কিন্তু

মাঝে ফারসী থাকায় সংস্কৃত শব্দ সরাসরি আরবী ভাষায় প্রবেশ করতে পারেনি। সুতরাং মধ্যযুগে ভারতের বিজ্ঞান ও দর্শন আংশিকভাবে ভারতের পশ্চিমে প্রসারলাভ করলেও ভারতের আর্যভাষা (সংস্কৃত) সেরূপভাবে প্রস্তুত হতে পারেনি। এর অবশ্য আর একটি কারণও ছিল। তা হল—আরবী ও ফারসী ভাষী মুসলমান, তুর্কী ও ইরাণীগণ ভারত বিজয়ের ফলে সংস্কৃত ভাষা বিজিত, মূর্তিপূজক ও বিজেতার চোখে হেয় হিন্দু জাতির ভাষা বলেই ইরাণী, তুর্কী ও আরবের কাছে যোগ্য সমাদরলাভে সমর্থ হয়নি। অবশ্য অল-বীরুনীর মতো দু'চারজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এ ভাষাকে সমাদর করেছেন। যাহোক ভারতীয় ভাষা (সংস্কৃত) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মত পশ্চিম এশিয়ায় প্রসারলাভ করতে সমর্থ হয়নি।

শ্রেষ্ঠ সভ্যতা, মৌলিক দৃষ্টি ও চিন্তা এবং আধ্যাত্মিক অবলোকন ও ভাব প্রকাশের ভাষা হিসেবে পৃথিবীতে সংস্কৃত, গ্রীক ও চীনা ভাষা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আরবী ভাষা প্রধানতঃ গ্রীক সভ্যতা ও চিন্তার বাহন। সংস্কৃতভাষা ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছে। সংস্কৃত পড়েই চীনারা নিজেদের ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। কোরিয়ান ও জাপানীরা সংস্কৃতের বর্ণমালা দেখেই নিজেদের ভাষার জন্য ধ্বনি নির্দেশক বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। শুধু তা-ই নয় সংস্কৃতের সঙ্গেই ভারতীয় বর্ণমালা মধ্য-এশিয়া, ইন্দোচীন ও দ্বীপময় ভারতের বহু জাতির দ্বারা গৃহীত হয়।

আধুনিক কালে ইউরোপে এবং অন্যত্র সংস্কৃতভাষার চর্চার ফলে সংস্কৃত শব্দ এখন বিশ্বমানবের ভাষার সাধারণ ভাণ্ডারে স্থান করে নিচ্ছে। এতে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের উদ্ভব হচ্ছে। এবং ভারতের সঙ্গে ওই সকল দেশের ভাবের আদান প্রদানে সাহায্য করছে।

॥ ২ ॥

জাতীয়তা ও স্বাজাত্যবোধ সৃষ্টির জন্য ধর্ম অপেক্ষা ভাষাই বেশি কার্যকরী। কারণ ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রাচীন ইতিহাস বা ঐতিহ্য এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এক হয়েও যদি ভাষা বিভিন্ন হয় তবে পূর্ণাঙ্গ ঐক্য স্থাপিত হওয়া সাধারণত কঠিন হয়। এবং পূর্ণ স্বাজাত্যবোধ সৃষ্টিতে অন্তরায় ঘটে। এর

চরম দৃষ্টান্ত দেখা গেছে হালফিলের স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে, কারণ এক ইসলাম ধর্মীয় লোক হওয়া সত্ত্বেও উর্দুভাষী পাকিস্তানের লোকদের সঙ্গে বাংলাভাষী পূর্ববাংলার লোকদের আত্মিক মিল সম্ভব হয়নি। এছাড়াও ছিল বাংলাদেশের লোকেদের ওপর পাকিস্তানের লোকদের অর্থনৈতিক শোষণ। এক ভারতবাষ্ট্রে বাস করেও একই প্রদেশে একই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যেও বিরোধ হতে দেখা গেছে। হাল আমলে অসমীয়া ও বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। অবশ্য রাষ্ট্রীয় ঐক্যের খাতিরে ও শুভবুদ্ধিপরায়ণ এক শ্রেণীর লোকের হস্তক্ষেপে তা শেষ পর্যন্ত মিটে যায়। তবে এর পেছনেও যে অর্থনৈতিক কারণ ছিল না, তা নয়। কারণ কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী লোক যাদের কাছে রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থই বড়, তারা যখন একই ধর্মের অথবা ভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে ধর্মের নামে বিরোধ ঘটাতে ব্যর্থ হয় তখন ভাষাগত বৈষম্যকে আশ্রয় করে বিরোধ সৃষ্টির প্রয়াস করতে কসুর করে না। ওড়িশায়ও এরূপ ভাষা ভিত্তিক বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিলে শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে দেশবাসী অবশ্য সেটা বন্ধ করে দেন। তবে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ ভারতবাসী হিসেবে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা করে এক চরম উদারতার পরিচয় দিয়ে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছেন।

ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য অর্থনৈতিক বৈষম্যের হাত ধরে চলে। অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিলেই ধর্ম ও ভাষাগত বিরোধ ঘটার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। কাজেই প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কাজ হবে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করা।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়ে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের নামে জোর করে একটি ভাষা বিভিন্ন ভাষাভাষীদের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে প্রত্যেক প্রান্তিক ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিয়ে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে অর্থাৎ অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করা হয়েছে। অবশ্য বহুভাষী রুষ সাম্রাজ্যেও এককালে প্রান্তিক ভাষাগুলিকে বিনষ্ট করে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছিল, কিন্তু সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এক সময় রুষভাষার চাপে

পোলীয়, লিথুআনীয়, লেট, এস্তোনীয়, ফিন, আর্মাণী প্রভৃতি ভাষার অস্তিত্ব লোপ পাবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যের পতনের পর উক্ত ভাষাভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষা অবলম্বনে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে নিয়েছেন। বর্তমান সোভিয়েট শাসিত রুষদেশে প্রত্যেক ভাষাই রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা না দিয়ে হিন্দীকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিয়ে এক ভাষার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা চলছে। তবে এরূপভাবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসে অনেকেই সন্দিহান। কারণ এক একটি প্রদেশের বা অঞ্চলের এক বা একাধিক কোটি লোকের ভাষাকে স্তব্ধ করে রাখা সম্ভব হবে না। যেখানে প্রাদেশিক জনগণ তাঁদের প্রান্তিক ভাষা নিয়ে গর্ববোধ করেন এবং তার প্রসার ও উন্নতি কামনা করেন সেখানে সেই প্রান্তিক ভাষাগুলিকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষাকে অবলম্বন করে এক একটি স্বতন্ত্র জাতি বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলেই একই ভারতবর্ষের অন্তর্গত। সকলেরই প্রাদেশিক বা প্রান্তিক সত্তা সার্বভৌম ভারতীয় সত্তার বা সভ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভাষা-ভিত্তিতে কেউ বাঙালী, কেউ আসামী, কেউ ওড়িয়া, কেউ গুজরাটী, কেউ তামিল প্রভৃতি হলেও সকলেরই একটি বৃহত্তম জাতীয় পরিচয় আছে, তা হল—সকলকেই ভারতবাসী। এই পরিচয়ই বিবিধের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সহায়ক। তাই অনেকে মনে করেন প্রাদেশিক বা প্রান্তিক সত্তা বজায় রেখেও জাতীয় ঐক্য ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের জন্য বাঙালী বা বিহারী হয়েও ভারতবাসীরূপে সকলের জন্য একটি সাধারণ বা বৃহত্তম পরিচয়ের মতো একটি মাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। এ না হলে দৃষ্টি-ভঙ্গীর উদারতা ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যহত হবে। বাঙালীগণ যেমন বিহার, ওড়িশা, আসাম প্রভৃতি স্থানে গেলে ভাবের আদান প্রদানে ব্যর্থ হবেন, অনুরূপভাবে উক্ত প্রদেশের লোকেরা বাংলায় এলে একই ঘটনা ঘটবে। অর্থাৎ এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বা ভাবের আদান প্রদান করতে ব্যর্থ হবেন। অথচ নানা জাতি একই ভারতীয় রাষ্ট্রে বাস করার দরুন এরূপ আদান প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এছাড়া জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির জন্যেও এর প্রয়োজন রয়েছে।

বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কারণে এক রাষ্ট্রীয় বন্ধনে বাঁধা যায় কিন্তু ভাষাগত বৈষম্য থাকলে সে বন্ধন দৃঢ় হয় না। তাই বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসমষ্টিকে একটি রাষ্ট্রভাষা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করা যায় বটে, কিন্তু প্রান্তিক বা প্রদেশিক সত্তাকে বর্জন করে সকলে আন্তরিক ভাবে মিলিত হতে পারেন না বা চান না তাই অনেকে মনে করেন—সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের নিমিত্ত দেশে একটি মাত্র ভাষা রাখতে হবে, এবং অন্যভাষাগুলিকে হয় একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে হবে অথবা স্তব্ধ করে রাখতে হবে। গ্রেটব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ডের গেলিক ও ওয়েল্‌স্‌-এর ওয়েল্‌শ্‌ ভাষাকে বিলোপের দিকে এগিয়ে দিয়ে ইংরেজী ভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এবং একমাত্র ইংরেজী ভাষাকে আশ্রয় করেই ব্রিটিশ একতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় একতা স্থাপনের নিমিত্ত দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভাবশালী ভাষা ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রেতঁ ভাষাকে ক্ষয়িষ্ণু করে রেখে ফরাসী ভাষাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

যাহোক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক সত্তাকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বৃহত্তম জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টির জন্য যেমন বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় সত্তার প্রয়োজন সেরূপ বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে একসূত্রে গ্রোথিত করার জন্য একটি জাতীয় ভাষার প্রয়োজন।

বাংলার বাইরে একজন বাঙালী আর একজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হলে আনন্দিত হন। তখন একে অপরকে বাঙালীভাবেই দেখেন। কে কোন জেলার লোক সেটা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। অনুরূপভাবে ভারতের বাইরে গিয়ে একজন ভারতীয় অপর একজন ভারতীয়কে পেলে খুশি হন; তখন কে কোন প্রদেশের লোক তা গৌণ হয়ে ওঠে এবং বৃহত্তম পরিচয়টাই মুখ্য হয়ে জাতীয় ঐক্যের কথা বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রাদেশিক সংকীর্ণতাবোধকে দূর করে দেয়। এরপর যদি আবার ভারতের বাইরে ভারতেরই বিভিন্ন প্রদেশের লোক একটি রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরস্পরে কথা বলে ভাবের আদান প্রদান করতে পারেন তা হলে একই ভাষার মাধ্যমে বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য বোধের গুরুত্ব যে কত বেশি তা বুঝতে আর বিলম্ব হয় না

॥ তিন ॥

ভারতীয়দের সঙ্গে বিশ্বের অপর সকল দেশের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর দৈহিক গড়ন এবং সেই সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস, ভাষা ও সংস্কৃতির মিল দেখে পণ্ডিতগণ নানা মত পোষণ করেন। কেউ বলেন—ভারতবর্ষই মানবজাতির আদি বাসস্থান, যেখান থেকে মানুষ পৃথিবীর সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন—ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের কথা শুনে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে স্থল ও জলপথে ভারতে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তবে প্রাচীনকাল হতেই বিশ্বের অপরাপর দেশের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ও ভারতীয়দের মধ্যে যে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান হত তার অনেক পরিচয় পাওয়া গেছে। অতি প্রাচীনকালের ভৌগোলিক অবস্থা থেকে জানা যায়—এককালে ভারত, আরবদেশ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণআমেরিকা প্রভৃতি দেশ ও মহাদেশের মধ্যে সহজেই যাতায়াত হত। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার ১ম ও ১০ম খণ্ডে আছে—'প্রাচীন মহাদেশ—'গণ্ডয়ানা' দক্ষিণ আটল্যান্টিক মহাসাগর হতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই মহাদেশ উত্তর পশ্চিমাংশ বাদে সমগ্র আফ্রিকা, মাদাগাসকার, ভারতীয় উপদ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া, এ্যানটার্কটিকা অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু অঞ্চল, ফকল্যাণ্ড এবং চরম উত্তর ও পশ্চিমাংশ বাদে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ওই সময়ে ভারতের মধ্য ও দক্ষিণাংশের নাম ছিল—গণ্ডোয়ানা এবং সেখানে গণ্ড নামে এক উপজাতি এখনও বাস করেন। উপকূলাংশের প্রাচীন গঠন বাদ দিয়ে পরবর্তী প্রাচীন ও মধ্যযুগের জীবাশ্ম বা জীবের গঠন দেখেও এরূপ ধারণা করা হয়েছে যে, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণমেরু অঞ্চল একসঙ্গে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড নামে এক বিশাল দক্ষিণাঞ্চল গঠন করেছিল—যার একটি অংশ ছিল আফ্রিকা। এবং ভূমির গঠনানুসারে আরবদেশ আফ্রিকার একটি অংশ। এছাড়া ভারত, আরবদেশ ও আফ্রিকার মরু অঞ্চলের অস্তিত্বও প্রমাণ করে যে, ওই সকল দেশ এককালে ভূপ্রাকৃতিক গঠনানুসারে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত

ছিল। যাহোক, প্রাচীনকালে ওই সকল দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা অবাধ মিশ্রণ এবং পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটেছিল।

বহু পাশ্চাত্য জাতি ও হিন্দু জাতির পূর্বপুরুষ এক। বেদের সংস্কৃতভাষা ও পারস্যদেশের জেন্দ-আবেস্তার ভাষা, গ্রীক, ল্যাটিন, প্রাচীন ইংরেজী, আইরিশ, স্কটিশ, জার্মান, ডেন, নরওয়ে, সুইডিশ, পুরাতন প্রুশিয়া, লিথুনিয়, আলবেনীয়, বুলগেরিয়, আরমেণীয়, রুষ ও ইউরোপের আরও বহু ভাষার মধ্যে এমন শত শত শব্দ আছে যাদের মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে এবং তার কিছু কিছু ইতিমধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু ও বহু প্রাচীন ইউরোপীয় জাতির মধ্যে অনেক সামাজিক নিয়ম ও ধর্মবিশ্বাস প্রায় একই ছিল। তাঁরা সকলেই আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত পূর্বপুরুষের অর্চনা ও প্রেতপূজা করতেন। ঊষা, বরুণ প্রভৃতির আরাধনা ও যাগযজ্ঞ করতেন এবং সেজন্য তাঁদের মধ্যে পুরোহিত ছিল। বেদের অনেক দেবতার নাম কিছু পরিবর্তিত রূপে পূর্বোক্ত ভাষা সকলের মধ্যে পাওয়া যায়। এই সকল মিল ছাড়া ইউরোপীয় জাতিদের ইতিহাসে আছে যে, তাঁদের পূর্বপুরুষ কোনো দূরদেশ হতে এসে ইউরোপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য বহু কারণ বিশ্লেষণ করে ভাষাতত্ত্ববিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই মতে উপস্থিত হয়েছেন যে, সংস্কৃত ভাষা ও পূর্বোক্ত সমুদয় ভাষার মূলে একই ভাষা ছিল, যার কিছু পরিচয়, ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় আর্যগণের পূর্ব পুরুষ এবং ওই সকল ভাষা ব্যবহারকারী জাতিসমূহের পূর্বপুরুষ অতি প্রাচীনকালে একই স্থানে বসবাস করতেন ও তাঁরা সকলে একজাতি ছিলেন।

ভারতীয়দের সঙ্গে বহির্ভারতের মানবগোষ্ঠীর আকৃতি, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কতিপয় প্রচীন গ্রন্থ এবং দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের মতবাদ এখানে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। অবশ্য ওই সকল মতবাদের অনেক কিছুই বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায়—লৌহযুগের প্রারম্ভে ব্যাবিলনও ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের বণিকগণের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সাগরতীরবর্তী লোকদের ব্যবসায় বাণিজ্য চলত এবং পরবর্তীকালে মিশরীয়, গ্রীক ও ফিনিসিয়দের দ্বারা ওই ব্যবসায় পরিচালিত হত। এই ব্যবসায়-সূত্রেই পারস্য সাগর, লোহিতসাগর

ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলভূমি এবং মিশরদেশে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এঁরাই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ওই সকল দেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্য যেমন, মনুসংহিতা (১০।৪৫) থেকে জানা যায়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র বর্ণেরা ক্রিয়ালোপাদির জন্য বাহ্য জাতিতে পরিণত হয়ে দস্যু নামে অভিহিত হন। এতে মনে হয় মধ্যদেশীয় আর্যগণ পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েন এবং তাঁদের মধ্যে সদাচারে শিথিলতা আসে। তাঁরা ভাষার বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলে অপভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেন। এই কারণেই তাঁরা রক্ষণশীল আর্যদের কাছে বাহ্য জাতিতে পরিণত হন। তখন রক্ষণশীলগণ নিজেদের সুর বা দেব ও প্রগতিশীল এবং বাহ্যজাতিদের তাঁরা অসুর বা দস্যু ও অপ্রগতিশীল বলে অভিহিত করেন। এবং তাঁদের কথিত অপভাষাকে ম্লেচ্ছভাষা বলে চিহ্নিত করেন। এর দ্বারা কেউ কেউ মনে করেন—ভারতবর্ষই আর্যগণের আদি বাসস্থান এবং তাঁদের একটি দল ভারতের বাইরে চলে গিয়ে সেখানে বসতি বিস্তার করেন। যাহোক, পৌরাণিক সাহিত্যেও সুর এবং অসুর উভয়কেই প্রজাপতির সন্তান বলা হয়েছে। কাজেই তাঁরা পরস্পরে ভ্রাতৃস্থানীয়। অঙ্গিরা, অথর্ব্ব ও দধিচি প্রমুখ ঋষিগণ যে অগ্নিযজ্ঞ করতেন তাতে দেব ও অসুর উভয়েই যোগ দিতেন। কিন্তু পরে যজ্ঞকারী হিসেবে শুধু দেবতাগণকেই বোঝাত। এক সময়ে সুর বা দেব শব্দের ন্যায় অসুর শব্দ ও শ্রদ্ধাবাচক ছিল। তাই ইন্দ্র, বরুণ, সবিতা, মরুৎ প্রভৃতি সকলকেই ঋগ্বেদে সম্মানসূচক অসুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তবে যতদিন সুর ও অসুরদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল ততদিন অসুরদের মর্যাদা হানি হয়নি কিন্তু পরে এঁদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে দেবতারা অসুরদের পরাস্ত করে তাঁদের অমর্যাদাকর অবস্থায় ফেলেন। রুদ্র ছিলেন 'মহান অসুর'। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে—"রুদ্রো অসুরোমহো" অর্থাৎ রুদ্র মহান অসুর। মহাদেবের অন্য নাম মহান অসুর। রুদ্রই শিব বা মহাদেব। এবং বৈদিক আর্যদের রুদ্র বা শিবই মহান অসুর রূপে অভিহিত হন। এই শিব বা মহাদেবই গ্রাম্য সংস্কৃতির আদিপিতা এবং সিন্ধু-সভ্যতার যোগাসনস্থ পশুপতি। পার্শীদের সর্বপ্রধান দেবতা ছিলেন এই শিব বা মহান অসুর। বৈদিকদের প্রধান অসুরই পরবর্তীকালে শিবের সঙ্গে একীভূভ হয়ে গেছেন। সুতরাং প্রাচীন রুদ্র শিব, যিনি মহেঞ্জোদড়োর দেবতা তিনিই ঋগ্বেদের রুদ্রশিব

এবং হিট্টাইটদের দেবতা। বৈদিক রুদ্র ও উমা এশিয়া-মাইনরে হিট্টাইটদের দ্বারা পূজিত হতেন।

সিন্ধু সভ্যতায় ও বেদে বৃষের আদর ছিল। পরবর্তী কালে বৈদিকদের মধ্যে বৃষভবাহন মহাদেবের ও মহিষবাহন বলে যমের পূজা করা হত। বেদে কিন্তু কোথাও গাভীকে মাতৃদেবতা রূপে পূজা করার কোনো প্রমাণ নেই। এ ধারণা পরবর্তী পৌরাণিক কালের।

মনুসংহিতায় দ্রাবিড় সভ্যতাকে বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় জাতির সভ্যতা রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, দ্রাবিডজাতি আর্যজাতির বহির্মুখী শাখা। সুমের ও মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার মধ্যে মিল দেখে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ-দুটি সভ্যতাও সম্পর্কযুক্ত ছিল। জলপথের কথা বাদ দিয়ে স্থলপথে, পদব্রজে এবং উষ্ট্র ও শকটাদির দ্বারা এ-দুটি স্থানের মধ্যে যাতায়াত হত। মোটেরওপর স্থলপথে এ-দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল যার মাধ্যমে এঁদের মধ্যে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সম্ভব হয়েছিল।

রামায়ণ হতে জানা গেছে—ভরতের মাতুলালয় ছিল কেকয় দেশে অর্থাৎ ককেশাস পর্বতের নিকট আর্মেনিয়ায়। দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে মাতুলালয় হতে আনবার জন্য যে অমাত্যগণকে কেকয়ে পাঠানো হয়েছিল তাঁদের বহ্লীক দেশ অতিক্রম করে আরও অনেক উত্তর-পশ্চিমে যেতে হয়েছিল।

ব্যাকট্রিয়া নামক জনপদই পুরাণে বর্ণিত প্রাচীন বহ্লীক রাজ্য। জানা গেছে—জরথুস্ত্র পশ্চিম পারস্যে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এবং পেশোয়ার হতে কয়েক কিলোমিটার দূরে বহ্লীকেই তিনি তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। বহ্লীকের অধিপতি সম্রাট বিষ্টাস্প জরথুস্ত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীনকালে ইরাণ দেশ (ইলাবৃতবর্ষ) তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যেমন—পার্থব (পার্থিয়া) পর্শু (পার্শিয়া) এবং মাধ্য (মিদিয়া)। ঋগ্বেদে এই তিনটি প্রদেশেরই উল্লেখ আছে। এগুলির মধ্যে পর্শুই প্রধান বলে সমগ্র দেশটির নাম হয়েছিল পর্শু। বিহিস্তান লিপিতে দেশটিকে পার্স নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইরানীয়েরা এটিকে পার্সই বলতেন কিন্তু ভারতীয়েরা বলতেন পর্শু। যাহোক পার্স শব্দই কালক্রমে পারস এবং পারস্যে রূপান্তরিত হয়েছে। বৈদিকযুগে পুরাণের প্রসিদ্ধ সম্রাট নহুষ এবং তাঁর পুত্র যযাতি পারস্য দেশে রাজত্ব করতেন।

আফগানিস্থানের প্রতিষ্ঠানপুরই ছিল পুরুরবার রাজধানী। ঋগ্বেদে পাঠান-দিগকে পক্থ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এবং এটাই পাখতুনিস্থান নামের মূল ইতিহাস।

মহাভারতে আছে—"এক মনু হতে সমুদয় মানব জাতি উৎপন্ন হয়েছে। একই বংশে হিন্দু, যবন ও ম্লেচ্ছ জন্মেছেন। ক্ষত্রিয় রাজাযযাতীর ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু এবং অন্য স্ত্রী অসুব কন্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু এই মোট পাঁচপুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই যতুব বংশে যাদবগণ, দ্রুহ্যর বংশে ভোজগণ, পুরুব বংশে পৌরবগণ, তুর্বসুব বংশে যবনগণ এবং অনুর বংশে ম্লেচ্ছগণ জন্মেছিলেন।"[১] এতে আছে—যবন, শক, পহ্লব, চীন, গান্ধার প্রভৃতি বহু জাতি পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে তাঁদের দেখা না হওয়ায় তাঁরা পতিত হয়েছিলেন।"[২] পারসিকগণকে হিন্দুগণের অংশ এবং ক্ষত্রিয় বংশদ্ভূত বলে উল্লেখ কবা হয়েছে। এটাও সম্ভব যে, ওই সকল জাতি ভাবতবর্ষ হতে নানা দেশ দেশান্তবে চলে গিয়েছিলেন এবং বহুকাল পরে তাঁদের বংশধবগণ পুনবায ভাবতবর্ষে ফিরে এসেছিলেন। পুরাণে আছে—হিন্দুরাই পুবাকালে মিশব দেশে গিয়েছিলেন ও নীলনদের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার কবেছিলেন। মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতাব এক অপূর্ব মিল আছে। এবং প্রাচীন পাবসিকগণেব সঙ্গেও ভাবতীযগণেব বহু বিষযে সৌসাদৃশ্য আছে।

মহাভারতেব পণ্ডবগণ যখন বিরাট দেশে আত্মগোপন করেছিলেন তখন নকুল মাতুল দেশের কুলধর্ম অনুসারে একটি মৃতদেহ বৃক্ষে ঝুলিয়ে বেখেছিলেন। পার্শীরা মৃতদেহ দাহ না করে বা কবর না দিয়ে কোনো উঁচুস্থানে রেখে দিতেন যাতে সেটি পক্ষীবা আহার কবতে পাবে। মহাত্মা বিদুর পাবস্যদেশে বিয়ে করার দরুণই বোধ হয় তাঁর পত্নীকে মহাভাবতে পারসবী কন্যা বলা হয়েছে। এছাড়া গান্ধারী ছিলেন কান্দাহারের কন্যা। এবং বিখ্যাত বৈযাকবণিক মহাত্মা পাণিনির বাসস্থান ছিল আফগানিস্থানের শালাতুব গ্রামে। এসকল ঘটনার দ্বারা এরূপ প্রমাণিত হয় যে—মহাভারতের সময় পর্যন্ত হিন্দুও পার্শীদের মধ্যে কোনো প্রকার বিশেষ সামাজিক প্রভেদ ছিল না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কুরুগণ দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন নাগবাজগণ তক্ষশিলায় রাজধানী স্থাপন করে হস্তিনাপুব আক্রমণ করেন। এতে কুরুরাজ পরীক্ষিত নিহত হন এবং তাঁব পুত্র জন্মেজয়

নাগদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হলেও এই সময় তাঁদের পক্ষে আর হস্তিনাপুরে বাসকরা সম্ভব হয় নি।

"কুরুবংশের একটি শাখা হস্তিনাপুর হতে কয়েকশত মাইল দক্ষিণে সরে গিয়ে কৌশাম্বীতে নতুন করে রাজধানী স্থাপন করেন। এবং আর একটি শাখা পশ্চিম-দিকে গিয়ে পারস্যে পার্শীপোলিস (পার্শীপুর) নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। নবকুরু ছিলেন এই বংশের প্রথম সম্রাট (এইচ, জি, ওয়েলস—এ সর্ট হিস্টরী অব দি ওয়ারল্ড পৃ, ৭৬) নবকুরুকে গ্রীকগণ বলতেন সাইবাস কিন্তু পারস্যের শিলালিপিতে তাঁকে কুরু এবং হিব্রু সাহিত্যে তাঁকে কো.রস নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সম্রাট কুরুই এশিয়া-মাইনরের তদানীন্তন গ্রীক রাজা ক্রোশাসকে পরাজিত করে সমগ্র এশিয়া-মাইনর তাঁর দখলে নিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, পরে সম্রাট কুরু প্রথমে কালদিয়ার রাজা বেলথেসরকে এবং আরও পরে তাঁর পুত্র নবনীদাসকে পরাভূত করে সমগ্র ব্যাবিলনে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সম্রাট কুরুর পুত্র কম্বেশ তাঁর বাহুবলে মিশরদেশকে নিজের অধিকারে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাইবেলেও সম্রাট কুরুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় এক হাজার বছর পরের কথা। ঐতিহাসিকগণ খ্রীষ্ট পূঃ পঞ্চদশ শতকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল বলে নির্ণয় করেছেন। যাহোক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এক হাজার বছর পরে পারস্যে কুরু বংশের খ্যাতি পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সম্রাট দয্যবাহু (দেরিয়াস বা দারায়ুস) ছিলেন নবকুরুর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। তিনি নিজেকে প্রধান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং সকলদেশের ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করে গেছেন। একজন দিগ্বিজয়ী পারস্য সম্রাটের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী ভারত ও পারস্যের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্যের নিদর্শন বহন করে। এছাড়া দয্যবাহুর রাজত্বকালে পারস্যের সীমা পূর্বে সিন্ধুনদ হতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয়—পারস্যের কথিত ভাষা সংস্কৃতের মতোই ছিল।

মিশরের আদিম সভ্যতার স্তরে দেবতা ও পূজার প্রথা ছিল। ফিনিসিয় অঞ্চলে আদি মাতা ও আদি পিতার অর্চনা শুধু হিকশোস, হিট্টাইট জাতির প্রভাবেরই ফল। শিব ও গৌরী মিশরে পরিবর্তিত হয়ে অসিরিস ও আইসিস নামে পূজিত হয়েছেন। শিব সংস্কৃতির ভারতীয় ধারা প্রথমে নিকট প্রাচ্যে,

গ্রীসে ও পরে মিশরে আনা হয়েছে। প্যালেস্টাইনে মহাকালের মন্দির ছিল। আদি মাতা ও আদি পিতার সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতারই আদি দান।

এক সময়ে এশিয়া-মাইনরের অর্ধেকটা গ্রীক আর্যেরা আর বাকি অর্ধেকটায় পারসিক আর্যেরা বসবাস করতেন (এইচ. জি. ওয়েলস—এ সর্ট হিষ্টরী অব দি ওয়ার্ল্ড, চ্যাপটার ২৩ এবং ২৪) এবং তাঁরা পরস্পরের মধ্যে অতি ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করতেন। বৈদেশিক সংস্কৃতি ওই সময়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বেদে উল্লিখিত মাধ্যদেশই মদ্র নামে অভিহিত হয়েছে। মাদ্রী যখন পাণ্ডুর সঙ্গে সহমরণ বরণ করেন তখন কুন্তী তাঁকে বহ্লীকী বলে অভিনন্দন করেছিলেন। এতে মনে হয়—মদ্র ও বহ্লীক প্রদেশ কাছাকাছি অবস্থিত ছিল।

অতি প্রাচীনকালে মেসোপোটেমিয়া, সিরিয়া, এশিয়া-মাইনর ও প্যালেষ্টাইনে প্রাপ্ত কীলকাক্ষরে লিখিত মাটির চাকতি থেকে জানা গেছে—পশ্চিম এশিয়ার অনেক লোক ইন্দো-ইউরোপীয় এমনকি বৈদিক নাম যেমন ইন্দ্রকত, আর্ত্ততম, স্বর্ণ, দশরথ ও কিককুলি প্রভৃতি ধারণ করতেন। এই ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর লোকদের মিটান্নী, হিট্টাইট ও কাসসাইট বলা হত। মিটান্নীর আর্যজাতি বৈদিক দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ ও মিত্র প্রভৃতির উপাসনা করতেন। একদল আর্য উরুমিয়া হ্রদের পশ্চিমে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এখানকার আর্যদের ভাষায় বৈদিক প্রাকৃতের ব্যবহার দেখে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, বৈদিক যুগে এই সকল মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতের অভিন্ন সম্বন্ধ ছিল।

প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা পশ্চিম এশিয়ার বহুদূর পর্যন্ত প্রসার লাভ করেছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়ান বলেন—ভারতের সীমানা উত্তরে তরাস পর্বতমালা অর্থাৎ সাইলেসিয়া, লাইসিয়া ও পাম্ফেলিয়া প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তরাস পর্বতমালা এশিয়া মহাদেশের তুরস্ক রাজ্যে অবস্থিত। তরাস হতে ককেশাস এবং সেখান হতে হিমালয় পর্বতের উত্তর পর্যন্ত ভারতের সীমা প্রসারিত ছিল। আরব, পারস্য, তুরস্কের কিয়দংশ এবং মধ্য এশিয়ার বহুদূর পর্যন্ত এবং আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানসহ বিস্তীর্ণ ভূভাগ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চীন, পারসিক, পারদ, দরদ ও হূণ প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের সীমানার

নিকটে বসবাস করতেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টলেমি বলেছেন—আর্যাবর্তের সীমানা এককালে মধ্য এশিয়ার বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং ওই সময় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব উক্ত স্থান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভারতীয়দের সঙ্গে পারসিকদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। ভাষাবিদ ম্যাক্সমূলারের মতে—"জোরাষ্ট্রীয়ান ধর্মাবলম্বী পারসিকগণ অনেকদিন পর্যন্ত আর্যনাম অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন। তাঁদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আভেস্তায় আর্য ধর্মেরই অংশ বিশেষ বিদ্যমান আছে।"

অধ্যাপক হীরেনের মতে, জেন্দভাষা প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষা হতে সৃষ্ট হয়েছে। কাউন্টবোর্ণষ্টার্ন বলেছেন—পারসিকগণ সম্ভবতঃ—ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশ, আফগানিস্থান ও কাশ্মীরের আদি অধিবাসী ছিলেন। ডঃ হগের মতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে পরস্পর বিবাদের ফলেই পারসিক ধর্মের সৃষ্টি হয়। কর্ণেল টড বলেছেন—"অজমেধের পাচ পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে দুই পুত্র ভারতবর্ষ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় এবং পিতৃস্মৃতি রক্ষার জন্যই তাদের পদবী হয়েছিল মেধ আর বাসস্থানের নাম হয়েছিল মেধদেশ এবং সেই মেধ দেশ হতে ক্রমে মিডিয়া নামের উৎপত্তি হয়" (দুর্গাদাস লাহিড়ী—ভারতবর্ষ)। পণ্ডিতগণ মনে করেন—প্রাচীন ব্যাকট্রিয়া রাজ্য হিন্দুকুশ পর্বতের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। তাঁদের মতে ব্যাকট্রিয়া আর্যগণের আদিভূমি। এই ব্যাকট্রিয়, মিডীয় ও পারসিকগণের মধ্যে মিল আছে এবং জেন্দ ভাষাই তাঁদের মাতৃভাষা।

জানা গেছে—কাসসাইট নামে একটি সূর্যপূজক আর্যজাতি ব্যাবিলনে রাজত্ব করতেন। এঁদের প্রধান দেবতা ছিলেন মারুত্তস এবং তিনি ছিলেন বায়ুর দেবতা। এঁরা মিটান্নী নামক আর্যদের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত ছিলেন। এবং সবিতৃ দেবতাকে সূর্য নামে অভিহিত করে পূজা করতেন।

কিছু প্রাচীন লিপির সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ ও মনুসংহিতার বিবরণের মিল দেখে এরূপ ধারণা করা যেতে পারে যে, বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য, সূর্য, মরুৎ প্রভৃতির উপাসক ভারতীয় আর্যগণ, ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া, এশিয়া-মাইনর ও আইওনিয়া (যবন দেশ) পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

কথিত আছে—মগধ দেশীয় প্রদ্যোতন রাজ্যের পুত্রপাল নামক নৃপতি শৈব ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস করতেন না এবং বৌদ্ধগণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে

স্বদেশ ত্যাগ করে মিশ্র (বর্তমান মিশর) দেশে গিয়ে বাস করেছিলেন। তিনিই মিশরে শৈবধর্ম প্রচার করেছিলেন (বাইবেল, জেনেসিস)।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা চন্দ্রগুপ্ত কাবুল, কান্দাহার, হিরাট প্রদেশ শাসন করতেন।[৩] এছাড়া মধ্য এশিয়ার চীন-তুর্কিস্থানে বৌদ্ধধর্ম এমনভাবে প্রচারিত হয়েছিল যে, তখনকার স্থানীয় সভ্যতা বৌদ্ধ সভ্যতায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে সংস্কৃত ভাষা প্রবল হয়েছিল।[৪]

মিশর দেশীয় ভূগোল শাস্ত্রবিদ টলেমি বলেছেন—ভারতের পশ্চিমে গুজরাটের দক্ষিণদিকে কাম্বে নামক অখাতের তীরে সুপার নামে একটি প্রদেশ অবস্থিত ছিল। এই সুপার প্রদেশে ফিনিসীয় ও ভারতীয়দের বাণিজ্য চলত। এবং এঁরা ইজরাইল বণিকদের পূর্ব হতেই ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন। ভারতের সঙ্গে ফিনিসীয়দের যে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল সে কথা 'পেরীপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ানসি' নামক গ্রন্থ থেকেও জানা যায়।

অধ্যাপক ফ্লিণ্ডার্স পেট্রির মতে—ইজিপ্টবাসিগণ মনে করেন তাঁরা লোহিত সাগরের অপরপারে বহুদূরবর্তী পাণ্ট নামক দেশ হতে এসেছেন। এদেশ সম্বন্ধে তাঁরা বলেন—দেশটি মহাসাগরের উপকূলে পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত এবং সেখানে হস্তীদন্ত, চিতাবাঘ, বানর, বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী, চন্দন, নারকেল, নানাপ্রকার সুগন্ধ মশলা, ধূপ, রত্ন প্রভৃতি পাওয়া যেত—এ থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য দেশকেই পাণ্ট দেশ বলা হয়েছে।

করোটির মাপের সাদৃশ্য সম্পর্কে আধুনিক নৃতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, চুল, দেহের রং এবং নাক ও মাথার মাপ ঋতু ও স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এ কারণেই সভ্যতার সাদৃশ্য স্থাপনে নৃতাত্ত্বিক মিলের চেয়ে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক মিলের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

বিখ্যাত পণ্ডিত হল সাহেব নানা প্রমাণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের দ্রাবিড়গণই প্রকৃতপক্ষে প্রাগৈতিকহাসিক যুগে সুমের, ব্যাবিলন ও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। বেলুচিস্থানের একটি জায়গার ব্রাহুই ভাষা, সুমেরে পাওয়া খোদিত চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি এবং মৃৎপাত্রে মৃতদেহ সমাধি দেওয়ার প্রথা ও করোটির মাপ থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, দক্ষিণ ভারত থেকেই তামিলভাষী জাতিগুলি সুমের, ব্যাবিলন এবং আসিরিয়ায় সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভারত সংস্কৃতি আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। স্যার উইলিয়াম জোন্স বলেছেন—এককালে যাঁরা ভারতবর্ষে শাসন করতেন ইথিওপিয়া তাঁদেরই অধীন ছিল। উইলিয়াম জোন্সের বহু পূর্বে গ্রীসদেশের তার্কিক ও অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ ফিলষ্ট্রেশাস্ বলে গেছেন--ইথিওপিয়াবাসীরা ভারতবাসীদের বংশধর। এবং তাঁরা পূর্বে ভারতবর্ষে বসবাস করতেন। তাঁরা নিজেদের দেশের সম্মানিত নৃপতিকে হত্যা করে যে পাপ করেছিলেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হন, এবং ইথিওপিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ক্যানষ্টানটিনোপল রাজ্যের অন্যতম ধর্মাক্ষও বলেছেন—সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চল হতে যাঁরা মিশরে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন ইথিওপিয়গণ তাঁদেরই একটি শাখা। ফিলস্ট্রেশাসের গ্রন্থে লেখা আছে, "একজন মিশরবাসী তাঁর পিতার নিকট শুনেছিলেন—ভারতবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান ও ধীশক্তিসম্পন্ন। ইথিওপীয়গণ তাঁদেরই একটি শাখা এবং তাঁরা ভারতবর্ষ হতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা ভারতীয় পিতৃপুরুষের ন্যায় জ্ঞানবান ছিলেন এবং তাঁদেরই আচার ব্যবহার পালন করতেন।" ইথিওপিয়গণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন যে, তাঁরা ভারতবাসী হতেই উৎপন্ন এবং তাঁদের থেকে অভিন্ন নন। রোমীয় ঐতিহাসিক জুলিয়াস আফ্রিকেশশ পূর্বোক্ত মতকেই সমর্থন করে গেছেন।

অধ্যাপক হীরেন বলেন—আবুইশীন (সিন্ধুনদের একটি প্রাচীন নাম) এর তীরবর্তী প্রদেশ হতে আফ্রিকায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে ভারতীয় হিন্দুগণ সেই স্থানকে আবিসিনীয়া নামে অভিহিত করেছিলেন। অনেকের ধারণা—মিশরের নীলনদের নাম এই উপনিবেশকারীদের দেওয়া এবং এই নদীর তীরবর্তী অনেক অঞ্চলের নামের সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের নামের মিল আছে ও নীলনদের মোহনায় যে বিরাট বাণিজ্য বন্দর ছিল ওই বন্দর থেকে ফিনিসিয় এবং ইথিওপিয়গণ স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

কর্ণেল টড্ বলেছেন—"ভারতবর্ষই মনাবজাতির আদি বাসভূমি।"[৫] তিনি আরও মন্তব্য করে গেছেন—"আমি প্রমাণ করেছি যে, রাজস্থান ও প্রাচীন ইউরোপ, উভয় দেশের সমর-প্রিয় জাতি সকল একই বংশ হতে উৎপন্ন হয়েছেন।"[৬] স্যার ওয়ালটার র‍্যালে লিখেছেন—"জল প্লাবনের পর ভারতবর্ষেই

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মনুষ্য জাতির বসতি হয়েছিল।"[৭] এঁদের মতে ভারত-বাসীরাই নানাস্থানে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ লিখেছেন—"এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইউরোপের ভাষা সকল, সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন ভারতের ভাষা, সহিত্য, শিল্প ও দর্শনের সঙ্গে অসংখ্য প্রকারে সম্বন্ধ বিশিষ্ট।"[৮]

কর্ণেল অলকটের লেখা থেকে জানা যায়—"ভাষাবিদ পণ্ডিতগণ সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপের ভাষা সমূহের তুলনা করে স্থির করেছেন যে, আর্য সভ্যতাই ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হোক, তার সঙ্গে তুলনীয় উপযুক্ত অন্য প্রমাণের দ্বারাও সেটা নির্ণয় করা যায়। ব্যাবিলনিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম ও উত্তর ইউরোপের দর্শন ও ধর্ম আলোচনা করলেও জানা যায় যে, আর্যচিন্তা পূর্ব হতে পশ্চিমে গিয়েছে। পিথাগোরাস, সক্রেটিস্, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হোমার, জেনো, হিসিয়ড, সিসিরো, স্কাভোলা, ভারো ও ভার্জিলের (গ্রীস ও ইতালীয় পণ্ডিতগণ) উপদেশাবলীর পার্শ্বে বেদব্যাস, কপিল, গৌতম, পতঞ্জলি, কণাদ, জৈমিনি, নারদ, পাণিনি, মরীচি প্রভৃতি অনেকের উপদেশাবলী রেখে সাদৃশ্য দেখলে বিস্ময়ে পূর্ণ হতে হয়। মনে হয়—নবীন পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ প্রাচীন প্রাচ্য দার্শনিকগণের নিকট হতে তাঁদের মত গ্রহণ করেছিলেন।"[৯] প্রাচীন মিশরবাসীর সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস, সমাজ, রাজনীতি ও আচার ব্যবহারের অদ্ভুত মিল দেখে অধ্যাপক হিরেণ বলেছেন—"ভারতবাসীই মিশরে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।"[১০] আরও লিখেছেন যে, ভারতবর্ষই আদিস্থান যেখান হতে শুধু অবশিষ্ট এশিয়া নহে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ জ্ঞান ও ধর্ম্ম আহরণ করেছে।"[১১] "অ্যানি বেসেণ্ট বলেছেন, ভারত-ভূমিই সকল ধর্মের জননী।"[১২] দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'পৃথিবীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে আছে—কর্জন সাহেব লিখেছেন যে, সংস্কৃতই আর্যগণের আদিভাষা, এবং ভারতবর্ষই আর্যগণের আদি বাসস্থান হওয়াতে এই দেশে উক্ত ভাষা অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর মতে ভারত হতে আর্যগণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন বলেই সেই সকল দেশের ভাষার সঙ্গে আর্যভাষার অনেক শব্দের মিল আছে।

ভারতীয় এবং মিশরীয়দের সমাজ ও সংস্কৃতির মিল সম্পর্কে টেলর লিখেছেন, "ভারত ও মিশর দেশের মধ্যে বহু বিষয়ে ঐক্য আছে। এমন প্রমাণ পাওয়া

গেছে যে, সিন্ধুনদের মুখ হতে এক ক্ষুদ্র উপনিবেশের উপযোগী লোক আফ্রিকার উপকূলে এসেছিল এবং সেখান হতে মিশর দেশের দক্ষিণ সীমাবর্তী নীলনদ পর্যন্ত গিয়েছিল। মিশর দেশেও ভারতের স্থায় জাতিভেদ প্রথা ছিল। পুরোহিত ও যোদ্ধাগণ সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানভাজন ছিলেন। তাঁদের নীচে কৃষক, বণিক, নাবিক, শিল্পী ও সর্বনিম্নে মেষপালকগণ স্থান পেত। উক্ত পুরোহিতগণের মধ্যেই আবার বিচারক, ভবিষ্যদ্বক্তা ও চিকিৎসক ছিলেন। রাজ-পরিবার যোদ্ধ জাতির অন্তর্গত ছিলেন। সকল ব্যবসায়-বাণিজ্য বংশানুক্রমিক ছিল। আত্মার পুনর্জন্মবাদ মিশরে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ তা ভারতবর্ষ হতেই আনা হয়েছিল। মিশরবাসীরা গাভীর পূজো করতেন। তাঁরা পৌত্তলিক ছিলেন, তাঁদের দেবমন্দির ছিল। ভারতের সঙ্গে মিশরের বাণিজ্য সম্পর্কও ছিল।"[১৩] ভারত ও পারস্যের সম্পর্কে প্লিনী লিখেছেন, "অনেকের মতে পারস্যদেশের অধিকাংশ একদা ভারতেব অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[১৪] এবং অধ্যাপক হগ বলেছেন, "ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে পারস্যদেশের জোর-আষ্টার ধর্মের মিল আছে। দেবতার নাম, গল্প, যাগ-যজ্ঞাদি প্রভৃতি অনেক বিষয়েই ঐক্য রয়েছে। বেদের সঙ্গে পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তার বহু মিল আছে। অনেক বৈদিক দেবতার নাম কিছু পরিবর্তিত অবস্থায় জেন্দ-আবেস্তায় পাওয়া যায়। হিন্দু ও পারসিক উভয়েই অগ্নির উপাসক। পারসিকগণ পুত্রদের উপনয়নও দিয়ে থাকেন।"[১৫]

কাউন্ট বোর্ণস্টার্ণ মন্তব্য করেছেন যে, "ব্যাবিলোনিয়া, কলডিয়া ও কোলচ্চি-বাসীরা ভারতীয় সভ্যতার কাছে বিশেষভাবে ঋণী।"[১৬] তিনি আরও লিখেছেন, আর্যাবর্তে যে শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল, তা-ই নয়, সেখানেই হিন্দুদের সমুন্নত সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। তা ক্রমে ক্রমে পশ্চিমদিকে ইথিওপিয়া, মিশর ও ফিনিসিয়া দেশে; উত্তরে পারস্য, কলডিয়া, কোলচ্চি এবং সেখান থেকে গ্রীস, রোম ও পৃথিবীর সর্বোত্তর প্রদেশে; পূর্বে শ্যাম, চীন ও জাপানে এবং দক্ষিণে লঙ্কা, যব ও সুমাত্রা দ্বীপে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।"[১৭]

স্যার উইলিয়াম জোনস্ লিখেছেন—"ডু-পেরণ প্রণীত জিন্দ অভিধানের প্রত্যেক দশটি শব্দের মধ্যে ৬।৭টি খাঁটি সংস্কৃত।"[১৮] অন্যত্র তিনি লিখেছেন —"হিন্দুদের সম্বন্ধে সকল কথা বলতে গেলে বহু গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন। তার মোট ফল এই যে, প্রাচীন পারসিক, ইথিওপিয়া ও মিশরবাসী; ফিনিসীয়, গ্রীক ও টাসকন জাতি; শক বা গথ ও কেলটস; চীন, জাপান ও পেরু-

বাসী—এই সকল জাতির সঙ্গে হিন্দুগণের স্মরণাতীত সময়ে সম্পর্ক ছিল।"[১৯] স্যার জোনস্ ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। তিনি ভারত তত্ত্বানুশীলনকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কালিদাসের শকুন্তলা ও মনুস্মৃতি অনুবাদ করেছিলেন। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি বহুভাষাবিদ স্যার জোনসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ফরাসী পণ্ডিত জেকোলীয়ট লিখেছেন—"বাইবেলের মুসা মনুসংহিতা হতেই তাঁর বিধি সকল সংগ্রহ করেছিলেন। মিশর, পারস্য, গ্রীস ও রোমদেশের আইন মনুর স্মৃতি হতে গৃহীত। মনুর স্মৃতিই তাদের মূল। ইউরোপে আজও মনুর প্রভাব দৃষ্ট হয়।"[২০] এ থেকেও মনে হয়, ওই সকল দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল।

হোঁমারের সময়কার গ্রীসের অবস্থা বর্ণনা করে পোকক লিখেছেন—"গ্রীসের ভাষা, দর্শন, ধর্ম, জাতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধিবৃত্তি, রাজনৈতিক প্রথা, রহস্য, নদী ও পর্বত, সকলেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে, ভারতবাসীরাই প্রথম গ্রীসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।"[২১] কর্ণেল টড লিখেছেন—"গ্রীক প্লেটো বলেন, 'গ্রীকগণ মিশর ও প্রাচ্য দেশ হতে তাঁদের দেবদেবী সকল গ্রহণ করেছিলেন।' হিন্দু, মিশরবাসী ও গ্রীকগণের দেবদেবীর ইতিবৃত্তে সম্পূর্ণ মিল আছে। এটা অসম্ভব নয় যে, একদল হিন্দু গ্রীস দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।"[২২] থর্ণটন মন্তব্য করেছেন—"যখন মিশরের বিস্ময়কর পিরামিড সকল নীলনদের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়নি, যখন ইউরোপীয় সভ্যতার জননী গ্রীস ও ইতালী বন জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল ও কেবল অসভ্য ও বর্বরের আবাসস্থান ছিল, সেই সময় ভারতবর্ষ ধনৈশ্বর্য ও বিভবের লীলাক্ষেত্র ছিল।"[২৩]

আমেরিকায় হিন্দুগণের উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার লিখেছেন—প্রাচীন এশিয়া ও প্রাচীন আমেরিকার ভাষা ও ধর্মে এমন চিহ্ন পাওয়া যায় যে, মনে হয়—পুরাকালে এশিয়ার বহু অধিবাসী আমেরিকায় গিয়েছিল। তারা এশিয়ার উত্তরাংশ হতে কিংবা তার দক্ষিণ ভাগ হতে যাত্রা করে অনুকূল বাতাসে পাল তুলে দিয়ে এক দ্বীপ হতে অন্যদ্বীপে এরূপে ক্রমে ক্রমে দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে আমেরিকায় উপনীত হয়েছিল। (এ্যানসিয়েণ্ট জিওগ্রাফি, পৃঃ ৫৫-৫৭)

বেদাচার্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন—"আর্যগণ ভারতবর্ষ হতে আরবে এবং

এশিয়া-মাইনরে গিয়ে বসতি করেছিলেন।" স্বামী শংকরানন্দ বলেছেন, "যখন প্রাচীনকালে সমস্ত জগৎ নিদ্রিত ছিল, শুধু ভারতবাসীই জাগ্রত ছিল। আর তারা বিদেশে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তাদের সংস্কৃতি দান করেছিল আর রাজ্য স্থাপন করেছিল যার দ্বারা তারা ঐ সমস্ত দেশ শাসন করেছিল" (সুমেরীযার হিন্দুরাজত্ব ; স্বামী শংকরানন্দ, পৃঃ ৬৮)। মাসিক মোহম্মদীর ১৩৩৯ সালের পৌষ সংখ্যায় আবদুল সাবুদ নামে জনৈক লেখক উল্লেখ করেছিলেন—"ইতিবৃত্ত পুরাতত্ত্ব বাবিধি মন্থন করিয়া স্বদেশী ও বিদেশী বহু গবেষক পণ্ডিত এই সত্যটি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এহুদী জাতির পূর্বপুরুষেরা ভারতবর্ষের যাদব কুলের একটা প্রবাসী শাখা মাত্র। যদু (সংস্কৃত ও হিন্দীতে য-এর উচ্চারণ ইয়। যাদব এর উচ্চারণ ইয়াদব। যদু = ইযদু = ইযদী = ইহুদি) হইতেই তাহাদের Juda(জুডা) নাম উৎপন্ন হইযাছে। দ্বাপর যুগশেষের 'অবতার' শ্রীকৃষ্ণ এই যদু কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সিরিয়া অঞ্চলে অবস্থান করিবার সময় বাইবেলের যত ভাববাদী যদু বংশের ঐ শাখা হইতে সমুৎপন্ন হন। ইহারই এক প্রশাখা মক্কায গিয়া অবস্থান করে এবং তাহাই মক্কার পুরোহিত কুশ বা কোরেশ বংশ নামে বিখ্যাত। এছলাম ধর্ম প্রবর্তক হজরত মোহম্মদ কোরেশ গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত পরিবারের সন্তান।"[২৮] লেখকের এই উদ্ধৃতিটির সত্যতার বিচার থাক। এর দ্বারা তিনি যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্টতর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

কবি নজরুল ইসলাম তাঁর সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপন করে তাদের সম্প্রীতিকে দৃঢ়তর করার উদ্দ্যেশ্যে লিখেছেন :

"মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলমান তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ।।

অবিভক্ত ভারতে পাঞ্জাবের তদানীন্তন ন্যাশন্যালিষ্ট মুসলিম দলের প্রাক্তন নেতা আবদুল মজিদ্ খাঁন মন্তব্য করেছিলেন—"আমরা ভারতবাসী, হিন্দুস্থান আমাদের দেশ, এই দেশ অতীত যুগে গ্রীকদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, এই পুণ্যভূমি হইতেই সমগ্র জগতে জ্ঞান বিজ্ঞানের রশ্মিরাজি বিকীর্ণ হইয়াছিল। এই ভূমি হইতেই জগৎ একেশ্বরবাদের অনাহূত ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিল। এই সেই দেশ, যে দেশ হইতে আরবের প্রেরিত পুরুষ সুশীতল সমীরণের স্পর্শলাভ

করিয়াছিলেন। এই দেশের আকাশে বাতাসে অমরার আনন্দ বিরাজমান।"[২৫]

অবিভক্ত ভারতের সুরমা ভেলিতে অনেক বৎসর আগে এক মুসলমান সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্বের ভাষণে মৌলানা মহম্মদ আকরম খাঁ মন্তব্য করেছিলেন—"আজ একদল মুছলমান উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই ভারতবর্ষ, হিন্দুর ন্যায় মুছলমানেরও মাতৃভূমি। যুগ যুগ অতিবাহিত করিয়া এই দেশের সুখ দুঃখ ও হাসি কান্নার সহিত আমরা নিজদিগকে মিশাইয়া দিয়াছি। দুনিয়ার অন্য সমস্ত কেন্দ্রে আমরা বিদেশী, একমাত্র এই ভারতের মাটিতে দাঁড়াইয়া আমি জোর করিয়া বলি—এই আমার দেশ, এই আমার মাতৃভূমি। এই মাতৃভূমির মাটিতে মিশিয়া আছে আমার পূর্বপুরুষের অস্থি মজ্জা। এই মাতৃভূমির আনন্দ, আমারই আনন্দ।"[২৬]

এই সকল উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ একটি বিখ্যাত দেশ এবং এই ভারতবাসীগণ একটি মহান জাতি বলে পরিচিত। এই পরিচয় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতগণের লেখায়ও বর্তমান। এখন হতে 'প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচশ বছর পূর্বে, হেরোডোটাস নামে জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিক ও পর্যটক লিপিবদ্ধ করে গেছেন—বর্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবাসীই সর্বাপেক্ষা প্রবল জাতি।[২৭]

খ্রীষ্টের জন্মের চারশত বছর পূর্বে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দরবারে কয়েক বছর বসবাস করেছিলেন। তিনি লিখে গেছেন—"ভারতবাসীদের সাহস তাঁদের সর্বপ্রধান গুণ। তাঁরা এত সৎ ও সাধু যে, তাঁদের মধ্যে চোর নেই, গৃহদ্বার রুদ্ধ করবার প্রয়োজন নেই। সর্বোপরি কেউ কখনও বলতে পারবেন না যে একজন ভারতবাসীও মিথ্যেবাদী, ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি, ভারতের নারীগণ অত্যন্ত সতী।"[২৮] খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ, মধ্য-ভারত পরিভ্রমণান্তে লিখেছেন—"ভারতবাসীরা সরল ও সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট। তাঁরা প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক নন। বাক্য ও প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাঁরা সম্মানযোগ্য।"[২৯] এই সকল বিদেশী পরিব্রাজক ভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের ভাব বিনিময়ে ও সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেছেন।

ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাচীন ঐতিহ্য ও দর্শন শুধু যে দেশবাসীদের

মধ্যেই গভীর রেখাপাত করেছে তা-ই নয়, বিদেশীদের মনে ও বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে। তাই ভারতবর্ষ যে একটি শ্রেষ্ঠ দেশ এবং ভারতীযরা যে একটি মহান জাতি সে কথা অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সংস্কারমুক্ত মনে স্বীকার করেছেন। মিস মার্গারেট নোবল (ভাগিনী নিবেদিতা) বলেছেন—ভারতবর্ষই এশিয়ার সভ্যতার জন্মভূমি। ভারতবর্ষ হতেই ওই সভ্যতা জন্মলাভ করে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশ্চত্ত্য দেশের সভ্যতা হতে এটা যেমনই পৃথক তেমনই বৈশিষ্ট্যপর্ণ।

বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পর ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার তুলনা নেই। তিনি লিখেছেন, "যদি আমাকে সমুদয় পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি দেশ দেখিয়ে দিতে হয়, যেখানে প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি, সৌন্দর্য ও ঐশ্বয ঢেলে দিযেছে, কোনো কোনো বিষয়ে স্বর্গসদৃশ করে দিয়েছে, তাহলে আমি ভারতবর্ষকেই দেখিয়ে দেব। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, কোন আকাশ তলে মানুষের মন তার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিসমূহকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত করেছিল, জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলির সর্বাপেক্ষা অধিক চিন্তা করেছিল এবং তার মধ্যে কোনো কোনো প্রশ্নের এমন সমাধান করেছিল যে, তা যাঁরা প্লেটো ও ক্যাণ্টের দর্শন শাস্ত্রও পাঠ করেছেন তাঁদেরও ভাববার বিষয়, তাহলে আমি ভারতবর্ষকেই দেখিয়ে দেব। যদি আমি নিজে আমাকেই জিজ্ঞেস করি, জগতের কোন সাহিত্য হতে, আমরা ইউরোপবাসী, যারা শুধু গ্রীক, রোমান, জুইসদের চিন্তা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছি সেই সত্য গ্রহণ করতে পারি যা আমাদের অভ্যন্তরীণ সমধিক সম্পূর্ণ, সমধিক উদার, সমধিক বিশ্বব্যাপক, এক কথায় সমধিক মানুষ্যোচিত করতে পারে—কেবল এ লোকের জন্য নয় কিন্তু পরবর্তী ও অনন্ত জীবনের জন্যও, তাহলে আমি ভারতবর্ষকেই দেখিয়ে দেব।"[৩০]

ফরাসী পণ্ডিত জেকোলীয়ট লিখেছেন "পৃথিবীর সমুদয় জাতিরই আদি বাসভূমি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষই পৃথিবীর সকল জাতির সাধারণ জননী। ভারতবর্ষই তার সন্তানদিগকে পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রেরণ করেছিল। ভারতবর্ষই আমাদের ভাষা, সাহিত্য, আইন, নীতি ও ধর্মপ্রদান করে আমরা যে কোথা হতে উৎপন্ন হয়েছি তার অবিনশ্বর প্রমাণ রেখে গিয়েছে। হে প্রাচীন ভারতবর্ষ, সমুদয় মানব জাতির আদি বাসভূমি! আমি তোমাকে বন্দনা করি।

তুমিই প্রাচীন ও সুদক্ষ ধাত্রী শত শত শতাব্দীর পাশবিক আক্রমণও তোমাকে বিস্মৃতির সমাধি গর্ভে প্রোথিত করতে সমর্থ হয়নি। ধর্মবিশ্বাস, প্রেম, পদ্য ও জ্ঞানের জন্মভূমি, আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি যেন তোমার ভাবী পাশ্চাত্ত্য ভাবে অনুপ্রাণিত, আবার অতীত গৌরব-মণ্ডিত মূর্তিকে অভিবাদন করতে পারি।"[৩১]

॥ ২ ॥

এবার প্রাচ্যদেশে ভারত-সংস্কৃতি বিস্তারেব আরও কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা যাক।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সুদূর প্রাচ্যের ভারতীয় কলোনীসমূহ প্রাচীন ভারতীয়দের সামুদ্রিক এবং ঔপনিবেশিক উদ্যোগের সর্বোচ্চ সাক্ষ্য। প্রাচীন ভারতীয়রা উদ্যমহীন, গৃহাভিমুখী ছিলেন না, তাঁরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিলেন নতুন দেশ আবিষ্কার, ধর্মপ্রচার, ব্যবসায় বাণিজ্য এবং নতুন দেশে আধিপত্য স্থাপনের জন্য। যে সমস্ত কারণে তাঁবা সুদূব প্রাচ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন তার মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান, তবে কেউ কেউ গিয়েছিলেন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। আবার কেউ বা শুধু দুঃসাহসিক কাজের আনন্দ লাভের জন্যই ওসব দেশে গিযেছিলেন। তবে সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহ এক সময়ে সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতেব অতিরিক্ত জনসংখ্যার এক আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল।

বহির্বিশ্বে প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ-বিস্তৃতি সম্বন্ধে চারটি বিভিন্ন সূত্র থেকে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম দুশত বর্ষের মধ্যেই প্রাচ্যদেশে সমস্ত ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। সূত্রগুলো হল (১) সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত অনেক ভৌগলিক নাম যেগুলো খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে টলেমী ইন্দোচীনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। (২) যখন আন্নামের চাম নামে অভিহিত জনগণ দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে ইতিহাসে স্থান পেলেন তখন তাঁরা এক হিন্দু অথবা হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজার অধীনে বসবাস করেছিলেন। (৩) খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধে চামের সঙ্গে হিন্দুরাজ্য কন্‌-হান্‌ এর যোগাযোগ ছিল। সেই সময়ে একজন রাজা বলপূর্বক সিংহাসন দখল করে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর আগেও অবশ্য দুজন রাজা রাজত্ব করে গেছেন।

(৪) ৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি ছোট হিন্দুরাজ্যের (তেনাসেরিম) রাজদূত চীনা রাজদরবারে এসেছিলেন। কথিত আছে—তিনি বলেছিলেন যে, তাঁদের রাজ্য চারশ' বছরেরও আগে স্থাপিত হয়েছিল।

ভারতীয় সভ্যতা ও সস্কৃতি যে সকল দেশে প্রসার লাভ করেছিল সেগুলো হল চম্পা, যাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, বলি, কাম্বোডিয়া, শ্যাম, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য, সিংহল, ব্রহ্ম, চীন ও তিব্বত। এই সকল দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কিভাবে প্রসার লাভ করল তা নীচে আলোচনা করা হল। অবশ্য এ সম্পর্কে আগেও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাচ্যদেশের মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী উপনিবেশ ছিল চম্পা। এবং এটা কম্বোজ বা জাভার মতন অত পরিচিত ছিল না। ইলিয়টের মতে চম্পার হিন্দু-রাজবংশ দেড়শ থেকে দু'শ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। বিজেতা চাম-এদের নাম অনুসারে এদেশ একসময় চম্পা নামে পরিচিতি লাভ করে। হিন্দু রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীমারা। শ্রীমারার পরবর্তী একজন রাজা ছিলেন ভদ্রবর্মন। এই ভদ্রবর্মনই মাইসন নামক স্থানে শিবের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যেটা পরবর্তীকালে চামেদের জাতীয় মন্দিরে পরিবর্তিত হয়। এছাড়া এখানকার আর দুটি রাজবংশের নাম হল পাণ্ডুরঙ্গা ও ভৃগু রাজবংশ। রাজা তৃতীয় ইন্দ্রবর্মন (৯১০ খ্রীঃ) ভারতীয় সংস্কৃতিতে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় দর্শনের ছটি ধারা জানতেন। তাছাড়া বৌদ্ধ দর্শন, পাণিনি ও কশিকার ব্যাকরণ এবং শৈব শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

চম্পা দেশের বিভিন্ন বিষয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মের দিক থেকে বলা যায়—ব্রাহ্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম এখানে প্রচলিত ছিল। চম্পায় ঠিক প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচলন ছিল না। তবে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের সমসাময়িক নব-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার এখানে ঘটেছিল। এই নব-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—এর সাম্প্রদায়িক রূপ। এবং এই মতবাদের লোকেদের প্রধান দেবতা ছিল হয় ব্রহ্মা, নতুবা বিষ্ণু, নয়ত শিব। বহু দেবদেবতায় বিশ্বাসের পরিবর্তে তাদের মধ্যে এক সর্বশক্তিমান দেবতায় বিশ্বাস জন্মে। কালক্রমে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও প্রগতি বৈদিক ধর্মের এই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্য মতবাদকে ব্যাহত করে।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে দুটি শাখা চম্পায় প্রসার লাভ করে তার মধ্যে শৈব মতবাদ

ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী। এবং এখানকার ধর্মীয় প্রগতির ওপর এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মশায় এখানকার যে সমস্ত লিপি সংগ্রহ করেছেন তার ১৩০টির মধ্যে ৯২টিতে শিবের উল্লেখ রয়েছে। মাইসন এবং পো-নগরের মন্দিরগুলো শিবকে উৎসর্গীকৃত। এখানে শিবকে বিভিন্ন নামে পূজা করা হত।

চম্পায় বৈষ্ণব ধর্মেরও বেশ কিছু প্রসার ঘটেছিল। বিষ্ণু শিবের নামে পরিচিত ছিল। লক্ষ্মীকে বলা হত পদ্ম এবং শ্রী। এ ছিল চম্পার এক অতি পরিচিত দেবতা। চম্পায় বিভিন্ন লিপিতে ব্রহ্মাকে স্বষ্টিকর্তারূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে বিভিন্ন ধর্মের প্রসার ও প্রগতির ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তা হল—ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রচলন থাকলেও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বজায় ছিল। তাছাড়া এখানকার এক উদার এবং সর্বজনীন চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাব স্বষ্টি করে। ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি ছিল পুনর্জন্মে বিশ্বাস। চম্পার জনগণের ওপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও বেশ প্রবল ছিল।

ভারতীয় ঔপনিবেশিকরা চম্পায় একটি গোঁড়া হিন্দু ধর্মীয় সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

তত্ত্বগতভাবে এখানকার জনগণ চার জাতিতে বিভক্ত ছিলেন, যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য এবং শূদ্র। ভারতীয় ঔপনিবেশিকেবা প্রধানতঃ ক্ষাত্রিয অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্ভবতঃ বণিকেরা তাঁদের সম্পদেব জন্য সমাজেব উঁচুস্থান অধিকার করেছিলেন। এছাডা সমাজের সাধারণ মানুষেব মধ্যে ভারতীয় অথবা চাম বলে কোনো ভাগ ছিল না। দুটি পৃথক শ্রেণীব মধ্যেও বিবাহ হত। ব্রাহ্মণের স্থান সমাজে অনেক ওপরে ছিল। তবে তাঁবা ভাবতবর্ষের মতন এখানে রাজার ওপর আধিপত্য করতে পারতেন না। মানুষের মধ্যে তাঁদেরকে দেবতা বলে গণ্য করা হত। এবং ব্রাহ্মণ হত্যা চরমতম অপরাধ বলে বিবেচিত হত। এসব ছাড়া সমাজে আ. এক ধরনের শ্রেণী বিভাগ ছিল। তা হল—অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ।

এখানকার লোকেরা ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। সাধু সন্ন্যাসীরা ভারতীয়দের মতো কৌপীন ব্যবহার করতেন। প্রত্যেকের নিজ নিজ

গোত্রের মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ ছিল। বিবাহের আচার অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের বিভিন্ন কাজ ভারতীয়দের অনুরূপ ছিল। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কও ছিল ভারতীয়দের মতো।

চম্পায় সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। রাজরানীদের স্বামীর চিতায় আত্মদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে ভারতীয় হিন্দু পঞ্জিকার ব্যবহার প্রচলন ছিল। এবং ভারতীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদিও পালন করা হত। শবানুষ্ঠানও অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মতোই ছিল। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, তবলা, বাঁশী ইত্যাদি সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

সাহিত্য ক্ষেত্রে সংস্কৃত ছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভাষা। তাছাড়া সরকারী কাজে সংস্কৃত ব্যবহার করা হত। চম্পার অনেক রাজা সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। লিপিতে ব্রাহ্মী অক্ষর ব্যবহার করা হত। যে সকল বইয়ের ব্যবহার প্রচলন ছিল তাব মধ্যে হল—চারি প্রকারেব বেদ, ছয় প্রকার শাস্ত্র, মহাকাব্য সকল, মহাযান মতবাদ সমেত বৌদ্ধ দর্শন, শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মীয় সাহিত্য, ব্যাখ্যা সহ পাণিনির ব্যাকরণ, মনু এবং নারদের ধর্ম শাস্ত্র, পুবাণ এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত পদ্য ও কাব্য সাহিত্য ইত্যাদি।

ভারতের মতো চম্পার শিল্প ছিল ধর্মভিত্তিক। এখানকাব ডোং-ডোযাং এর মন্দিরগুলো হল বৌদ্ধ এবং অন্য মন্দিরগুলো শৈব। চম্পার মন্দিরেব স্থাপত্যশিল্প বাদামী, কাঞ্চিভরম ও মমাল্লাপুবমের অনুরূপ।

জাভাতে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তাব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে। এক মতবাদ অনুসাবে প্রাচীন উপনিবেশগুলি ছিল অজিসাক নামক এক দলপতির অধীনে এবং এদের সঙ্গে মহাভারতের বীব যোদ্ধাদের ও অস্তিনা বা হস্তিনাপুরের কোনো সংযোগ ছিল। এবং দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে এই উপনিবেশ-বিস্তার শুরু হয়েছিল গুজরাট থেকে। তৃতীয় মতবাদ অনুসারে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তার শুরু হয় কলিঙ্গ থেকে, কারণ এখান থেকে কলিঙ্গেব যুবরাজ কুড়ি হাজার পরিবারকে জাভাতে পাঠিয়েছিলেন। অপর মতে জাভায় ৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের শকাব্দ ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে থেকে গণনা করা হয় এবং ওই সময় হতেই আজিসক জাভার যুগ গণনা আরম্ভ করেন বলে জানা গেছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মশায়ের মতে জাভাতে ভারতীয়দের বসতি স্থাপন শুরু হয় খুব আগে না হলেও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এবং ভারতীয়

সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার চলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন চীনে যাবার পথে ৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে জাভা পর্যটন করেন। তিনি বলেন—জাভাতে কোনো বৌদ্ধধর্ম ছিল না। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছিল। সম্ভবতঃ সংস্কৃত শব্দ জবা থেকে জাভা এসেছে। জাভার রাজাদের নামের অন্তঃ শব্দ ছিল বর্মন। ৮ম শতকে রাজা সন্নাহ জাভায় হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী রাজা ছিলেন সঞ্জয় যিনি সমগ্র জাভা এবং বলি দ্বীপ জয় করে সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া ও অপরাপর সামুদ্রিক অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিলেন। রাজা বিজয় মজাপহিত নামে অপর একটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। রাজা রজসনগরের অধীনে জাভারাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। এবং এই কর্তৃপক্ষ নিকটবর্তী সকল প্রধান দ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপের এক বিশাল অংশের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রজসনগরের মৃত্যুর পর থেকেই ওই বংশের পতন শুরু হয়। এবং পরবর্তীকালে মুসলমানেরা জাভাতে আধিপত্য বিস্তার করেন।

ভারতীয়রা জাভার জনগণের ওপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম পাশাপাশি প্রসার লাভ করেছিল। এখানকার মন্দিরগুলিতে শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা পূজিত হতে দেখা যায় বেয়নে শিবের মন্দির আছে। মহাদেব ও দুর্গার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধলিপি, মন্দির ও বুদ্ধদেবের মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া বরোবুদুরের মন্দিরে মঞ্জুশ্রী ও বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত চিত্রিত আছে। জাভাতেও জাতিভেদ প্রথার প্রচলন করা হয়েছিল। এখানে প্রায়ই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভারতীয় শিল্প ও চিন্তাধারা যে জাভার শিল্পরীতিকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল তার জলন্ত দৃষ্টান্ত হল জাভার মন্দিরগুলি। জাভার বিস্তৃত ইতিহাস শুরু হয়েছে মধ্য জাভার ডিং উপত্যকা থেকে যেখানে রয়েছে ভারতীয় বিভিন্ন মন্দির যথা চণ্ডী, পুন্টোদেব, ভীম, শ্রীখণ্ড, পওয়ন এবং অর্জুন। সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের নাম হল তারা যেটি চণ্ডী কলাসন নামে পরিচিত এবং ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। এর পরে স্থাপিত হয়েছিল চণ্ডী মেন্দুত। এতে আছে বুদ্ধদেবের তিনটি বিশাল প্রস্তর মূর্তিসহ দুটি বোধিসত্ত্ব। এগুলি শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন।

বরোবুদুরের কাছে চণ্ডী বেনন নামক স্থানে আছে শিবের মন্দির। সেখান থেকে বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, গণেশ ও অগস্ত্য শিবগুরু ইত্যাদির সুন্দর সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রামবানাম নামক স্থানেও অনেক মন্দির রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মন্দির হল চণ্ডীলোরো জঙ্গগ্রাং। এগুলো জাভাতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্ব্বোচ্চ নিদর্শন। অবশ্য সবচেয়ে বিখ্যাত নিদর্শন হল বরোবুদুরের বৌদ্ধ স্তূপ। এটা শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র রাজারা প্রায় ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন।

সুমাত্রার সব চেয়ে প্রাচীন হিন্দুরাজ্য হল শ্রীবিজয়, যেটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে অথবা তারও আগে স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীজয়নস নামে এক বৌদ্ধ রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। সুমাত্রা ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র। এখানকার রাজার বাণিজ্য পোতও ছিল। এবং বাণিজ্য জাহাজগুলো ভারত ও সুমাত্রা মধ্যে যাতায়াত করত। সুমাত্রা শুধুমাত্র ভারতীয় উপনিবেশেই পরিণতর হয়নি, সহস্রাবিক বছরের ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে এ স্থানটি হয়ে উঠেছিল বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বাংলাদেশের চেয়ে তামিল এবং মালাবার অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব সুমাত্রার উপর বেশি পড়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের পল্লব ও একাদশ শতাব্দীতে চোল রাজত্বের সময়কার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন লিপি থেকে জানা যায় যে, প্রায় ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ণিওতে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। কুণ্ডুঙ্গা রাজার পৌত্র এবং অশ্ববর্মণ রাজার পুত্র মূলাবর্মণের উল্লেখ এই সব লিপিতে পাওয়া যায়। মূলাবর্মণ এক যজ্ঞ করেন তার নাম বহুসুবর্ণকম এবং এতে তিনি ২০ হাজার গরু ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করেন। বিভিন্ন লিপি থেকে জানা যায় যে, এখানকার সমাজে ব্রাহ্মণের আধিপত্য বেশি ছিল।

বলি দ্বীপের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এটাই সুদূর প্রাচ্যের একমাত্র ভারতীয় উপনিবেশ যেখানে অদ্যাবধি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিদ্যমান। মুসলমান ধর্ম এদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। বলির লোকেরা এখনও তাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত। বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, গণেশ, নন্দি, কৃষ্ণ এবং মহা-

ভারতের বীর যোদ্ধারা এখনও এখানে পরিচিত। যদিও বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এখানে সংস্কৃতে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে 'কিউয়ি' ভাষাতে। লোকেরা তাদের দেবদেবীকে বলে দেবাস। এখানে দুর্গার মন্দির এবং দুর্গা ও কালিকীর মূর্তি রয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে সতীদাহ প্রথার প্রচলন আছে। মৃতদেহ এখনও দাহ করা হয়। এখনেও ভারতীয় জাতি প্রথার প্রচলন আছে। জাতিগত-ভাবে সমাজ চার ভাগে বিভক্ত যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। উচ্চ জাতির লোকেরা অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন।

চীনা বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা শাসিত বলি ছিল এক সম্পদশালী সভ্য দেশ। এখানকার শাসকেরা ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল।

কাম্বোডিয়াতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় জনবসতি চৈনিক-নাম ফুনান রূপে পরিচিত। এই রাজ্য খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কৌণ্ডিন্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় কৌণ্ডিন্য এই রাজ্য ও সমাজকে পুনর্গঠিত করেছিলেন। তিনি ভারতীয় আইন ও শাসন এই রাজ্যে প্রবর্তন করেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে একজন ছিলেন গুণবর্মণ। তিনি বিষ্ণুর নামে একটি মন্দির উৎসর্গ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কম্বুজরাজ ফুনান রাজ্য দখল করেছিলেন। কম্বুজরাজ্য প্রথমে উত্তর কাম্বোডিয়াতে ফুনানের অধীনস্থ রাজ্য ছিল।

কম্বুজ এক সময়ে জাভার অধীনস্থ রাজ্য ছিল। পরে দ্বিতীয় জয় বর্মণের অধীনে এটা স্বাধীন হয়। তিনি ৪০২ থেকে ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় জয় বর্মণ হিরণ্যদাম নামে এক ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ থেকে আমন্ত্রণ করেন। ৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যশোবর্ধন কম্বুজের রাজা হন। তিনি ছিলেন কম্বুজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। যশোবর্ধন আংকোর সভ্যতার পত্তন করেন। দেশে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন হয়। দ্বিতীয় সূর্য বর্মণ কম্বুজের বিখ্যাত রাজাদের মধ্যে একজন। তিনি অনেক যজ্ঞ করেন। পৃথিবী বিখ্যাত আংকোরভাট মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি চীন দেশে দূত পাঠান।

কাম্বোডিয়াতে ভারতীয় সভ্যতা প্রসারের নিদর্শন রয়েছে এখানকার বিভিন্ন স্থানের ভারতীয় নামকরণে যেমন—তাম্রপুরা, বিক্রমপুরা, ধ্রুবপুরা, অধ্যাপুরা—ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এখানে অনেক

ভারতীয় দেবদেবতার পূজো করা হত। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং মন্দিরে মন্দিরে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ থেকে সংস্কৃতে স্তোত্র আবৃত্তি করা হত। ভারত ও কাম্বোডিয়ার মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তিদের যাতায়াতের উল্লেখ আছে।

কাম্বোডিয়ার শিল্প মূলতঃ ভারতীয়। এর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল আংকোরভাট। এটা রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন। আংকোরভাট একটা বিশাল সৌধ, এর চারধারে ঘিরে রয়েছে আড়াই মাইল দীর্ঘ এবং ৬৫০ ফুট প্রশস্ত একটি খাল। কাম্বোডিয়ার কীর্তিস্তম্ভগুলোর মধ্যে আংকোরভাট সবচাইতে চমৎকার। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে শিল্পের ক্ষেত্রে কম্বুজের স্থান এখানকার অন্য সকল রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে ওপরে।

আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ থেকে শ্যামে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। ভারতীয়রা শ্যামদেশে যে সব উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দ্বারাবতী যা দশম খ্রীষ্টাব্দে কৌণ্ডিন্য সাম্রাজ্য কর্তৃক পরাভূত না হওয়া অবধি কাম্বোডিয়া থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত শাসন করত। তবে মনে হয় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব দক্ষিণ শ্যামে পৌঁছেছিল অনেক আগে, খ্রীষ্টীয় শতকেরও পূর্বে। শ্যাম ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং গান্ধার নামে পরিচিতি লাভ করে। গান্ধারের ভারতীয় থাই রাজ্য সাম্রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে এবং ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা কুবলাই খাঁর দ্বারা অধিকৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিন শত বৎসর এই শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকে।

স্থলপথে ব্রহ্মদেশ হয়ে বৌদ্ধধর্ম শ্যামে প্রবেশ করে। এখানে বুদ্ধদেবের অনেক মূর্তি দেখা যায়। তবে এখানকার জনগণ বিভিন্ন দেবদেবতা ও আত্মার পূজাও করতেন। বিষ্ণু ও শিবের অনেক মূর্তিও এখানে পাওয়া গিয়েছে। শ্যামে বৌদ্ধ স্তূপগুলিতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখা যেত। এখনও পর্যন্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম ধর্মের রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়। বর্তমান শ্যামের ভাষাতে অনেক পালি এবং সংস্কৃত শব্দের প্রচলন রয়েছে। ত্রিপিটক, বেদ ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করা হত। শ্যামের আইন গ্রন্থাদি মনে হয় ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলির অভিযোজন মাত্র।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের লিপি থেকে জানা যায় যে, মালয় উপদ্বীপে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ঔপনিবেশিকদের দ্বারা। খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে ভারতীয় ঔপনিবেশিকরা এখানে যে সমস্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তাদের নাম হল ল্যাং-কাই-সু, কমলঙ্কা অথবা কর্মরঙ্গা, কলসপুর, কল এবং পাহাং।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে। সুমাত্রা. জাভা, মালয় উপদ্বীপ এবং অধিকাংশ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে এই সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল এক নৌবহর নিয়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং এর অনেক অংশ অধিকার করেন। বীর রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু যখন শৈলেন্দ্ররাজ তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন তখনই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। ১০৯০ খ্রীষ্টাব্দে শৈলেন্দ্ররাজ চোল-রাজের নিকট এক দূত পাঠান। দীর্ঘ একশত বৎসর সংগ্রাম করার পর চোলরা শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা পরিত্যাগ করে।

ভারতের সঙ্গে সিংহলের যোগাযোগ রামায়ণের সময় থেকে যখন রাম সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কা আক্রমণ করেছিলেন। তবে সিংহলে রীতিমত উপনিবেশ বিস্তার শুরু হয় বিজয় কর্তৃক সিংহল জয় করার পর থেকে। তিনি সিংহলী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোক মহেন্দ্র এবং তার ভগ্নী সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম সিংহলে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলেই ভারত এবং সিংহলের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর আমরা কবিতায় লিখেছেন—

"আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়,
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।

সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মদেশ তার সমগ্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্যে ভারতের কাছে ঋণী, চীনের কাছে নয়। ব্রহ্মদেশের অনেক লিপি সংস্কৃত ও পালি ভাষাতে লিখিত। ভারতীয় ধর্মও এখানে বেশ প্রসার লাভ করে। এখানকার অনেক ধর্মীয় মঠ মন্দিরে ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। ব্রহ্মের শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পরীতির দ্বারা

এত প্রভাবিত হয়েছিল যে, আনন্দমঠ সম্পর্কে বলা হয়—যদিও এটা ব্রহ্মদেশের রাজধানীতে তৈরী করা হয়েছে তবুও এটা ভারতীয় মন্দির। মন্দিরের সর্বত্র শিখর থেকে ভিত পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিভা ও শিল্প নৈপুণ্যের ছাপ রয়েছে।

ভারত ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ অতি প্রাচীন কালের। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ইউ-চি শাসকগণ কর্তৃক চীনা আদালতে বৌদ্ধ গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে। ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন সম্রাট ধর্মরক্ষা ও কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তাঁর রাজ্যে নিয়ে যাওয়া জন্য ভারতে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছিলেন। এই সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে পার্থিয়ান রাজপুত্র তাঁর অনূদিত কতকগুলি পবিত্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে চীনে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ইউচি বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারকগণও চীনদেশে গিয়েছিলেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধর্মপ্রচারক ছিলেন ধর্মরক্ষা। তিনি সংস্কৃত ও চীনা সমেত ৩৬টি ভাষা জানতেন।

কুমারজীবকে বলপূর্বক চীনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন এবং তাঁর অধীনে আটশ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করেন। তিনি নিজেই শতাধিক গ্রন্থ লেখেন, তার মধ্যে ছাপান্নটি মাত্র পাওয়া গেছে। একথা বলা হয় যে, কুমারজীব হলেন মধ্য এশিয়া এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার প্রতীক। তাছাড়া এসমস্ত দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যৌথভাবে চীনে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের যে চেষ্টা করেন তারও তিনি প্রতীক।

গুণরত্ন নামে উজ্জয়িনীর এক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন এবং পাটলিপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এক চীনা প্রতিনিধিদল মগধ বিশ্ববিদ্যালয় পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁরা তাঁকে চীনে আমন্ত্রণ জানান। তিনি ৭১ বৎসর বয়সে মারা যান এবং ত্রিশ বৎসর চীনে অতিবাহিত করেন। তিনি ৭০টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং বহু মঠ নির্মাণ করেন। ষষ্ঠ শতকে প্রায় সমগ্র চীনদেশ বৌদ্ধ ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। চীন সম্রাট উইউ এর শিক্ষক ছিলেন বোধিক্রম। ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ্ ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি

৬৫৭টি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনে নিয়ে যান এবং তার মধ্যে ৭৫টি তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে ইত্‌সিঙ ভারত ভ্রমণে আসেন।

৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম চীন থেকে কোরিয়াতে প্রসার লাভ করে। বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। প্রায় ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র কোরিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। এবং বহু বৌদ্ধ স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ষষ্ট থেকে দশম শতক পর্যন্ত কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম সর্বাপেক্ষা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আনুমানিক ৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজা বুদ্ধদেবের একটি মূর্তি এবং কয়েকখানি বৌদ্ধগ্রন্থ জাপানের রাজার নিকট পাঠান তাঁর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা লাভের জন্য। জাপানের রাজার নিকট প্রেরিত একটি বাণীতে তিনি বলেন যে, 'বৌদ্ধধর্ম হল সমস্ত সূত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এই ধর্ম এর অনুগামীদের অপরিমেয় উপকার করে থাকে। তাই এই মহান ধর্মমত ভারতবর্ষ ও কোরিয়ার মধ্যবর্তী সকল দেশে গৃহীত হয়েছে।' পরবর্তীকালে কোরিয়ার বৌদ্ধভিক্ষুরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ফলে গৃহযুদ্ধের সময় বৌদ্ধমঠগুলি সৈন্য শিবিরে পরিণত হয় এবং মঠের অধ্যক্ষগণ হন সেনাধ্যক্ষ, এর পরিণামে বৌদ্ধধর্ম এদেশে প্রতিপত্তি হারায় এবং কনফুসিয়াসের মতবাদ আধিপত্য লাভ করে।

চীন ও কোরিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রসার লাভ করে। ৫২২ থেকে ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ছিল জাপানের প্রধান ধর্ম। জাপানের প্রধান দুটি বৌদ্ধসম্প্রায়ের নাম ছিল জেনও নিচিরেন। গণেশ ও বিষ্ণুর মূর্তিও জাপানে পাওয়া গেছে। তাছাড়া জাপানের শিল্পকলার ওপরও কিছু কিছু ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

স্রোন্‌-বট্‌সন্‌-স্‌গাম্‌-পো এর রাজত্বকাল থেকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রসার লাভ করতে থাকে। এই সময় বহু মন্দিরও বৌদ্ধস্তূপ তৈরি করা হয়েছিল। অনেক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থও অনুবাদ করা হয়েছিল। ভারতবর্ষ ও চীন থেকে অনেক মূর্তি ও পবিত্র স্মারক ইত্যাদি তিব্বতে আনা হয়েছিল। এখানে সংস্কৃত ভাষারও প্রবর্তন করা হয়। তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা অনেক ভারতীয় বই পাওয়া গিয়েছে। এইভাবে তিব্বত ও ভারত পরস্পরের কাছে ঋণী।

ভারতের বাইরে ভারত সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "ভারত সংস্কৃতি" গ্রন্থে ২০২-২০৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিন্তু ভারতের পুরাণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যানুমোদিত পুরাণ একেবারে দিগ্‌বিজয় করিয়া সেই দেশের লোকদের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে। 'ইন্দোচীন' নামধেয় ভূভাগে—অর্থাৎ সুবর্ণভূমি বা দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ বা উত্তর ও মধ্য বর্মা, দ্বারাবতী বা দক্ষিণ-শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা বা কোচিন-চীন, এবং শ্যামরাষ্ট্র এই কয়টি দেশে, এবং ইন্দোনেসিয়া অর্থাৎ দ্বীপময়-ভারতে, অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপে, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানে ভারতের পুরাণকথা এবং রামায়ণ-মহাভারত নব নিকেতন প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্মা, শ্যাম ও কম্বোজের লোকেরা এখন বৌদ্ধ; মালয়, সুমাত্রা ও যবদ্বীপের লোকেরা এখন মুসলমান; কেবল ক্ষুদ্র বলিদ্বীপের লোকেরা মিশ্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম পালন করিয়া থাকে। তথাপি ঐ সব স্থানে রামায়ণ মহাভারত এবং আমাদের বহু পৌরাণিক কাহিনী, ভারতবর্ষের হিন্দুদের কাছে যতটা আদৃত হইয়া থাকে ততটা-ই আদৃত হইয়া আছে এবং ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারতে বোধ হয় ভারতবর্ষের চেয়েও অধিক আদৃত। ভারতবর্ষেরই মত ঐ সব দেশের ভাস্কর্য ও অন্য শিল্পকে আমাদেরই ইতিহাস ও পুরাণ পুষ্ট করিয়াছে—রামায়ণ মহাভারত বা তদবলম্বনে রচিত নানা কাব্য ও নাটক গ্রন্থ বাদ দিলে, যবদ্বীপীয় ও বলিদ্বীপীয় সাহিত্যের শ্যাম ও বর্মা ভাষার সাহিত্যের এবং কম্বোজ সাহিত্যের অনেকখানি চলিয়া যায়। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব আমরা স্বচোক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি—আমাদেরই জাতীয় সম্পদ লইয়া সেখানকার লোকেরাও যে এতটা আপনার করিয়া ফেলিয়াছে, এতটা গর্ব করে, তাহা দেখিয়া আমাদের মন গর্ব-সুখে ভরিয়া উঠে। যবদ্বীপের প্রাম্বানায় এক বিশাল শিবক্ষেত্রের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের তিনটি বিরাট মন্দিরেরগাত্রে খোদিত রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ণ চিত্র ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন; ভারতবর্ষেও এত সুন্দর ও লক্ষণীয় অনুরূপ রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ণ চিত্রাবলী কুত্রাপি নাই। কম্বোজের সুবিখ্যাত আঙ্করবাৎ মন্দিরের ভিত্তিতেও তদ্রূপ রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের দৃশ্যাবলী অঙ্কিত আছে। রামায়ণ-মহাভারত এবং কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যান এখনও বিশেষ লোকপ্রিয় নাটকের কথাবস্তু, এবং এইগুলিকে আশ্রয় করিয়া

বর্মা, শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের অভিনব ছায়ানাট্য সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে।

শ্যাম ও কম্বোজে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রসার সম্পর্কে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'আমরা' কবিতায় লিখেছেন—

"স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি
শ্যাম-কম্বোজ-'ওঙ্কার-ধাম'—মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।

একজন ফরাসী পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের সংস্কৃতি প্রাচীনকালে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান, মধ্য-এশিয়া, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, মালয় উপদ্বীপ ও দ্বীপময় ভারত,—সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই সংস্কৃতির দ্বারা চীন, কোরিয়া, জাপান, তোঙকিও, আসাম, বোর্ণিও এবং সেলিবিস্ প্রভৃতি দেশও অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীতেও রবীন্দ্রনাথের বলিভ্রমণের সময় বলিদ্বীপের এক রাজার মুখে ভারত সংস্কৃতির যে মুল কথা শোনা গিয়েছিল তা হল—নির্বাণ বা মোক্ষ সাধনই দুঃখ নিবৃত্তির চরম উপায়, মানবজীবনের একমাত্র কাম্য। তিনি মালাই ভাষায় বলিদ্বীপীয় উচ্চারণে বলেছিলেন, 'ডেওআ ডেওআ টিডাঃ আপা, নিরওঅনা সাটু' অর্থাৎ দেবতারা—এরাঁ কোনও কাজের নয়, একমাত্র নির্বাণ। ভারতের বাইরে ভারত-সংস্কৃতির এটাই শ্রেষ্ঠ অবদান (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারত সংস্কৃতি—পৃঃ ৬৩,৭৫)।

বলিদ্বীপে বড় বড় মন্দিরে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজা হয়। এখানে এখনও চতুর্বর্ণ আছে। যেমন, ব্রাহমাণা বা ব্রাহ্মণ; সাত্রিয়া বা ক্ষত্রিয় এবং বেসিয়া বা বৈশ্য। ওই তিনটিকে উচ্চবর্ণ বা দ্বিজ জাতি বলে। আর বাকী সকল লোককে বলা হয়—সুদারী বা কাউলা অর্থাৎ শূদ্র বা কৌল। এরা শবদাহ করে (শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বলিদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা)।

॥ চার ॥

হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মে যেমন কোনো কোনো বিষয়ে অমিল আছে, তেমন অনেক মিলও আছে। এই তিনটি ধর্মই সৃষ্টি হয়েছে এশিয়া মহাদেশের পবিত্র মাটিতে। এদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের মূলভাষা সংস্কৃত, আরবী হল মুসলমান ধর্মের মূলভাষা আর খ্রীষ্টান ধর্মের মূলভাষা হল হিব্রু। অথচ বহু বিষয়ে উচ্চারণ ও নাম করণে একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে এই তিন ধর্মের লোকদের মধ্যে। এই মিল যেন সবার অজ্ঞাতেই ঘটেছে। যেমন, রাম-রহিম, কৃষ্ণ-করিম, কৃষ্ট-খ্রীষ্ট, কেশব-করিম, মহাদেব-মহম্মদ, হরি-হজরত, কার্তিক-কাজী, কালীমা করমা, গণেশ-গাজী, শিবরাত-সবেরাত, কোরান-পুরাণ, বেদ-বাইবেল, সরিয়ত-স্মৃতি, রোজা-পূজা, রমজান-রামনবমী, ইঁদপূজা-ঈদমোবারক, হিন্দু সম্প্রদায়-হানিফ সম্প্রদায়, কুরুবংশ-কোরেশ বংশ, মন্দির-মসজিদ, শাক্ত ও শৈব, শিয়া ও সুন্নী, মক্কা ও মথুরা প্রভৃতি। মুসলমানগণ মক্কা যান হজ করতে, হিন্দুগণ যান পুরী, কাশী, হরিদ্বার, মথুরা প্রভৃতি জায়গায় তীর্থ করতে। মক্কায় গিয়ে মুসলমান তীর্থযাত্রী-পুরুষদের মাথার চুল কেটে ন্যাড়া হতে হয়। সেরূপ গয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়ে হিন্দু তীর্থযাত্রী-পুরুষদেরও মাথার চুল কেটে ন্যাড়া হতে হয়। হিন্দুদের কাছে গঙ্গার জল পবিত্র, মুসলমানদের কাছে পবিত্র জমজম কূপের জল, খ্রীষ্টানদের কাছে পবিত্র জর্ডন নদীর জল। এক শ্রেণীর মুসলমান সপ্তম অবশ্য করণীয় হিসেবে আল্লাহর নিরানব্বইটি অপরূপ নাম তসবির সাহায্যে জপ করেন, হিন্দুগণ অনুরূপভাবে তুলসীর মালা জপেন। হিন্দু ধর্মে আছে—কুরু বংশ পাণ্ডব বংশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। মুসলমান ধর্মে আছে—এজিদ হজরত মহম্মদের বংশধরকে শেষ করতে চেয়েছিল।

হিন্দুগণকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সেরূপ মুসলমানগণেরও চারটি ভাগ আছে। যেমন—শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান। মুসলমানগণের কোরান ও খ্রীষ্টানগণের বাইবেল মানুষের সৃষ্টি নয়, ভগবানের সৃষ্টি বলে মনে করা হয়। এজন্য মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণকে

বলা হয়—আল-এল-কেতাব অর্থাৎ কেতাবের লোক। হিন্দুগণের বেদকে মনে করা হয়—অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষের সৃষ্টি নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত বাণীই হল গীতা। প্রেমনাথ তাঁর গুজরাটি ভাষায় কুলজামস্বরূপে লিখেছেন—বেদ ও কোরান পরস্পর বিরোধী নয়। মুসলমানগণ ও খ্রীষ্টানগণ যেমন মৃতদেহ কবর দেন, সেরূপ হিন্দু বৈষ্ণবগণও তাঁদের সাধুদের মৃতদেহ সমাধি দেন। মুসলমানগণ বকরীদের দিন কোরবানি করেন। হিন্দুরা কালী, দূর্গা, শীতলা, মনসা প্রভৃতির কাছে পাঁঠা এবং মোষ বলি দেন। অবশ্য একমাত্র দূর্গা পুজায় মোষ বলি দেওয়া হয়, তাও বর্তমানে প্রায় উঠেই গেছে এবং পাঁঠা বলির প্রথাও খুব সীমিত করা হয়েছে অর্থাৎ দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া বেশি হতে দেখা যায় না। এককালে বেদ গো-হত্যার অনুমোদন দিয়েছিল। কথিত আছে—তখন মুনি ঋষিরা গো-হত্যা করে মন্ত্রবলে পুনরায় তাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু পরে যখন তাঁরা মৃতকে জীবিত করার মত শক্তি হারিয়ে ফেলেন, তখন গো-হত্যা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর গো-হত্যাকে অনেক হিন্দু পিতৃ-মাতৃ হত্যার সমান মনে করেন। যেহেতু গাভীর দুধ খেয়ে অনেক ক্ষেত্রে শিশু জীবনধারণ করে ও লোকের পুষ্টিসাধন হয় এবং বলদ গরু খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে, তাই অনেক হিন্দু পরবর্তীকালে এদের পিতা মাতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এছাড়া এর পেছনে আর একটি যুক্তিও আছে। যেমন—গাভী একবারে মাত্র একটি বাচ্চা দেয় এবং এর বংশবৃদ্ধি খুবই সীমিত। কাজেই কোটি কোটি হিন্দু যদি গরু খেতে আরম্ভ করতেন তবে এই অতি প্রয়োজনীয় জন্তুটি নিশ্চিহ্ন হয়ে না গেলেও এর খুবই অভাব দেখা দিত। পক্ষান্তরে পাঁঠী বা ছাগী একবারে অনেক বাচ্চা দেয় এবং বংশ বৃদ্ধির হার খুব বেশি। এদিকটা চিন্তা করে হিন্দু সমাজে শুধু ছাগের বা পাঁঠার মাংসা খাওয়া প্রচলিত। কারণ ছাগ অপর কোনো বিশেষ উপকারেই আসে না। কিন্তু ছাগী বা পাঁঠী যেহেতু দুধ দিয়ে উপকার করে, সেহেতু ছাগীর মাংস হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ। মক্কায় হজ্জ অনুষ্ঠানের মুখ্য অংশের অর্থাৎ শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর ছোড়ার পর যে কোরবানি-অনুষ্ঠান অর্থাৎ পশু বলি হয় তাতে কিন্তু দুম্বা, উট, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

'বিশ্বের ধর্ম প্রচারকগণ গরুকে শ্রদ্ধা করতেন। বাইবেলে আছে—যে গরু হত্যা করে সে একজন মানুষ হত্যাকারীর সমান (ইসাইয়া —৬৬-৩); হজরত মহম্মদ বলেছেন—'গরুর দুধ স্বাস্থ্য রক্ষা করার প্রধান উপায়। ঘি একটি ওষুধ এবং গোমাংস একটি ব্যাধি'। বাবর, হুমায়ুন ও আকবর প্রমথ মুসলমান সম্রাটগণ তাঁদের রাজ্যে গোহত্যা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। মহীশূরের শাসক হায়দার আলী গোহত্যার শাস্তি স্বরূপ হাত কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন। বর্তমানে আফগানিস্থানে গোহত্যা সফলরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি হায়াৎ মামুদ 'মহরম পর্ব' নামে যে বই লিখেছেন তাতে কারবালা কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। মুসলমানদের মহরম উৎসবে তাজিয়া বহনের সঙ্গে রথযাত্রার সময় হিন্দুদের রথ বহনেরও অনেকটা মিল আছে। শিবরাতের অগ্নিকর্মের সঙ্গে মিল আছে সবেবরাতের অগ্নিকর্মের।

ইলিয়ডের মূল আখ্যনভাগের সঙ্গে হিন্দুদের রামায়ণের অনেক সাদৃশ্য আছে। ট্রয়নগর জয় ও তার পতনের দিক যেন স্বর্ণলঙ্কা জয় ও তার পতনের সঙ্গে মিলে যায়। মিল আছে হেলেনের উদ্ধারের সঙ্গে সীতা দেবীর উদ্ধারের।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের মধ্যে নানা বিষয়ে বহু মিল আছে এবং ওই সকল মিলের কিছু কিছু কারণ এখানে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

অতি প্রাচীন কাল হতেই ভারতীয়দের সঙ্গে আরবীয়দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। লঘু ভারত (১ম খণ্ড) হতে জানা যায়—পুরাকালে মগধের একজন হিন্দু রাজা আরব দেশ জয় করে সেখানে মেখিনা (বর্তমান মদিনা) নগরী নির্মাণ করেছিলেন। এরপর বুদ্ধদেবের জন্মের কিছু পূর্বে কৌশাম্বীর রাজা রিপুঞ্জয়ের পুত্র রাজা শিশুনাগ আরবে গিয়ে মক্কা নগরী নির্মাণ করেছিলেন। এবং সেখানে তিনি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে শৈব ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু পরে (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে) তিনি পারস্যরাজ দরায়ুস কর্তৃক পরাজিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে কেবল মাত্র মক্কা ও মদিনা শাসন করতেন। পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজা থাকা কালে মুসলমানগণ মদিনা জয় করেছিলেন (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে)। কানিংহাম সাহেব লিখেছেন—"মুক্তেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণ মক্কায় রাজত্ব করতেন। পরে তাঁর পুত্র পরাজিত হয়ে ভারতে এসেছিলেন।"[২]

বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও যে মক্কায় তীর্থ করতে যেতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে কাউন্ট বোর্ণষ্টার্ণ লিখেছেন,—"বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন তাঁর ভক্তগণ কর্তৃক পূজিত হত। তা প্রস্তর ও পর্বতে খোদিত থাকত। উহা পূজো করতে দেশের সকল অংশ হতেই বহু লোক যেতেন। এখন জানা গেছে যে, ওই সকল পদচিহ্ন অধিকাংশ দেশে আজও বিদ্যমান আছে। এরূপ ছটি পদচিহ্ন পূর্বদেশে পাওয়া গেছে। আশ্চর্যের বিষয় তাদের মধ্যে একটি পদচিহ্ন মক্কায় আছে। মুসলমান ধর্মের বহু পূর্বে বৌদ্ধরা তথায় তীর্থ করতে যেতেন।"[৩] এর দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বহু লোক মক্কায় বসবাস করতেন নতুবা সেখানে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন স্থাপনের কোনো প্রয়োজন বা সম্ভাবনা থাকত না। "খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও আরবের বাগদাদ নগরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল।"[৪]

আরবের লোকেরা যে কিধরণের অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলেন এবং হজরত মহম্মদ যে কোরেশবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই কোরেশ জাতি যে কিরূপ কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় মগ্ন ছিলেন তা শেখ আবদর রহিম প্রণীত "হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি" গ্রন্থ হতে জানতে পারা যায়। কোরেশবংশের তৎকালীন ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, নারীর প্রতি ব্যবহারের সঙ্গে ভারতের সনাতন বেদপন্থা পরিত্যক্ত সত্যধর্মভ্রষ্ট শোচনীয় অবস্থা বিশেষ করে বৌদ্ধযুগের পরবর্তী বামাচারমার্গী তান্ত্রিকগণের এক অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। শেখ আবদর রহিমের উক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায়—(ক) মক্কাবাসীরা অতিশয় পানাসক্ত ছিল; (খ) নৃত্যগীত কারিণী (ক্রীতদাসী) স্ত্রীলোকগণ তাদের নিকট বিশেষ সম্মান পেত; (গ) হিন্দুগণের ন্যায় তাদের মধ্যে বহু স্ত্রী গ্রহণ প্রভৃতি কুপ্রথা প্রচলিত ছিল; (ঘ) বিধবাগণ স্বামীর অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় ব্যবহার্য রূপে পরিগণিত হত; এবং (ঙ) শিশুকন্যাদিগকে জীবিত অবস্থায় প্রোথিত করার প্রথাও তাদের মধ্যে বহুলপরিমাণে প্রচলিত ছিল। বিকৃত তন্ত্রোপাসক বামাচারিগণ ও অনুরূপভাবে (ক) অতিশয় পানাসক্ত ছিল; (খ) বহু দেব মন্দিরে নৃত্য গীতকারিণী দেবদাসী, নর্তকী, স্বর্গ বিদ্যাধরী অপসরী প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ, আসক্তি ও আদর যত্নের কথা বর্ণিত আছে; (গ) বহু স্ত্রী গ্রহণের কথা শত শত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে; রাজা মহারাজা ও ধনবানগণের শত শত স্ত্রী ছিল, (ঘ) মনুসংহিতার মধ্যে পর্যন্ত আছে—স্ত্রীলোকগণ বাল্যকালে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর

অধীন ও বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন থাকবে, তাদের কোনো স্বাতন্ত্র্য (স্বাধীনতা) থাকবেনা; (৬) বন্ধ্যা নারীগণ কর্তৃক গঙ্গাসাগরে ও চলন্ত রথের সম্মুখে (মানতের ফলে সন্তান লাভের পর প্রথম পুত্র কন্যা) সন্তান নিক্ষেপের বহুল প্রবাদ প্রচলিত আছে। কাবা মস্‌জিদের উত্তর কোণে প্রসিদ্ধ হেজরে (হাজ্জা রোল) আসোয়াদ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর স্থাপিত রয়েছে। এই গৃহে (কাবা মস্‌জিদে) আরবগণ ৩৬০টি পুত্তলিকার পূজো করতেন এবং হাজ্জারোল আসোয়াদ নামক স্বর্গীয় প্রস্তরকে চুম্বন করবার জন্য প্রতিবছর আরবগণ দলে দলে মক্কায় এসে সমবেত হতেন। বিশ্বকোষ থেকেও জানা যায়—'মহম্মদের পূর্বে মক্কায় অগ্নিপূজকগণের প্রাদুর্ভাব ছিল।'

পৃথিবীতে নিরাকার একেশ্বরবাদী ধর্মাবলম্বীগণের নিকট একমাত্র হিন্দুগণই পৌত্তলিক অর্থাৎ দেবদেবী রূপে নানারূপ পুতুল পূজায় বিশ্বাসী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে পরিচিত। হিন্দুগণ ছাড়া আর কোনো জাতি পুতুল, পশু বৃক্ষলতা, পর্বত, পাথর, (কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর, শালগ্রামশীলা) প্রভৃতি পূজো করতেন না এবং জাতিভেদে বিশ্বাসী ছিলেন না—এরূপ ধারণা কিন্তু সত্য নয়। স্বয়ং হজরত মহম্মদ পুতুল পূজক পুরোহিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ মক্কার উপসনালয়ের রক্ষক ছিলেন। জাতিভেদ-সমর্থিত—"মক্কার প্রধান আচার্যরূপে মহম্মদের বংশের সর্বাপেক্ষা সম্মান ছিল। জানা গেছে—যুবা বয়সে হজরত মহম্মদ সিদ্ধিলাভের আগে প্রায়ই মক্কার কাবা মন্দিরে যেতেন। সেখানে হোবাল ও অপরাপর দেবতার মূর্তি ছিল। বহু দেবদেবীর, মধ্যে একমাত্র আল্লাহ ছিলেন প্রধান। হানিফ সম্প্রাদায়ের লোকেরাই শুধু আল্লাহর আরাধনা করতেন এবং কেবল তাঁরাই ছিলেন একেশ্বরবাদী। তাঁদের সংস্পর্শে এসে হজরত মহম্মদ দেশকে পৌত্তলিকতা হতে উদ্ধার করেন এবং একেশ্বরবাদ প্রচারে নিজেকে স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট বলে ঘোষণা করেন।'

মাখনলাল রায় চৌধুরীর মতে "মহম্মদের পূর্ববর্তী আরব দেশের আরবগণ গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্তছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন নায়ক ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল 'শেখ'। তিনি ছিলেন গোষ্ঠীর জীবন-মরনের কর্তা। প্রত্যেক পরিবারেই থাকত একটি দেবতা। দেবতার নামে আরবগণ যুদ্ধ করত, পরাজিত গোষ্ঠী বিজেতার প্রাধান্য স্বীকারকরে বিজেতার দেবতাকে পূজা করত। শুক্রবারে

তারা বাজারে সমবেত হত। সেখানে ক্রয়বিক্রয় করত। বাজারে নৃত্যগীত ও কবিতা আবৃত্তি হত ও নানা দেবতার পূজা হত। বাজারের নাম ছিল 'ওক্কা'। প্রধান প্রধান বাজারের নাম ছিল 'মক্কা'। সেই বাজারের নাম হতেই 'মক্কা' শহরের নাম করা হয়েছিল। মহম্মদের মক্কা ইহুদী, খ্রীষ্টানগণ ও পৌত্তলিকদের মিলন স্থল ছিল।

মহম্মদের পূর্বে আরব, ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ অগ্নির উপাসক অথবা প্রকৃতি পূজক ছিলেন। আবার কেউ বা ছিলেন পৌত্তলিক, মহম্মদ ছিলেন কোরায়েশ বংশের সন্তান। কোরায়েশগণ বহু দেবতার পূজা করতেন, তারা পৌত্তলিক ছিলেন। সেই সমস্ত দেবতার মধ্যে অল্লাহ, হবাল, মনাত, উজ্জ ইত্যাদি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল দেবতার মধ্যে আল্লাহ ছিলেন প্রধান। প্রত্যেক পরিবারেই বাস্তু দেবতা থাকত। কোনো যুদ্ধ বিগ্রহে বা লুণ্ঠনে যাত্রার পূর্বে আরবগণ বাস্তু দেবতার পূজা করত। আরবজাতির একটি প্রধান তীর্থস্থান। 'মক্কার' প্রধান মন্দির ছিল কাবা। এখানে অনেক কৃষ্ণ প্রস্তর ছিল। আরবগণ সেই প্রস্তরগুলি পূজা করত। এই মন্দিরের পরিচালনার ভার ছিল কোরায়েশ বংশের ওপর। মহম্মদ একবার মক্কার কাবা মন্দিরে তাঁর রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তা হল—"লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন কোনো ঈশ্বর নেই।"

হঠাৎ চল্লিশ বৎসর বয়সে (৫৯০ খ্রীঃ) মহম্মদ একদিন একটি জ্যোতির্ময় ছায়া দেখতে পান এবং সেই জ্যোতির্ময় অশরীরী ছায়ার বাণী শুনেন, তা হল—'বল মহম্মদ আল্লাহ এক, আল্লাহ ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নেই'। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মহম্মদ এই বাণী প্রচার করলেন। তাঁর ধর্মের নাম হল 'ইসলাম' ধর্ম।

মক্কার কোরায়েশ বংশের লোকজন এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। কারণ তাঁরা ছিলেন বহু ঈশ্বরবাদী এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্য দেবতাদেরও পূজা করতেন। প্রথমে তাঁর স্ত্রী খাদিজা ও পরিবারের কয়েক জন লোক কয়েকটি ক্রীতদাস এবং অত্যন্ত দারিদ্র কয়েকজন ব্যক্তি ভিন্ন কেউ মহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেন নি। মহম্মদের আত্মীয়গণ তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা করেছিলেন। মদিনা ছিল মহম্মদের মাতা আমিনার জন্মস্থান। মহম্মদ মদিনাবাসীর

আমন্ত্রণে মদিনায় পলায়ন করে সেখান থেকে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন এবং অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করে তাঁর বিরোধীদের পরাস্ত করে ইস্লাম ধর্ম প্রচারে সক্ষম হন।"

সঞ্জিবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর "মহম্মদের জীবন চরিত" গ্রন্থে লিখেছেন—"আরবদেশে এককালে অশ্ব, উষ্ট্র, প্রভৃতি জন্তু ও নানাপ্রকার বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতির পূজাও বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক বংশের পৃথক পৃথক ইষ্ট দেবতা ও তার মন্দির ছিল। উপাসকগণ দেবতার মনস্তুষ্টির জন্য নরবলি দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করত। কাবা মন্দিরে ৩৬০টি দেব প্রতিমা ছিল। আরবগণ বছরে এক একদিন এক একটি প্রতিমার পূজো করত।"

হিন্দুগণের ন্যায় পৌত্তলিক আরবগণের মধ্যেও এককালে কৃষ্ণপ্রস্তর চুম্বন, হিন্দুগণের বারমাসে তের পার্বণের মতো বছরে প্রায় এক একদিন এক একজন করে ৩৬০টি দেবদেবীর প্রতিমা, গমনাগমণের সহায়ক অতি প্রয়োজনীয় পশু অশ্ব, উষ্ট্র ও নানা প্রকার বৃক্ষলতা, পর্বত প্রস্তর প্রভৃতির পুজো বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মোটের ওপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগে আরবগণ নানাপ্রকার দেবদেবী, চন্দ্র সূর্য, গ্রহনক্ষত্র ও বৃক্ষলতা প্রভৃতির উপাসনা করতেন। হিন্দুগণ যেমন বিশ্বাস অনুযায়ী সূর্য, হরগৌরী, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধাকৃষ্ণ রামসীতা, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতির পূজা বা উপাসনা করে থাকেন, সেরূপ আরবগণের মধ্যেও এককালে ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দেবতার পূজার প্রচলন ছিল। উপাসকগণ দেবতাদের তুষ্টির জন্য পশু ও নরবলি দিতেন, যেমন শক্তি উপাসক শাক্ত হিন্দুগণ কালী, দুর্গা ও সিদ্ধেশ্বরী প্রভৃতির কাছে এককালে ছাগ, মেষ এমন কি নরবলিও দিতেন। এখন তাঁরা শুধু ছাগ ও মোষ বলি দিয়ে থাকেন।

হিন্দুগণ যেমন মৎস্য ও কূর্ম প্রভৃতিকে ভগবানের অবতার বলে মনে করেন তেমন খ্রীষ্টানগণও ঈশ্বর ঘুঘুর রূপ ধরে এসেছিলেন বলে মনে করেন। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও মুসলমানগণ সর্বাপেক্ষা প্রতীক বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও প্রোটেস্ট্যাণ্টরা গীর্জার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বাড়ি-প্রতীক ও বাইবেলকে গ্রন্থ-প্রতীক রূপে ভক্তি করেন। অনুরূপ ভাবে কাবার কৃষ্ণ-প্রস্তরটিও এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ মুসলমানের ভক্তি ব্যাকুল চুম্বনে পবিত্র। এবং তাঁরা বিশ্বাস

করেন—জমজম কূপের জলে পাপ মোচন হয় এবং পুনরুত্থান-কালে নরদেহ লাভ হয়—এর দ্বারা মুসলমানগণও ভবন-প্রতীককেই পরোক্ষভাবে অনেকটা মেনে নিয়েছেন। খ্রীষ্টানগণের খ্রীষ্টমাস উৎসব পালন, খ্রীষ্টমাসের সময় ইউল গুড়ি পোড়ানো, কুমারী মেরীর পূজা, সকল আত্মার দিন পূজা, নেসল ডালের নিম্নে চুম্বন প্রভৃতি আরও বহুপ্রকার প্রথা যাদুমন্ত্র বা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসের ফল।

সত্য ও অহিংস ধর্মভ্রষ্ট হিন্দু তান্ত্রিকদের এককালের নরবলির সঙ্গে খ্রীষ্টানদের স্যাক্রামেণ্টরূপ প্রতীক অনুষ্ঠান তুলনীয়। কোনো মানুষের সদ্‌গুণ পাবার জন্য তাকে হত্যা করে তার রক্তমাংস খাওয়া বুনো নরমাংস ভোজীদের রীতি। খ্রীষ্টীয় স্যাক্রামেণ্ট অনুষ্ঠানে নরবলিরও ঠিক ওই একই উদ্দেশ্য হওয়ায় খ্রীষ্টানদের এই অনুষ্ঠান অসভ্যদের আচরণ থেকেই নেওয়া হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। যাইহোক, ভক্ত খ্রীষ্টানগণ এই অনুষ্ঠানকে পরম পবিত্র বলেই মনে করেন। গ্রীক ও রোমের দেবদেবীরা খ্রীষ্টান ধর্মের মেরী এবং সেণ্টদের মূর্তিরূপে পূজিত হন। যেমন হিন্দু শাক্তগণ দেবদেবীর সামনে বলি বা রক্তদানের এবং মুসলমানগণ কোরবানির মাধ্যমে পুণ্যার্জনে বিশ্বাসী, সেরূপ খ্রীষ্টানগণও রক্তের দ্বারা ত্রাণলাভে বিশ্বাসী। ইহুদীরা মনে করেন—মানুষের পাপ একটি ভেড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর সেই ভেড়াটিকে বলি দিলে পাপমুক্তি ঘটে।

প্রাচীনকালে আরববাসীগণের সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুগণের ধর্মবিশ্বাস ও ইহুদীগণের আচার, ব্যবহার, মূর্তিপূজা এমনকি নরবলি দান প্রভৃতি বিষয়ে মিল দেখে মনে হয় এঁদের মধ্যে এককালে রক্তের সম্পর্ক ছিল অর্থাৎ এঁরা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

॥ ২ ॥

একেশ্বরবাদী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের মতো হিন্দুগণও বিশ্বাস করেন—পৃথিবীর সর্বত্র সব সময়ে এক ঈশ্বরই বিরাজমান। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার নবম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে—শ্রীভগবান বলেছেন—আমি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন আমার শত্রুও কেউ নেই, মিত্রও কেউ নেই। তবে যারা ভক্তিসহকারে আমার ভজনা করে তারা যে জাতীয়ই হোক না কেন তারা আমার মধ্যে বিরাজ করে, আমিও তাদের মধ্যে বিরাজ করি। তিনি গীতার (৬:৩২) শ্লোকে আরও

বলেছেন—নিজের সুখ দুঃখের যিনি সকল প্রাণীতে সমান সুখ দুঃখ অনুভব করেন তাঁকে আমি পরম যোগী মনে করি।

মহর্ষি মনু (অনুবাদ-মনুসংহিতা—৩২৪, দ্বাদশ অধ্যায়) লিখেছেন—পরমাত্মারূপী ব্রহ্মই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমূর্তির দ্বারা সমুদয় প্রাণী ব্যাপ্ত হয়ে বৃদ্ধি ও নাশ দ্বারা চক্রের মতো এই সংসার প্রবর্তিত করছেন।

সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্বব্যাপ্ত বিষ্ণুকে উপলব্ধি করে বলেছেন—"আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্রাদি, ভূতগণ (প্রাণী সকল), দিক সকল, তরু, গুল্মলতাদি, তড়াগ, নদী, সাগর প্রভৃতি যা কিছু দৃষ্ট-পদার্থ সবই ভগবান হরির শরীর মনে করে প্রণাম করবে।" তিনি আরও বলেছেন—

সর্বজীব দেহ মাঝে পরমাত্মা হরি,
বিরাজেন নারায়ণ আত্মারূপ ধরি।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্দ)

কান্ত কবি রজনীকান্ত বলেছেন—"আছ অনলে অনিলে, চিরনভোনীলে, ভূধর সলিলে গহনে, আছ বিটপী লতায়, জলদের গায়, শশী তারকায় তপনে।" চিরঞ্জীব শর্মা গেয়েছেন—"জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি, অনল অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।"

"বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ঐশ্বরিক সত্তা বা শক্তি বিদ্যমান। ঐশী শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে বা বিশ্ব-প্রকৃতিতে লীলা করছেন; মানব-দেহে, মানব-প্রকৃতিতেও লীলা করছেন ও শক্তি, কাম, দুঃখ উহা সুখরূপে মানবজীবনে অদৃশ্যভাবে বিরাজ-মান, আবার জড়জগতের গতি ও অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও এই শক্তিই ক্রিয়া করছে। তাই যজুর্বেদের শতরুদ্রীতে বলা হয়েছে, হে রুদ্র-শিব, তুমি পাতায় আছ, তোমাকে নমস্কার; তুমি পাতার ঝরাতেও আছ তোমাকে নমস্কার" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারত সংস্কৃতি, পৃঃ ৫৪ থেকে সংক্ষেপিত)।

সর্বত্র ঈশ্বর আছেন—এরূপ ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই হিন্দুগণ বৃক্ষের মধ্যে উপকারী বেল, তুলসী, নিম, বট প্রভৃতি; নদীর মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি; প্রাণীর মধ্যে গাভী; পাহাড় পর্বতের মধ্যে হিমালয়, কৈলাশ, গোবর্ধন প্রভৃতি এবং এছাড়াও গ্রহ যেমন সূর্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতির মধ্যে

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্মরণ করে দেবতা-জ্ঞানে এদের শ্রদ্ধাভক্তি ও স্তবস্তুতি করে থাকেন। কিন্তু তাঁরা একথা ভাবতে পারেননি যে ঈশ্বর সর্বত্র থাকলেও কাঠ, পাথর ও মাটির তৈরি দেববিগ্রহাদি এবং কয়েকটি বৃক্ষ ও নদনদী বাদে আর সব জায়গাতেই আছেন। তবে সর্বভূতে ঈশ্বরানুভূতি প্রকৃতপক্ষে মানব-মনীষাকে মহিমান্বিত করেছে। এবং ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙ্গে মানুষের দৃষ্টিকে আরও উদার ও ব্যাপক করে তুলেছে। এছাড়া জীবকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পরম করুণাময় ভগবানেরই অপার শক্তির কথা বর্ণিত আছে। এসম্পর্কে গীতার কয়েকটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল। যেমন, শ্রীভগবান (১৫।১২) বলছেন, সূর্যস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে যে তেজ এবং অগ্নিতে যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশ করে সেই সমস্তই আমার তেজ বলে জানবে। আদিত্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ অবস্থিত হয়ে সমগ্র জগৎ প্রকাশ করে তা তাঁরই তেজ। সূর্য উদিত হয়ে ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে জীবের দৃষ্ট ভোগসাধন কর্মগুলি নিষ্পন্ন করে এবং অন্ধকার ও জড়তা নাশপূর্বক সুখের কারণ হয়ে থাকে। মোটের ওপর ভগবানেরই প্রেরণাক্রমে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি জীবের উপকার সাধন করেছে। জীব ভগবানের এ শক্তি জানতে পারলে ক্রমশঃ তাঁর চরণে শরণাগতি লাভের যোগ্য হয়। শ্রীভগবান (১৫।১৩) বলেছেন—আমি স্বীয় শক্তির দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পৃথিবীকে দৃঢ় করে স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসমূহকে ধারণ করি। অর্থাৎ শ্রীভগবানের শক্তিতেই পৃথিবী স্বপক্ষে অধিষ্ঠিত হয়ে স্বকার্য সাধনে সক্ষম হয়। মোটের ওপর শ্রীভগবানের শক্তিতেই বিচিত্র জগতের ধারণ, পোষণ ও পালন পৃথিবীর দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। শ্রীভগবান নিজ শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করে চরাচর ভূতসমূহের আশ্রয়দাতারূপে এবং তিনিই রসস্বরূপ হয়ে ব্রীহিযবাদি শস্য বর্ধিত করে ভূতগণকে (প্রাণীগণকে) পালন করছেন। অর্থাৎ পৃথিবী, ভূতগণ ও শস্যাদির ধারণ ও পোষণাদি কার্যে শ্রীভগবানের কর্তৃত্ব জেনে জীবের সেই বিষয়ে অভিমান দূর করা কর্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্যাস বাক্যেও (১০।৮৫।৭) পাওয়া যায়—চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্যের প্রভা, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রগণের স্ফুরণসত্ত্বা পর্বতের স্থৈর্য, ভূমির আধারত্ব ও গন্ধগুণ—এসকলই প্রকৃত পক্ষে ভগবানের নিজের স্বরূপ। কাজেই পরমকরুণাময় ঈশ্বরকেই আরাধনা করা উচিত। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ (ব্রহ্ম সত্য আর সব মিথ্যা,

কাজেই জীবের এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কারও সাধনা করা উচিত নয়)। আচার্য শঙ্কর এই একটি উক্তির দ্বারাই অদ্বৈত বেদান্তের তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদের মতে আত্মা, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম একই পদার্থ। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এটাই আত্মার স্বরূপ। সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম এক বা অদ্বিতীয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন—সত্যমেব জয়তে নানৃতং (অর্থাৎ সত্যেরই জয় অসত্যের নয়)। দেবযানরূপ উত্তম মার্গ এই সত্যের দ্বারাই আবৃত। তাই ঋষিগণ এই পথেই গমন করে সত্যরূপ পরমার্থ লাভ করেন (উপনিষদ সংকলন ১ম খণ্ড—রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম)।

শান্তং শিবমদ্বৈতম্

অনন্ত বিশ্বকে যিনি ধারণ করে আছেন তিনি শান্তং, যিনি রক্ষা করছেন তিনি শিবম্। তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক। আর এই অদ্বৈতই আনন্দ। একে উপাসনা করতে হলে পরকে আপন, অহমিকাকে খর্ব ও বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করতে হবে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। অর্থাৎ সকল প্রাণীকে যে নিজের মতো করে দেখে সেই যথার্থ দেখে। এরূপ দেখতে হলে নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে। নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখলেই অদ্বৈতম্ অর্থাৎ আনন্দ প্রচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং তাতে সুখের চেয়ে দুঃখই বাড়ে। এজন্য স্বার্থ ত্যাগ করাই মহত্ত্বের লক্ষণ। তাই ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন—জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত আছে—ওঁ তৎসৎ—এই নামত্রয় হতেই সৃষ্টির আদি সময়ে অন্নদান ক্রিয়ার প্রকাশ হয়েছিল। সেজন্য সর্বদা ওই তিনটি নামের মধ্যে 'ওম' এই একটি নামই উচ্চারণ করে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বেদোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এক ব্রহ্মকেই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ওম্, ঐতেরেয় শ্রুতিতে তদ্ এবং ছান্দোগ্যে সদ্ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। (গীতা, ১৭ : ২৩)

"ওঁ একমেবদ্বিতীয়ম্"

ওঁ অর্থাৎ ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। এই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই। হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন ধর্মপ্রবর্তকগণ ভগবানের দূত বা প্রেরিত পুরুষ।

॥ ৩ ॥

"এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর",

—এই একেশ্বরবাদের ওপরেই খ্রীষ্ট ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত। প্রাচীনকালে মিশর, ব্যাবিলন ও আসিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বহু দেবদেবীর উপাসনার প্রতিবাদেই ইহুদী তথা খ্রীষ্ট ধর্মে একেশ্বরবাদের বিশ্বাস জন্মে। এতে ঈশ্বরের অপার করুণা ও প্রেমের রূপটিই বিশেষ করে প্রতিভাত হয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্মের মূল মন্ত্র হল—মানব প্রেম ও মানুষের সেবা। খ্রীষ্টীয় ঐশ্বরিক ত্রিমূর্তির ধারণা একেশ্বরবাদের সঙ্গে তুলনীয়। খ্রীষ্টধর্মের মতে—ঈশ্বর স্বয়ং পিতৃ স্বরূপ ; যীশু ঈশ্বরেরই একজাত পুত্র বা প্রতিনিধি ; তার ঐশ্বরিক পবিত্র আত্মা ভগবৎশক্তির নামান্তর মাত্র। এবং এই তিন রূপ এক ঈশ্বরেরই প্রকাশ। যীশু ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, প্রতিভূ।

খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাসোক্তি হল—"স্বর্গ মর্ত্যের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে এবং তাঁর অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্টে আমি বিশ্বাস করি।" খ্রীষ্টানগণের বিকল্প বিশ্বাসোক্তি হল—"এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, স্বর্গমর্ত্য দৃশ্য-অদৃশ্য বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান পিতায় আমি বিশ্বাস করি। পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টেও আমি বিশ্বাস করি।"

বাইবেলে আছে—"যদি কেউ বলে—আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করি, তবে সে মিথ্যেবাদী।"

বাইবেলে আরও আছে—সেখানকার যাজকগণ বেতন নিয়ে শিক্ষা দেন, ভাববাদীগণ অর্থ নিয়ে মন্ত্র পাঠ করেন, তথাপি প্রভুর ওপর নির্ভর করেন বলে তাঁদের মধ্যে কি প্রভু নেই? কিন্তু যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন—"তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান করিও।"

প্রায়ই দেখা যায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশাল ধনসম্পত্তির অধিকারী। আর যে স্থানে তাদের সভ্যগণ সম্পূর্ণ দরিদ্রতার মধ্যে ক্ষুধার্ত জীবন যাপন করছে সেখানেই ধর্মীয় উচ্চ প্রাসাদগুলি অবস্থিত। এ থেকে মনে হয়—জগতের ধর্মগুলি প্রতারক এবং তা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরূপে প্রমাণিত হয়ে ঈশ্বরকে গুরুতর অসত্যভাবে পরিচিত করেছে এছাড়া মানুষের সুখসুবিধা সম্পর্কেও ধর্মগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই বাইবেল বলে—ঈশ্বর মিথ্যা ধর্মগুলির স্বরূপ প্রকাশ করে প্রকৃত ধার্মিকতাপ্রিয় লোকদের অনন্ত উপকারার্থে অবশ্যই পথ প্রদর্শন

করবেন। ওই কারণেই জগতব্যাপী মিথ্যা ধর্মের সাম্রাজ্যকে এক অশ্লীল, চরিত্রহীনা নারীর সঙ্গে তুলনা করে "মহতী ব্যাবিলন" নামে আখ্যাত করা হয়েছে। সেই নারী "মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে নির্লজ্জ বিলাসিতায় জীবন যাপন করছে। আর সেই নারীর মধ্যে "সমুদয় পৃথিবীর নিহতদের রক্তের দোষ পাওয়া গেছে। ওই নারীকে আগুনে পুড়িয়ে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য পরম করুণাময় ঈশ্বরের বিচারাজ্ঞা নির্গত হয়েছে। আর এতকাল ধরে যে রাজনৈতিক শক্তির ওপরে সে কর্তৃত্ব করে আসছিল সেই রাজনৈতিক শক্তি হতেই ধর্মগুলির ধ্বংস আসবে। ঈশ্বর শীঘ্রই সমস্ত মিথ্যা ধর্মগুলি ধ্বংস করবেন। ঈশ্বরের সতর্কবাণী এই—"উহা হতে বার হয়ে এসো যেন মহতী ব্যাবিলনের আঘাত সকলে প্রাপ্ত না হও।" কপট ধর্মগুলোর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ওগুলির সঙ্গে সকল যোগাযোগ ছিন্ন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্য উপাসনা পালন করতে হবে। পৃথিবীর বহু দেশে একই সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ মিথ্যা ধর্মের কপটতা ও প্রতারণাকে ঘৃণা করে সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাধ্য বাইবেলকে সমর্থন করে ও তা পালন করে প্রতিবাসী মানুষের অনন্ত মঙ্গলের জন্য কাজ করে চলেছেন। ঈশ্বরের নামের সম্মানার্থে তাঁরা যিহোভার সাক্ষী বলে পরিচিত। এঁরা যীশুর উপাসনাগুলি বিশ্বাস করেন। যদিও তাঁরা বিভিন্ন বংশ, জাতি ও পৃথক পৃথক জীবনধারা হতে এসেছেন তথাপি যিহোভার সাক্ষীগণ ঐক্যবদ্ধ। তাঁরা ঘৃণা ও হত্যা করেন না এবং তার পরিবর্তে পরস্পরকে প্রেম করেন। তাঁরা শিখেছেন—কি করে নৈতিক চরিত্রহীন অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করে পরিচ্ছন্ন ও সুখীজীবন যাপন করা যায়। তাঁরা ঈশ্বর বা প্রতিবেশী কারও ওপর বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। বরং তাঁরা 'মরবে তবু করবে না' নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁদের ধারণা—ঈশ্বরের রাজ্য সরকারের অধীনে উদ্যানতুল্য পৃথিবীতে এক শান্তিপূর্ণ ও শুদ্ধ জীবন লাভ করবে।

॥ ৪ ॥

"লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ, মুহম্মদ রসুলুল্লাহ,"

—অর্থাৎ আল্লাহ, ব্যতীত উপাস্য নেই ; মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ। সকল মুসলমানকেই এই কলমামন্ত্র মেনে চলতে হয়।

"কোরানে (২০ : ৯৮) আছে—তোমাদের উপাস্য কেবল আল্লাহ, আর কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন ; তাঁর জ্ঞানে সব কিছু তিনি ধারণ করেন। কোরানে (২২ : ৬২) আরও আছে—আল্লাহ হচ্ছেন সত্য ; আর তাঁকে ভিন্ন যাকে তারা ডাকে তা হচ্ছে মিথ্যা ; আর এই জন্য যে আল্লাহ মহীয়ান, মহান।

পবিত্র কোরানে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে তাঁর অপার মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। পরম করুণাময় আল্লাহর মহান শক্তি সম্বন্ধে কোরানের বিভিন্ন সুরা থেকে কয়েকটি আয়াতের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল—যেমন (৩৯ : ৫) আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্যের সঙ্গে ; তিনি রাত্রিকে দেন দিনকে আবৃত করতে আর দিনকে দেন রাত্রিকে আবৃত করতে, আর তিনি সেবারত করছেন সূর্যকে ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকে ধাবিত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট কালের দিকে। তিনি মহান শক্তি, পরম ক্ষমাশীল নন ? (৪০ : ৬৪) আল্লাহই তিনি যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য করেছেন বিশ্রামস্থান আর আকাশ একটি চাঁদোয়া, আর তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, তারপর তোমাদের আকৃতি পূর্ণাঙ্গ করেছেন। আর তিনি তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন ভাল বস্তু থেকে। এই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, পুণ্যময় তবে আল্লাহ, বিশ্বজগতের পালয়িতা। (২২ : ৬৩) আল্লাহ আকাশ থেকে পাঠান জল, আর ধরণী সবুজ হয় তারপরই। নিঃসন্দেহ আল্লাহ সদয় ও ওয়াকিফহাল (৩০ : ২৭) আর তিনি প্রথম সৃষ্টি করেন আর পুনঃসৃষ্টি করেন ; আর এ তার জন্য সহজ। আর তারই মহীয়ান দৃষ্টান্ত (গুণাবলী) আকাশে ও পৃথিবীতে ; আর তিনি মহাশক্তি, জ্ঞানী। (৪৫ : ২৭) আর আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর ; আর সেইদিন যখন সেই সময় আসবে যেদিন তারা ধ্বংস হবে যারা মিথ্যার অনুসরণ করে। (৪৫ : ৩৬) সে জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশের পালয়িতা ও পৃথিবীর পালয়িতা, আর বিশ্ব জগতের পালয়িতা। (৩০ : ৪০) আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের জীবিকা দিয়েছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তারপর তোমাদের পুনর্জীবিত করেন। (৪২ : ৯) আল্লাহই বন্ধু আর তিনিই মৃতকে জীবন দেন, আর তিনি সব কিছুর ওপরে ক্ষমতাবান। (৬২ : ১) আল্লাহর মহিমা কীর্তন করে যা কিছু আছে পৃথিবীতে, তিনি প্রভু, পবিত্র, মহাশক্তি, জ্ঞানী। (৩১ : ১০) তিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন থাম না দিয়ে যা তোমরা দেখ, আর পৃথিবীতে প্রবিষ্ট করিয়েছেন অনড়

পাহাড়দের যেন তা তোমাদের সঙ্গে কম্পিত না হয়, আর তিনি তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকমের প্রাণী। আর তিনি আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন জল, আর তাতে উৎপন্ন করেন প্রত্যেক রকমের উদ্ভিদ, আর তাঁর করুণা থেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পারো আর যেন তাঁর প্রাচুর্যের অন্বেষণ করতে পারো, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। তোমাদের কোনো অংশী-দেবতা কি আছেন যে এর কিছু করেন? মহিমা কীর্তিত হোক তাঁর, আর তাঁর বহু উচ্চে অবস্থিত থাকুন তিনি তারা তাঁর যেসব অংশী দাঁড় করায় সে সব থেকে।"[১]

মোটের ওপর গীতার সঙ্গে কোরানের যা মিল আছে তা হল—শ্রীভগবান সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ। আবার তিনিই সমগ্র জগতের প্রলয়ের হেতু। ভগবানের ইচ্ছাতেই সূর্য ও চন্দ্র কিরণ দিচ্ছে এবং দিন রাত হচ্ছে। তিনি জীব জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের আহার দিচ্ছেন আবার ধ্বংস করছেন; আবার সৃষ্টি করছেন। ভগবানই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। সমগ্র বিশ্ব জগৎকে ধারণ ও পালন করছেন, তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের পালয়িতা। তিনি সত্য, আর সবই মিথ্যা, সুতরাং তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নন।

॥ ৫ ॥

হিন্দু ধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মেরও বিশেষ মিল রয়েছে মহাভারত অনুসারে ধর্মের সংক্ষিপ্ত নিয়ম হল—তুমি অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর অপরের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করবে। এর আক্ষরিক অনুবাদ বাইবেলেও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—Do unto others as you would that others should do unto you.

হিন্দু ধর্মে আছে ভগবত-ভক্ত-ভগবান; গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব; অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব বা সত্ত্ব, রজ, তম এটাই হল ত্রিত্ব বা trinity। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় একের মধ্যেই তিনভাব বিদ্যমান।

চরিত্রের উন্নতির জন্য মহর্ষি মনু, মহাভারতকার ও বুদ্ধদেব দশটি নিষেধ বিধি প্রচার করেছেন, বাইবেলেও তা আছে। জল প্লাবনের কাহিনী মহাভারত, বাইবেল ও কোরানে আছে। অবশ্য কিছু পার্থক্যও আছে। স্বর্গ

স্বর্গ সুখের ও নরক যন্ত্রণার কথা মহাভারত ও বাইবেলে আছে। এই উভয় ধর্মগ্রন্থই লোককে স্বর্গ সুখের লোভ দেখিয়ে সৎকার্য করতে এবং নরক যন্ত্রণার ভয় দেখিয়ে পাপ কার্য হতে বিরত থাকতে বলেছে। পাপ করে মহাজনের নিকট স্বীকার করলে পাপ লাঘব হয়—একথা মহাভারত ও বাইবেল উভয়েই শিক্ষা দিয়েছে। পাপ-স্বীকার রোমান ক্যাথলিকগণের ধর্ম বিশ্বাসের একটি বিশেষ অঙ্গ। হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয়েই বিশ্বাস করেন—প্রায়শ্চিত্ত করলে পাপ নষ্ট হয়। যীশুখ্রীষ্ট আপন প্রাণ দিয়ে সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

হিন্দুধর্মের মতো খ্রীষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদ আছে। বেদান্তের 'সোঽহং' এর মতো যীশুও বলেছেন, "আমি ও আমার পিতা ঈশ্বর এক।" হিন্দুদের গুরুর মতো যীশু নিজেকে পরিত্রাতা বলেছেন। হিন্দুগণের যেমন তীর্থক্ষেত্র আছে, প্যালেষ্টাইনও সেরূপ খ্রীষ্টানগণের তীর্থস্থান। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রধান অঙ্গ দীক্ষাভিষেকের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিশেষ মিল আছে। হিন্দুগণ যেরূপ গঙ্গা জল পবিত্র মনে করেন, সেরূপ খ্রীষ্টানগণ জর্ডন নদীর জল বিশেষ পবিত্র মনে করেন। হিন্দুগণ পূজোয় ধূপ, ধুনো, ঘণ্টা ও প্রদীপ প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন। রোমান ক্যাথলিকগণও ওই সকল দ্রব্য তাঁদের আরাধনার সময় ব্যবহার করে থাকেন। গীতার সঙ্গে বাইবেলের বহু বিষয়ে মিল আছে। এবং কৃষ্ণের জীবনীর সঙ্গে খ্রীষ্টের জীবনীরও শতাধিক বিষয়ে মিল আছে। অনেকের ধারণা খ্রীষ্ট কৃষ্ণ নামের অপভ্রংশ এবং ভারতে ধর্ম ব্যাখ্যাতা কৃষ্ণ নামে অভিহিত বলে বোধহয় যীশুও স্বদেশে ধর্ম ব্যাখ্যাতা হয়ে খ্রীষ্ট নামে পরিচিত হয়েছেন।

॥

বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যেও এক অসাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যীশু ও বুদ্ধের জীবনীতেও নানা বিষয়ে মিল আছে। উভয়ের জন্মের সময় একটি শুভ নক্ষত্রের উদয় হয়। বুদ্ধদেবের জন্ম সময়ে পুষ্যা নক্ষত্রের উদয় ও অসিতা ঋষির আগমন হয়। সেরূপ যীশুর জন্মের কথা শুনেও প্রাচ্যদেশ হতে সাধুগণের আগমন হয়। বুদ্ধদেবকে যেমন মার (কামদেব) প্রলোভন দেখিয়েছে,

সেরূপ যীশুকেও শয়তান প্রলোভন দেখিয়েছে এবং উভয়েই প্রথমে ১২ জন শিষ্য পেয়েছিলেন (জানা গেছে—হজরত মহম্মদও বার জনকে একীব বা প্রধান শিষ্যরূপে নির্বাচন করেছিলেন)। বুদ্ধদেবের বোধিদ্রুম এবং যীশুর ডুমুর গাছের সঙ্গে বিশেষ মিল আছে। মিল আছে উভয়ের উপদেশবলীতেও। যেমন, বুদ্ধ বলেছেন—"ঘৃণায় ঘৃণা দমিত হয় না, প্রেমই ঘৃণাকে জয় করতে পারে। আমাদের যারা ঘৃণা করে আমরা তাদের ঘৃণা না করে আমরা সুখে বাস করব। প্রেম দ্বারা ক্রোধকে জয় করব, সৎ দ্বারা অসৎকে জয় করব।" যীশু বলেছেন—"শত্রুকে ভালবাস, যে তোমাকে অভিশাপ দেবে—তুমি তাকে আশীর্বাদ করবে। যে তোমাকে অত্যাচার করবে তুমি তার জন্য প্রার্থনা করবে।" এছাড়া বৌদ্ধদের তিন মহাবাক্য, যেমন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি," এর সঙ্গে খ্রীষ্টানগণের তিন তত্ত্ব (ত্রিনীতি)—"ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র ও পরিত্রাতা," এর বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টানদের জল দ্বারা দীক্ষা দানের সঙ্গে বৌদ্ধদের জল দ্বারা অভিষেক প্রথা তুলনীয়।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট এই তিন ধর্মেই ত্রিত্ববাদ গৃহীত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মঠবাসী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের মতো খ্রীষ্টধর্মের মঠবাসী পাদ্রী সম্প্রদায়েরও মঠবাসী ও মঠবাসিনী আছে। রোমান ক্যাথলিকগণের যাজক সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠান, রীতি-নীতি বৌদ্ধধর্মের মতোই। বৌদ্ধগণের মতো খ্রীষ্টানগণও বিশ্বপ্রেম ও সেবাব্রতে বিশ্বাসী। বৌদ্ধগণ যেমন বুদ্ধমূর্তির উপাসনা করেন, রোমান ক্যাথলিকগণও তেমন খ্রীষ্ট ও তাঁর জননী মেরীর মূর্তির উপাসনা করেন। গ্রীক ও রোমান খ্রীষ্টীয়গণ বুদ্ধদেবকেও রাজপুত্র জোসাফৎ নামে অর্চনা করেন। শুধু তাই নয়, ম্যাক্সমুলার বলেছেন, "বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের বহু বিষয়ে বিস্ময়কর মিল আছে। বৌদ্ধধর্মের উপদেশজনক বহু গল্প বাইবেলে উদ্ধৃত হয়েছে।"

হিন্দু বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মের তাত্ত্বিক ও অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে অনেক বিষয়ে ঘনিষ্ঠ মিল দেখে অনেকে মনে করেন—যীশু কোনো এক সময়ে ভারতে এসেছিলেন এবং এখানকার ধর্মকর্ম ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। **The Unknown Life of Jesus Christ** নামক গ্রন্থের রুশ লেখক নিকোলাস নটোভিচ লাদকের রাজধানী লোতে হিমম মঠের

প্রধান লামার কাছে বৌদ্ধ যুগের যে প্রাচীন ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলির সন্ধান পেয়েছেন তা থেকে জানা যায়—ঈশা নামে এক কিশোর জেরুজালেম থেকে ভ্রাম্যমান বণিকদের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। তিনি ভারতের কাশ্মীর, রাজগৃহ ও কাঞ্চী প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণের পর এখানকার বৌদ্ধ ও হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে দীর্ঘ ষোল বছর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ওই পাণ্ডুলিপিগুলো পালি থেকে তিব্বতীতে অনূদিত এবং যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার অল্পকাল পরেই লিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়েছে। একটি পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ আছে—ভারত ভ্রমণের পর উক্ত ঈশা স্বদেশে গেলে সেখানকার নাস্তিক শাসকের হাতে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। নটোভিচ মনে করেন উক্ত ঈশাই ছিলেন যীশুখ্রীষ্ট।

খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থকাররা লিখেছেন—যীশু মাত্র বার বছর বয়সে তপস্যার উদ্দেশ্যে মরুভূমিতে চলে যান এবং সিদ্ধিলাভ করে ত্রিশ বছর বয়সে জুডিয়ায় ঈশ্বর পুত্র রূপে আবির্ভূত হন। পরে পন্টিয়াস পাইলেটের বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তাদের লেখা থেকে যীশুর জীবনের ষোল সতের বছরের কোনো হিসাব মেলে না। কাজেই তিব্বতী পাণ্ডুলিপির ঈশা যদি যীশু হন তবে যীশুর জীবনের অদৃষ্ট হওয়ার ষোল বছরের হিসাব মিলবে।

জুডিয়ার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অত্যাচারী ইহুদী পুরোহিত ও মহাজনগণ বিদেশী প্রভুদের সঙ্গে যোগসাজসে দেশের জনসাধারণকে অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্যে রেখেছিল এবং বাল্যকাল থেকেই যীশু সে দুঃখকষ্টের শিকার হয়েছিলেন এবং তা থেকে মানুষকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি বাল্যকাল হতেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এবং ওই সময় ভারতের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত। কাজেই ভারতীয় বণিকদের মুখে বুদ্ধের মৈত্রী ও মানব প্রেমের কথা শুনে যীশু যে বাল্যকালে ভারতে আসবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

বুদ্ধের সময় ভারতে আর্যদের কাছে শূদ্রেরা ছিল এক অতি নিকৃষ্ট জীব এবং ধর্মচর্চার অধিকারে বঞ্চিত। এছাড়া ভূস্বামীদের হাতে ভূমিদাসেরা ছিল সর্বাধিকার বঞ্চিত। এদের রক্ষার জন্যই যেন আবির্ভূত হলেন বুদ্ধ। আর্যদের হাতে শূদ্রদের নিগৃহীত হতে ও ভূস্বামীদের কাছে ভূমিদাসদের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হতে দেখে তথাগত বুদ্ধ এক নতুন ধর্মমত ও সাম্যবাদের প্রচার করেছিলেন। তাঁর ধর্মে সকল জাতির সমান অধিকার ছিল, এবং তিনশো

বছরকার বৌদ্ধধর্ম মহামতি অশোকের সময়ে রাজধর্মে পরিণত হয়ে বিশ্বের বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। যীশুখ্রীষ্টও বুদ্ধের মতো বিদেশী শাসক ও স্বদেশী পুরোহিত যারা ধর্মের নাম করে নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত ও অত্যাচারী ছিল তাদের হাত থেকে গরীব শ্রমজীবী, কৃষক ও ক্রীতদাসদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রুখে দাঁড়িয়ে প্রচারিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সাম্যবাদ ও মানব প্রেমমূলক ধর্মের প্রচার করেছিলেন। যার ফলে এক শ্রেণীর অত্যাচারী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের স্বার্থে আঘাত লাগায় তারা যীশুকে রাজদ্রোহীরূপে প্রমাণ করিয়ে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করায়। কিন্তু রোমের সম্রাট কনষ্টানটাইনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই তা রাজধর্মের মর্যাদা পেয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

অবশ্য বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নীরব ছিলেন এবং বেদ, ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করেছিলেন। পক্ষান্তরে যীশু পরম পিতা ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করেছিলেন এবং জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম এই ত্রিতত্ত্বের কথা বলেছিলেন এবং তার সঙ্গে ভারতীয় আর্য এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মিল আছে। এছাড়া বৈষ্ণবদের মতো সখীভাবে ভজনের রীতি ও মালা জপ পদ্ধতি রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাস, প্রব্রজ্যা, বৈরাগ্য ও সেবা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রেম, ভক্তি ও নতি খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যেও পরিলক্ষিত হওয়ায় খ্রীষ্ট ধর্মের ভিত্তি ভারতের ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তির ওপরেই গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা যায় না কি?

The Mystical Life of Jesus গ্রন্থের ইংরেজ লেখক স্পেন্সার লিউইস বলেছেন—যীশু ভারতবর্ষে এসে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন। উক্ত পুঁথিগুলি থেকে জানা গেছে যীশু হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্যতা অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের উদার সাম্যবাদিতার দ্বারা যেমন আকৃষ্ট হয়েছিলেন তেমনই আবার বুদ্ধ ধর্মের ঈশ্বর বিমুখীতার চেয়ে হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরমুখীতাই তাকে বেশি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এবং এ দু-এর সমন্বয় ঘটাবার জন্যই বোধ হয় তিনি একদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অপরদিকে সাম্যবাদিতা ও মানবপ্রেম প্রচার করেছিলেন তিনি তার জীবন, ধর্মতত্ত্ব ও সাধনার মাধ্যমে। উক্ত পুঁথিগুলির মধ্যে একটিতে মাতা মেরীর কাছে লেখা যীশুর একটি পত্রের তিব্বতী অনুবাদ থেকে জানা গেছে—তিনি সংসারের অনিত্যতা ও আত্মার

অবিনশ্বরতার কথা প্রকাশ করেছেন। এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে মোহমুক্ত হয়ে দিব্যদৃষ্টি লাভের ইঙ্গিতও উক্ত লিপিতে আছে। স্পেন্সার লিখেছেন—যীশু ওই চিঠি বণিকদের মারফতে তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। প্রাচ্যের প্রধান তিনটি ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম প্রত্যেকটি ছশো বছর অন্তর প্রচারিত হয়েছিল। যেমন, বুদ্ধের ছশো বছর পরে যীশু ও যীশুর ছশো বছর পরে হজরত মহম্মদ আবির্ভূত হয়ে তাঁদের ধর্মমত প্রচার করেন। এবং এঁদের ধর্মমতের সঙ্গে নানাপ্রকার মিলের কথাও এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এই ধর্মমতগুলো যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুব কম বা নেই বললেই চলে।

পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক হজরত মহম্মদের সঙ্গে আর্যদের যে সম্পর্ক খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তক যীশুর সঙ্গেও আর্যগণের একই সম্পর্ক। উভয়েই একই বংশের সন্তান।

॥ ৭ ॥

হজরত ইব্রাহিমের দুই স্ত্রীর গর্ভে ইসমাইল ও ইসাহক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই ইসমাইলের পরবর্তী বংশে হজরত মহম্মদ ও ইছাহকের পরবর্তী বংশে যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। মাসিক মোহম্মদীর লেখক আব্দুল সাবুদের মতে "হজরত এবং যীশু একই বংশের সন্তান"। যদু হতেই Juda (জুডা) নাম উৎপন্ন হয়েছে। দ্বাপর যুগ শেষের অবতার শ্রীকৃষ্ণ এই যদু কুলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে যে, সিরিয়ার অবস্থানের সময় বাইবেলের সকল ভাববাদী যদুবংশের ওই শাখা হতে উৎপন্ন হয়েছেন। এরই এক শাখা মক্কায় গিয়ে অবস্থান করে মক্কার পুরোহিত কুল বা কোরেশ বংশ নামে বিখ্যাত হন এবং হজরত মহম্মদ এই কোরেশ বংশেরই এক উজ্জল রত্ন। যদিও এ বিষয়ে সকলে একমত নন, তাহলেও এসকল ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান এই তিন সম্প্রদায়ের লোকদের মিলে মিশে পরম আত্মীয়ের মতো বসবাস করাই কি উচিত নয়? এছাড়া পরস্পরের মধ্যেকার সকলপ্রকার বিভেদ দূর করে দেশের জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে অটুট থাকে সে দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হিন্দু-মুসলমানগণকে একই সূত্রে গ্রথিত করার প্রচেষ্টা ভারতের আজকের নয়। এ প্রচেষ্টা ভারতের বহু কালের। তাই পুনরায় উল্লেখ করছি যে, আধুনিক কালে কবি নজরুল ওই একই উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

"মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান
মুসলমান তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ॥
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান।"

কিভাবে হিন্দু, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম পরস্পরে প্রভাবিত হয়েছে সে সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। যেমন—ইংরেজ পাদ্রী ডাঃ মানবী পি. হল লিখেছেন—"মহাভারতই বাইবেলের প্রাচীন অংশ (Old Testament) এর ভিত্তি এবং কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের জীবনীতে শতাধিক মিল আছে।"[২] ম্যাক্সমূলার বলেছেন—"কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের মধ্যে যে বহু বিস্ময়কর মিল আছে, তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।"[৩]

ডাক্তার লরিন স্যার বলেছেন, "গীতার সঙ্গে বাইবেলের প্রায় একশত ভাবে মিল আছে।"[৪] কেনেডি সাহেব গীতার সঙ্গে বাইবেলের নতুন অংশ (New Testament) এর তুলনা করে লিখেছেন—"খুব সম্ভব যে, বাইবেলের ওই সকল অংশের লেখকগণ ভগবদ্গীতা হতেই উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।"[৫] ম্যাক্স মূলার লিখেছেন—"অনেক পণ্ডিত গীতার সঙ্গে বাইবেলের নতুন অংশের মিল দেখিয়েছেন, তা হলে অধ্যাপক তেলাং এর মত সম্ভবতঃ সত্য যে, গীতার বহু পরে বাইবেল রচিত হয়েছিল।"[৬] সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত স্যার চার্লস উইলকিন্স ইংরেজী ভাষায় সর্বপ্রথম গীতা অনুবাদ করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

জেকোলীয়ট লিখেছেন—"আমরা পরিষ্কার রূপে প্রমাণ করেছি যে, প্রাচীন ভারতের প্রভাব প্রাচীন কালের সমুদয় জাতির ওপরই বিস্তৃত হয়েছিল। পারস্য, জুডিয়া (প্যালেষ্টাইন) মিশর, গ্রীস ও রোম তাদের দর্শন, নীতি, ধর্ম ও ইতিহাস ভারতের আদি উৎস হতেই গ্রহণ করেছিল। মুসা (Moses) তাঁর মত মিশর ও ভারতের পবিত্র গ্রন্থাবলী হতেই সংগ্রহ করেছিলেন। খ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যগণ বেদ ও কৃষ্ণের শিক্ষা হতেই তাঁদের মত গঠন করেছিলেন। কৃষ্ণের নীতি দ্বারাই খ্রীষ্ট তাঁর ধর্মের সংস্কার করেছিলেন। মনুসংহিতা হতেই

বাইবেলের বহু বিষয় গৃহীত হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষ হতে গৃহীত হয়েছিল। বাইবেলের মূল নিশ্চয়ই ভারতবর্ষীয়।"[৭]

"জানা গেছে আর্যরাই পারস্যে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। সে দেশের আইন মনুস্মৃতি হতে গৃহীত হয়েছিল। মনুর স্মৃতিই সে দেশের আইনের মূল। ভারতবর্ষই তার আইন, রীতি, নীতি ও প্রভাব পারস্যে বিস্তৃত করেছিল।"[৮] পারস্যের ধর্মগ্রন্থেও আছে—তাদের পূর্বপুরুষ পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশ হতে পারস্যে গমন করেছিল।[৯]

ম্যাক্সমূলার লিখেছেন—"জোর-আষ্টার ধর্মাবলম্বীগণ উত্তর ভারত হতে প্রাচীন পারস্যে গিয়ে বসতি করেছিল।"[১০] তাছাড়া অনেক বৈদিক দেবতার নাম কিছু পরিবর্তিত অবস্থায় জেন্দা-আবেস্তায় দেখা যায়। হিন্দু ও পার্শী এই উভয় জাতিই ধর্মকার্যে অগ্নির ব্যবহার করেন এবং উভয় জাতিই অগ্নির উপাসক। গীতার সঙ্গে জোর-আষ্টারের গাথারও অনেক মিল আছে। জোর-আষ্টার ভারতের ধর্ম প্রচারকগণের মতই পোষণ করতেন। কাউণ্ট বোর্ণষ্টার্ণ বলেছেন—"হিন্দুগণের সমুন্নত সভ্যতাই পারস্যে বিস্তৃত হয়েছিল।"[১১]

ইসলামি কৃষ্টির প্রায় সবই পারসিক কৃষ্টি-জাত। পারসিক কৃষ্টি আবার আর্য কৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এদিক থেকে ইসলামিক ও আর্য সভ্যতা এবং ধর্ম-বিশ্বাসে কোনো প্রভেদ থাকা উচিত নয়। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা চারজন ধর্মবীরের তিন জনই হলেন পারসিক। (ক) হজরত মহম্মদের কোরান, (খ) আরবুখারির হাদিস, (গ) গাজ্জলির তফসির এবং (ঘ) আবুহানিফার কিয়াস—এদের দ্বারাই বিরাট মুসলিম জগৎ নিয়ন্ত্রিত। এবং এই ধর্মবীরদের মধ্যে একমাত্র হজরত মহম্মদ ছাড়া আর তিন জনই হলেন পারসিক। ইসলামিক সভ্যতার যাঁরা গৌরব সেই আবুরেহান তবারি বা জমাক্সারি, মীরখোন্দ বা আবুল ফজল সাদি, হাফেজ, ওমর খৈয়াম বা জালালুদ্দিন রুমি প্রমুখ সকলেই পারসিক। সুফী-শ্রেষ্ঠ আবু সৈয়দ, পারসিক সাধক অদ্বৈতবাদী মনসুর, বোস্তামী শিবলি জুনৈদ ও ইমাম গজ্জলি পারস্যের সন্তান। এবং পুণ্য-ভূমি ইরানই সুফী-বাদের সূতিকাগৃহ। পারসিক কৃষ্টিকে বাদ দেওয়া ইসলামের পক্ষে অসম্ভব অর্থাৎ পারস্যের সভ্যতাই প্রকৃতপক্ষে ইসলামিক সভ্যতার প্রাণ-কেন্দ্র। পারস্যের ভাষা, সহিত্য, শিল্পকলা, পোশাক পরিচ্ছদ, কবি, দার্শনিক, ইত্যাদি বাদ দিলে ইসলামিক সভ্যতা নিতান্তই রিক্ততায় পরিণত হবে।

পক্ষান্তরে পারসিক কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করলে হিন্দুদের পক্ষে মূর্খতা বই আর কিছুই হবে না।

পৃথিবীতে ছটি প্রধান ধর্মতন্ত্র প্রচলিত আছে। এর মধ্যে তিনটি অর্থাৎ হিন্দুতন্ত্র, পার্শীতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র আর্য জাতিতে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। আর বাকী তিনটি যেমন ইহুদী-পন্থা, খ্রীষ্ট-পন্থা ও ইসলাম-পন্থা সেমিটিক শাখা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ইহুদীগণ পার্শীতন্ত্র হতেই একেশ্বরবাদ ও নিরাকারোপাসনার দীক্ষা লাভ করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ব্যাবিলোনিয়ার সম্রাট নেবুকাদনেজারের রাজত্বকালে ইহুদীগণ মঘবদ্‌দিগের অর্থাৎ জরথুস্ত্রদিগের সংস্পর্শে আসার পর থেকে একেশ্বরবাদী ও নিরাকারোপাসক সম্প্রদায়ে পরিণত হন। এর পূর্বে তাঁরা বহু দেবদেবী ও মূর্তি পূজো করতেন। তাঁদের তীর্থরাজ জেরুজালেমে প্রধান দেবতা বা আলের ন্যায় আষ্টারথ প্রভৃতি অপরাপর দেবতারও মন্দির ছিল। ওই সকল মন্দিরে ধাতুনির্মিত অনেক বিগ্রহ পূজো পেত। কিন্তু পার্শীদের সংস্পর্শে আসার পর হতেই ইহুদীগণ বহু দেববাদ ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেন। ইসলামের মূল তত্ত্বগুলি জরথুস্ত্র-তন্ত্র হতে পৃথক্ নয়। আবার জরথুস্ত্র-তন্ত্র অথর্ব বেদের অন্যতম অঙ্গভার্গব বেদের প্রস্থান। কাজেই মূলতত্ত্ব বিচার করলে ইসলামকে বৈদিক তন্ত্রের প্রশাখা বলেই মনে হয়। ইসলাম পার্শীতন্ত্রের অপভ্রংশ এবং মুসলমানগণ প্রচ্ছন্ন পার্শী। অতএব ইসলামিক কৃষ্টির অধিকাংশই পারসিক কৃষ্টি। আবার পারসিক কৃষ্টি ভারতীয় কৃষ্টির ন্যায় আর্য কৃষ্টিরই অন্যতম বিকাশ মাত্র। ভগবান জরথুস্ত্রের গাথায় আছে "শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্" এই মন্ত্র।

॥ পাঁচ ॥

মানব ইতিহাসে ধর্ম সবচেয়ে পুরানো ও সমবেত প্রচেষ্টার ফল। এটা একদিকে মানুষের যেমন দুর্বলতা, অন্ধবিশ্বাস, নৃশংসতা ও কুসংস্কারের সঙ্গে অপরদিকে তেমন আধ্যাত্মিকতা ও মানব প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ধর্ম নিয়ে যুগে যুগে প্রচুর মাতামাতি হয়েছে এবং একে আশ্রয় করেই একদল স্বার্থান্বেষী লোক রাজনীতি করেছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে মধ্য যুগের ইউরোপে চূড়ান্ত অশান্তি ঘটেছে। ধর্মান্ধ লোকগুলি এই ধর্মকে আশ্রয় করেই যুদ্ধবিগ্রহ করেছে। নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। অপরকে ডাইনী অপবাদ দিয়েছে এবং পরমত অসহিষ্ণু হয়ে অগণিত মানবমানবীকে পুড়িয়ে মেরেছে। আবার এই ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়েই বুদ্ধদেব, যীশু, হজরত, নানক, চৈতন্য, অশোক ও আকবর প্রমুখ মহামানব ও সম্রাটগণ বিশ্বে মানবপ্রেম প্রচারে উদগ্রীব হয়েছেন। সকল ধর্মমতই যে মানুষকে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভালবাসতে বলছে—সকল ধর্মমত ও সকল ধর্মগুরুদের জীবনাদর্শ জানলে তা বুঝতে পারা যাবে এবং ধর্মান্ধতা কাটবে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মসমূহ পর্যালোচনায় একটা সাধারণ ধারা পরিলক্ষিত হয় তা হল—প্রত্যেক ধর্মই এক ঈশ্বরে ভক্তি রাখতে, সত্যনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ হতে এবং মানুষকে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভালবাসতে শিখিয়েছে। এছাড়া বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মপ্রবর্তককেই সমসাময়িক অন্ধবিশ্বাস ও নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁদের ধর্মমত প্রচার করতে হয়েছে। ফলে অনেককেই হয় চরম বিপক্ষের মুখোমুখী অথবা বিরোধীদের হাতে নিগৃহীত বা নির্মমভাবে নিহত হতে হয়েছে। তাছাড়া প্রায় সকল ধর্মপ্রবর্তকের জীবনেই কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

॥ ১ ॥

রামচন্দ্র ঐতিহাসিক লোক কি পৌরাণিক লোক—সে বিচার থাক। তবে তিনি ছিলেন পরম পিতৃভক্ত, সত্যাশ্রয়ী ও প্রজাবৎসল। রাজা

হিসেবে তিনি যে রাজধর্মকে সকলের ওপরে স্থান দিয়েছিলেন তার পরিচয় মিলে তাঁর সময়ে প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও তাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনের কাহিনীতে। অপর দিকে তিনি ছিলেন কঠোর কর্তব্যপরায়ণ ও প্রজাবৎসল। তাই রামচন্দ্র কর্তব্য পালনের ও প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রী সীতাকে নির্দোষ জেনেও পরিত্যাগ করেছিলেন। রামের রাজ্য আদর্শ রাজ্য হিসেবেই চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর সুশাসনে অযোধ্যার প্রজাবর্গ সুখে ছিল এবং কারও অভাব অভিযোগ ছিল না বলে জানা যায়। সারা দেশে তিনি ন্যায় ও সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রামচন্দ্র পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে তাঁর সত্য রক্ষার নিমিত্ত দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের জন্য রাজসুখ বিসর্জন দিয়ে বনে গিয়েছিলেন। তিনি স্বার্থপর হয়ে পৃথিবীতে সুখে বাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। এছাড়া ধর্মপরায়ণ স্ত্রী যে সংসারের গৌরব বৃদ্ধি করে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত সীতা। রাম সত্য পালনকেই শ্রেষ্ঠধর্ম হিসাবে মনে করতেন। রামের কাছে সকল জাতির লোকই সমান ছিল। তাই গুহক চণ্ডালকেও তিনি প্রেমভরে আলিঙ্গন করেছিলেন।

॥ ২ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের ধ্বংসের জন্য—যার ফলে ধর্মসংস্থাপন হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই—একথা শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে বলেছেন। দেখা গেছে বিভিন্ন যুগে যখন সামাজিক অত্যাচার, কুসংস্কার, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এবং নিপীড়নরূপ তমিস্রায় সমগ্রদেশ ছেয়ে গেছে, রাজশক্তি পশুশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ধর্মের মুখোশ পরে এক শ্রেণীর অধার্মিক বা ধর্মান্ধ লোক দেশের সাধারণ লোকদের প্রতারিত করেছে ঠিক তখনই ধর্মপ্রাণদের রক্ষার নিমিত্ত দেশে দেশে এক একজন মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ, তথাগত বুদ্ধ, জরথুস্ত্র, যীশু খ্রীষ্ট, লাওসে, হজরত মহম্মদ, রামানন্দ, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ধর্মপ্রচারকগণের

আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ওই বাণীর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা সকলেই বিভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও কালে আবির্ভূত হলেও প্রকৃতপক্ষে একই একেশ্বরবাদ, সত্যধর্ম, অহিংসা ও মানব প্রেমের কথা প্রচার করেছেন।

মথুরায় অত্যাচারী রাজা কংস যিনি পিতাকে উপেক্ষা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তাঁর ধারণা হয়েছিল—ভগিনী দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তাঁকে হত্যা করবে। এরূপ অন্ধ ধারণার বশবর্তী হয়ে কংস দেবকী ও তাঁর স্বামী রাজা বাসুদেবকে বিবাহের পরই কারারুদ্ধ করেন, এবং কারাগারে একে একে দেবকীর সকল সন্তানকেই অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। কিন্তু একমাত্র অষ্টম গর্ভজাত সন্তান শ্রীকৃষ্ণকেই হত্যা করতে ব্যর্থ হন। কারণ এক অতি দুর্যোগময়ী রজনীতে কৃষ্ণের জন্ম হয় এবং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রাজা বাসুদেব তাঁকে অতি গোপনে গোকুলে বন্ধু নন্দের গৃহে রেখে আসেন। সেখানে কৃষ্ণ নন্দ-পুত্ররূপে মানুষ হতে থাকেন। কিন্তু কংস এখবর জানতে পেরে সেখানে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। তখন নন্দরাজা কৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে যান। ফলে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কংসের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এবং যুগাবতার কৃষ্ণের জীবন রক্ষা পায়।

শ্রীকৃষ্ণচরিত পাঠে জানা যায়—যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন সারা ভারতের অধিকাংশ রাজাই অত্যাচারী, অপদার্থ ও স্বার্থপর ছিলেন। তাঁদের এতদূর অধঃপতন হয়েছিল যে, প্রকাশ্য রাজসভায় তাঁরা অনেক কুলবধূকে চরম অপমান করতেও কুণ্ঠিত হননি। শ্রীকৃষ্ণ ওই অত্যাচারীদের বিনষ্ট করে ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে অসম্মতি জানালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। তিনি বলেন—তাঁর পাপাত্মা-আত্মীয়দের অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে, অর্জুন উপলক্ষ্য মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে 'বিশ্বরূপ' দর্শন একটি অলৌকিক ঘটনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয়ের কথা বলেছেন—"মানুষ নিজের পছন্দমত যে পথ ধরেই এগিয়ে যাক না কেন, শেষে সকলেই এক ভগবানের কাছেই পৌঁছোয়।"

কোরানে আছে—প্রত্যেক জাতির জন্যই ধর্মপ্রবর্তক প্রেরিত হয়েছেন। এবং প্রত্যেকের কাছেই প্রকৃতধর্ম সম্মিলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম-প্রচারকেরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের ভাষায় ধর্মপ্রচার করে ধর্মের বাণী তাঁদের দেশবাসীদের কাছে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কোরানের সুরায় হজরত মহম্মদও বলেছেন—তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে চীন, ইরান, ভারত প্রভৃতি দেশে অনেক ধর্মপ্রবর্তক আবির্ভূত হয়েছেন যা কোনো মুসলমান অস্বীকার করতে পারবেন না। সেই মতানুসারে কতিপয় উলেমা ভারতের রাম ও কৃষ্ণকে ধর্মপ্রবর্তক বলে অভিহিত করেছেন। মির্জা আবুল ফজল বলেছেন—কোরাণের মতে কেবল মোসেস এবং যীশুই নন ভারতের সকল বৈদিক ঋষি, রাম, কৃষ্ণ, মহাবীর, বুদ্ধ এবং পারস্যের জরথুস্ত্র ও চীনের কনফুসিয়াস খাঁটি ইসলাম অনুসারীদের হৃদয়ে সমান মর্যাদা পেয়ে থাকেন।

॥ ৩ ॥

প্রাণ আছে তরুলতার আছে ক্ষুদ্র জীবে,
হিংসা না ক'রে জীবে দয়া কর সবে।

—বৃক্ষলতা থেকে আরম্ভ করে সকল জীবে দয়া করার শিক্ষা দিয়েছে জৈন ধর্ম। এই ধর্মের প্রবর্তক হলেন তীর্থঙ্কর মহাবীর। এই মহামানবের জন্মের আগে তাঁর মা ত্রিশলা কয়েকটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। ফলে ধর্মপ্রাণা নারীর প্রাণে জেগে উঠেছিল এক দিব্য চেতনাবোধ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—অচিরেই তাঁর গর্ভে জন্ম নেবেন এক মহামানব। ত্রিশলা দেবীর সে ধারণা ব্যর্থ হয়নি।

অত্যাচারী লোকের হাতে অমানুষিকভাবে নির্যাতিত হয়েও মহাবীর বর্ধমান কঠোর তপস্যা থেকে বিচ্যুত হননি। এবং সুদীর্ঘ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট মানবসমাজের কাছে প্রচার করলেন আত্মার অমৃতত্ত্ব। তিনি সকল ইন্দ্রিয় জয় করে 'জিন' নামে পরিচিত হলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম জৈন ধর্ম। মানব জীবনের চরম আনন্দ বা মোক্ষলাভের জন্য যা প্রয়োজন তা হল ত্যাগ, তপস্যা ও অহিংসা। ভোগ লালসায় উন্মত্ত পথভ্রষ্ট মানবকে দেখাতে হবে চরম পথের সন্ধান যার পাথেয় হবে ত্যাগ ও অহিংসাব্রত। মানুষের জন্য এ শিক্ষার বাণী রেখে গেছেন তীর্থঙ্কর মহাবীর। মোক্ষ লাভই জৈন ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। মহাবীর বর্ধমানের জীবন ছিল উদার ও ব্যাপক, ধর্মের ক্ষুদ্র সংকীর্ণতাবোধ তাঁর মধ্যে ছিল না, তাই তাঁর সার্বজনীন ধর্মের মূল মন্ত্র হল—'অহিংসা'। জৈন ধর্মের সঙ্গে সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্মের অনেক

মিল আছে। এই উভয় ধর্মই শাশ্বত সত্য, ত্যাগ, অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছে।

ত্যাগ ও অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত জৈনরা বিশ্বাস করেন—প্রত্যেক তরুলতারও আত্মা আছে। তাঁরা জীবের দুঃখ কষ্টের প্রতি এত মমতাশীল ও সদয় যে একটি গাছের পাতা ছিঁড়তেও দ্বিধা বোধ করেন পাছে তারা কষ্ট পায়। একদল জৈন মাথায় ময়ূরপুচ্ছ নিয়ে রাজপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সরিয়ে দিয়ে পথ হাঁটেন পাছে পায়ের তলায় পড়ে কোনো জীবের প্রাণনাশ হয়। তাঁরা নিজেদের শরীরের রক্তদ্বারা মশা ও ছারপোকার ক্ষুধা মেটানোকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করেন। এবং পিঁপড়েকেও নিত্য শর্করা প্রদান করে কোনো কোনো জৈন ধর্মাবলম্বী "জীবে দয়া" সূত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এ ধর্ম ও মূলতঃ হিন্দু ধর্মের 'সর্বজীবে হরি ও হরিময় ব্রহ্মাণ্ড' এই ধর্মবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই বিশ্বাস থেকেই সর্বজীবে দয়ার ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

॥ ৪ ॥

করুণার অশ্রুজলে করুণার পরশনে
হইল বিগত ব্যথা বাঁচিল মরাল—
কুমার লইয়া বুকে মুগ্ধা জননীর মত
চাহি ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছুকাল।

শুধু মানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শন নয়, যিনি বাল্যকালে একটি শরাহত ক্ষুদ্র মরালের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তার দেহ হতে কোমল হাতে শর তুলে তাকে মুক্তি দিয়ে বিশ্বব্যাপী করুণার প্রস্রবণ বইয়ে দিলেন তিনিই হলেন তথাগত বুদ্ধ। বুক ভরা করুণার আধার নিয়ে তিনি বিশ্বচরাচরকে ভালবেসেছেন। ভালবাসতে বলেছেন। এই মহামানবের জন্মকালে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। শাক্য বংশের রাজা শুদ্ধোধনের বড় রাণী মায়াদেবী একদিন স্বপ্ন দেখলেন—আকাশ থেকে একটি সাদা ফুটফুটে ছোট হাতী নেমে আসছে, এবং তার শুঁড়ে রয়েছে একটি ফুটন্ত পদ্ম। এর পর হাতীটি রাণীর শরীরে মিলিয়ে গেল। রাণীর মুখে এই স্বপ্নের কথা শুনতে পেয়ে রাজা দৈবজ্ঞদের ডেকে বিচার করে জানতে পারলেন—এক মহাপুরুষ শাক্য বংশে জন্ম নেবেন। এই ঘটনার পরে যে

শিশুর জন্ম হল তিনি হলেন সিদ্ধার্থ। দৈবজ্ঞরা তাঁর নামকরণ উৎসবে এসে যা বলেছিলেন তা কবি নবীনচন্দ্র সেনের ভাষায়—

থাকে গৃহাশ্রমে, হবে নৃপতি ধরার,
হইবে সন্ন্যাসাশ্রমে বুদ্ধ অবতার।

রাজৈশ্বর্য ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে জন্ম, জরা, ব্যাধি মৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গৌতম সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে যে ধর্ম প্রচার করলেন তা হল বৌদ্ধধর্ম। পূজা-হোম বা দেবতার কৃপালাভ দ্বারা নয়, একমাত্র নির্বাণ লাভের দ্বারাই জীবের সকল দুঃখের নাশ হয়। তাই সাধু জীবিকা সদাচরণ, সত্যবাক্য কথন ও অহিংস জীবন যাপন প্রভৃতির মাধ্যমে নির্বাণ লাভই এই ধর্মের মূল লক্ষ্য।

বুদ্ধের সংঘে যেমন স্থান পেয়েছে বিত্তবান সমাজের প্রতিষ্ঠাবান নরনারী তেমন সমাজের ঘৃণিত পদমর্যাদাহীন নরনারীও তাঁর অপার করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি। অত্যাচারী দস্যু অঙ্গুলিমালও বুদ্ধের কৃপা লাভের পর পাপকার্য থেকে বিরত হয়েছিল। নর্তকী আম্রপালীও বুদ্ধের কৃপালাভে বঞ্চিত হয়নি। বুদ্ধদেব রাহুলকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন তা বিশ্বজনের কল্যাণ কামনায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কবির ভাষায় সে আশীর্বাদ হল -

সর্বপ্রাণী হোক্ সুখী হোক্ শত্রুহীন
অন্তরে অহিংসা যেন রয় চিরদিন।
নিজ নিজ যথা লব্ধ সম্পত্তি হইতে
বঞ্চিত না হয় যেন কেহ পৃথিবীতে।

বিশ্বপ্রেমবাদী বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বর সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী ও সাম্যবাদী হওয়ার ফলেই পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ার বিপুল সমর্থন লাভ করেছিল।

॥ ৫ ॥

"মানুষকে ভালবাসা মানবিকতা, মানুষকে বুঝতে পারা বিজ্ঞান"—একথা বলেছেন কনফুসিয়াস। তিনি চীন দেশে তাঁর ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেছেন। শত্রুরা তাঁকে হত্যা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তিনি যে

ঐশ্বরিক শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তা হল আধ্যাত্মিক শক্তি। কনফুসিয়াস বলেছেন—ঈশ্বর আমাদের সেই জ্ঞানালোক দিয়েছেন যার সাহায্যে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারি।

চীনাদের বিশ্বাস—'য়িন' হল প্রকৃতি, এই ধরিত্রী ও চাঁদ—ধারণ করাই এদের কাজ এবং য়িয়াং হল স্রষ্টা—সূর্য হল এই স্রষ্টার বহিঃপ্রকাশ।

কনফুসিয়াস এই স্রষ্টাকেই ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তি বলে অভিহিত করেছেন। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট এই বিশ্বে যে নিয়ম ও ন্যায়ের ধারা চলছে তাই প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনকে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, নানারূপ সমস্যা, বিপদ ও দুর্ঘটনা এবং যাবতীয় বাধাবিপত্তির কথাই সর্বদা মনে করিয়ে দেয় যে সত্যের ও কর্তব্যের পথে অবিচলিত থাকতে হবে, তার ব্যতিক্রম হলেই ধ্বংস অনিবার্য। কনফুসিয়াসের মতে রাষ্ট্রের প্রধান অর্থাৎ রাজাকে সৎ জীবন-যাপন করতে হবে যাতে প্রজারা তাঁর অনুসরণ করতে পারে। তিনি অসৎ হলে প্রজারাও অসৎ হবে। চীনদেশে রাজাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মনে করা হত। কাজেই রাজাকে নিজের কর্তব্য সম্পাদনে যথেষ্ট সতর্ক হতে হত। তাঁর মতে সৃষ্টিকর্তার নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সত্যের পথে চলে নৈতিক জীবন যাপন করতে হবে। ঈশ্বরে আস্থা রাখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভুললে চলবে না যে পৃথিবী, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে একটা যোগসূত্র বিদ্যমান। কনফুসিয়াসের মতে জনকল্যাণই হল প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য—রাজা-মহারাজের ভোগবিলাসের জন্য নয়। তাঁর মতে সৎপথে চালিত করে যে জ্ঞান তাই প্রকৃত জ্ঞান। কোনো মানুষকে শাস্তি দেওয়ার যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ স্বভাবতই ভাল। দেশের আইন এমন হবে যাতে তারা সৎপথে চলতে পারে। শাস্তি দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাঁর মতে দেশের নিয়ম-কানুনগুলো এমন হবে যাতে দেশের সাধারণ মানুষ নিজেরাই ভাল কি মন্দ বেছে নিতে পারে। তিনি এক অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে গেছেন। কনফুসিয়াস উদার হয়ে লোকের মন জয় করতে ও সত্যবাদী হয়ে লোকের বিশ্বাস অর্জন করতে বলেছেন। পিতামাতাকে মানিয়া চলাই শ্রেষ্ঠ পুণ্য। কথা ও কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। তিনি বলেছেন—অন্যের যে ব্যবহারে তোমার বিরক্তি উৎপাদন হয় সেরূপ ব্যবহার

অন্যের প্রতি ভুলেও করিও না। যে তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবে তুমি তার প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারই করবে।

॥ ৬ ॥

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়

—একথা বলেছেন মানবপ্রেমিক যীশু। কবি নজরুল তাঁর সাম্যবাদী গ্রন্থে লিখেছেন -'বিস্ময়কর জনম যাঁহার মহাপ্রেমিক সে যীশু'। সত্যই যীশুর জন্ম ছিল বিস্ময়কর। কারণ মাতা মেরী যখন কুমারী তখন দেবদূত গেব্রায়েল তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে এক দৈববাণী করেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে এক ঐশীশক্তির প্রভাবে তিনি সন্তান-সম্ভবা হবেন এবং সেই গর্ভ-জাত সন্তান যীশু ঈশ্বরের পুত্ররূপে পরিচিত হবেন। গেব্রায়েলের সেই দৈববাণী সত্য হয়েছিল। যীশুর জন্মের সময় বেথেলহেমের রাজা ছিলেন অত্যাচারী হেরড। তিনি জানতে পেরেছিলেন ইহুদীদের মধ্যে এক ত্রাণকর্তা 'রাজা' জন্মগ্রহণ করবেন এবং যীশুর জন্মের পর পূর্বদেশ থেকে গুণীগণের আগমনের কথা শুনে তাঁর সে ধারণা প্রকট হয়। তখন তিনি যীশুকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করে সমস্ত নবজাতক শিশুদের হত্যায় মত্ত হয়ে ওঠেন। জানা গেছে—রাজা হেরড দু'বছর পর্যন্ত যত শিশু জন্মেছিল তাদের সকলকেই হত্যা করেছিলেন। যেমন অত্যাচারী কংস কৃষ্ণকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে বোন দেবকীর গর্ভজাত সপ্তম সন্তান পর্যন্ত সকলকেই হত্যা করেছিলেন কিন্তু একমাত্র অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণের বেলায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ পিতা বাসুদেব তাকে গোপনে বন্ধু নন্দরাজার গৃহে গোকুলে রেখে এসেছিলেন এবং পরে সেখান থেকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অত্যাচারী কংসতুল্য হেরডের ভয়ে ভীত হয়ে যীশুর পিতা-মাতা যীশুকে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং অত্যাচারী হেরডের মৃত্যুর পর তাঁরা পুত্রকে নিয়ে ন্যাজারেথে ফিরে এসেছিলেন।

এদিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে যীশুর জন্মবৃত্তান্ত অনেকটা মিলে যায়। হজরত মহম্মদের বাল্যকালে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে, জানা গেছে—দুজন ফেরেশতা (দেবদূত) এসে তাঁর বুক চিরে তার ভেতর থেকে সমস্ত

কলুষ বের করে দিয়েছিলেন। এছাড়া যীশুর জীবনীতে যেমন গেব্রায়েলের দৈববাণীর কথা শোনা যায় তেমন হজরত মহম্মদের জীবনীতেও জিব্রিলের দৈববাণীর উল্লেখ আছে। জিব্রিল হজরত মহম্মদকে উদ্দেশ্য করে আকাশ থেকে বলেছিলেন—'হে মহম্মদ আল্লাহ এক এবং তুমি আল্লাহর রসুল, আর আমি জিব্রিল।'

ইহুদী পুরোহিতেরা যখন মন্দিরে মন্দিরে ধর্মের নামে নানা প্রকার কুসংস্কার ছড়াচ্ছিলেন, তখন মানবতার পূজারী যীশু তাঁদের মধ্যে মানব ধর্ম অর্থাৎ মানুষকে ভালবাসার ধর্ম ও একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য আবির্ভূত হন। যীশু তাঁর অলৌকিক শক্তি বলে রোগীর রোগমুক্তি, মরা মানুষের দেহে প্রাণসঞ্চার, সমুদ্রের ঝড় থামানো, পাঁচখানা রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে পেট ভরে খাওয়ানো, মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা প্রভৃতি নানা অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেছেন।

বহু লোকের একটা প্রাচীন ধারণা ছিল যে, খুব বেশি পাপ করলে কুষ্ঠ রোগ হয়। তাই একদিন জনৈক কুষ্ঠ রোগী তার মুক্তির জন্য যীশুর কাছে এসে তাঁর স্পর্শ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়। রোগীটির ধারণা যীশুর পবিত্র স্পর্শ পেলেই তাঁর কুৎসিত ব্যাধি থেকে তার মুক্তি ঘটবে। যীশুর একান্ত শিষ্যেরা ওই কুষ্ঠ রোগীকে তাঁর কাছে যেতে বাধা দিলে যীশু নিজে এসে রোগীটির হাত ধরলেন। এতে সঙ্গে সঙ্গে তার রোগমুক্তি ঘটল। তথাপি মানব-প্রেমিক যীশুর প্রেমের মাহাত্ম্য অনেকেই বুঝতে পারেন নি। তাই জনতার আদালতের বিচারে প্রেমের দেবতা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়। কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি ধীরে ধীরে বলেন—"পিতঃ! এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না, এরা কি করছে।" কি অপূর্ব মহত্ত্ব! কি অদ্ভুত ক্ষমা! তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পরে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তিনি কবর থেকে উঠে এসে তাঁর অনুরাগী দুঃখ সন্তপ্ত ভক্তদের দেখা দেন এবং তাদের আশীর্বাদ করে বলেন—"দুঃখ করো না, তোমাদের শান্তি হোক, আমি চললাম।"

মানবপ্রেমিক যীশু মানুষের কল্যাণের জন্য অনেক বাণী রেখে গেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হল, যেমন—"প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের সন্তান; যারা দীন, যারা নম্র, তারাই ধন্য; অন্যকে দয়া কর, ঈশ্বর তোমাকে দয়া করবেন; অন্তর পবিত্র রাখ, ঈশ্বরের স্পর্শ পাবে; তারাই ধন্য, যারা

ধর্মের জন্য দুঃখভোগ করে; পিতামাতাকে ভক্তি কর; সব চেয়ে, বড় পাপ—চুরি করা, মিথ্যে কথা বলা, অন্যকে ঠকানো; কেউ যদি তোমার একগালে চড় মারে, তাকে আর একগাল ফিরিয়ে দিয়ো, কারও ওপর প্রতিশোধ নিয়ো না; কেউ বিপদে পড়ে ধার চাইলে তাকে বিমুখ করো না; শত্রুকেও ভালবাসবে; যারা তোমার নিন্দা করে, তাদেরও তুমি মঙ্গল কামনা করবে, যারা তোমায় ঘৃণা করে, তাদেরও তুমি উপকার করবে; যারা তোমার ওপর অন্যায় অত্যাচার করে তাদের ভালোর জন্যও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে; সূর্য যেমন সব জায়গায় কিরণ দেয়, বৃষ্টিধারা যেমন সবকিছুকেই সিঞ্চিত করে, তুমিও তেমনি ভেদাভেদ না করে সকলকে ভালবাসবে; লোক দেখাবার জন্য ধর্মকর্ম করো না। কাউকে যখন কিছু দিবে গোপনে দিবে, তার জন্য ঢাকঢোল পিটাতে যেয়ো না, তোমার ডান হাত কি করে, তোমার বাঁ হাতও যেন তা জানতে না পারে; যদি সঞ্চয় করতে চাও, তুচ্ছ ধনরত্ন সঞ্চয় করো না, এসব চোরে চুরি করতে পারে, এমন ধনই সঞ্চয় করবে যা ঈশ্বরের চরণে পৌঁছে, কেউ তা কেড়ে নিতে পারে না; অন্যের বিচার না করে নিজের দোষ দেখবে; পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করবে; তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে; বাইরের পূজা দিয়ে নয়, অন্তরের ভক্তি দিয়ে ভগবানকে ভজনা করবে। দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে-অন্ন ভগবানের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয়, সে-বস্ত্র ভগবানের কাছেই যায়; ধনের লোভ করো না; শিশুদের ভালবাসবে। তাদের মতো সরল ও কোমল হলে ভগবানকে লাভ করতে পারবে; প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, বিশ্বাসের জোর বাড়বে, আত্মার কল্যাণ হবে।"

॥ ৭ ॥

তোমার ভয়ে ভীত যত পাপিষ্ঠ,
ওহে জরথুস্ত্র, মহাজ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ।

ইরানে যখন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার আচরণ ছিল অত্যন্ত গর্হিত ও ত্রুটিপূর্ণ, অধিকাংশ লোক মদ্যপান, অসৎ অভ্যাস ও মিথ্যাচরণে মেতে উঠেছিল, ধর্মের নামে নানা প্রকার অধর্মানুষ্ঠানে সমস্ত দেশ ছেয়ে গিয়েছিল এবং গরীবদের ওপর ধনীদের নিপীড়ন চলছিল প্রকটভাবে তখন এক

রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা জরথুস্ত্র (সত্যনিষ্ঠ্য)। তাঁর জন্মের সময় পাপাত্মারা দূরে পলায়ন করে এবং পৃথিবী শস্যশালিনী ও আনন্দময়ী মূর্তি ধারণ করে বলে এক দিব্যকাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি রাজা হতে চাননি এবং ভোগৈশ্বর্যের প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল অত্যন্ত প্রবল। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল, সত্যনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরতা ও সংসার বৈরাগ্য প্রভৃতি সৎগুণ। বহু বছর কঠোর তপস্যার পর তিনি জগৎ পিতা অমুর মজদার কৃপা ও দিব্যজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হন। তিনি সাবাতন নামক পর্বতশিখরে দিব্য জ্যোতির দর্শন লাভ করেন। জরথুস্ত্র পনের বছর বয়সে উপবীত ধারণ করেছিলেন। অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকদের মতো তাঁকে অসংখ্য বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করতে হয়। শত্রুরা তাঁর প্রাণনাশেরও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সত্যমেব জয়তে। শেষ পর্যন্ত তাঁর সত্য ধর্মের নিকট অসত্যাচারী পাপাত্মাদের পরাজয় ঘটে। জরথুস্ত্র সত্য ধর্ম প্রচারে ও লোকের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম ছিল সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য ও সৎকর্ম ভিত্তিক। জরথুস্ত্র তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি বলে বহু লোকের অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন। তাঁর কৃপায় বহু অন্ধজন দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে এবং রুগ্ন ব্যক্তিরা তাদের দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হয়েছে এবং দেশ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। জরথুস্ত্রের চারিত্রিক শুচিতা, সত্যনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরতা দেখে দেশের শুধু সাধারণ লোকই নয়, ইরানের রাজপরিবারও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রাজা তাঁর সত্য ধর্ম প্রচারে সহায়তা করেছেন।

শত্রুর হাতে নিহত হয়েছেন যীশু। নিহত হয়েছেন মজদীয় ধর্মের প্রবর্তক জরথুস্ত্র। তাঁর মৃত্যুকালে এক অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। শত্রু যখন তাঁকে এক মারাত্মক আঘাত করে, তখন জরথুস্ত্রের হাতের জপমালা ঘাতকের দেহ স্পর্শ করলে যে অগ্নির সৃষ্টি হয় তাতেই ওই পাপাত্মা প্রাণ ত্যাগ করে। যদিও এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, ওই পাপাত্মা ঘাতকের এক অতর্কিত মারাত্মক আঘাতের ফলে এই মহামানবের মহাপ্রয়াণ ঘটে। কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগ ও পরহিতব্রত এক পুণ্য আদর্শরূপে ধরাতলে অমর হয়ে আছে।

জরথুস্ত্রের অমর বাণী যে গ্রন্থে লেখা হয়েছে তারই নাম জেন্দ-আবেস্তা। চারিত্রিক শুচিতার তিনটি মূল ভিত্তি অর্থাৎ সৎচিন্তা, সৎবাক্য ও সৎকর্মের ওপর এই গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে মহাত্মা জরথুস্ত্রের

অনেক বাণী লিপিবদ্ধ করা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। যেমন—(১) পরের দুঃখ দূরীকরণ দ্বারাই প্রকৃত সুখ হয় (২) ক্রোধ ও প্রতিহিংসার দ্বারা আত্মার সৌন্দর্য নষ্ট করা উচিত নয় (৩) শত্রুর প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রেও অন্যায় আচরণ করা উচিত নয় (৪) পরদুঃখ দূরকারীই প্রকৃত পক্ষে জগৎ পিতা অসুর মজদার প্রকৃত উপাসক (৫) কখনও আত্মপ্রশংসা করা উচিত নয় (৬) অন্যের নিকট হতে যে ব্যবহার পেলে খুশী হই অন্যের প্রতিও সেরূপ ব্যবহার করা উচিত (৭) সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও বিনষ্ট হন না (৮) যে নিজেকে জয় করতে পারে না সে কিছুই জয় করতে পারে না (৯) স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও প্রতিবেশীদের সুশিক্ষা দান একটি অবশ্যকর্তব্য (১০) ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সকলের প্রতিই সমান ভাবে কর্তব্য পালন করা উচিত। (১১) ঈশ্বর মানুষের সৎবুদ্ধির নিয়ামক। তাঁর কাছে সর্বদা সৎপথে চালিত করার জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর জগৎ পিতা, সকলের স্রষ্টা বা প্রাণদাতা এবং তিনি মহান। এ ধর্মও বিশ্বাস করে যে চন্দ্র, সূর্য ও সমুদ্র জগৎ পিতা অসুর মজদার অর্থাৎ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মহিমা প্রকাশ করে। এদের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা প্রশস্ত। অগ্নি ঈশ্বরের জ্ঞান, জ্যোতি ও পবিত্রতার প্রতীক—এ ধারণা জরথুষ্ট্রীয়ানদের। তাই ঈশ্বর অগ্নির মাধ্যমে উপাস্য। পার্শী সমাজের প্রত্যেককেই আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। এঁদের সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি এক মহাপাপ। পার্শী সমাজে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে এঁরা বিশ্বাসী। কাজেই সৎকর্মের ভাল ফল অসৎ কর্মের মন্দ ফল ভোগ হয় বলে তাঁরা সারা জীবন সৎকর্ম করার পক্ষপাতী। এ বিশ্বাস হিন্দু সমাজেও রয়েছে।

মহাত্মা জরথুস্ত্র একেশ্বরবাদ, চারিত্রিক শুচিতা, সৎচিন্তা, সদ্বাক্য, সৎকর্ম, পরদুঃখকাতরতা, ধনী-দরিদ্রের বিভেদ মোচন, নারীর মর্যাদা রক্ষা প্রভৃতির ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সকলই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য বিশেষ উপাদান রূপে পরবর্তীকালেও অনেক মহামানব একবাক্যে স্বীকার করেছেন। জরথুস্ত্রের ধর্মগ্রন্থকে অনেকেই বিশেষ প্রশংসা করেছেন। এদের মধ্যে কবি হাফেজ ও বহু ইউরোপীয় মনীষী আছেন। শিকাগোর বিখ্যাত ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ এই ধর্মকে মহান জরথুস্ত্রের ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন।

॥ ৮ ॥

দেব-দেবতা সবই অসার,

এক ঈশ্বরই বিদ্যমান।

মানুষে মানুষে নাহি কোনো ভেদ;

সকল মানুষ এক সমান॥

—একথা ঘোষণা করলেন হজরত মহম্মদ যখন আরবে পৌত্তলিকবাদীরা নানা প্রকার দেবদেবী ও ধর্মের নামে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে নানা প্রকার কুসংস্কার ও লুটপাটে মেতে উঠেছিল। একদিন এক পর্বতগুহায় হজরত মহম্মদ এক দৈববাণী শুনলেন—আল্লাহ্ এক, মহম্মদ আল্লাহর রসুল (প্রেরিত পুরুষ)। এরপর তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হল—আত্মসমর্পণ। আল্লাহ্ এক এবং অভিন্ন, সকলের আত্মসমর্পণ করতে হবে আল্লাহর কাছে। তিনি ঘোষণা করলেন আল্লাহ চন্দ্র সূর্যের নিয়ামক। তিনিই দিন রাত সৃষ্টি করছেন। সেই পরম করুণাময় আল্লাহ্ জীব জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের আহার দিচ্ছেন, আবার তাদের মৃত্যু ঘটাচ্ছেন, আবার পুনরায় সৃষ্টি করছেন। যা আর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয় সুতরাং 'এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই'—পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এটা ছিল হজরত মহম্মদের এক চরম আদেশ। ফলে মক্কাবাসীরা প্রথমে হজরত মহম্মদের এরূপ ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। তাঁকে এবং তাঁর অনুচরদের প্রতি নানাভাবে অত্যাচার করেছিল। সাধারণ মানুষ তাদের দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হতে রাজী ছিল না। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হজরত মহম্মদের নতুন ধর্ম নিরাকারের উপাসনা অনেক বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাস থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি। তাঁর নবধর্ম প্রচারের জন্য অত্যাচার যখন চরমে উঠল তখন তিনি একদিন রাতে কয়েকজন অনুচর নিয়ে গোপনে মক্কা থেকে মদিনায় পৌঁছলেন। সেখানকার লোকেরা হজরত মহম্মদের নতুন ধর্ম গ্রহণ করলেন। এরপর হজরত মহম্মদ তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা বলে শত্রুদের নানা যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার আরম্ভ করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মক্কাবাসীরা দলে দলে তাঁর নবধর্ম গ্রহণ করলেন। মহম্মদের হল জয়জয়কার। তাঁর মধ্যে ছিল অসম সাহসিকতা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বোধ, অদম্য বীরত্ব ও নেতৃত্ব দানের বিস্ময়কর ক্ষমতা যার

বলে তিনি বিবদমান বিভিন্ন উপজাতিকে সংঘবদ্ধ করে এক আরব জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন—প্রতি কাজে, বস্তুতে ও দৃশ্যে সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাত আছে। মোটের ওপর আরবীয়েরা যখন ধর্মের নামে নানা প্রকার কুসংস্কার, লুটপাট, মারামারি, খুনোখুনিতে মত্ত হয়ে ওঠে এবং মন্দিরে মন্দিরে চলে নানা প্রকার অনাচার তখন তাদের মধ্যে গণতন্ত্র ও সাম্যবাদমূলক পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন হজরত মহম্মদ। তাই কবি বলেছেন—

"দিগন্ত প্রসারি বেলা আরবের মরু
তুমি সে মরুর বুকে দীর্ঘ ছায়াতরু,
ওগো বিধাতার দূত প্রিয় মানবের
এ মরুতে নামে বন্যা সাম্যের ও প্রেমের।"

একেশ্বরবাদের মহিমা ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রচার করাই ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য। যারা মহম্মদের পবিত্র ধর্মমত মানতে চাইল না তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হজরত মহম্মদ তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে তিনি শত্রুদের যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। হজরত মহম্মদের জীবনই তাঁর বাণী। তিনি খাদিজা বিবিকে বিয়ে করে বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন এবং বারবার যুদ্ধে জয়লাভ করেও প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি বলতেন—জনসাধারণের জন্য সংগৃহীত অর্থ জনসাধারণের স্বার্থেই ব্যয় করা হবে। রাজা বা কর্মচারীদের নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য সে অর্থ ব্যয় করার কোনো অধিকার নেই। তিনি ছিলেন খুব উদার, মিতব্যয়ী, সদালাপী ও একজন মহান আদর্শবাদী পুরুষ। হজরত ছিলেন পরদুঃখকাতর, দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত। পরনিন্দা, পরচর্চা, হিংসা দ্বেষ, কপটতা ও শঠতা প্রভৃতি পছন্দ করতেন না। একদিকে সংসারী আবার অপরদিকে সন্ন্যাসী ও আদর্শ পুরুষ হিসেবে কথায় ও কাজের মধ্যে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি নিজের জীবনকেই তার বাণী হিসেবে লোকের সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। এই মহাত্যাগী মহামানব পুরুষদের শিক্ষার জন্য অনেক উপদেশ রেখে গেছেন। তিনি বলেছেন মানুষের বাঁচার জন্য দরকার একটি ঘর, একখানি বস্ত্র, একটুকরো রুটি ও একটু পানীয় জল। হজরত

নিজের জীবনে ও এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। কারণ এত ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও যেদিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করে যান সেদিন যে তাঁর কিরূপ দুরবস্থা ছিল তা ভাবতে গেলেও মন বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে যায়। কারণ তখন তাঁর একটি কবচ একজন ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিল এবং এমন কি সেই পবিত্র রাতে তাঁর ঘরে বাতি জ্বালাবার এতটুকু তেলও ছিল না। জগতের ইতিহাসে ত্যাগ ও মহত্ত্বের এতবড় নিদর্শন সত্যই বিরল।

হজরত মহম্মদ শুধু ধর্মপ্রবর্তকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও সাম্যবাদী। যে মন্দিরের মধ্যে দেবতার নামে চলে অনাচার, চলে নেশার উদ্দেশ্যে মদ্যপান এবং যে মন্দিরের ভক্তগণের লক্ষ লক্ষ টাকা জমে আর তারই পাশে দেখা যায় হাজার হাজার অনাহারক্লিষ্ট ছিন্ন ও জীর্ণ বসন পরিহিত রোগক্লিষ্ট কঙ্কালসার অগণিত অভুক্ত ভিখারী। সেই মন্দিরে দেবপূজাকে তিনি ভণ্ডামি বলেই মনে করতেন। মানব সেবাই যদি ভগবান সেবা হয় এবং মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করাই যদি ধর্মের উদ্দেশ্য হয় তবে যে মন্দিরের পাশে অগণিত অভুক্ত নরনারী ক্ষুধার জ্বালায় কাতর কণ্ঠে ভিক্ষে মাগে এবং যে সমাজের ধনীরা গরীবদের দান না করে অর্থ সঞ্চয় করে ও আরও অর্থ লাভের জন্য মন্দিরে এসে অর্থ দান করে, পূজা দেয় সে মন্দির ও সে পূজা অর্থহীন এবং সে ধর্মও অধর্ম বই কিছুই নয়। তাই পৌত্তলিক পুরোহিত কুলে জন্মে ও তদানীন্তন ধর্মের নামে ধর্মহীনতা দেখে মর্মাহত হয়ে হজরত মহম্মদ মদ্যপান ও মূর্তি পূজার বিরোধিতা করে অতি অনাড়ম্বর ভাবে একাগ্রচিত্তে ভক্তি ভরে শুধু এক ঈশ্বরের (আল্লাহর) আরাধনা করতে বলেছেন। এবং বিধবারা যাতে অন্য ভোগ্য বস্তুর মতো পুরুষের অবাধ ভোগ্য বস্তুতে পরিণত না হয় এজন্য তিনি প্রথমেই বিধবা খাদিজা বিবিকে বিয়ে করেছিলেন, এবং বড়লোকেরা যাতে গরীবের মতো ক্ষুধার তীব্র জ্বালা অনুভব করতে পারে এজন্য দীর্ঘ একমাস রমজানের উপবাস প্রথা চালু করেন এবং ধনীলোকদের উপার্জনের এক পঞ্চমাংশ গরীবদের মধ্যে বিতরণের জন্য জাকাত প্রথা প্রচলন করেছিলেন। তিনি মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার ভেদাভেদ পছন্দ করতেন না, তাই বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী ইসলাম ধর্ম ধনী গরীব রাজা প্রজা সকলকে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার অধিকার দিয়েছে। হজরত মহম্মদ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং

বলেছিলেন যদি কোনো স্ত্রীলোকও এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয় তবে তাকেও নির্বাচন করা যেতে পারে রাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত। এককথায় তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের বিরোধী ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

হজরত মহম্মদ বলেছেন—মানুষের সেবাই আল্লাহর সেবা। তিনি কারও দোষ না দেখতে এবং সম্পদে বিপদে সদা সত্য কথা বলতে বলেছেন। পিতার আনন্দে খোদার আনন্দ, পিতার অসন্তোষে খোদার অসন্তোষ এবং মাতার পদতলে বেহেশ্‌ত অর্থাৎ স্বর্গ—এ শিক্ষাও ইসলামের। এ সকল বাণীর সঙ্গে পৃথিবীর অপরাপর ধর্মপ্রবর্তকগণের বাণীরও বিশেষ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

॥ ৯ ॥

একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য
আর সবই অনিত্য।

—একথা বলেছেন শঙ্করাচার্য। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের প্রায় বারশ বছর পরে দেশে যখন বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বর বা শূন্যবাদ ও বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানের প্লাবনে বুদ্ধের পবিত্র ধর্ম এবং তার সঙ্গে সনাতন বৈদিক ধর্মবিলুপ্ত হতে বসেছিল ঠিক সেই সময় এক দিব্য ঐশী শক্তি নিয়েই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন শঙ্কর। জন্মের পর থেকেই তাঁর মধ্যে এক অভূতপূর্ব প্রতিভার বিকাশ ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটে। মাত্র দুবছর বয়সে তিনি পুরাণাদি পাঠে আগ্রহশীল হন। নিজের চেষ্টায় বেদ ও উপনিষদের বহু শ্লোক কণ্ঠস্থ করে ফেলেন এবং তিন বছর বয়সে তাঁর চূড়াকরণ হয়। কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি অদ্বৈত বাদ প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর অলৌকিক জ্ঞানবত্তার দ্বারা তিনি অনেককেই শাস্ত্রালোচনায় পরাস্ত করেন। জানা গেছে—শঙ্করের শিষ্য সনন্দনের গুরুভক্তি দেখে অনেকেই তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হলে শঙ্কর তাঁর গুরু-ভক্তির নিষ্ঠা প্রমাণ করে সকলকে মুগ্ধ করেন। কথিত আছে—একদিন কাশীধামে সনন্দন যখন গঙ্গার অপর পারে নৌকোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন একটা বিশেষ প্রয়োজনে শঙ্কর তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে সেই মুহূর্তেই কাল-বিলম্ব না করে ওপারে যেতে বলেন। গুরুর আহ্বানে ভক্ত সনন্দন খড়ম পায়ে গুরুর নাম জপতে জপতে গঙ্গার ওপর দিয়ে হেঁটে মুহূর্তের মধ্যে অপর

পারে পৌছলেন এবং তার প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পদ্মফুল ফুটে উঠল। এ দৃশ্যে উপস্থিত সকলেই সনন্দের গুরুভক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করল। ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, জীবে দয়া, বিষয়ানাসক্তি, শৌচ ও অভিমান বর্জন প্রভৃতিকে শঙ্করাচার্য চিত্তপ্রসাদের কারণস্বরূপ বর্ণনা করেছেন। পূর্বজন্মের পাপের ফলে এ জন্মে যদি কোনো দুঃখ সহ্য করতে হয় তবে তা স্থির চিত্তে সহ্য করতে হবে। এই সহ্য করাকেই তিনি তিতিক্ষা বলেছেন।

তার মতে অর্থলোভ ত্যাগ করতে হবে এবং বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত থেকে নিজের শ্রমলব্ধ অর্থের দ্বারাই নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। শত্রু, মিত্র প্রভৃতিকে সমান চোখে দেখতে হবে। সকল জীবেই এক বিষ্ণু বর্তমান, কাজেই সকলকেই নিজের মতো মনে করে ভেদাভেদ জ্ঞান বর্জন করতে হবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি ত্যাগ করতে হবে এবং সর্বদাই জীবগণের হিত সাধনে ব্রতী হতে হবে। আমিত্ব বর্জন করে নিজেকে ঈশ্বরে অর্পণ করে আত্মজ্ঞান লাভ ও আত্মোপলব্ধি করতে হবে; অন্যথায় গঙ্গাস্নান, ব্রতপালন বা প্রচুর দানধ্যান করলেও শত জন্মেও মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

শঙ্করাচার্য বলেছেন—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত বদ্ধজীব। বেদবিহিত আত্মজ্ঞান ছাড়া সংসার বন্ধন লোপ হয় না; মনের দিক দিয়ে সেই বেশি গরীব যে সর্বদা বিশাল বিষয়াকাঙ্ক্ষায় মগ্ন, বিবেকহীন ব্যক্তিই প্রকৃত মূর্খ এবং পরোপকারী ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে ধন্য; সকলের নিকট বিনয়ভাব প্রশন করাই দিব্যব্রত; এবং নিজের মূর্খতাই অশেষ দুঃখের কারণ; গুরু, দেবতা ও বয়োবৃদ্ধগণই প্রকৃত পূজ্য; ঈশ্বরের প্রীতি বন্ধনই প্রকৃত কর্ম; এবং সর্বদা জীব-গণের হিত সাধন করাই প্রকৃত সত্য।

অপরাপর মহামানবের উপদেশাবলীর সঙ্গে শঙ্করাচার্যের উপদেশাবলীরও বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে এবং এ সকলই মানুষের বিশেষভাবে পালনীয়।

"মহাত্মন্, আপনার আদেশ লঙ্ঘন করছি এজন্য আমার নরকভোগ হোক, কিন্তু আপনার দেওয়া মন্ত্রের দ্বারা সহস্র সহস্র পাপীতাপীর পরমাগতি হোক"—যিনি নিজেকে নরকবাসী করেও এরূপে অপরের মুক্তি কামনা করেছিলেন তিনি হলেন আচার্য রামানুজ। রামানুজের গুরু গোষ্ঠীপূর্ণ দেবাদেশে রামানুজকে মহামন্ত্র দান করে আর কাউকেও সে মন্ত্রদান করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু যিনি নিজের সঙ্গে অপরেরও মুক্তি কামনা করেছেন সেই রামানুজ গুরুর

আদেশ লঙ্ঘন করে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মহামন্ত্র দানে হাজার হাজার হতাশ হৃদয়ে ভক্তির বান ডাকিয়ে দিয়েছিলেন। যাহোক, গুরু গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের অসাধারণ হৃদয়বত্তার পরিচয় পেয়ে নিজের ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। রামানুজের বহু বিরুদ্ধবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তারা তাঁর প্রাণনাশের জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

রামানুজের কাছে কোনো প্রকার জাতিভেদ ছিল না। মানুষকে তিনি মানুষরূপেই দেখতেন। দিল্লীর এক মুসলমান সম্রাটের কন্যা লচিমা সম্পৎকুমারের বিগ্রহকে ভালবাসতেন ও নিয়মিত পূজা করতেন। কিন্তু রামানুজ সম্রাটের কাছ থেকে সেই বিগ্রহ নিয়ে এলে, সম্রাট কন্যা মনের দুঃখে দেহত্যাগের সঙ্কল্প নিয়ে বনে চলে যান এবং বহুদিন ফলমূল খেয়ে বসবাসের পর নিজের ভক্তির আকর্ষণে যাদবাদ্রিতে এসে পৌছেন। তখন রামানুজ লচিমার অসাধারণ ভক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মন্দিরে প্রবেশ করতে দেন। তখন লচিমা তাঁর অবশিষ্ট জীবন সম্পৎকুমারের সেবায় কাটিয়ে শ্রীভগবানে মিলিয়ে যান। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে আজও লচিমার বিগ্রহ পূজা হয়ে থাকে।

রামানুজ বলতেন—জীব মাত্রেই ভগবানের দাস। কাজেই ভগবানে বিশ্বাস হতে বিচ্যুত হলেই সে দুঃখ পাবে। কেউ বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করেও যদি বিষয়াসক্ত হয় তবে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। ভগবৎশরণ গতিই মুক্তির একমাত্র উপায়।

॥ ১০ ॥

এক ঈশ্বর ছাড়া কাউকে মানি না,
জাতিভেদ মানি না।

—একথা বলেছেন গুরু নানক। যখন ধর্মে ধর্মে হানাহানি এবং ধর্মের নামে নানাপ্রকার কুসংস্কার ও মানুষে মানুষে বিভেদ চরম ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখন বিশ্বমানবের সেবক নানক শিখ ধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। তিনি হিন্দু মুসলমানদের পৃথক্‌ভাবে দেখতেন না। তিনি প্রচার করলেন—সকল ধর্মের সার ছিল ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ এবং আচার অনুষ্ঠানাদি সকলই মিথ্যে। অনেক ধর্মান্ধ পণ্ডিত ও মোল্লারা তাঁর মতবাদের বিরোধিতা করলেও পরে তাঁর

সততা, ভগবদ্ভক্তি ও মানবপ্রেমে মুগ্ধ হন। নানক হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত পোশাক পড়তেন। এবং নিজের সহকর্মী হিসেবে মর্দানা নামে এক মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞকে বেছে নিয়ে সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করে একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন। তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থান ছাড়াও সিংহল, তিব্বত, চীন, মক্কা, মদিনা, বোগদাদ, জেরুজালেম, মিশর, দামাস্কাস প্রভৃতি স্থানে সকল জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শুধু নাম ধর্ম প্রচার করেছেন। শেখ সজ্জন নামে এক কুখ্যাত দস্যু নানকের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল এবং তার লুণ্ঠিত সকল অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিল। নানকের মত শ্রীচৈতন্য ও নামকীর্তনের মাধ্যমে দেশে ভক্তির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন এবং জগাই মাধাইয়ের মতো মার্তাল দস্যুরা শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করে হরি নামে মেতে উঠেছিল। নানক এবং শ্রীচৈতন্য উভয়েই জাতিভেদ মানতেন না এবং উভয়েরই হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়েরই শিষ্য ছিল।

জাতিভেদ ত্যাগ করে ভগবানের নাম ও গুণকীর্তন করাই শিখ ধর্মের উপাসনার প্রধান অঙ্গ। নানক মানব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণ ও দরিদ্র ও অধঃপতিতদের সেবাকে তাঁর ধর্মে প্রধান স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রকৃত সাধু হবেন বিনয়ী ও দীন দুঃখীর সেবক। তিনি দেহ মন পবিত্র রেখে সৎ জীবন যাপন ও সৎ পথে চলতে ও সত্যকে আশ্রয় করে একমাত্র ঈশ্বরে অচলা ভক্তি রাখতে সর্বদা তাঁর নাম জপ করতে বলেছেন।

গুরু নানক সর্বদাই হিন্দু মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন। তাঁর ধর্ম ছিল মানবতার ধর্ম। ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি এবং সৎকার্যের উপরই তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ও বিষয়াসক্তি, অহংকার প্রভৃতি ত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরের নাম করতে ও সকল মানুষকে ভালবাসতে বলেছেন। তিনি জাতিভেদ এবং হিন্দু মুসলমানকে বিভেদকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন তাই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সকল জাতি ও হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। তিনি বলতেন আচার-অনুষ্ঠানে ধর্ম হয় না। একমাত্র ভগবানের নাম করলেই আসল ধর্ম হয়।

॥ ১১ ॥

ঈশ্বর নিত্য

আর সব অনিত্য

ভারতের সেই পুরাতন শাশ্বত বাণী, যা ভারত চিরকাল ঘোষণা করে আসছে সেই বাণীই ভারতকে পুনরায় যিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বুদ্ধ ও যীশুর মত তিনিও স্বপ্নাদিষ্ট সন্তান। জানা গেছে—গয়াধামে বিষ্ণুমন্দিরে পূজা দেবার পরেই পিতা ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখলেন বিষ্ণু যেন তাকে বললেন তাঁর পুত্র হয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয় এবং পিতা ক্ষুদিরাম পুত্রের নাম রাখেন গদাধর। ভারত যে মরেনি, তার ধর্ম যে মিথ্যা নয় তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আবির্ভূত হলেন ভারতের এক চরম দুর্দিনে যখন পরাধীনতার গ্লানি ভারতের শুধু রাজনৈতিক জীবনকেই যে অভিশপ্ত করল তা-ই নয়, তার ধর্ম ও কৃষ্টিকেও বিপন্ন করে তুলল। একদল ভারতবাসী ভারতের ধর্ম শিক্ষাদীক্ষাকে তুচ্ছ মনে করে শুধু পাশ্চাত্ত্য ধর্ম, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তা নকল করতে আরম্ভ করল। দেশী শিক্ষার পরিবর্তে দেশে প্রবর্তিত হতে লাগল ইংরেজী শিক্ষা, ফলে একদল যুবক ভারতীয় ধর্ম, বেদ বেদান্ত, দর্শন, ন্যায়, ব্যাকরণ, কালিদাস, ভবভূতির সাহিত্যকে নিকৃষ্ট মনে করে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে লাগলেন। হীনমন্যতায় দেশ ছেয়ে যেতে বসল। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য জাতির সংস্পর্শে এসে ভারতের যে শুধু ক্ষতি হল, একথা স্বীকার করা যায় না। এর ফলে ভারতের বহুদিনের জড়তা ভেঙ্গে ভারত নতুন করে বিশ্ব সমক্ষে নিজেকে তুলে ধরার প্রেরণা লাভ করল এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানভাণ্ডার ও তার কাছে এক নতুন জগতের সন্ধান দিল। ফলে ভারতের মনীষা নতুন প্রাণ-শক্তি ফিরে পেল। ভারতের রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ক্ষেত্র নব নব প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দী ভারত ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ হিসেবেই দেখা দিল। এ হল পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ। দেশে যখন প্রাচ্যের আদর্শ অনাদৃত ও অবমানিত ঠিক এমন সময় ভারতবাসীদের আরও মোহান্ধ ঘোচাবার জন্য আবির্ভূত হলেন যুগাবতার রামকৃষ্ণ। এই সরল ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষটি যে আদর্শ, ত্যাগ, অহিংসা, প্রেম ও ভক্তির

বীজ বপন করে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হৃদয়ের মানব সমাজকে দেখিয়ে গেলেন—ভক্তির দ্বারা একাগ্রচিত্তে কায়মনবাক্যে যে কোন রূপে ভগবানকে ডাকা যাক্ না কেন তিনি তার ভক্তের ডাকে সেইরূপে সারা দেবেনই এবং তাকে দেখা দেবেনই। এর জন্য চাই আত্মত্যাগ, সংযম, সকল ধর্ম ও সকল মানুষকে সমান ভাবে দেখা। এই সরল মানুষটি যে আদর্শ রেখে গেলেন তা শুধু ভারতকে নয় সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করবে। রক্ষা করবে যারা পরম করুণাময় ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান।

অন্তরের একনিষ্ঠ ভক্তি এবং বুদ্ধ ও যীশুর মত তিনিও স্বপ্নাদিষ্ট সন্তান। জানা গেছে—গয়াধামে বিষ্ণুমন্দিরে পূজা দেবার পরেই পিতা ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখলেন বিষ্ণু যেন তাঁকে বললেন তাঁর পুত্র হয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয় এবং পিতা ক্ষুদিরাম পুত্রের নাম রাখেন গদাধর। প্রগাঢ় সংযমের দ্বারা নিরাকার ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে যে সাকার ঈশ্বর (বা আদ্যা-শক্তি) রূপে দেখা সম্ভব তা তিনি প্রমাণ করে দিলেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন সূর্য এত তেজস্বী যে দিনের বেলায় প্রখর কিরণের মধ্যে তার দিকে তাকিয়ে থাকা অসম্ভব কিন্তু একটি পাথরের পাত্রে জল নিয়ে তা দুপুরবেলা খোলা জায়গায় সূর্যের কিরণে রেখে দিলে পাথরের জলে সূর্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তার দিকে কিন্তু প্রাণভরে যতক্ষণ ইচ্ছে তাকিয়ে থাকা যায়। সেইরূপ বিশ্ব-ব্যাপী ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই রামকৃষ্ণ সেই বিশ্বব্যাপ্ত ঈশ্বরকেই একটি পাথরের মূর্তির মধ্যে আদ্যাশক্তিরূপে কল্পনা করে তার উপরই মান স্থির করে প্রগাঢ় সাধনার দ্বারা তার দর্শন করেছিলেন। এবং তিনি বলেছেন—মনের একাগ্রতা ও কঠোর তপস্যার দ্বারা ভক্ত ভগবানকে যে-কোন রূপে দর্শন করতে চাইবেন ভগবান সেই রূপেই দেখা দিবেন। আবার বিশ্বময় ঈশ্বরে কল্পনা করে চোখ বুজেও তাঁর ধ্যানমগ্ন হওয়া যায়। যেমন, তেজস্বী সূর্যের দিকে প্রত্যক্ষভাবে তাকানো না গেলেও চোখ বুজেও মনে মনে তাঁর কল্পনা করে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা সম্ভব।

রামকৃষ্ণ শুধু মায়ের নাম করেই তুষ্ট থাকলেন না, তাঁকে প্রত্যক্ষ করার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন এবং বাহজ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মাদের মতো শুধু মা মা বলে ডাকতে আর কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও মায়ের দর্শন লাভ না হওয়ায় একদিন সত্য সত্যই পশুবলির খড়্গ নিয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন।

তখন ঈশ্বররূপী মা বাহ্যজ্ঞান রহিত সন্তানের সংযম ও মনের প্রগাঢ় ভক্তি ও একাগ্রতায় মুগ্ধ হয়ে সেই পাথরের মূর্তির মধ্যেই ভক্ত যেভাবে দেখলে খুশী হয় সেইভাবেই দেখা দিলেন। আর রামকৃষ্ণও মাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন। এর পর থেকে আত্মভোলা রামকৃষ্ণের মুখে সব সময়ে মা মা বুলি লেগেই থাকত এবং মাকে ছাড়া একমুহূর্তও থাকতে পারতেন না। মাকে জিজ্ঞেস না করে কোন কিছুই করতেন না। এইভাবে মায়ের নামে আত্মোৎসর্গ করে এক আত্মভোলা জীবনযাপন করতে লাগলেন। তাঁকে সংসারী করার জন্য বিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু কোন পরিবর্তন হল না বরং বেড়েই গেল দিনদিন। মায়ের আরাধনায় তিনি প্রায়ই সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। হিন্দুমতের সকল সাধন প্রণালী তিনি তো আয়ত্ত করলেনই, এমন কি অদ্বৈত মতের অত্যন্ত দুঃসাধ্য নির্বিকল্প সমাধি তাও অতি অবিলম্বে লাভ করেন। ভগবান দর্শনের জন্য রামকৃষ্ণের আত্মহত্যার করার চেষ্টার কাহিনী হজরত মহম্মদের ঈশ্বর-দর্শনের জন্য আত্মহত্যার করার চেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কথিত আছে—

হজরত মহম্মদ যখন হেরা পর্বতে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে তিন বার একটা অজ্ঞাত কিছু পাঠ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করায় তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে হজরত শেষ পর্যন্ত তাকে বললেন তিনি কি পড়বেন? তখন সে বললে—

ইকরা বিসাম রাব্বকাল্লামী খালাকা·· পড়ো তোমার পালয়িতার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, পড়ো—আর তোমার পালয়িতা মহাসম্মানিত—যিনি শিখিয়েছেন লেখনীর যোগে, শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।

অবশেষে হজরত মহম্মদ তা পড়ার পর সে চলে গেল। কিন্তু তার কথাগুলো হজরত মহম্মদের হৃদয়ে লেখা হয়ে থাকল। হজরত মহম্মদ একজন ভাবোন্মত্ত কবি, অথবা ভূতে বা জিনে পাওয়া লোককে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন। কাজেই এই অলৌকিক ঘটনা জেনে পাছে কোরেশরা তাঁকে সেরূপ কিছু মনে করে সেজন্য তাঁর মধ্যে আত্মগ্লানি দেখা দিল। তিনি ঠিক করলেন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে নিজেকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করবেন যাতে তিনি শান্তি পেতে পারেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করে যখন তিনি

পাহাড়ের মধ্য পথে গিয়েছেন তখন আকাশ থেকে শুনতে পেলেন—হে মহম্মদ, তুমি এ যুগের পয়গম্বর আর আমি জিব্রিল। তখন হজরত মহম্মদ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—মানুষের রূপ ধরে জিব্রিল (স্বর্গীয় দূত) দিগন্তে দু-পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলছে—হে মহম্মদ, তুমি আল্লাহর রসুল, আর আমি জিব্রিল। (কোরাণ ৮১ : ২৩) নিঃসন্দেহ তিনি তাকে দেখেছিলেন স্পষ্ট আকাশ প্রান্তে। হজরত মহম্মদ ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগলেন। কিন্তু আকাশের যেদিকেই তাকালেন পূর্বের মতো তাকে দেখলেন তাঁর সামনে। তখন তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন এগোলেন না, পিছেও হঠলেন না। তারপর জিব্রিল তাঁর কাছ থেকে চলে গেলে হজরত গৃহে ফিরলেন এবং খাদিজাকে সব বললে তিনি হজরত মহম্মদকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তিনি কিছু দেখেছেন এবং নিশ্চয়ই এই জাতির নবী হবেন।

এর পর খাদিজা তাঁর আত্মীয় সুপণ্ডিত ওবাকা বিন্ নওফলের কাছে গিয়ে হজরত সম্পর্কিত সব ব্যাপার বললেন। ওবাকা বলে উঠলেন—কদ্দুস কদ্দুস (পবিত্র, পবিত্র)। এরপর হজরতের সঙ্গে ওবাকার দেখা হলে তিনি হজরতকে আশ্বস্ত হতে বললেন। তিনি বললেন—তোমার কাছে শ্রেষ্ঠতম নামুস এসেছে, যে এসেছিল মুসার কাছে, ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, অপমানিত করবে, তাড়িয়ে দেবে আর তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তারপর ওবাকা নিজের মাথা হজরতের কাছে এনে তাঁর ললাটে চুম্বন করলেন ও বাড়ী চলে গেলেন। ওবাকার কথায় হজরতের আত্মবিশ্বাস বাড়ল, আর তাঁর দুশ্চিন্তার বোঝা হাল্কা হল।

প্রথম আঘাতগুলো পাবার পরে হজরতের কাছে কিছুদিন কোনো বাণী এল না। এতে তাঁর চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে গেলে। এই অবস্থায় একদিন হঠাৎ তিনি পূর্ববৎ সেই পরিচিত শব্দ শুনতে পেলেন এবং আকাশের দিকে মাথা তুলে দেখলেন, স্বর্গ মর্তের মধ্যস্থলে এক আসনের উপর উপবিষ্ট—হেরার পূর্ব পরিচিত সেই ফেরেশতা। তখনও তাঁর ত্রাস হল এবং তিনি গৃহে এসে পূর্ববৎ কাপড় গায়ে দিয়ে শুয়ে রইলেন। তখন নিম্নলিখিত আয়তগুলি অবতীর্ণ হল :—

"হে পোশাক পরিহিত,
ওঠো, তারপর সতর্ক করো ;

আর তোমার প্রতিপালক তাঁর মহিমা কীর্তন করো,
আর তোমার পোশাক—তা পবিত্র করো,
আর কদর্যতা পরিহার করো,
আর অনুগ্রহ করো না পুনরায় বেশি পাবার জন্য
আর তোমার পালয়িতার উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধরো।"

এই ঘটনার পরই হজরত মহম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

রামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন সকল ধর্মমত না জানলে ধর্মান্ধতা কাটে না। তাই হিন্দুধর্মের সকল শাখা-প্রশাখা আয়ত্ত করে তিনি স্থির করলেন ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মমতগুলিও সাধন করবেন। ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে এক সুফী-দরবেশ এসে উপস্থিত হলে রামকৃষ্ণ তার তত্ত্বাবধানে ইসলামের সাধনে মগ্ন হলেন। এর জন্য তিনি হিন্দুদের পোশাক, আচার-বিচার ও হিন্দুদের মধ্যেকার ধর্মচিন্তা ছেড়ে দিয়ে একজন নিষ্ঠাবান খাঁটি মুসলমানে পরিণত হলেন। তিনি চিত্তের একাগ্রতা ও প্রগাঢ় ভক্তির দ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই ইসলাম সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হলেন। এরপর তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন হৃদয়ের অগাধ ভক্তিবলে। খ্রীষ্ট ধর্মের সাধনাতেও যথা সময়ে সিদ্ধিলাভ করলেন। এইভাবে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন বাইরে নামের অমিল থাকলেও সকল ধর্ম প্রকৃত পক্ষে সেই এক ঈশ্বরের কাছে পৌছানোরই বিভিন্ন পথ মাত্র। এক ঈশ্বরকে লাভ করাই সকল ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া এখানে দেওয়া সকল ধর্ম-প্রবর্তকের বাণীতে ঠিক একই কথা বলা হয়েছে এবং তাঁদের সকলের বাণীর মধ্যে একটা অসাধারণ মিল রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন ধর্ম সাধনায় বিশেষ তাৎপর্য হল—তখন ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান মিশনারীরা প্রচার করছিলেন—তাঁদের নিজেদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং অপর ধর্ম যেমন হিন্দু, ইসলাম প্রভৃতি নিকৃষ্ট। অপর দিকে হিন্দু ধর্মেরও নানা শাখা-প্রশাখা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। সকলেরই একই কথা—স্বর্গে যেতে চাও তোমরা আমাদের ধর্ম অনুসরণ কর নচেৎ তোমাদের অনন্ত নরকবাস। তাদের এসকল যুক্তি ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য রামকৃষ্ণ একজন হিন্দু সাধক হয়ে ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে জনসমক্ষে প্রচার করলেন—সকল ধর্মই শ্রেষ্ঠ। সকল ধর্মই ঈশ্বরে পৌছবার বিভিন্ন পথমাত্র এবং সকল ধর্মেরই

লক্ষ্য এক। কাজেই রুচি বা ইচ্ছানুসারে যার যেমন খুশী সে সেরূপ ধর্মমত বেছে নিয়ে ঈশ্বরারাধনা করতে পারে।

রামকৃষ্ণের কাছে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোন ভেদাভেদ ছিল না এবং তাঁর হৃদয় যে দরিদ্র, অভুক্ত এবং নিপীড়িতদের জন্য কেঁদে উঠত তারও বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া গেছে। উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণ বালককে স্বীয় জননীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষে নিতে হয়। তিনি ভিক্ষে দিলে তবে অপরাপর আত্মীয়-স্বজন ভিক্ষে দিবেন। কিন্তু বালক গদাধরের (রামকৃষ্ণের) বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটল। এবং তা ঘটবেই কারণ যিনি পরবর্তীকালে সকল মানুষকে এবং সকল ধর্মকে সমান চোখে দেখেছেন। তাঁর বাল্যকালে এরূপ মানবিকতার নিদর্শন পাওয়াই স্বাভাবিক। যেমন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য জীবনীতেও পাওয়া যায়—বালক নরেন বিভিন্ন জাতের জন্য পৃথক্ পৃথক্ হুঁকো খেয়ে বলেছেন—কই আমার জাত তো গেল না? যাহোক, বালক গদাধর উপনয়নের সময় ধরে বসলেন তাঁকে প্রথম ভিক্ষা দিবে তাঁর ধাত্রী মা যিনি ছিলেন শূদ্রের তনয়া এবং অছুৎ। রামকৃষ্ণকে অনেক বুঝান হল—শূদ্র তনয়া ভিক্ষে দিলে উপনয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। পরবর্তীকালে সকল মানুষকে যিনি সমান চোখে দেখবেন বাল্যকালেই বা তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? শেষ পর্যন্ত বালকরূপী ভাবী মহামানবের দাবীই সকলকে মেনে নিতে হল।

একবার রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু রামকৃষ্ণকে নিয়ে কিছু দিনের জন্য তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন। পথে দেওঘরে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সেবার দেওঘরে ভীষণ অন্নাভাব দেখা দেওয়ায় বহু গরীব লোক ক্ষুধার জ্বালায় রেল-ষ্টেশনের আশেপাশে ভিক্ষার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঐসকল অভুক্ত লোকের মলিন মুখ দেখে মানবদরদী মহামানবের হৃদয় কেঁদে উঠল। কিসের তীর্থ-ভ্রমণ? তিনি তাদের মধ্যে গিয়ে বসলেন এবং বায়না ধরলেন—মথুরবাবু যদি তাদের পেট পুরে না খাওয়ায় এবং প্রত্যেককে একখানি করে কাপড় না দেয় তবে তিনি তীর্থে যাবেন না। কারণ মানুষের মধ্যেই দেবতা। সেই মানুষরূপী দেবতাই যদি ক্ষিদের জ্বালায় কষ্ট পায় তবে তীর্থ দর্শনে তাঁর কি ফল হবে? তখন মথুরবাবু উপায়ান্তর না দেখে রামকৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ করে তারপর আবার তীর্থক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি শুধু বাণী নয়

নিজের জীবনে কাজের মাধ্যমেই প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মিথ্যে এবং জনসেবাই ভগবান-সেবা আর ধর্মে ধর্মেও কোন প্রভেদ নেই এবং সকল ধর্মই শ্রেষ্ঠ। এরপরও কী জাতিভেদ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানধর্মে ভেদাভেদ, ও দেশে অভুক্ত লোক বা গরীব শ্রেণী থাকা উচিত? হজরত মহম্মদও কোরানের বিভিন্ন সুরায় তাঁর পূর্ববর্তী সকল ধর্ম-অবতার বা প্রেরিত পুরুষদের ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং ধনীদের অর্থের কিছু অংশ জাকাত নামে আদায় করে গরীবদের মধ্যে দান করার কথা বলে গেছেন। সকল মানুষকে সমানভাবে ভালবাসতে বলেছেন বুদ্ধ, বলেছেন যীশু, বলেছেন কনফুসিয়াস ও জরথুস্ত্র প্রমুখ ধর্মপ্রবর্তকগণ—এবং তাঁদের কথা বিস্তারিতভাবে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই ধর্মের যদি সারমর্ম কেউ বুঝে থাকেন তবে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা এবং কোন ধর্মকে নীচু করে দেখা—ধর্মহীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রামকৃষ্ণ স্ত্রী সারদাদেবীকেও মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। যাঁরা ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে ভারতীয় জীবন, ধর্ম ও আদর্শের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা এই মহামানব রামকৃষ্ণের কথা শুনে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি পুনরায় শ্রদ্ধাশীল হলেন। ফলে তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজও রামকৃষ্ণের ধর্মসাধনার কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে পড়তে লাগলেন। কেশবচন্দ্র সেন রামকৃষ্ণের অলৌকিকতত্ত্বের কথা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রবন্ধে প্রচার করতে লাগলেন। শুধু তাই নয় সেই সময়কার দিকপাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ রামকৃষ্ণের বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেতে লাগলেন।

রামকৃষ্ণ যে শুধু লোককে ভালবাসতেন তা-ই নয়, আসল লোক চিনতেও তাঁর অসুবিধে হত না। যুবক নরেন্দ্রনাথ যখন স্কটিস চার্চ কলেজে অধ্যয়নকালে অধ্যাপক হেষ্টিংস সাহেবের মুখে রামকৃষ্ণের গুণাগুণ শুনে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে হাজির হলেন তখন রামকৃষ্ণ ওই প্রতিভাবান যুবককে দেখে বললেন—নরঋষি। এবং লোকশিক্ষার জন্যই নাকি তিনি এসেছেন। রামকৃষ্ণের সে বাণী বিফলে যায়নি। এই নরেন্দ্রনাথই পরবর্তীকালের বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বুঝতে পেরেছিলেন

রামকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানব নন, একজন মহামানব। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মানুষের শিক্ষার জন্য রেখে গেলেন নিজের জীবনে পালিত মৌলিক আদর্শ আর তার সঙ্গে অনেক মূল্যবান উপদেশ যা মানব কল্যাণে যুগ যুগ ধরে বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো কাজ করবে। সেই সকল মূল্যবান উপদেশাবলীর কিছু কিছু এখানে তুলে ধরা হল যা তাঁর পূর্ববর্তী মহামানবদের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন—"ঈশ্বর লাভই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য আর সবই অনিত্য; তিনি সকলের মধ্যেই আছেন, যে একাগ্রতার সঙ্গে ভক্তিভরে ডাকতে পাবে সে ঈশ্বরের দেখা পাবে; ঈশ্বরে পৌঁছবার অনেক উপায় আছে—এক একটি ধর্ম এক একটি উপায়; ভগবানের দর্শন লাভ করতে হলে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি জয় করলে তবে ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয়, তার দর্শন ঘটে; সত্যই পরম ধর্ম; সর্বদা সত্যকে আশ্রয় করতে হবে; সকল জীবের জন্য চাই দয়া, ভালবাসা আর সমদৃষ্টি; মায়া জীবকে বদ্ধ করে রাখে আর দয়া জীবকে চিত্তশুদ্ধি করে বন্ধনমুক্ত হতে সাহায্য করে; দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হলে তবে ভক্ত হওয়া যায়; ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় এবং ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়; ভক্তের কোনো জাতি নেই; তাই ভক্তি থাকলে অস্পৃশ্যজাতিও শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে তবে ভগবানকে চিনতে পারে; এছাড়া আমিত্ব বিসর্জন দিতে হবে; আমিত্ব বাদ দিলে যা পড়ে থাকে তা হল আত্মা অর্থাৎ চৈতন্য। জীব সেবাই ভগবান সেবা। এবং জীব সেবা করতে হলে আমিত্ব ত্যাগ করতে হবে। আমার 'আমিত্ব' দূর হলে তবে ভগবান দেখা দেন। ঝড় উঠলে যেমন কোন্‌টি বটগাছ কোন্‌টি অশ্বত্থ গাছ তা চেনা যায় না সেরূপ আত্ম সূর্য উদয় হলেও জাতিভেদ থাকে না।" রামকৃষ্ণদেব জাতিভেদ ও ধর্মভেদ ত্যাগ করে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান চোখে দেখতে ও সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে বলেছেন।

॥ ১২ ॥

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জ্ঞানালোকে যাঁরা সবচেয়ে বেশি উদ্ভাসিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমা সারদামণি ছিলেন অন্যতমা। তিনি ছিলেন যোগ্য স্বামীর

যোগ্যা সহধর্মিণী। তাঁর চরিত্রের প্রয়োজন ছিল রামকৃষ্ণজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্যই। সারদাদেবীর মধ্যেও ছিল অসাধারণ চরিত্রবল, অভূতপূর্ব আত্মসংযম, অদম্য ঈশ্বরানুরাগ, নিরলস সাধনা ও অকপট মানবপ্রেম। ছোটবেলা হতেই তাঁর মধ্যে জননী সুলভ স্নেহ ও সেবার ভাব ফুটে উঠেছিল। তাই পরবর্তীকালেও তিনি মা হতে পেরেছিলেন অসংখ্য ভক্তজনের এবং মাতৃস্নেহ ঢেলে দিয়েছিলেন অগণিত নরনারীর প্রাণে। তিনি যে এইরূপ হতে পারবেন তার পরিচয় তাঁর বালিকাকালে মিলেছে—বাঁকুড়া জেলায় একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হলে সারদাদেবীর সহৃদয় পরদুঃখকাতর পিতা সংসারের কথা না ভেবেই ঘরে যে সামান্য চাল থাকত তা কড়ায়ের ডাল দিয়ে খিচুড়ী রেঁধে হাঁড়িতে করে রেখে দিতেন। ক্ষুধার্ত লোক যে যেমন আসত তাকে তেমন খেতে দেওয়া হত। ছোট বালিকা সারদা তাদের গরম খিচুঁড়ী খেতে অসুবিধে হত দেখে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করে ঠাণ্ডা করে দিত। পরদুঃখে ছোট বেলায়ই যার দুঃখ হত, বড় হলে তিনি সকলকে মাতৃ-স্নেহে ভালবাসবেনই। সংসারের নীচতা ও ভোগ বিলাস তাঁকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারেনি। যা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তা হল—ভগবৎপ্রেমিক স্বামীর শিক্ষা ও উপদেশামৃত। একদিকে তিনি সতীসাধ্বী স্ত্রী হিসেবে পত্নীর মমতা নিয়ে পরমভক্তি সহকারে দেবতুল্য স্বামীর সেবা করতেন, অপরদিকে পরম ভক্তিপ্রাণা শিষ্যার মতো বিনয়াবনত চিত্তে স্বামীর শিক্ষা ও কথাকে বেদবাক্যের মত শ্রদ্ধা করে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। ধর্মসংস্থাপক স্বামীর স্বভাবে ও আচরণে যে পবিত্র ধর্মভাব ছিল সারদাদেবী তা অনুসরণ করে চলতেন। রামকৃষ্ণের যে বাণী সারদাদেবীর মনে সবচেয়ে বেশী রেখাপাত করেছিল তা হল—চাঁদামামা যেমন সকলেরই মামা, ঈশ্বর তেমন সকলেরই অতি আপনার। যে ঈশ্বরকে মনে প্রাণে ভালবাসে, সেই তাঁকে দেখা পায়। তুমি যদি ঈশ্বরকে ডাক, তুমিও তাঁর দেখা পাবে। আর ঈশ্বরের দেখা পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য—নতুবা মানব জীবন বৃথা।" স্বামীর এই উপদেশামৃত জীবনের একমাত্র পাথেয় করে সংসারের সকল কাজকর্মের মধ্যেও ঈশ্বরকে পাওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে ধরে নিলেন সারদাদেবী, এবং সকলের অলক্ষ্যে ভগবৎ প্রেমে বিভোর স্বামীর নির্দেশিত শিক্ষা ও সাধনায় তন্ময় হয়ে, মানবী-সারদা দেবী-সারদায় রূপান্তরিত হতে লাগলেন। স্বামী, আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তগণের সেবায়

নিজেকে নিরলসভাবে ব্যস্ত রেখে আবার তার মধ্যেই সময় করে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিতভাবে ধ্যান-ধারণা ও নাম জপে প্রতিদিন সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। গভীর ধ্যানে কখনও কখনও এমন ভাবে মগ্ন হয়ে যেতেন যে কোনো প্রকার জাগতিক বা বাহ্যিক জ্ঞান থাকত না। একদিন অমাবস্যার রাত্রিতে সারদাদেবী রামকৃষ্ণের ন্যায় ভগবতীর ভাবে আবিষ্টা হয়ে সমাধিস্থা হলে রামকৃষ্ণ স্বামী-স্ত্রীর সাংসারিক ভাবের পরিবর্তে স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও যে দিব্য, পবিত্র অথচ আনন্দময় সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে তা পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে এক নতুন অকল্পনীয় উজ্জ্বল দিব্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

সারদাদেবীর পতিপ্রেম ও পতিভক্তি মনে করিয়ে দেয়, হজরত পত্নী খাদিজা বিবির কথা। তিনি ছিলেন ধনী, রূপবতী ও গুণবতী। হজরতের সততার কথা শুনে তিনি তাঁকে ব্যবসায় নিয়ে প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। কিন্তু সংসার বিষয়াক্ত না হয়ে হজরত মহম্মদ প্রায়ই পর্বতগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। কারণ সংসার জীবন তাঁর কাছে বেশীদিন ভাল লাগেনি এবং একদিন যখন গভীর রাতে পর্বতগুহায় আকুল ভাবে ঈশ্বর চিন্তায় জাগতিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে ছিলেন তখন তিনি যে দৈববাণী (অর্থাৎ আল্লাহ এক, এবং মোহম্মদ আল্লাহর রসুল) শুনতে পেয়েছিলেন তা তিনি আনন্দে অধীর হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে সর্বপ্রথম খাদিজা বিবিকে শুনিয়েছিলেন। হজরতের প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল বোধ হয় তিনি কবি হয়েছেন অথবা তাঁকে জিনে বা ভুতে পেয়েছে। তখন খাদিজা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—"হে আবুল কাসেম (হজরতের অপর নাম) আল্লাহ আপনাকে কখনও এরূপ করতে পারেন না। কেননা আল্লাহ জানেন আপনার সত্যবাদিতা, অসাধারণ বিশ্বস্ততা, আপনার উত্তম চরিত্র ও আপনার দয়ার কথা। অতএব এ কখনই হতে পারে না প্রিয়তম যে আপনাকে জিনে পেয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই কিছু দেখেছেন। "তখন হজরত মহম্মদ বললেন, হ্যাঁ, তিনি কিছু দেখেছেন। তা শুনে খাদিজা বললেন—আপনি আনন্দিত হোন এবং আশ্বস্ত হোন ; আপনি নিশ্চয়ই এই জাতির নবী হবেন। হজরত যে নব ধর্মজীবনের বাণী লাভ করেছিলেন তাতে প্রথম আস্থাবতী হলেন তাঁর পত্নী হজরত খাদিজা। তিনিই প্রথম আল্লাহতে ও তাঁর রসুলে আর তাঁর বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি কখনও হজরতের বিরুদ্ধাচারণ

অথবা অনাস্থাবতী হয়ে তাঁকে দুঃখিত করেননি বরং যখন হজরত সন্দিগ্ধ হৃদয়ে গৃহে ফিরেছিলেন তখন তিনি হজরতকে আল্লাহর নবীরূপে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং তাঁর বোঝা হালকা করে দিয়েছিলেন এবং লোকদের বিরোধিতা তুচ্ছ করে স্বামীর ধর্ম ও সত্য প্রচারে সাহায্য করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পর শ্রীমা সাময়িকভাবে ভেঙ্গে পড়লেও অবশেষে স্বামীর কথা তাঁর মনে পড়ে গেল—"আমার অসমাপ্ত কাজ তোমায় করতে হবে।" শুধু তা-ই নয় রামকৃষ্ণও দেহাবসানের পর শ্রীমাকে দেখা দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে কর্তব্যে কর্ম সম্পাদনে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। যেমন যীশু মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে এসে প্রিয় শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অভাবে বহু লোক শ্রীমার কাছে এসে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে ধর্মজীবন গঠনের অনুপ্রেরণা ও শক্তি পেয়েছে।

একটি অনাবিল মাতৃস্নেহ নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, দূর-নিকট, বিদ্বান-মূর্খ, পাপী-পুণ্যবান সকলকেই পরিতৃপ্ত রাখতেন এবং তারা সকলেই তাঁকে নিজের মায়ের মত মনে করে শান্তি পেত। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ আরও সকলে শ্রীমাকে জগন্মাতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি রূপে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রণাম করে নিজেদের প্রগাঢ় ভক্তি জানাতেন। এমন কি বাড়ীর পোষা পশু পাখীগুলো পর্যন্ত শ্রীমার অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের স্পর্শ অনুভব করত। যা পৌরাণিক যুগের বনবাসী শকুন্তলার কথা স্মরণ করিয়ে দিত। সত্যই সারদাদেবী ছিলেন মূর্তিবতী ভগবতী। তাই তাঁর মধ্যে ছিল একাধারে অফুরন্ত স্নেহ, করুণা, পরদুঃখকাতরতা ও তার সঙ্গে পবিত্রতা, সেবা, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা যা একজন সাধারণ মানবীর মধ্যে থাকতে পারে বলে কল্পনাও করা যায় না। শ্রীমাকে সকলপ্রকার কাজকর্ম করতে হত এবং সর্বদা তাতে ব্যস্ত থাকতে হত। সংসারের অভাব-অনটন, দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক সকলই তাঁকে অম্লান-বদনে সহ্য করতে দেখা যেত। শুধু তা-ই নয় যাদের নিয়ে তাঁকে চলতে হত তাদের কেউ শান্ত, কেউ দুষ্ট, কেউ বদমেজাজের, কেউ সৎ স্বভাব কেউ বা অসৎ স্বভাবের ছিল। শ্রীমা কিন্তু সকলকেই নারায়ণ জ্ঞানে এবং সন্তান ভাবে দেখতেন, আদর-যত্ন করতেন, কখনো কারও দোষ দেখতেন না। সকলেই বুঝতে পারত শ্রীমা সকলকেই আপনজনের মতো অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। তাঁর অফুরন্ত স্নেহস্পর্শে অনেক কুপথগামী নর-নারীর জীবন সুপথে পরিচালিত হয়েছে, তারা

ধন্য হয়েছে। শ্রীমা ইচ্ছে করলে সংসারের এসকল যন্ত্রণা ঝামেলা এড়িয়ে দূরে তীর্থ ক্ষেত্রে বা দেবালয়ে শান্ত পরিবেশে কেবল সাধু ও ভক্তদের নিয়েই বাকি জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন। কিন্তু মানব সেবাই যাঁর জীবনের ব্রত, তিনি যে তা পারেন না—এটাই সত্য। তিনি যদি এরূপ সেবাধর্মে নিজেকে ব্যস্ত না রাখতেন তবে সংসারের নানা প্রতিকূল অবস্থা যেমন দুঃখ-দৈন্য, হতাশা, রোগ-শোক প্রভৃতি সহ তীব্র কর্মব্যস্ততার মধ্যে বাস করেও কিভাবে মনকে সর্বদা ঈশ্বরমুখী রাখা যায় তা সাধারণ লোক শিখতে পারত না। এছাড়া বিভিন্ন স্বভাবের লোকের মধ্যে বাস করেও কিভাবে নরনারায়ণ জ্ঞানে পরম প্রীতির সঙ্গে সকলকে স্নেহ ও সেবা করা সম্ভব, সাধারণ লোকের সে ধারণা জন্মানো কষ্ট হত যদি শ্রীমা ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কর্মের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে না ধরতেন। তাই শ্রীমার জীবন প্রতিটি ধর্মপিপাসু নরনারীর পক্ষে অনুকরণযোগ্য একটি মহান আদর্শ। তাঁর স্নেহ ছিল অতিশয় গভীর এবং সেবা ছিল বহুমুখী।

শ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে থাকতেন তখন তাঁর অলৌকিক মহিমার কথা শুনে বহুলোক তাঁর কাছে যেতেন। তিনি অতি স্নেহাতুর হৃদয়ে হাসিমুখে বাড়ী বাড়ী ঘুরে তাদের জন্য দুধ সংগ্রহ করে এনেছেন। নিজ হাতে তাদের রেঁধে খাইয়েছেন এবং তাদের উচ্ছিষ্ট পাতা নিজ হাতে পরিষ্কার করেছেন। কোনো জাতি বিচার তাঁর কাছে ছিল না। সকল মানুষকে তিনি নরনারায়ণ হিসেবে দেখেছেন, দেখতে বলেছেন। ওই সকল লোককে তিনি দীক্ষা দিয়েছেন, ধর্ম-কথা শুনিয়েছেন, এবং অমানুষিক দেবী শক্তিবলে তাদের পূর্ব দুষ্কৃতির ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। শুধু এই নয়—সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাতে যখন সমস্ত জগৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়েছে তখন অতিশয় ক্লান্ত ও শ্রান্ত শরীরে একটু ঘুমিয়ে নিয়েই আবার উঠে পড়ে বিছানায় বসেই তন্ময় হয়ে জপ করেছেন সেই সব সন্তানদের জন্য যারা অনিচ্ছায় বা অক্ষমতায় ঈশ্বরের জপ-তপ ও ধ্যান-ধারণা করতে পারে না বা করে না। তিনি আকুল-ভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন—"হে করুণাময় ঠাকুর তুমি আমার ছেলেরা যারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে যাদের সকলের নাম আমার মনে পড়ছে না তাদের সকলেরই ইহকাল পরকাল দেখিও, তাদের মঙ্গল কর।"

রামকৃষ্ণ জগতে কোনো নতুন ধর্মমত প্রচার করেননি। শ্রীমাও অনুরূপ

কোনো ধর্মমত প্রচার করেন নি। তাঁদের শিক্ষা ছিল—"মানুষ যে কোন ধর্ম অনুসরণ করুক না কেন এবং যেখানে খুশী থাকুক না কেন, সে যদি ভক্তি সহকারে একাগ্রচিত্তে ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকে তবে তাঁকে অনুভব করতে সক্ষম হবেই। মানুষের পশু স্বভাবও একদিন দেব স্বভাবে রূপান্তরিত হবেই হবে। এবং এভাবেই জগতের সকল ধর্মপ্রাণ মহামানব ভগবানের সাক্ষাৎ-লাভ করেছেন।"

রামকৃষ্ণের যুগোপযোগী শিক্ষা হল—"শিবজ্ঞানে জীবসেবা"। স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক একই বাণীর প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন—"জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। স্বামীজী বলেছেন—ভারতে মহাশক্তি জাগাতেই শ্রীমা আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীমা নরনারীর শিক্ষার জন্য রেখে গেছেন তাঁর জীবনাদর্শ আর তার সঙ্গে অনেক বাণী যা সত্যই মানবতাকে এক চরম উৎকর্ষের পথ দেখাতে সক্ষম। তাঁর কয়েকটি বাণী এখানে তুলে ধরা হল।

তিনি সংযমী হতে ও মনকে সরল রাখতে এবং মন থেকে সকল প্রকার সংশয় দূর করতে বলেছেন, কারণ সংশয়ী মনের বড় কষ্ট; তা কখনও শান্তি পায় না। মনের কালি না ঘুচলে ঈশ্বর লাভ হয় না। কখনও পরের দোষ না দেখে সর্বদা নিজের দোষ দেখে তা শোধরানো উচিত। সত্যই ধর্ম। যে ধর্মকে আশ্রয় করে, ধর্মই তাকে রক্ষা করে। চিত্তশুদ্ধির জন্য নিয়মিত ধ্যান-ধারণা জপতপ করতে হবে। তাতে সব ইন্দ্রিয় স্থির হয় এবং ভগবানের নামে সব শুদ্ধ হয়। যার মধ্যে ত্যাগধর্ম আছে সে সংসারে অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে মনে শান্তি পেতে পারে। পিতৃগৃহ, পতিগৃহ বা যেখানেই থাকুক না কেন সেবাই নারীর প্রধান কাজ। কন্যারূপে, পত্নীরূপে, মাতৃরূপে সকলরূপে সেবা করাই নারীর পরম ধর্ম।

শ্রীমার অন্তিম বাণী হল—"যদি শান্তি চাও কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শিখবে। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।"

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

—একথা বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি আরও বলেছেন—জীব সেবার চেয়ে আর ধর্ম নাই।

রামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও বিবেকানন্দ এ তিনজন একটি যুগ সৃষ্টি করে গেছেন। এঁদের কাউকে বাদ দিয়ে ওই যুগের কল্পনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সব চেয়ে আশ্চর্য যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যে যুবক নরেন্দ্রনাথ ভগবানের অস্তিত্ব একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ মনে করে রামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই রামকৃষ্ণ কিভাবে ভগবানের অস্তিত্ব প্রকাশ করে দিয়ে যুবক নরেনের মধ্যে ভগবৎশক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটি অভাবনীয় ঘটনা আছে। তা হল—একদিন ঠাকুর ভাবের ঘোরে তার পা দিয়ে নরেন্দ্রনাথের বুক স্পর্শ করলে তাঁর ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তিনি দেখেন আশেপাশের দৃশ্যমান সব কিছু তলিয়ে যাচ্ছে, ক্রমে তাঁর আমিত্বটুকুও তিনি হারিয়ে ফেললেন। ফলে উপায়ন্তর না দেখে আর্তনাদ করে ওঠেন। তখন রামকৃষ্ণদেব হাত দিয়ে তাঁর বুক স্পর্শ করতেই তিনি তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। এবং দেখেন ঠাকুর সহাস্যবদনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এ ঘটনার পর থেকেই এই নররূপী দেবতার প্রতি নরেন্দ্রনাথ প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। রামকৃষ্ণদেবের প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, অকপট সরলতা, শুদ্ধ পবিত্রতা নরেন্দ্রনাথকে মোহিত করে। ঠাকুরও নরেন্দ্রনাথকে, যাকে তিনি 'নরঋষি' বলতেন তাঁর মনমাতানো গান শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন এবং তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ? ঠাকুর উত্তর দিলেন—হ্যাঁ গো যেমন তোমাকে দেখছি তেমন তাঁকেও দেখি। ওই উত্তর নরেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করে দেয়। ঠাকুর আরও বলেন তিনি নরেনকেও ঈশ্বর দেখাতে পারেন। এতে যে যুবক মূর্তি উপাসনা বা শুধু অদ্বৈত চিন্তাকে উপহাস করতেন তিনি বিস্মিত হলেন। এবং শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের প্রস্তাবে তিনি সত্যই সাকার উপাসনা স্বীকার করলেন এবং মা কালীকে মানলেন। ভক্ত একাগ্র চিত্তে ভগবানকে ডাকলে

সে যে মূর্তিতে দেখতে চায় সেই মূর্তিতেই ভগবান দেখা দেন অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরও সাকার হন ভক্তের ডাকে। যেদিন কেবল নিরাকারবাদী যুবক নরেন্দ্রনাথ সাকার ঈশ্বররূপী মা কালীর অস্তিত্ব অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর স্বীকার করলেন সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণের খুব আনন্দ হল। এবং তার সাধনার মৌলিকত্ব প্রমাণিত হল। জাগতিক সম্পদ যে অতি তুচ্ছ তা বুঝতে পেরেই চরম দুর্দিনেও মা-ভাই-বোনদের জন্য জগন্মাতা ভবতারিণীর কাছে টাকাকড়ি ভিক্ষা না করে তিনি চাইলেন অপার্থিব বস্তু, যা তুচ্ছ টাকা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। তিনি মায়ের দর্শন পেয়ে তাঁর কাছে চাইলেন—জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক ও বৈরাগ্য। অবশ্য মায়ের আশীর্বাদে শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের বাড়ীর অভাব অনটনও মিটে গিয়েছিল। যাহোক, নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যব্রত পালন, নিরামিষ ও পরিমিতি আহার এবং ভূমিশয্যায় শয়ন করে কঠোর জীবন-যাপন করতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন—ধ্যান যোগেই দর্শন সম্ভব। তাঁর ধ্যানপ্রবণ মন সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল বহুকাল আগে থেকেই। তিনি ধ্যান ধ্যান খেলতে খেলতে তন্ময় হয়ে বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন ও বিষধর সর্প এলেও তার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ থাকত না—এ ঘটনা একবার তাঁর বাল্য জীবনেই ঘটেছিল।

অপরাপর মহামানব যেমন, বুদ্ধ, মহাবীর বর্ধমান, যীশু, রামকৃষ্ণ প্রমুখের জন্মের আগে তাঁদের পিতামাতা হয় স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছেন না হয় দৈববাণী শুনেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও ঠিক তাই ঘটেছে। পুত্রহীনা ভুবনেশ্বরী দেবী কাশীর বীরেশ্বরের কাছে একটি পুত্র প্রার্থনা করে মানত করেছিলেন। বীরেশ্বর তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিলেন। দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা ও স্নেহশীলা ভুবনেশ্বরী দেবী একদিন স্বপ্ন দেখলেন তাঁর আরাধনায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব পুত্ররূপে তাঁর কোলে আসছেন। তাঁর সে স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। তাই বিবেকানন্দের জন্মের পর বীরেশ্বরের (শিবের) নাম অনুসারে মাতা পুত্রের নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর। সত্যই বীরেশ্বর যে দৈবশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ হল ভাবী স্বামী বিবেকানন্দ।

একবার নৈনিতাল থেকে বদরিকাশ্রমের পথে স্বামিজী এক গছের নীচে গভীর ধ্যানমগ্ন হলে তাঁর সামনে নতুন রূপে পরমতত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। তিনি সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন। এর পর ধ্যানের আসন ছেড়ে একাকী

বের হয়ে পড়েন ভারতের আসল রূপটি দেখবার জন্যে। বিবেকানন্দ পায়ে হেঁটে হিমালয় হতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। রামকৃষ্ণ যেমন ঈশ্বরের নিরাকারত্বে বিশ্বাস করেও আবার সেই নিরাকার ঈশ্বরকেই সাকারে পুজা করার সুন্দর ও অকাট্য যুক্তি তুলে ধরেছেন, তাঁর যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দও অনুরূপ ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার মূর্তির আরাধনার যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্ক একটি সুন্দর ঘটনা আছে—একবার স্বামীজীর সঙ্গে রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। রাজার সঙ্গে গভীর পরিচয় হবার পর তিনি স্বামীজীকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন—স্বামীজী, আমি কিন্তু আপনার মতো পুতুলে বিশ্বাস করি না। ওসব আমার মানতে ইচ্ছে হয় না। তখন দেওয়ালের দিকে তাকাতেই স্বামীজীর দৃষ্টি পড়ে দেওয়ালে টাঙানো মহারাজের একটি ছবির ওপর। তিনি রাজাকে বললেন—আপনি আপনার ওই ছবিটি নামাতে বলুন আমি আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি। রাজার কর্মচারিরা ছবিটি নামালে বিবেকানন্দ তাদের যে কোন একজনকে ওই ছবিটির ওপর থুথু ফেলতে বললেন। তখন তারা বলল—একি কথা বলেন স্বামীজী। মহারাজার ছবিতে থুথু ফেলবে কে? তা ছাডা ওই ছবিকে আমরা মহারাজা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে থাকি।

তখন স্বামীজী বললেন—দেখলেন তো মহারাজ? ওই ছবিটি কিন্তু আপনি নন এবং ওর মধ্যেও আপনি নেই। মোটের ওপর ওটা কিছুই নয়, শুধুমাত্র আপনার ছবি ছাড়া। তবুও কেউ সাহস পেল না ওই ছবিটির ওপর থুথু ফেলে ওটিকে অপমান করতে। কারণ আপনার লোকেরা মনে করে—ওই ছবিটিকে অপমান করার মানে আপনাকেই অপমান করা। আপনার ছবিটি ওদের নজরে পড়লেই ওদের মনে আপনার কথা উদয় হয়। আমারও তেমনি মাটির মূর্তি দেখলেই ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে। তাই আমরা পুতুল পুজো করি না, পুজো করি স্বয়ং ঈশ্বরকে। স্বামীজীর জীবনেও অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। একবার গরমকালে ট্রেনে যেতে যেতে অনাহারে ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ট্রেন থেকে একটি স্টেশনে নেমে পড়েন। খবর নিয়ে জানতে পারেন—সেখানে জলও পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। অথচ তখন তাঁর কাছে একটি পয়সাও ছিল না। ক্লান্ত হয়ে একটু দূরে বসে পড়েন স্বামীজী এবং তাঁরই অনতিদূরে আর একজন লোক যে স্বামীজীর সঙ্গে ট্রেনে

আসছিল সেও বসে পড়ে এবং তার কাপড়ের বাঁধন খুলে বড় বড় লাড্ডু ও পুরী খেতে আরম্ভ করে এবং স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—যাদের পৃথিবীতে কোন কিছুর জন্যেই লোভ নেই এবং নিজের জীবনকে বাঁচাবার চেষ্টা পর্যন্ত করে না তাদের না খেয়ে কষ্ট করতেই হবে। স্বামীজী কোন উত্তর না দিয়ে শুধু শুনলেন। এমন সময় দেখা গেল একজন লোক একটি মাদুর, এক ঘটি জল ও কিছু খাবার নিয়ে দ্রুত তাঁর কাছে এসে হাজির হয়ে বললেন—স্বামীজী এই খাবার খেয়ে নিন। তিনি স্বামীজীর বসবার জন্য মাদুর বিছিয়ে দিলেন। তখন স্বামীজী অবাক হয়ে ওই অপরিচিত লোকটিকে বললেন—আপনি ভুল করছেন। আমি আপনাকে চিনি না এবং কখনো দেখিনি। তখন লোকটি বললেন—না আমি ভুল করিনি। আমি স্বপ্ন দেখেছি রামচন্দ্র আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন—এক স্বামীজী স্টেশনে এসেছেন। তুই তাড়াতাড়ি সেখানে যা এবং সেই ক্ষুধার্ত স্বামীজীকে খাবার দে। তাছাড়া সেই স্বামীজীকেও আমি স্বপ্নে দেখিছি এবং আপনিই সেই স্বামীজী, দয়া করে এ আহার গ্রহণ করুন। এ দৃশ্য দেখে আগের লোকটি লজ্জা পেয়ে স্বামীজীর কাছে ক্ষমা চাইল। সেই সময় স্বামীজী নিজের মোক্ষলাভের কথা না ভেবে কি করলে দরিদ্র ভারতবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটে, কি করলে তাদের অভাব কাটে এই চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন। নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভ্রূক্ষেপ করেননি। তখন ভারতীয়দের প্রকৃত চেহারা দেখার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যিনি অপরের মঙ্গলের কথা ভাবেন, ভগবান তাঁর কথা ভাবেন। স্বামীজীর জীবনে উক্ত ঘটনাটি তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি ভারতবর্ষকে জাগরণ মন্ত্র দিয়েছেন। স্বামীজী ও নেতাজীর নামে জাদুমন্ত্রে উদ্বেল হয়েছিল সমগ্র দেশ। তাঁদের নামের মধ্যেই রয়েছে জাদুমন্ত্র।

ভারতের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণের সময় বিভিন্ন সমাজ, চিন্তাধারা ও ভারতবাসীদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং এরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের পথে ঈশ্বরে নির্ভরশীল স্বামীজী কখনও কখনও রাজা মহারাজার অতিথি হয়েছেন। কখনও দীন-দরিদ্রের কুটীরে স্থান পেয়েছেন কখনও বা গাছের তলায় অনাহার অনিদ্রায় রাত কাটিয়েছেন। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, হিন্দু-মুসলমান সকলেই স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে এক পরম শান্তি লাভ করে। আশায় তাদের বুক ভরে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন—অর্থবান, উচ্চবর্ণ ও শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালের নির্যাতনে ও নিষ্পেষণে দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এক চরম সীমায় উপস্থিত হয়েছে। তারা দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে জর্জরিত। তাই ওই শ্রেণীর লোকের অপরিসীম দুঃখে পরদুঃখকাতর স্বামীজীর হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল। তিনি ওই সকল অধঃপাতিত দরিদ্র ভারতবাসীর সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারলেন তারা তাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে এবং তারা বিশ্বাস করতে পারে না যে তারাও মানুষ, তাদেরও ভালভাবে বাঁচবার পূর্ণ অধিকার আছে।

স্বামীজী বুঝতে পারলেন পাশ্চাত্ত্য অনুকরণে ব্যস্ত এবং সর্বদা বিলাসব্যসনে লিপ্ত এক শ্রেণীর ধনবান ব্যক্তি বা রাজা মহারাজার দ্বারা ভারতের কোটি কোটি লোককে তাদের হীন ও পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এর সমাধানকল্পে কন্যাকুমারীর মন্দিরের অদূরে একটি প্রস্তরখণ্ডে আবার ধ্যানমগ্ন হয়ে সমস্যা জর্জরিত ভারতের পুনরুদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করেন। তিনি বুঝতে পারেন হতাশায় পরিপূর্ণ পতিত দরিদ্র ভারতবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। এবং ভারতবর্ষে মানব সেবা ও পতিত উদ্ধারের মধ্য দিয়ে জন সেবা ও সত্যধর্মের এবং তার মধ্য দিয়ে ভারতের চিরন্তন সাধনার বস্তু আধ্যাত্মিকতাকে পুনরায় জাগরিত করতে হবে। মায়ের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল স্বামীজী গেরুয়া পোশাক পরে মাথায় পাগড়ী দিয়ে সামান্য অর্থ নিয়ে আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর অসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে ধর্মমহাসভায় যোগদানের সামান্য সুযোগ করে দিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত। এ ছাড়াও হয়েছে বিরাট জনসমাবেশ। মাত্র ত্রিশ বছর বয়স্ক ভারতের যুবক সন্ন্যাসী মঞ্চে উঠে প্রথমেই আমেরিকার বোন ও ভাইয়েরা বলে সম্বোধন করায় উপস্থিত শ্রোতাগণ বিস্মিত ও সম্মোহিত হয়ে গিয়ে তাঁকে আন্তরিকভাবে সম্বোধন জানান। সেখানে তিনি ভারতীয় ঋষিগণের তপস্যালব্ধ ধর্মসমন্বয়ের শাশ্বত বাণী উল্লেখ করেন এবং সকল ধর্মের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটুক এই আশা প্রকাশ করেন। স্বামীজীর তাঁর এই ক্ষুদ্র অথচ হৃদয়গ্রাহী উদার বিশ্বমানবতাবাদী বাণীর দ্বারা আমেরিকাবাসীর মন জয় করেন। খবরের কাগজে স্বামীজীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছাপা হতে

লাগল। রাস্তাঘাটে স্বামীজীর ছবি টাঙ্গানো হল। চারদিকে স্বামীজীর জয়জয়কার, ধনীর গৃহে অতিথি হয়ে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভারতবাসীর সেই দৈন্য অনাহারক্লিষ্ট চেহারা যা তিনি নিজচক্ষে দেখেছেন তা ভুলতে পারেন না বরং সে চিন্তা তাঁর অন্তরকে ব্যথা দেয়, তাঁদের কথায় হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমেরিকায় বিভিন্ন সহর পরিভ্রমণ করে তিনি সেখানে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রকৃত রূপ পাশ্চাত্যদের কাছে তুলে ধরেন। বেদান্তের গভীর ও উদার ভাবরাশি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সামনে তুলে ধরে তিনি পাশ্চাত্য চিন্তা জগতে এক অলোড়ন সৃষ্টি করেন। উদারভাবাপন্ন জ্ঞানীগুণী অনেক আমেরিকাবাসী স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অপর দিকে কিছু ধর্মান্ধ গোঁড়া খ্রীষ্টান তাঁর জীবন সংশয় করার প্রয়াস চালায়। অনেক বৃটিশ নাগরিকও ধীরে ধীরে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারা গ্রহণ করেন। স্বামীজী আমেরিকার নিউইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন আমেরিকার কাজের দায়িত্ব নেন স্বামী সারদানন্দ আর ইংলণ্ডের কাজের দায়িত্ব নেন স্বামী অভেদানন্দ। শুধু তাই নয়, আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে স্বামীজীর তথা ভারতের ভাবধারায় পুষ্টি সাধনের ও তার সম্প্রসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অনেক সহৃদয় ও উদারভাবাপন্ন আমেরিকা ও ইউরোপবাসী। তাঁদের মধ্যে আমেরিকার ডাঃ জেমস মিস ওয়াল্ডা, মিসেস বুল প্রমুখ কর্মীবৃন্দ এবং ইংলণ্ডে সেভিয়ার দম্পতি ও মিস মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই স্বামীজীর আদর্শ প্রচারে নিজেদের উৎসর্গ করেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতে এসে ভারতকে তথা ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। ভারতকে তিনি নিজের জন্মভূমির মত ভালবাসতেন। তিনি প্রাচ্যপ্রীতিতে ভরপুর ছিলেন। তাই তিনি বলছেন—সমগ্র এশিয়া খণ্ডে প্রত্যেক প্রদেশে একই জীবন স্পন্দিত হচ্ছে। প্রাচীন মানব সভ্যতার প্রসূতি, এশিয়া চিরদিন এক এবং অখণ্ড (একথা তিনি লিখেছেন মিঃ ওকাকুরার ‘আইডিয়ালস অফ দি ইষ্ট’ গ্রন্থের ভূমিকায়)। তিনি আরও লিখেছেন —ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার উদ্ভবকেন্দ্র অর্থাৎ ভারতবর্ষই এশিয়ার সভ্যতার জন্মভূমি। ভারতবর্ষ হতেই এই সভ্যতা জন্ম লাভ করে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা থেকে এটা যেমনই পৃথক্ তেমনই উন্নত। ভারতবর্ষে ফিরে ভারতবর্ষের পূর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজী তাঁর

সুচিন্তিত পরিকল্পনা গঠন করলেন। যোগ্য কর্মীদের শিক্ষাদানে সচেষ্ট হলেন এবং সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ কর্মীদের স্থায়ীভাবে জনসেবার কাজে পরিচালনার জন্য তিনি স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ মিশন।

স্বামীজী ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন—ভারতবর্ষের প্রাণধারা যে আধ্যাত্মিকতা তা দীর্ঘকালের অযত্ন ও অবহেলায় নিশ্চিহ্ন না হয়ে গেলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত। তিনি আবিষ্কার করলেন সেই অতিমূল্যবান তত্ত্ব যা নানা ঐতিহাসিক কারণে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। স্বামীজী ঠিক করলেন ভারতের সেবাধর্ম অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে মানব সেবা রূপ আধ্যাত্মিকতাবাদ যা ভারতের অতি প্রাচীন সম্পদ তাকে জাতির সর্বাঙ্গে পৌছে দিতে হবে ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য। প্রকৃত ধর্মপথের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে ভারতের জাতীয় কল্যাণ। তাই স্বামীজী জাতীয় সম্পদ অর্থাৎ সেবাধর্মকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি ঠিক করলেন—ভারতের ঋষি প্রদর্শিত পথে ভারতকে পরিচালিত করতে হলে সর্বপ্রথম যা করণীয় তা হল—ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র নিপীড়িত জনসাধারণের খাওয়া পরার অভাব দূর করতে হবে। এর জন্য দরকার হলে বিদেশীর সাহায্য নিতে হবে। ভারতীয় ঐতিহ্যে গর্বিত স্বামীজী বন্ধুভাবে বিদেশের সাহায্য নেওয়ার কথা বলেছেন ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য। এছাড়া জাতীয় দুর্বলতা দূর করতে হবে। কারণ জগতে যদি কিছু পাপ থাকে দুর্বলতাই সেই পাপ। দেশবাসীদের দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্য ব্রতী যুবকদের উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলেছেন—সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন। অপরের কল্যাণ কামনায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। স্বার্থ ত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ। এই আদর্শের কথা ভুললে চলবে না। তিনি বলেছেন মনে রাখতে হবে—জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। নিঃস্বার্থভাবে জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষের সেবা করলে চিত্তের মালিন্য দূর হয়ে শান্তি আসবে এবং ক্রমে ঐকান্তিক মুক্তি লাভও হবে। স্বামীজীর বেলুড় মঠে বাস করা কালে সেখানে কয়েকজন সাঁওতাল কাজ করতেন। স্বামীজী তাদের বড় প্রিয়জন। এক দিন তাদের তৃপ্তি করে খাইয়ে স্বামীজী বলেছিলেন—নারায়ণ সেবা হল জেনে আনন্দ পেলাম। এমনি জাতির বিচার না করে

তিনি সকল মানুষকে নরনারায়ণ হিসেবেই সেবা করতে বলেছেন। রামকৃষ্ণ ও তাঁর যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ—জনসেবাই ভগবান সেবা—একথা ভুললে চলবে না। এবং এটাকে জাতীয় আদর্শ হিসেবে মেনে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। এঁরা মরেও আজ মহা মৃত্যুঞ্জয়ীরূপে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন।

স্বামীজী ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য রেখে গেছেন তাঁর জীবন ও তার সঙ্গে বহু মূল্যবান উপদেশ। তিনি বলেছেন—নিজের মুক্তির কথা না ভেবে অপরের সাহায্য করতে হবে। মানুষকে পাপী বলা মহাপাতক; চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না; ত্যাগই বড় ধর্ম; অপরের কল্যাণের জন্য স্বার্থশূন্যভাবে কাজ করতে হবে। পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু; জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই; অপরের জন্য এতটুকু করলেও ভিতরে শক্তির উন্মেষ হয়; স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে জাতীর উন্নতি হয় না। এজন্য রামকৃষ্ণ শ্রীগুরু গ্রহণ করে নারীভাব সাধন ও মাতৃভাব প্রচার করেছেন।

স্বামীজী দেখিয়েছেন ভারতের অধঃপতনের কারণ। তার প্রতিকারের জন্য তিনি অনেক মূল্যবান বাণী রেখে গেছেন।

স্বামীজী (ক) সামাজিক অত্যাচার (খ) শিক্ষার অভাব (গ) স্ত্রীজাতির অসম্মান (ঘ) ভালবাসা ও সহানুভূতির অভাব (ঙ) অপরের প্রতি ঈর্ষা, ঘৃণা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা (চ) ধর্মশিক্ষার অনুসরণ না করা, দরিদ্র জনসাধারণকে অবজ্ঞা (ছ) ধর্মশিক্ষার অনুসরণ না করা (জ) বাল্যবিবাহ (ঝ) অপরাজাতি হতে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং অনভিজ্ঞ সমাজ সংস্কার ইত্যাদি অধঃপতনের কারণগুলি দূর করতে বলেছেন। এবং জাতির উন্নতির জন্য—তিনি যা করতে বলেছেন তা হল (১) সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা এবং দরিদ্রসাধারণের উন্নতি সাধন (২) ত্যাগ ও সেবা (৩) পরোপকার স্পৃহা ও সহযোগিতা (৪) শিক্ষা বিস্তার (৫) সংঘবদ্ধ হওয়া (৬) সত্যনিষ্ঠ ও অকপটতা হওয়া (৭) অহংকার, ঈর্ষা ও ভিরুতা এবং শৈথিল্য ত্যাগ (৮) চিন্তা ও কার্যে স্বাধীনতা বজায় রেখে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতিকে সম্মান।

তিনি বলেছেন—ধর্ম-অনুরাগে, অনুষ্ঠানে, হৃদয়ের পবিত্রতা ও অকপটতাই ধর্ম নহে। পরহিতের জন্য জীবনপাত করার কথা বলেছেন স্বামীজী।

॥ ১৪ ॥

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের অধ্যাত্ম জগতে আধুনিক যুগের এক ভাস্বর জ্যোতিষ্ক তিনি বিশ্বজনের মধ্যে কোনো প্রভেদ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি সমগ্র বিশ্বে এক মানবজাতির কল্পনা ও তার মঙ্গলের কথাই ভেবেছেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে স্বামী বিবেকানন্দের মতো তিনিও সকল মানুষকে আধ্যাত্মিকতার পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। যেরূপে স্বামীজীর শিক্ষায় আইরিশ মহিলা মিস মার্গারেট নোবল (ভগ্নী নিবেদিতা) স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা ও মানবপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও বরণীয় তা প্রায় সবই আপন করে নিয়ে অগণিত ভারতবাসীর প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠেছিলেন, অনুরূপভাবে বিদেশিনী হয়েও ফরাসী মহিলা এবং শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যা ও সাধন-সঙ্গিনী শ্রীমা ভারতীয় সংস্কৃতি ও অধ্যাত্ম সাধনাকে শুধু আত্মস্থ করেই নেননি তার প্রেরণার উৎস স্বরূপ ছিলেন। শ্রীমার অধ্যাত্মজীবন নানা দিক দিয়ে অসাধারণত্ব লাভ করেছে এবং তাঁর সাধনার পীঠস্থান পণ্ডিচেরীই তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মসাধনায় অনুপ্রাণিত ও সমার্পিত-প্রাণা এই মহিয়সী মহিলা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাধনমার্গের এক অতি উচ্চস্তরে উঠেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আশ্রম পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার এই সুযোগ্যা অধ্যাত্মপরায়ণা মহিলার ওপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। শ্রীমা যে কি বিস্ময়কর কৃতিত্বের সঙ্গে সেই গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁর মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত পণ্ডিচেরীর আশ্রমই তার এক মহান দৃষ্টান্ত। শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসার বহু আগে থেকেই, বলা চলে তাঁর শৈশবকাল থেকেই তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটেছিল। শ্রীঅরবিন্দের জীবদ্দশায় এবং তাঁর মহাপ্রয়াণের পরেও শ্রীমা অগণিত নরনারীর ধর্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করে শ্রীঅরবিন্দের অনেক অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। যেমন করেছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা স্বামীজীর মৃত্যুর পর ও দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীমা পরম-হংসের তিরোধানের পরে। সকল ধর্ম ও ধর্মবেত্তাদের সারকথা আর একবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক—

॥ ১৫ ॥

হিন্দুধর্মের মতে জীবসেবাই ভগবানের সেবা, খ্রীষ্টধর্মও ঠিক তাই বলেছে—"সকল মানুষকে ভালবাসলে ভগবানকে ভালবাসা হয়।" হজরত মহম্মদ বলেছেন—"মানুষের সেবাই আল্লাহর সেবা।"

মানব সমাজে দাঁড়িয়ে যীশু নিজেকে পরম করুণাময় ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি সকল মানুষকেই ঈশ্বরের সন্তান বলতেন। হিন্দুদের বেদেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে, "পিতা নোহসি অর্থাৎ তিনি আমাদের পিতা।" ঈশ্বর জগতের পিতা এবং সকল মানুষ তাঁর সন্তান, অর্থাৎ বিশ্বভ্রাতা—এ কথা কোরানেও বলা হয়েছে। জরথুস্ত্রের মজদীয় সম্প্রদায়ও একই মতবাদে বিশ্বাসী। "এক ঈশ্বর ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই"—হিন্দু ধর্মের এই আদি তথ্যের সঙ্গে মুসলমান ধর্মের 'আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়' এই তথ্যের মিল আছে। খ্রীষ্টধর্মেও এক ঈশ্বরকেই আরাধনা করা হয়। অথর্ববেদে উল্লেখ আছে—যে ভগবানকে এক বলে মনে করে সে সুখী হয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ মনে করেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এই ধর্মে নর অর্থাৎ মানুষকে নারায়ণ অর্থাৎ দেবতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন—তুমি নিজেকে যেমন ভালবাসবে তোমার প্রতিবেশীদের সেইভাবে ভালবাসবে। হজরত মহম্মদও ঠিক এই কথাই বলেছেন—কেউ নিজেকে যেমন ভালবাসে প্রতিবেশীকেও সেরূপভাবে ভালবাসলে তবে সে খাঁটি মুসলমান বলে পরিচিত হতে পারবে।

জননী জন্মভূমি স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ। পিতাই স্বর্গ এবং পিতাই ধর্ম। পিতাকে তুষ্ট রাখলে সকল দেবতা তুষ্ট থাকেন। তাই পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন। হজরত মহম্মদ বলেছেন—"পিতার আনন্দে খোদার আনন্দ। পিতার অসন্তোষে খোদার অসন্তোষ এবং মাতার পদতলে বেহশ্‌ত (স্বর্গ) অবস্থিত।" অর্থাৎ মাতা স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। যীশু বলেছেন—"পিতা মাতাকে ভক্তি করবে।" কনফুসিয়াস বলেছেন, "পিতা মাতাকে মানিয়া চলাই ধর্ম।"

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, জরথুস্ত্রিয়ান, মুসলমান, কনফুসিয়ান, শিখ প্রভৃতি সকল ধর্মই বলেছে—সত্যের জয় সর্বত্র। কাজেই প্রত্যেক ধর্মই সত্যভ্রষ্ট হতে নিষেধ করেছে। সব ধর্মই প্রতিবেশীদের ভালবাসতে বলেছে, তারা যে কোন ধর্মের লোকই হোক না কেন।

যীশু বলেছেন, "সূর্য যেমন সব জায়গায়ই কিরণ দেয় সেরূপ তুমিও ভেদাভেদ না করে সকলকে সমানভাবে ভালবাসবে।"

কনফুসিয়াস বলেছেন—"অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার তুমি পেতে চাও না, অপরের সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার কখনও করবে না। অর্থাৎ সকলকে নিজের

মতই ভালবাসবে।” লাওসে সত্যের ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন—“যদি কেউ তোমাকে আঘাত করে, তাকেও তুমি ক্ষমা কর, তার সঙ্গেও সদয় ব্যবহার কর।” এই দুজন ধর্মপ্রচারক চীনদেশে ধর্ম প্রচার করেন। জৈন ধর্মের মূলনীতি হল অহিংসা। জৈনরা মনে করেন প্রাণী হত্যা মহাপাপ।

॥ ১৬ ॥

কীট পতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে যে কোন প্রাণী এমন কি গাছপালারও জীবন নাশে বিরত থাকা এই ধর্মের নির্দেশ। সদা সত্য কথা বলা, পরের সম্পত্তিতে লোভ না করা এবং সরল ভাবে বাস করাই এ ধর্মের আদর্শ।

বুদ্ধদেবও প্রেম ও ভালবাসার এবং সর্বজীবে দয়া করার ধর্ম শিখিয়েছেন। অহিংসা, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি এ ধর্মের অঙ্গ। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তাও ধর্মের অনেক মিল আছে। বৌদ্ধ ধর্মের মত তাও ধর্মের প্রধান লক্ষ্য নির্বাণ লাভ।

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকও ধর্মমত নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে বলেছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কথিত আছে, একবার নানক মক্কায় গিয়ে ঈশ্বরের সার্বজনীনতা প্রচার করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন—ভগবানের কাছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কোন মূল্য নেই। তিনি সর্বত্র সকল জীবে বর্তমান। তিনি প্রচার করেছিলেন—ভগবান সবদিকেই আছেন। তাই একদিন রাতে নানক যখন কাবা মসজিদের দিকে পা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন তখন একজন মোল্লা এসে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ঈশ্বরের দিকে পা রেখে ঘুমোচ্ছ কেন? মোল্লাকে নানক যে দিকে আল্লাহ নেই সেই দিকে তাঁর পা ঘুরিয়ে দিতে বলেছিলেন। এতে মোল্লা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। এবং ভাবলেন যে, আল্লাহ সব দিকেই আছেন। হিন্দু ধর্মেও বলে—ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। ঈশ্বর যে এক এবং অদ্বিতীয় এটাও হিন্দু ধর্মের মূল কথা।

॥ ১৭ ॥

কবীরের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শিষ্য ছিলেন। তিনি সর্বদা তাঁদের মিলন কামনা করতেন। কবীর দেহত্যাগ করলে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে

হিন্দু ও মুসলমান ভক্তদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। হিন্দুগণ চাইলেন হিন্দুমতে কবীরের মৃতদেহ দাহ করতে, আর মুসলমানগণ চাইলেন তা কবর দিতে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান ভক্তগণের সেদিনের সেই বিবাদ ঘোচাবার উদ্দেশ্যে ভক্ত-বৎসল গুরু যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তা সত্যই মহান। এই দৃষ্টান্ত হিন্দু মুসলমানগণের মূল্যহীন ভেদবুদ্ধিকে ভুলে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ হিন্দু ও মুসলমান ভক্তেরা গুরুর মরদেহের আবরণ উন্মোচন করে যা দেখলেন, তাতে তাঁরা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। তাঁরা দেখলেন সেখানে মৃতদেহ নেই, তার বদলে পড়ে আছে একগুচ্ছ ফুল। মুসলমান ভক্তেরা নিজেদের সান্ত্বনা দেবার জন্য অর্ধেক ফুল নিয়ে মগহরে কবর দিলেন ; আর বাকী অর্ধেক হিন্দুরা কাশীতে দাহ করলেন। এইভাবে ভক্তবৎসল কবীর উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তদেরই সান্ত্বনা দিলেন।

ওই রকম ঘটনা গুরু নানকের জীবনেও ঘটেছে বলে জানা গেছে। গুরু নানকের হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর শিষ্যই ছিলেন। হিন্দু শিষ্যেরা চাইলেন, নানকের মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাহ করবেন, আর মুসলমান শিষ্যেরা চাইলেন তা কবর দেবেন। তখন নানক বললেন—হিন্দুরা তাঁর মৃতদেহের ডান দিকে এবং মুসলমানেরা বামদিকে কতকগুলো ফুল রেখে দেবেন। পরের দিন সকালে যাঁদের ফুল তাজা থাকবে, তাঁরাই মৃতদেহের ভার গ্রহণ করবেন। যথা সময়ে সঙ্গীত করণের মধ্যে নানক দেহত্যাগ করলেন। তাঁর মৃতদেহ ঢেকে রাখা হল পরের দিনের অপেক্ষায় এবং নানকের আদেশমত ফুল রাখা হল তাঁর দুদিকে কিন্তু পরের দিন আবরণ সরিয়ে দেখা গেল, সেখানে মৃতদেহ নেই, আছে দুস্তবক তাজা ফুল ; এইভাবে ভক্তবৎসল নানক তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভক্তদের সম্প্রদায়গত মূল্যহীন ভেদাভেদ ভুলে এক হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন।

বিশিষ্ট ভক্ত হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবের অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যেও মতভেদ আছে। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল থেকে জানা যায়, ভক্ত হরিহাস আসলে হিন্দুর সন্তান এবং তাঁর পিতার নাম ছিল মনোহর এবং মাতার নাম ছিল উজ্জ্বলা। কিন্তু প্রাচীনতম চৈতন্য রচিতকার মুরারী গুপ্ত তাঁর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃতম্ গ্রন্থে লিখে গেছেন—হরিদাস মুসলমান কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যাহোক, মুসলমান হয়েও কৃষ্ণ নাম করার অপরাধে হরিদাসকে ধর্মান্ধ কাজীর পরামর্শে মুলুকপতির হাতে প্রথমে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করতে হয়। অবশ্য পরে হরিদাসের অলৌকিক কার্যকলাপে মুলুকপতি মুগ্ধ হন এবং তাঁর অপার্থিব মহিমা স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের সুযোগ দিয়ে এক উদার মনোভাবের পরিচয় দেন।

জানা গেছে—একবার ধর্মান্ধ কাজীর পরামর্শে মুলুকপতি হরিদাসকে কৃষ্ণ নাম করার অপরাধে বাইশ বাজারে নির্মমভাবে প্রহার করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রাণ বের হল না এবং তিনি মৃতের মত হয়ে পড়ে রইলেন। তখন মুলুকপতি হরিদাসকে কোন প্রকার অসম্মান না দেখিয়ে তাঁকে ইসলামের রীতি অনুসারে কবর দিতে বললেন, কিন্তু কাজী তাঁর পরলোকের পথ রুদ্ধ করার জন্য তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে বললেন।

হরিদাস প্রথমে যোগবলে অনড় অচল হয়ে রইলেন। অনেক চেষ্টায়ও উপস্থিত মুসলমানগণ তাঁকে তুলতে পারলেন না। অবশেষে তিনি যোগবল সংবরণ করলে মুসলমানগণ তাঁকে কাঁধে করে গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন এবং হরিদাসের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল বলে ধরে নিলেন। হরিদাস কিন্তু মরলেন না। তিনি আবার জীবিত হয়ে তীরে উঠে এসে কৃষ্ণ নাম করতে লাগলেন। মুলুকপতি এ সংবাদ জানতে পেরে তার কাছে এসে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, 'আর কেউ তাঁর কৃষ্ণনামে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না'। হরিদাসের জীবনের এই ঘটনাটি পুরোপুরি সত্য না হলেও এটা যে আংশিক সত্য সে বিষয়ে অনেকেই একমত। এবং হরিদাসের ধর্মীয় মহিমা স্বীকার করে তাকে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দানের মধ্য দিয়ে মুলুকপতি যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

মধ্যযুগে সাধনা মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু হিন্দু হয়েছেন মুসলমান সাধকগণের শিষ্য এবং মুসলমান হয়েছেন হিন্দু সাধকগণের শিষ্য। এই শ্রেণীর সাধকগণের কাছে জাতিভেদ বা ধর্মভেদের কোন স্থান ছিল না। তাঁরা ছিলেন মানবধর্মে বিশ্বাসী। ধর্মীয় কুসংস্কার বা ধর্মান্ধতা তাঁদের ছিল না। তাই তাঁরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবেসেছেন। তাঁদের মানব প্রেমই বর্তমান ভারতের অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গড়ার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

পরবর্তী যুগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল সাধনাতেই বিশ্বাসী হয়ে ছিলেন। জানা গেছে—ঠাকুর সুফী গোবিন্দের নিকট ইসলাম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহর পবিত্র নামের মর্যাদা রেখেছিলেন। তিনি তিন দিন যথা নিয়মে নমাজ পড়েছিলেন এবং মুসলমানের খাদ্য ভোজন করেছিলেন। সকল ধর্মের সার কথা উপলব্ধি করে তিনি যে মহান জ্ঞান লাভ করেন, তা হল—সকল ধর্মই সত্য। তিনি বলেছেন—যেমন সব নদীই সাগরে গিয়ে পড়ে, তেমন সব ধর্মই মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। ধর্মের পথ বহু, মানুষ নিজের পছন্দমত যে কোন পথ ধরেই এগিয়ে যাক না কেন, শেষে সকলে একই ভগবানের কাছে পৌছয়। এই সমন্বয়ের বাণী আমরা গীতায়ও দেখতে পাই। এতে সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এরূপ বিশ্বাস ও আচরণের পরেও কি ধর্মের প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য করে রাখার প্রয়োজন আছে? দক্ষিণেশ্বরের এ মহিমা ভারতীয়রা যেদিন উপলব্ধি করতে পারবে সেদিন ধর্মের প্রাচীর ভেঙ্গে সমতল হয়ে যাবে। ভারতে একজাতি ও এক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে।

॥ ১৮ ॥

হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মই দানশীলতা ও মহত্বের পরিচয় দেয়। এখানে উভয় ধর্মে বর্ণিত দানের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত দুটি উপাখ্যান তুলে ধরা যেতে পারে।

মহাভারতে কর্ণ তাঁর দানশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন বলে তাঁকে বলা হত দাতাকর্ণ। একদিন এক বৃদ্ধ তপস্বী দীর্ঘদিন নিরম্বু তপস্যার পর ক্ষুধার্ত হয়ে কর্ণের কাছে আহার্য প্রার্থনা করলেন। তপস্বী জানালেন যে, তিনি কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণ করে উপবাস ভঙ্গ করবেন। একথা শুনে কর্ণ প্রথমে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন, এবং পরে চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেললেন তা দেখে ক্রুদ্ধ তপস্বী আহার না করেই চলে যেতে উদ্যত হলেন। তখন কর্ণের শিশুপুত্র বৃষকেতু বাবার সঙ্কটের কথা বুঝতে পেরে পিতাকে সাহস দিল। ধার্মিক পিতার যোগ্য পুত্র একটুও বিচলিত না হয়ে বরং তাঁর পবিত্র ধর্ম-কর্মে সহায়ক হতে চাইল। কর্ণ তপস্বীর কাছে তাঁর সাময়িক দুর্বলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন—"আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"। রাজা ও রাণী তাঁদের সত্য রক্ষার্থে পুত্রের মস্তকে

করাত চালাতেই মুনি কর্ণের হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিলেন। এবং স্বয়ং অগ্নিদেবের মূর্তি ধারণ করে বৃষকেতুকে কোলে তুলে নিলেন। তাঁর মাথায় হাত বুলতেই রক্তের রেখা মিলিয়ে গেল। অগ্নিদেব কর্ণকে বললেন—কর্ণ তুমি ধন্য। ধন্য তোমার দানের অপরিসীম ক্ষমতা। আমি তোমাকে যে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম তাতে তুমি উত্তীর্ণ। তোমার দানের ক্ষমতা ও সত্য নিষ্ঠার মহিমায় তুমি দেবতাদেরও হার মানিয়েছ।" এটি হিন্দু ধর্মের ত্যাগের একটি মূল্যবান কাহিনী।

অপরদিকে মুসলমান ধর্মেও হজরত ইব্রাহিমের অসাধারণ দানশীলতার ও ধর্ম-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। হজরত ইব্রাহিম ছিলেন আল্লাহর পরম ভক্ত। এজন্য তাঁকে বলা হত হবিবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহ একবার ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করতে চাইলেন—ইব্রাহিম তাঁকে কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে ভালবাসে। তিনি ইব্রামিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন যে, পৃথিবীতে ইব্রাহিমের কাছে যা সবচেয়ে প্রিয়, তা তাঁর নামে কোরবানি করতে হবে। পৃথিবীতে পুত্রই ইব্রাহিমের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তাই ইব্রাহিম এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। "আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক" এই ভেবে তিনি পুত্র ইসলামকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লেন। মক্কার কাছে মিনা পাহাড়ে পৌঁছে তিনি ভারাক্রান্ত মনে পুত্রকে সব কথা খুলে বললেন। ধার্মিক পিতার যোগ্য পুত্র মোটেই বিচলিত হল না। বরং পিতার মনোবল অক্ষুন্ন রাখবার জন্য সে বলল—বাপজান, তুমি আমার হাত পা বেঁধে উপুড় করে ফেল, যাতে আমি ছটফট করলেও তোমার কাজে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। এছাড়া তোমার চোখ দুটিও বেঁধে রাখ। কারণ হত্যার সময় আমাকে দেখে তোমার মমতা জাগবে তাতে তোমার পবিত্র কর্তব্যে বাধা পড়তে পারে। পুত্রের কথায় পিতা কর্তব্য সম্পাদনে সাহস পেলেন। এবং চোখ বাঁধা অবস্থায় পুত্রের গলায় শাণিত খঞ্জর (ছোরা) বসিয়ে দিলেন। যখন স্নেহের পুত্তলী পুত্রের উষ্ণ রক্তে দুহাত ভেসে গেল, তখন ইব্রাহিম বুঝতে পারলেন, তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে। চোখের বাঁধন খুলে ইব্রাহিম বিস্মিত হলেন। তিনি দেখলেন তাঁর সামনে সদ্য কোরবানি করা একটি দুম্বা ভেড়া ছটফট করছে এবং তার পাশে হাসিমুখে অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর প্রাণাধিক পুত্র ইসলাম। এ দৃশ্য দেখে আনন্দে আত্মহারা ইব্রাহিম চেঁচিয়ে উঠলেন "আল্লাহো আকবর" অর্থাৎ আল্লাহই সবচেয়ে বড়। এই কঠোর

পরীক্ষায় ইব্রাহিমের গভীর ঈশ্বরভক্তির প্রমাণ পাওয়া গেল। ঈশ্বর তাঁকে প্রাণ-ভরে আশীর্বাদ করলেন।

ধর্মপ্রাণ ইব্রাহিমের এই ত্যাগের কাহিনী স্মরণ করে ঈদ-উজ-জোহা বা বকর-ইদ পালন করা হয়। এই কাহিনীটি মুসলমান ধর্মে ত্যাগ ও উৎসর্গের একটি মূল্যবান নিদর্শন।

উপরের দৃষ্টান্ত দুটি থেকে ত্যাগের মাহাত্ম্য ছাড়াও জানা যায় যে, ভগবান সর্বদাই ভক্তকে রক্ষা করেন। এ দৃষ্টান্ত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সবধর্মের সর্ব কালের ঘটনা।

আরেকটি জনশ্রুতিতে জানা গেছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে হুগলী জেলার বিখ্যাত ব্যাণ্ডেল চার্চের পাদ্রী ষ্টা-ক্রুজকে বন্দী অবস্থায় শাস্তি দেবার জন্য মত্ত হস্তীর পায়ের সামনে নিক্ষেপ করা হয়। তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ওই মত্ত হস্তী ষ্টা-ক্রুজকে পদদলিত না করে বরং তাঁকে শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে নিয়ে আদর করতে থাকে। সম্রাট জাহাঙ্গীর এ দৃশ্য দেখে শুধু বিস্মিত হন নি, তিনি তাঁকে সাধুব্যক্তি বলে মুক্তি দেন। এবং ওই চার্চের ব্যয় নির্বাহের জন্য ষ্টা-ক্রুজকে ৭০১ বিঘা জমি দান করেন। হাতির পদতল থেকে রক্ষা পাওয়ার এই দিনটিকে স্মরণ করে আজও প্রতি বৎসর ব্যাণ্ডেলের এই গির্জায় "জেমিং গো ষ্টা-ক্রুজ" নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় ধর্ম নিরপেক্ষতা ও পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবধারা সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং ধর্মকে ব্যক্তিগত অধিকার ও রাষ্ট্রশক্তির বাইরে রাখা। কিন্তু পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা সৃষ্টি হয় ধর্মযাজকগণের সঙ্গে রাজন্যবর্গ এবং রাজনীতিকগণের মতবিরোধের ফলশ্রুতি হিসেবে। এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় ও জাগতিক ভাবধারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মসাধনার মহান অর্থাৎ চার্চের উপর রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে আর জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না যা ধর্মযাজকগণের ক্ষমতার সময় সম্ভবপর হয়েছিল।

"সর্বধর্ম সম্ভব"—এই প্রাচীন হিন্দু মতবাদের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে। সম্রাট অশোক হতে আরম্ভ করে মহামতি আকবর পর্যন্ত অনেকেই সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখার মতবাদে

বিশ্বাসী ছিলেন। এছাড়া অনেক ভারতীয় সাধকও মানবতার পূর্ণ বিকাশের নিমিত্ত সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্ত নিজেদের মতবাদ প্রচার করেছেন। পরাধীন ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দ্বিজাতি-তত্ত্বকে ভারত ঘৃণায় পরিত্যাগ করার প্রয়াস করেছে এবং নানান জটিলতা ও বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ভারত বিভাগের পর খণ্ডিত ভারত তার সেই অখণ্ডিত সময়কার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। ভারতীয় ধর্মের সারকথা হল—সকল ধর্মীয় লোকদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করা এবং তাদের নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের পূর্ণ অধিকার দেওয়া। ভারতীয় সংবিধান জাতি ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমমর্যাদা ও সর্ববিষয়ে সমসুযোগ ভোগের স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় স্থান রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারাকে রক্ষা করার পূর্ণ দায়িত্ব সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ওপর যারা সমস্ত লোকসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ এবং তাদের পরেই বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানগণের উপর যারা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ।

॥ ১৯ ॥

অসট্রিকদের সঙ্গে নেগ্রিটো এবং পরবর্তীকালে দ্রাবিড় ও আর্যদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলেই হিন্দু জাতির সৃষ্টি হয়। মোটের ওপর আর্য ও অনার্য অর্থাৎ নেগ্রিটো, অসট্রিক ও দ্রাবিড়গণ মিলে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব হতে বিহার পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্বের বিস্ময় এবং এক উদার বিশ্বজনীনতা। হিন্দু শব্দটি প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্মীয় সংজ্ঞা নয়। এটা একটি সমন্বয়বাচক শব্দ। বৃহত্তর অর্থে হিন্দু বলতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, আর্যসমাজী, ব্রহ্মসমাজী, আদিবাসী প্রভৃতি সকলকেই বোঝায়। প্রাক-আর্য বা অনার্য, আর্য, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে হিন্দু সংস্কৃতিতে। প্রকৃতপক্ষে পারসিক এবং গ্রীকগণই সিন্ধু শব্দটিকে হিন্দুরূপে আখ্যায়িত করেন এবং পরবর্তীকালে মুসলমান রাজন্যবর্গও ভারতবাসী মাত্রকেই হিন্দু এবং ভারতকে হিন্দুস্থান বলে অভিহিত করেন। অনেকে মনে করেন হিন্দু নামটি প্রকৃতপক্ষে ইরানীদের দেওয়া এবং প্রাচীনকালে সিন্ধু-

তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী সকল জনতাকেই হিন্দু বলা হত এবং পরবর্তী-কালে ভারতবাসী মাত্রেই হিন্দু নামে অভিহিত হয়েছিলেন যার জন্য এখন হিন্দু বলতে বৌদ্ধ, জৈন ও শিখদেরও বোঝায়। কিন্তু ভারতে বসবাসকারী তথাকথিত হিন্দু জনসাধারণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে পারসিক, গ্রীক ও মুসলমান রাজন্যবৃন্দ কর্তৃক ব্যবহৃত হিন্দু সংজ্ঞায় নিজেদের চিহ্নিত না করে ভারতবাসী রূপেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, ভারতবাসী বলতে ভারতের হিন্দু, মুসলমান পার্শী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলকেই বোঝায়। এছাড়া বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, জোরাষ্ট্রীয়ান, ইসলাম প্রভৃতি সকল ধর্মেরই প্রচারক আছেন। কিন্তু হিন্দু নামীয় ধর্মের কোনো প্রচারক নেই। এটা অপৌরুষেয়। ধর্ম বলতে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতিকে বোঝায়।

ভারতে অনার্যগণ বৈদিক ধর্ম ও হোম যজ্ঞাদি এবং ব্রাহ্মণগণের শিক্ষা দীক্ষা অনেকাংশে মেনে নিলেন। পক্ষান্তরে অনার্য ধর্মও মরল না। তাঁদের ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মবিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান আর্যরা গ্রহণ করলেন। এই ভাবে আর্য-অনার্যের মিলনের ফলে সৃষ্টি হল—হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং তাঁদের মিলিত ধর্মবিশ্বাস ও সভ্যতাই যথাক্রমে হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস ও সভ্যতারূপে পরিচিত হল। মোটের ওপর হিন্দুগণ আর্য-অনার্যদের নিয়ে একটি মিশ্রজাতি এবং হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা হল আর্য-অনার্যদের নিয়ে একটি মিশ্র ধর্ম ও সভ্যতা। কাজেই হিন্দুগণ যদি একমাত্র আর্যদের বংশধর বলেই দাবি করেন তবে তারা ভুল করবেন। এছাড়া হিন্দুগণ একটি মিশ্রজাতি বলেই বোধ হয় এঁরা সমন্বয় ধর্মে বিশ্বাসী এবং কোনো একটি বিশেষ মতের উপর জোর দেননি। তাই বুদ্ধদেবের সংসার বৈরাগ্য ও কর্মে নিবৃত্তির উপদেশ ও সকল জীবের প্রতি প্রেম ও করুণা প্রদর্শন, মহাবীরের জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা ও জীবে দয়া, যীশুর পিতৃরূপে ঈশ্বরে প্রেম ও ভ্রাতৃরূপে মানবে দয়া, মহম্মদের ঈশ্বরের সত্তায় একাগ্র বিশ্বাস ও ঈশ্বরে একনিষ্ঠ নির্ভর-শীলতা ও জরথুস্ত্রের ঈশ্বর রূপে সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এসবই হিন্দুদের নিকট গ্রাহ্য। এছাড়া হিন্দুধর্ম আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বা একচ্ছত্রত্বে বিশ্বাসী নয়। তাই স্বভাবজ ধর্ম বা স্বাভাবিক প্রণালীতে সৃষ্ট ধর্ম যা নিজেকে পরমেশ্বরের একমাত্র পথ বা মত বলে অন্য ধর্মের প্রতি অসহন-

শীল নয় তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের ঐক্য আছে। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস, ইতালীয় ধর্ম, প্রাচীন টিওটনিক, কেলটিক ও শ্লাব জাতিসমূহের ধর্মবিশ্বাস, প্রাচীন পারস্যের ধর্ম, চীনের তাও ও কনফুসীয় ধর্ম, জাপানের শিন্তোধর্ম, আফ্রিকা, ওশেয়ানিয়া, কলাম্বাস কর্তৃক আবিষ্কৃত আমেরিকার পূর্বেকার ধর্ম বিশ্বাস প্রভৃতির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিরোধ নেই। হিন্দুধর্মও ভারতে উদ্ভূত স্বভাবজাতধর্ম। এ ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল—সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল ও উদার মনোভাব পোষণ করা। সকল প্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতিই বাস্তব সত্য। এবং বিভিন্ন দেশ কাল ও জাতির পরিপ্রেক্ষিতেই বিভিন্ন অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী। এছাড়া যতক্ষণ না কোনো ধর্ম বা আচার অনুষ্ঠান অপরের ন্যায় সঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ করে ততক্ষণ তাকে বিনষ্ট বা ধ্বংস করার চেষ্টা করা পাপ। যদি কেউ সকল রকম ধর্মের সমন্বয়ের বা সংমিশ্রণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আস্থাশীল হতে না পারে তবে তাকে যে কোনো একটি ধর্মমত ধরে অগ্রসর হতে হবে এবং অপরগুলি নিশ্চিহ্ন না হোক বরং সকলেই নিজ নিজ স্থানে অক্ষুন্ন থাকুক—এরূপ ধারণা হিন্দুকে মানতে হবে। তবেই সে যথার্থ হিন্দু বলে গণ্য হবে অন্যথায় সে হিন্দু ধর্মের বিরোধী বলে গণ্য হবে। হিন্দু ধর্ম এরূপ ঐতিহ্যবাহী হওয়ার দরুনই বোধ হয় হিন্দুধর্মের জন্মস্থান ভারতভূমিতে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধর্মের লোক এসে তাদের স্বীয় ধর্মমত বজায় রেখে ভারতীয় অধিকার ভোগ করতে করতে ভারতবাসীরূপে পরিণত হয়েছে। তাই ভারতীয় পার্শী, মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ আর আজ বিদেশী নন। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখদের মতো তাঁরাও আজ ভারতবাসী।

॥ ২০ ॥

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইসলাম কি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী এবং সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল? ইসলাম কি অপর ধর্মকেও সমান চোখে দেখতে বা শ্রদ্ধা করতে বলেছে? অথবা এর ভ্রাতৃত্ববোধ কি এই যে এতে অমুসলমানদের স্থান নেই? —ইত্যাদি। এসকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কারণ এটা ইসলামের অগ্রগতির সমগ্র ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। ইসলামের আদি শিক্ষা বা আদর্শ বিভিন্ন যুগে বহু মুসলমান শাসক তাঁদের সর্ববিধ কার্যাবলী যা ইসলাম অনুমোদিত হোক বা না হোক তা তাঁদের সমর্থক প্রিয় ধর্মতত্ত্ববিদগণ দ্বারা

বিচার-সহ বা ইসলাম স্বীকৃত বলে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। যার ফলে অনেকে গজনীর মাহমুদের লুণ্ঠন, আলাউদ্দীন খিলজীর রোমাঞ্চকর অভিযান, জাহাঙ্গীরের জীবনের ভোগসুখমুখী উপাখ্যান এবং ঔরঙ্গজেবের নীতিকে ইসলামিক আদর্শের প্রতিফলন বলে স্বীকার করেন।

যাহোক, নিম্নোক্ত ঘটনার দ্বারা ইসলামিক সহনশীল আদর্শের কিছুটা পুনরায় তুলে ধরার প্রয়াস করা হল। যদিও এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে—

"বল, ওহে অবিশ্বাসী—
আমি পূজা করি না তাকে যাকে তুমি পূজা কর,
অথবা তুমি পূজা ক'র না তাকে যাকে আমি পূজা করি,
এবং আমি পূজা করব না তাকে যাকে তুমি পূজা কর;
অথবা তুমি পূজা করবে না তাকে যাকে আমি পূজা করি,
তোমার কাছে তোমার ধর্ম এবং আমার কাছে আমার ধর্ম।"

অপর ধর্মের লোকদের কিরূপ চোখে দেখতে হবে তা পবিত্র কোরানের উক্ত পংক্তিনিচয়ই স্পষ্ট নির্দেশক। পবিত্র কোরাণের সুরার পর সুরায় অপর ধর্মীয়দের প্রতি সহনশীল হতে এবং নিজেদের ধৈর্য ও বিনয়ের সঙ্গে পরিচালিত করার নির্দেশ আছে। হজরত মহম্মদের উপদেশবাণী ও আচরণেও এর প্রতি কঠোর সমর্থন পরিলক্ষিত হয়েছে। এবং প্রথম চারজন খলিফাও এ মত পোষণ করেছেন। বরং ইতিহাসে ইসলামের নামে অনেক রাজন্যবর্গ অসহনশীলতার পরিচয় দিয়ে পরোক্ষভাবে ইসলামের পবিত্র ভাবমূর্তিকে বিকৃত বা অবমাননাই করেছে। এবং ভারতে অনেক মুসলমান এবং অমুসলমান ঘোষণা করেছে—ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে আপোষের সমর্থন করে না। এখানে লিখিত ঘটনা থেকে নিশ্চয়ই তার সমর্থন মিলবে না।

'ইসলাম' শব্দের গূঢ় অর্থই হল ধর্ম যা সালাম অর্থাৎ 'শান্তি' হতে উদ্ভূত। এর পূর্ণ অর্থ হল—ঈশ্বরকে শান্তিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা।

প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তকের কাছে সত্যসম্বলিত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মপ্রবর্তকেরা তাঁদের লোকদের ভাষায় ধর্মপ্রচার করেছেন যাতে তাঁদের মতবাদ সকলের কাছে বোধগম্য হয় (১৪ : ৪)।

মহম্মদ তাঁর অনুসারীদের বলেছেন—কোরান ভগবানের বাণী যা তার

মাধ্যমে দেবদূত জেব্রায়েলের অথবা পবিত্র শক্তি কর্তৃক বিঘোষিত হয়েছে। ইহা মুসলমানগণের লৌকিক ও পারলৌকিক নীতি নির্দেশক। ইহা দয়া, সুবিচার দান, সমতা ও জ্ঞানার্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। হজরত মহম্মদ বলেছেন—তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে চীন, ইরান, ভারত প্রভৃতি দেশে অনেক ধর্মপ্রবর্তক আবির্ভূত হয়েছেন, যা কোনো মুসলমান অস্বীকার করতে পারেন না, সেই মতানুসারে কতিপয় উলেমা ভারতের রাম ও কৃষ্ণকে ধর্মপ্রবর্তক বলে অভিহিত করেছেন। মির্জা আবুল ফজল বলেছেন যে, কোরানের মতে কেবল মোসেস এবং যীশুই নয় ভারতের সকল বৈদিক ঋষি এবং রাম, কৃষ্ণ, মহাবীর, বুদ্ধ এবং পারস্যের জরথুস্ত্র ও চীনের কনফুসিয়াস খাঁটি ইসলাম অনুসারীদের হৃদয়ে সুমান মর্যাদা পেয়ে থাকেন।

কোরানের মতে কাউকেও ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করা উচিত নয়; কারণ এরূপও হতে পারে যে সে তোমার চেয়ে ভাল (৪৯ : ১১) জ্ঞান, যুক্তিও সমগ্র প্রচারের সঙ্গে তর্ক করা চলে (১৬ : ১২৫), কিন্তু কাউকে নিন্দা, মানহানি বা অপমান করা উচিত নয় (৪৯ : ১১)। কোরানে আছে—আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তোমাদের সকলকে একজাতি হিসেবেই সৃষ্টি করতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের যে যে জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন সেই ভাবেই বিচার করতে চান। কাজেই পরস্পরের সঙ্গে ভাল কাজে প্রতিযোগিতা কর (৫ : ৪৮)। প্রত্যেক জাতির জন্য আল্লাহ দূত পাঠিয়েছেন। সুতরাং যখন তাদের দূত আসেন তখন তাদের মধ্যে নিরপেক্ষতা বা ন্যায়-পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করা হয় এবং তাঁরা ভুল পথে পরিচালিত হন না (২ : ৪৮)।

কোরান স্বীকার করে—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; এর ভিন্ন মত সম্পর্কে কোরান কারও সঙ্গে কোনো আপোষে না এলেও তা বিশ্বাসীদের সতর্ক করে দিয়েছে—আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদের কাছে তারা প্রার্থনা করে তাদের কুৎসা রটিও না, পাছে তারাও ভুল করে তাদের অজ্ঞতার জন্য আল্লাহরও কুৎসা রটনা করে। এইভাবে প্রত্যেক জাতির কাছে আমরা তাদের কাজকে ভাল মনে করি (৬ : ১০৯)।

এমনকি অপরকে ইসলামে তলব বা আহ্বান জানাবার জন্য কিরূপভাবে কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোরান ধর্মাবতার হজরতকে উপদেশ দিয়েছেন

যে "বল, যে কোনো ধর্মগ্রন্থই ভগবান পাঠান তাতে আমি বিশ্বাস করি ; আমি ঠিক তোমাদের দুজনের মধ্যে ঠিকভাবে বিচার করার জন্য আদিষ্ট। ঈশ্বর তোমাদের প্রভু এবং আমাদের প্রভু ; আমরা আমাদের কাজ করি তোমরা তোমাদের কাজ কর ; আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নয়। ঈশ্বর আমাদের সকলকেই এক করবেন ; তাঁর কাছে আমরা সকলেই ফিরে যাব (৪২ : ১৩-১৪)।"

হজরতের কাছে বার বার এরূপ আদেশ আসা সত্ত্বেও শেষ সুরায় অমুসলমানদের কাছে আবেদন জানাবার বিষয়টি এত সুস্পষ্ট ছিল যে, এমনকি যারা নিকৃষ্ট স্থলে ভগবানের চিহ্ন বা নাম বিক্রি করে এবং অপরকে ভগবানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তাদের সম্পর্কেও বিশ্বাসীদের বলা হয়েছে— তথাপি তারা যদি ভগবানে বিশ্বাসী হয়, প্রার্থনা করে এবং দান করে তা হলে তারা ধর্মবিশ্বাসে তোমাদের ভাই (৯ : ২)।

হজরত মহম্মদের প্রতি কোরানের শুধু এই আদেশই ছিল না যে ধর্মে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না, কিন্তু তাকে এও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, আমরা তোমাকে সমস্ত জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন ছাড়া অপর কিছুর জন্য পাঠাইনি (২৫ : ১)।

কোরানের উক্ত নির্দেশের পরেও কেউ কি বলপূর্বক ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনকে সমর্থন জানাতে পারেন ? যদি কেউ তা করে থাকেন তবে আল্লাহর বাণীর বিরুদ্ধেই তা করেননি কি ? কাজেই ধর্মান্ধ শাসকগণ এক হাতে কোরান আর অন্য হাতে তরবারি নিয়ে যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন তা নিশ্চয়ই কোরান বিরোধী। ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচারই কোরান-সমর্থিত।

এছাড়া কুফর বা কাফির এবং মুসরিক বা শার্ক যা অমুসলমানদের প্রতি ব্যবহার করা হয় তা কিন্তু ধর্মীয় অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণেই করা হয় যা ও শব্দগুলির অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। অমুসলমানদের প্রতি এরূপ শব্দ ব্যবহারের জন্য ইসলাম ধর্মীয় সমর্থন নেই।

কোরানে কাফির শব্দটি তাদের জন্যই ব্যবহার করা হয় যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে হয় ঢেকে রাখতে অথবা অস্বীকার করতে চায়। এবং যারা অপরকে ঈশ্বরের সমান অথবা তার অংশীদার হিসেবে গণ্য করতে চায় তাদেরকে বলা হয় মুসরিক। এরা ঈশ্বরের এক ও অদ্বিতীয়ত্ব অস্বীকার করে।

কোরানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কতিপয় মুসলমান শাসক যে তরবারির সাহায্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। মহম্মদের কাছে আদি সুরাগুলির একটিতে আছে—যাদের ধর্মগ্রন্থ আছে বা যারা অজ্ঞ তাদের বল—তোমরা কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে? যদি করে তো ভাল না করলে তোমার কর্তব্য হবে কেবল ধর্ম প্রচার করা (৩ : ১৯)।

এছাড়া আর একটি ভুল ধারণাও প্রচলিত আছে যে ইসলাম অপর ধর্মীয় লোকদের ধর্মস্থানের ধ্বংস করাকে সমর্থন করে। ইহা কিন্তু কোরানের শিক্ষা বিরোধী। কার্যতঃ সুরা আলহজ্জাজে এরূপ কার্যাবলীকে নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ যদি একদল লোক দিয়ে অন্য দলকে নিয়ন্ত্রিত না করতেন তবে বৌদ্ধ-স্তূপ, গীর্জা, মসজিদ প্রভৃতি যেখানে ঈশ্বরকে স্মরণ করা হয় সে স্থানগুলি নিশ্চিতরূপে ভেঙ্গে দেওয়া হত (২২ : ৪১)।

প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় খলিফা ওমর যে অপর ধর্মীয় লোকদের ধর্মস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতেন তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেমের পবিত্র নগরী দখলের পর ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের প্রতি তাঁর ব্যবহারের কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খলিফা ওমর মদিনা হতে জেরুজালেমে পৌঁছে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের স্বার্থ রক্ষা করার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং প্যাট্রিয়ার্কের আমন্ত্রণে তিনি পবিত্র শিপালচারের গীর্জা পরিদর্শন করলেন। এটি খ্রীষ্টানগণের কাছে বিশেষ পবিত্র, কারণ এটি যীশুর সমাধিস্থল বলে কথিত। খলিফা যখন গীর্জার চারপাশে প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন নমাজের সময় উপস্থিত হওয়ায় প্যাট্রিয়ার্ক কর্তৃক খলিফাকে গীর্জার মধ্যে নমাজ পড়তে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি গীর্জার বাইরে গিয়ে খোলা জায়গায় নমাজ পড়ে বললেন—আমি যদি গীর্জার মধ্যে নমাজ পড়তাম তাহলে আমার কতিপয় আগ্রহী অনুগামী গীর্জাটিকে মসজিদে পরিণত করতে চাইত।

হজরত মহম্মদ তাঁর আচরণে অমুসলমানদের প্রতি সম্মান ও সহনশীলতার পরিচয় বারবার দিয়েছেন। ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও অমুসলমানদের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রাম করার সময়েও অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করাও তাদের প্রতি সদয় হওয়ার কথা বলেছেন। আল্লাহর পথে যদি কারও বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়, কর, তবে শত্রুতা কর না। ওহে, আল্লাহ আক্রমণকারীকে ভালবাসে না (২ : ১৯০) এবং আরও—কিন্তু যদি তারা তাদের বিরত করে,

ওহে, আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, দয়াবান (২ : ১৯২)। ঐতিহাসিক সংগ্রাম হিজরাতের পর মক্কা থেকে ইয়াত্রিব (মদিনা) পৌছবার পর হজরত ইহুদীদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন তা ছিল নিঃসন্দেহে অমুসলমানদের জন্য এক স্বাধীনতার দাবী সনদের স্বীকৃতি যার বলে ইহুদীদের সম্মিলিত জাতির একটি অংশ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল এবং এর সর্তগুলি ছিল স্পষ্ট এবং নিরপেক্ষ। যেমন—'যে সকল ইহুদী কমনওয়েলথ-এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাদের সর্বপ্রকারে সকল অপমান এবং বিরক্তিকর অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করা হবে। তারা মুসলমানদের সঙ্গে সমান সুযোগ-সুবিধে ভোগ করতে পারবে। ইহুদীদের বিভিন্ন শাখা মুসলমানদের মতো স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। এমন কি ইহুদীদের মক্কেল এবং সগোত্রীয়গণও সমান স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করতে পারবে এবং অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে।

সকল শত্রুর হাত থেকে ইয়াত্রিব (মদিনা) রক্ষার ভার থাকবে সকল ইহুদী ও মুসলমানের উপর এবং মদিনা সকলের পবিত্রস্থান হবে যারা উক্ত দাবী সনদ মেনে নেবে। মুসলমান এবং ইহুদীদের মক্কেল সমগোত্রীয়গণকে সমানভাবে সম্মান দেখানো হবে এবং বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়কারীদের জাতিধর্ম নির্বিশেষে শাস্তি দেওয়া হবে।

হজরত মহম্মদ মদিনার সকল মুসলমান ও ইহুদীদের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল অধিকার প্রদান করেছিলেন এবং অপরাধীদের মুসলমান ও ইহুদী নির্বিশেষে সমান শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এবং মদিনাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার ভার যারা কমনওয়েলথের অংশীদার ছিলেন সেই মুসলমান ও ইহুদী নির্বিশেষে সকলের ওপরেই ন্যস্ত ছিল।

মহম্মদ নজরাণের খ্রীষ্টানদের সমান মর্যাদা দান ও সমান ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি তাদের বিখ্যাত দাবী সনদে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, নজরাণ ও তার আশপাশ অঞ্চলের খ্রীষ্টানগণের জীবন, ধর্ম ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে ও তাদের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং তাদের সুযোগ সুবিধে ভোগেরও কোনো পরিবর্তন করা হবে না। গীর্জা থেকে কোনো বিশপ, স্তূপ থেকে কোনো সন্ন্যাসী এবং কোনো পুরোহিতকে তার পৌরোহিতত্ব থেকে সরানো হবে না এবং তাঁরা এখন হতে তাঁদের বর্তমান

সকল সুযোগ সুবিধে ভোগ করবেন। কোনো মূর্তি বা ক্রুশকে নষ্ট করা হবে না। তারা কাউকে অত্যাচার করতে পারবে না এবং তাদের উপরও কেউ অত্যাচার করতে পারবে না। আগের মতো তারা রক্তের বিনিময়ে প্রতিশোধ নিতে পারবে না এবং সৈন্য রক্ষার নিমিত্ত তাদের উপর কোনো করের বোঝা চাপানো হবে না।

জানা গেছে, যখন একদল প্রতিনিধি হজরত মহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত এসেছিলেন তখন তিনি তাদেরকে কেবল আতিথেয়তাই প্রদর্শন করেননি, তাদেরকে নিজেদের ইচ্ছেমত তাঁর প্রার্থনা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এতে মহম্মদের কতিপয় অনুরাগী প্রতিনিধিদের এরূপ প্রার্থনা করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করলে মহম্মদ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রতিনিধিদের নিজেদের ধর্মানুসারে প্রার্থনা করার সকল সুযোগ দেওয়া হোক।

প্রচলিত প্রথার সকল নির্ভরযোগ্য কেতাবের মধ্যে সাহিহ বোখারির সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য একটি কেতাব থেকে জানা যায়—হজরত মহম্মদ কত অধিক সহনশীল ছিলেন অথবা মহম্মদের সহনশীলতা কত গভীরে যেতে পারে। কথিত আছে—একবার একজন অবিশ্বাসী বেদুইন মুসলমান ও ধর্মপ্রচারকগণের কার্যকলাপে ক্রুদ্ধ হয়ে যে মসজিদে হজরত এবং তাঁর সঙ্গীগণ নমাজ পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন সেখানে ঢুকে মাঝখানে বসে মূত্রত্যাগ করতে আরম্ভ করল, তখন হজরতের সঙ্গীগণ ছুটে গিয়ে তাকে বাধা দিতে গেলে হজরত তাদের থামিয়ে দেন এবং বেদুইনটিকে ইচ্ছেমত মূত্র ত্যাগ করতে দিয়ে পরে এক জারভর্তি জল নিয়ে নিজের হাতে সে জায়গা পরিষ্কার করে তারপর নমাজ পড়তে শুরু করেন। এর পরেও কি কোনো মুসলমানের অপর ধর্মীয় লোকদের প্রতি অসহনশীল হওয়া উচিত?

বোখারি কর্তৃক অনুবেদিত অপর একটি প্রথা অনুসারে জানা যায়—একদিন একজন ইহুদী একটি জনবহুল বাজারে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলেছিল, "সেই ঈশ্বরের তেজ বৃদ্ধি পাক যিনি সকল ধর্মপ্রচারকের ওপরে মোসেসকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" এতে হজরতের একজন সঙ্গী জিজ্ঞেস করলেন, "মহম্মদের উপরেও? ইহুদী উত্তর করল—হ্যাঁ। তখন উক্ত সঙ্গীটি তাকে চপেটাঘাত করলেন। এতে ইহুদীটি হজরত মহম্মদের কাছে তাঁর উক্ত

সঙ্গীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন মহম্মদ সঙ্গীটিকে তিরস্কার করলেন এবং তাঁকে সকলের প্রতি সহনশীল হতে বললেন।

মহম্মদের পরবর্তী সঙ্গী বিশেষ করে প্রথম চারজন খলিফা বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর আদর্শ ও আচরণগুলি পালন করেছেন। আবুবকরের দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা, ওমরের অমুসলমান প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার, সকলের প্রতি ওসমানের সহৃদয়তা প্রদর্শন এবং আলির রাজনৈতিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃত পক্ষে উদারতার জলন্ত দৃষ্টান্ত যা হজরত তাঁর অনুগামীদের প্রদর্শন করতে বলেছিলেন।

আবুবকরের বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ খালিদ-ইবণ-অল-ওয়ালিদ দামাস্কাস দখলের পর সেখানকার অধিবাসীদের জীবন, সম্পত্তি ও গীর্জা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাদের নগরের দেওয়াল ভাঙ্গা হয়নি এবং মুসলমানদের ও তাদের গৃহগুলিতে জোর করে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় খলিফা ওমর জেরুসালেম অধিকারের পর সেখানকার অধিবাসীদের জীবন, সম্পত্তি, গীর্জা, ক্রশ ভূমি ও ধর্ম রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাদের গীর্জা অপবিত্রকরণ বা ধ্বংস করা হয়নি; তাদের নাগরিক মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। জেরুশালেমের কোনো অধিবাসীকে স্বধর্ম পালনের জন্য কোনো প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে তাদেরকে দৈহিক ক্ষতি বা আহত করা হয়নি। এরূপ ঘটনার পরও কেউ যদি মুসলমান ধর্মকে অসহনশীল বলে তবে ভুল করবে।

॥ ২১ ॥

ইসলাম ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে সুফীগণের অবদানও অনস্বীকার্য। মুসলমান ও অমুসলমানগণের মধ্যেকার ব্যবধান দূরীকরণে সুফীগণের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুফীগণের মধ্যে জলালুদ্দীন রুমির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মসনবী কাব্য সারা বিশ্বে পারস্যভাষার কোরানরূপেই বিশেষভাবে সম্মানিত। তিনি সকল ধর্মমতকেই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ইসলাম ধর্মমতে অপর ধর্মীয়দের প্রতি কোনো প্রকার ঘৃণা প্রদর্শন, অত্যাচার এবং প্রতিশোধ নেওয়া অন্যায় বলে বিবেচিত হত।

তিনি প্রায় হতাশ হয়ে গাইতেন—

ওহে মুসলমানগণ! আমি কি করি?
আমি আমার ওপর কোনো ছাপ দিতে পারি না;
আমি পারসিক পুরোহিতও নই, ইহুদীও নই,
অথবা তোমাদের মতো মুসলমানও নই,
আমি কোনো জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক আকর্ষণ অনুভব করি না।
আমি প্রাচ্যেরও নই পাশ্চাত্ত্যেরও নই;
এবং তথাপি তোমরা আমার ধর্ম জানতে চাও
তবে শোনো! আমি একজন ভালবাসার প্রেমিক,
আমার প্রেম সকল ধর্মের মধ্যে বিস্তৃত।

রুমি তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় কাব্যে মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

জনগণকে মেলাবার জন্যই তোমাকে পাঠানো হয়েছে,
তাদেরকে পৃথক করার জন্য তোমাকে পাঠানো হয়নি।

কুসংস্কার সত্যই ধর্মনিরপেক্ষতার পরম শত্রু। যারা কুসংস্কার জয় করতে পারবে তারাই খাঁটি ধর্মীয় সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হবে। ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদী কবি হাফিজ বলেন—

ইহা প্রকৃতপক্ষে কুসংস্কার যা
শেখ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।
পক্ষান্তরে পান্থগৃহে কেবল একটি
পেয়ালা ও একজন পেয়ালা-ধারক আছে।

ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ইহুদী, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মীয় লোকেরাই তাদের নিজ নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন যেমন মুসলমানগণ মনে করেন। নিজের ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত নিষ্ঠাবশতঃও অনেকে এরূপ করেন। এমনকি মহাত্মা গান্ধী সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেও এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার বেদিতে নিজের জীবনপাত করা সত্ত্বেও বলেছিলেন—"হিন্দু ধর্মকে আমি আমার মায়ের মতো ভালবাসি।" তিনি বলেছিলেন, কোরান ও বাইবেলের সঙ্গে বিশ্বের অপরাপর ধর্মগ্রন্থের জন্য আমার সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা থাকলেও কৃষ্ণের গীতা ও তুলসীদাসের রামায়ণের মতো আর কিছুই আমাকে

মুগ্ধ করতে পারেনি। গান্ধীজীর এ উক্তির দ্বারা অবশ্য এরূপ বোঝায় না যে তিনি অপর ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন না।

বিশ্বাসীদের প্রতি কোরানের নির্দেশ—কাউকে উপহাস বা ঠাট্টা কর না, কারণ এরূপ হতে পারে যে অপর লোক তোমার চেয়ে ভাল, প্রত্যেক জাতির জন্যই ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হয়েছেন এবং প্রত্যেকের কাছেই প্রকৃত সত্য সম্বলিত ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মপ্রবর্তকগণ তাঁদের নিজ নিজ দেশের লোকদের ভাষায় ধর্মপ্রচার করে ধর্মের বাণী তাদের কাছে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আল্লামা ইকবাল যাঁর ইসলাম ভক্তি অদ্বিতীয় ছিল বলে কথিত আছে, তিনি ঘোষণা করেছেন—যে সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ক্ষতি করার ইচ্ছায় উদ্দীপ্ত হয়, সেই সম্প্রদায় নীচ ও ঘৃণ্য। আমি অপর সম্প্রদায়গুলির আচরণ, আইন, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বাপেক্ষা সম্মান পোষণ করি। মৌলানা হোসেন আহমেদ মাদানি বলেছেন—কোনো জাতি গঠনের বিষয়ে ধর্ম একটি আবশ্যকীয় উপাদান নয়। এ যুক্তি তিনি কোরানে বর্ণিত হজরত মহম্মদ কর্তৃক ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণদের নিয়ে মদিনায় এক মিশ্রজাতি গঠনের দৃষ্টান্ত থেকে তুলে ধরেন। এবং বলেন—মুসলমান এবং অমুসলমানগণ নিজ নিজ ধর্ম পালন করেও এক জাতি হিসেবে গণ্য হতে পারতেন। পরবর্তীকালে কতিপয় ধর্মান্ধ রাজন্যবর্গের আচরণে ইসলামের প্রাথমিক সহনশীলতা ও উদার বিশ্ব-মানবতাবোধ অনেকটা ব্যাহত হয়েছিল।

॥ ছয় ॥

বৈদিক যুগে জাতিভেদের কঠোরতা ছিল না। তখন এক শ্রেণীর লোক অন্য যে কোনো শ্রেণীর লোকের কাজ করে সেই শ্রেণীভুক্ত হতে পারতেন। একজন ক্ষত্রিয় ইচ্ছে করলে যাগযজ্ঞ ও ধ্যান ধারণা করে ব্রাহ্মণ হতে পারতেন। যেমন—বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়েও সাধনা বলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। মোটের ওপর ওই সময় জাতিভেদের কঠোরতা ছিল না। বরং তখন সমাজে এ বিষয়ে একটা সাম্যের ভাবই বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের বৈদিক ধর্ম যখন আচার সর্বস্ব হয়ে পড়ল তখন সমাজ দেহ হল অসাম্য, সংকীর্ণতা ও অস্পৃশ্যতায় পরিপূর্ণ। সেই সময়ে সাম্যের বাণী ও ভেদাভেদহীন মনোভাব নিয়ে আবির্ভূত হলেন ক্ষত্রিয় রাজকুমার গৌতম বুদ্ধ। তিনি বেদকে অস্বীকার না করে, বেদের অর্থহীন ও নানাবিধ আচার ব্যবহারকে অস্বীকার করে স্থাপন করলেন অহিংস-মানবধর্ম। তিনি আরণ্যক উপনিষদের অমৃতবাণী জাতি ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করলেন। কালক্রমে ভালবাসার মাধ্যমে মানুষের মন জয়ের সংকল্প নিয়ে আবির্ভূত হলেন মহামতি অশোক। তাঁর সময় বৌদ্ধধর্মের চরম বিকাশ ঘটল। ফলে একটি আঞ্চলিক ধর্মমত শুধু ভারতেই নয় ভারতের বাইরেও বহু দেশে আপন মহিমায় ছড়িয়ে পড়ল। এ ধর্ম শান্তি ও প্রেমের পতাকা নিয়ে চরম সার্থকতার সঙ্গে দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হল।

সম্রাট অশোক তাঁর দ্বাদশ শিলা লিপিতে অহিংস-ধর্মনিষ্ঠার এক অতি সুন্দর সংজ্ঞা দান করে গেছেন। এতে ছিল—স্বধর্মে তীব্র অনুরাগ বশে যদি কেউ পর ধর্মকে বা ভিন্ন সম্প্রদায়কে হেয় জ্ঞান করে, কিংবা অপর ধর্মকে নিন্দা করে স্বধর্মের গৌরব ঘোষণার চেষ্টা করে, তবে সে প্রকৃত পক্ষে স্বধর্মেরই সমূহ ক্ষতি সাধন করে থাকে। ভারত-ধর্মের এই শাশ্বত সংজ্ঞার স্রষ্টা মহামতি সম্রাট অশোক। তাঁর কাজের মধ্য দিয়েও পর ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি পেতই, এমন কি কিছু সংখ্যক বর্ধরোচিত আজীবিক সম্প্রদায়ের লোকেরাও স্বাধীনভাবে পর্বত গুহায় তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা করতে পারত।

প্রজাদের সুখ সুবিধে বিধান করাই ছিল সম্রাট অশোকের প্রধান লক্ষ্য, প্রজাদের সুবিধের জন্য তিনি রাস্তার দুধারে বৃক্ষ রোপণ, সরাইখানা স্থাপন ও

জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শুধু অসুস্থ মানুষের চিকিৎসাই নয়, পশু চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্রাট অশোক প্রজাদের নিজের ছেলেমেয়ে-দের মতো মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন—পিতা যেমন নিজের ছেলে-মেয়েদের ভালবাসেন ও তাদের মঙ্গল চান তেমনি আমি আমার প্রজাদের কল্যাণ চাই। সম্রাট অশোক নিজে বৌদ্ধ হয়েও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

কলিঙ্গ জয়ের পূর্বে অশোক মাংস খেতেন, কিন্তু পরে তিনি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে একেবারেই নিরামিষভোজী হন। অবশ্য তিনি নিজে মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেও প্রজাদের মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে বলেননি। তবে অকারণে কোনো প্রাণীকে হত্যা করতে বা কষ্ট না দিতে উপদেশ দিতেন। নিজের জীবনের সমস্ত সুখ-সুবিধে ও ভোগবিলাস পরিত্যাগ করে মহামতি অশোক দিনরাত শুধু প্রজাদের মঙ্গলের দিকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শুধু তা-ই নয় নিজের বিশ্রামের জন্যও কোনো সময় রাখতেন না, এবং সর্বদাই প্রজাদের হিতচিন্তা করতেন। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদের আদেশ পালন, দাসদাসীর প্রতি ভাল ব্যবহার এবং ভোগবিলাস ও আলস্য ত্যাগ করে সত্যবাদী হতে উপদেশ দিতেন।

অশোক নিজে বৌদ্ধ হলেও কাউকে বৌদ্ধ হতে বলতেন না, বরং তিনি বলতেন—কেউ যেন নিজ ধর্মের অযথা প্রশংসা ও অন্য ধর্মের অযথা নিন্দা না করে। তাঁর মতে এক ধর্মের লোকের উচিত অন্য ধর্মের গুণগুলির কথা স্মরণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া। অশোক শুধু নিজের প্রজাদের উপকার করেই সন্তুষ্ট থাকতেন না, অন্যান্য রাজ্যের প্রজাদের মঙ্গলের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। তিনি মাসিদন, সিরিয়া ও মিশর প্রভৃতি দেশের রাজাদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলতেন।

পরধর্মে শ্রদ্ধা ও বিদেশী হলেও মানবজাতি হিসেবে সকলকে ভালবেসে আপন করে নেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী ভারত-ধর্ম। তাই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ তার উদার মানবিক নীতি বলে ভারতবিজয়ী গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ, গুর্জর, হূণ প্রভৃতি বহু বহিরাগত জাতিকে ভারতের আর্য সমাজে স্থান করে দিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় করে নিয়ে এক মহান উদারতার পরিচয় দিয়েছে। তখন কিন্তু 'ভারতধর্ম' বিদেশী বলে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেনি বরং মহাযান

বৌদ্ধধর্মের প্রচারক সম্রাট কনিষ্ক বিদেশী কুষাণ বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসে অশোকের উত্তর সাধক হিসেবে অশোকের পরেই স্থান দিতে ভারত কার্পণ্য করেনি। যেমন, মধ্যযুগের মুঘল সম্রাট আকবরও ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসেবেই পরিগণিত হয়েছেন তাঁর অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় উদারতার জন্য।

ইতিহাস বসে থাকে না। সে আপন গতিতে যুগের পর যুগ রচনা করে চলে। কালের পঙ্কিলচক্রে অহিংস ভেদাভেদহীন বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতিতে যখন হিংসা, দুর্নীতি, সংকীর্ণতা প্রবেশ করল, তখন রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। একতা হল বিনষ্ট। গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি একে একে ভারতের বিভিন্ন অংশে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করল। ধীরে ধীরে পৌরাণিক সংস্কৃতি নিয়ে দেখা দিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। ভারত ইতিহাসে এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আবির্ভূত হলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য প্রমুখ রাজাগণ। তাঁরা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস না করে বরং একে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে বেদভিত্তিক পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন। এই ধর্মকে হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয়ীকৃত ধর্ম ও সংস্কৃতি বলা চলে। তাই চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে এসে দেখলেন—কোনো প্রকার ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়ে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিরোধহীনভাবে সহাবস্থান করে চলেছে।

একদিকে রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে যেমন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের উন্নতি সাধিত হয়েছিল, অপরদিকে রাজা যে বৌদ্ধ নন বা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, তাও বুঝতে পারা যায় নি। অর্থাৎ তাঁর সময় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সমান শ্রদ্ধা পেত। ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট হর্ষবর্ধন আমৃত্যু কৌলিক দেবতা আদিত্য ও শিবের উপাসক ছিলেন। এবং বৌদ্ধধর্মগ্রহণ না করলেও এ ধর্মের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। যার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর রাজত্বকালে স্থাপিত হয়েছিল। মোটের ওপর হর্ষবর্ধন ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ সম্রাট। প্রয়াগের নিকট প্রতি পাঁচ বছর অন্তর যে মেলা বসত তাতে হর্ষবর্ধন গরীব দুঃখী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের অকাতরে অর্থদান করতেন। পাঁচ বছরে হর্ষবর্ধন যা টাকা কড়ি জমাতেন তা তো নিঃশেষে দান করতেনই এমন কি গায়ের জামা কাপড় পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়ে বোন রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে সামান্য একটুকরো

কাপড় চেয়ে নিয়ে তা পরিধান করে মেলা হতে বেরিয়ে আসতেন। তাঁকে একজন দানশীল প্রজারঞ্জক সম্রাট বলা চলে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের দানশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। তাঁর সময়ে প্রজারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। জমির খাজনাও কম ছিল। গরীবদের জাতিধর্ম নির্বিশেষে অর্থদান করা হত, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বজায় ছিল। প্রজাদের অর্থদানের সময় হর্ষবর্ধন জাতি বা ধর্মের বিচার করতেন না।

বাংলার বৌদ্ধ পাল রাজাগণও সমন্বয়-ধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তাঁদের রাজত্বকালেও বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের ভাবধারা পাশাপাশি সম্প্রীতির সঙ্গে অবস্থান করেছে। কাজেই সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সকল ধর্মের লোকের পাশাপাশি বিরোধহীন ভাবে সহাবস্থানের নীতি যেন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভারত-ধর্ম। যে সকল শাসক, তাঁরা হিন্দুই হোন, আর মুসলমানই হোন, ভারতের এই মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং পাশাপাশি সম্প্রীতির সঙ্গে সকল ধর্মের লোকের বসবাসের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদের রাজত্বই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। আর যাঁরা এই নীতির অবমাননা করেছেন, তাঁদের রাজ্যের স্থায়িত্ব যে দীর্ঘ হয়নি ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে।

ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমনের পূর্বে গ্রীক, শক, হূণ প্রভৃতি যে সকল বিদেশী এদেশে এসেছিলেন তাঁরা কালক্রমে ভারতীয় তথা হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব নেই। তাঁরা ভারতীয় ধর্ম-কর্ম, ভাষা, ভাবধারা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি গ্রহণ করে ভারতীয় সমাজ-দেহে বিলীন হয়ে গেলেন। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্ম আরবের মরুভূমি হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এক দুর্জয় শক্তি নিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কোথাও এ ধর্ম স্থানীয় সমাজ সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে কবলিত করে নিয়ে নিজস্থান করে নিল, ব্যতিক্রম ঘটল শুধু ভারতে। এখানে ইসলাম হিন্দু সভ্যতা ও ধর্ম সম্পূর্ণভাবে কবলিত করতে ব্যর্থ হল। অপর দিকে ইসলাম যেমন হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতাকে গ্রাস করতে পারল না হিন্দু ধর্মও তেমনি মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতাকে গ্রাস করতে চেষ্টা করল না। তাই এদেশে হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা এবং মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতা পাশাপাশি বিদ্যমান রইল। পরবর্তীকালে খ্রীষ্টান ধর্মের বেলায়ও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ভারতীয় ধর্ম স্বীয় ঐতিহ্যানুযায়ী খ্রীষ্টান

ধর্ম ও সভ্যতা গ্রাস করতে চেষ্টা করল না। ফলে খ্রীষ্টান ধর্ম ও সভ্যতা হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার পাশাপাশি অবস্থান করতে লাগল। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্ত্য জাতি ও গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এ দেশের উপকার হয়েছে। বহু কালের জড়তা ভেঙ্গে নবজীবনের সূত্রপাত হয়েছে এবং পুনরায় ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে—এ কথা স্বামী বিবেকানন্দও স্বীকার করেছেন।

॥ ২ ॥

আল্-বেরুনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারিখ-ই-হিন্দে' ভারত ভূমিতে সুলতান মামুদের দস্যুতার জন্য তাঁকে নির্ভীক ও কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন—'হিন্দুরা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কৃপণের ধনের মতো অপরের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতেই আনন্দ পায়। বিদেশীরা তাঁদের কাছে ঘৃণ্য, ম্লেচ্ছ।' হিন্দুরা তাঁদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলেছেন, অথচ তাঁদের পূর্বপুরুষেরা আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে তাঁদের সভ্যতাকে মার্জিত ও সমৃদ্ধ করে বাইরের পৃথিবীকে কাছে টেনে নিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জাতের নামে একটানা বজ্জাতি করে মানুষে মানুষে ও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টির ফলেই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদে বিশ্বাসী ইসলাম ধর্মের নিকট হিন্দুদের পতন ঘটে। এই পতনের কারণ—ধর্ম নয়, ধর্ম-হীনতা। হিন্দু সংস্কৃতি বা ধর্মের মূল লক্ষ্য সমন্বয়বাদ যখন অবলুপ্ত হয়, তখন হিন্দুগণ ধর্মহীন, কদাচার, কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে পৌত্তলিকতার খোলসটা আঁকড়ে ধরে এবং নিজেরা নিজেদের পরম ধার্মিক ও সবজান্তা আর মুসলমানদের ম্লেচ্ছ বলতে শুরু করে তখনই তাঁদের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে নিষ্ঠাবান মুসলমান সম্রাট ঔরঙ্গজেব নিজ ধর্মের প্রতি অত্যধিক গোঁড়ামি প্রদর্শন করতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছেন এবং হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর বসিয়েছেন। তাঁর ধর্মান্ধ নীতি ভারতের সবধর্ম-সমন্বয়-নীতির ওপর আঘাত হেনেছিল। এবং ওই আঘাতের জন্যই মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় উহার পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কারণ ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতির জন্য মারাঠা, রাজপুত, জাঠ ও শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায় মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী

হয়ে উঠেছিল। ধর্মান্ধতার জন্যই স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ ও ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই তাঁদের নিজ নিজ সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ঘটিয়েছিলেন। ঠিক এরূপ কারণেই পতন হয়েছিল বিজয়নগরের হিন্দু রাজত্বের, পতন হয়েছিল বাহমনীর মুসলমান রাজত্বের। বাহমনী রাজ্যে হিন্দুগণের ওপর মুসলমানগণের উৎপীড়নের ফলেই ওই রাজত্বের পতন হয়, সৃষ্টি হয় কতগুলি টুকরো টুকরো রাজ্য। দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্য ভেঙে যে কয়েকটি রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল, বিজাপুর ছিল তাদের মধ্যে একটি। বিজাপুরের মুসলমান শাসনকর্তা ইয়ুসুফ আদিল খাঁ হিন্দুদের প্রতি যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করতেন। তিনি নিজে হিন্দু রমণী বিবাহ করেছিলেন। তাঁর শাসন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। তাই তিনি শাসন ব্যবস্থায় হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও নিষ্কলুষ প্রকৃতির লোক।

বিজয়নগরে যতদিন হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি সমান অধিকার ভোগ করে বাস করতেন, ততদিন বিজয়নগর ছিল আর্থিক, সাংস্কৃতিক, শিল্প ও স্থাপত্যের দিক দিয়ে বিশেষ সমৃদ্ধশালী। নিকোলা কণ্টি, আবদুল রেজ্জাক, নুনিজ ও পায়েস প্রমুখ বিদেশী পর্যটকগণ বলেছেন—বিজয়নগরের মতো দ্বিতীয় দেশ আর নেই। বিজয়নগরের অধিবাসীদের অনেকেই ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। রাজা কৃষ্ণদেব রায় এবং অচ্যুত রায়ও বিষ্ণুর উপাসনা করতেন। বিজয়নগরের রাজাগণ ধর্মবিষয়ে বিশেষ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা নিজেরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁদের রাজ্যে বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমানগণ নির্বিবাদে বসবাস করতে পারতেন।

কিন্তু রামরাজার হিন্দু সৈন্যগণ আহমদনগরে প্রবেশ করে যখন মসজিদ ধ্বংস করল ও কোরান অপবিত্র করল তখনই ইসলামের অবমাননায় তেলিকোটের প্রান্তরে বিজয়নগরের সমাধি রচিত হল। রাম রাজার দ্বারা অন্য ধর্মের অবমাননাই বিজয়নগরের পতনের মূল কারণ বলে অনেকের ধারণা। পরধর্মের ওপর আঘাত ভারত-ধর্ম কোনো দিনই সহ্য করেনি। তাই ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতিতে পরধর্মের প্রতি প্রয়োজনীয় সহনশীলতার অভাবই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়েছিল। পক্ষান্তরে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাই মারাঠা শক্তির উৎস ছিল। যতদিন ধর্ম ছিল নিরপেক্ষ, মারাঠা শক্তি ততদিন ছিল অপরাজেয় ঐতিহাসিক কাফি খাঁ ছিলেন চরম হিন্দু-বিদ্বেষী এবং

ঔরঙ্গজেবের পরম সুহৃদ। তিনি ব্যর্থ আক্রোশে শিবাজীকে নরকের কীট বলে বর্ণনা করলেও একথা না লিখে পারেননি যে, 'এই ঘৃণ্য কাফের ইসলামকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে, মসজিদ নির্মাণের জন্যও অর্থ সাহায্য করে, মুসলমান ফকিরকে গুরুর মতো শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে'। একাধারে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যেই নিহিত ছিল শিবাজীর এমনকি মারাঠা জাতির সমগ্র শক্তির উৎস। শিবাজী যেমন তদানীন্তন মুসলমান শাসন হতে হিন্দুদের মুক্তির চেষ্টা করতেন তেমনি অসীম উদারতার সঙ্গে ইসলামকেও শ্রদ্ধা করতেন।

॥ ৩ ॥

কোন্ মুসলমান শাসক কত মন্দির ভেঙ্গে কত মসজিদ গড়ল, কত হিন্দুকে নির্বিচারে খুন অথবা ধর্মান্তরিত করল; পক্ষান্তরে কোন্ হিন্দু রাজা কত মসজিদ ভাঙ্গল বা কত মুসলমান নিধন করল—ইতিহাসের পাতা থেকে তা খুঁজে বের করে তুলে ধরা এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাস যে নিরপেক্ষ তাই বা কে জোর করে বলতে পারেন? কারণ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন মুসলমান শাসকগণের পক্ষে, আর হিন্দু ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন হিন্দু শাসকগণের পক্ষ হয়ে। অবশ্য সকল মুসলমান বা হিন্দু ঐতিহাসিকই যে পুরোপুরি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট এ কথাও জোর করে বলা যায় না। এবং বৈদেশিক মুসলমান ও অমুসলমান ঐতিহাসিক এবং পর্যটকগণের লেখা থেকে যে কিছু নিরপেক্ষ তথ্য পাওয়া যায় না, তা নয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মত দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো বোধহয় কষ্টসাধ্য নয় যে, যে সকল মুসলমান শাসক ইসলাম ধর্মের নামে জেহাদ ঘোষণা করে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের খাঁটি প্রতিনিধি নন, তাঁরা যা করেছেন তা নেহাৎ রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তই করেছেন। ইসলাম ধর্ম তথা মুসলমানদের ওপর অত্যাচারী হিন্দু শাসকগণের বেলায়ও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। যাহোক, শুধু মিলনের বাণী প্রচার করাই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় হিন্দু মুসলমান শাসকগণ পরধর্মের প্রতি কতটা সহনশীল ছিলেন তা এই গ্রন্থে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। এমন কি কোনো কোনো ধর্মান্ধ শাসক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে চরম অত্যাচারী হয়েও তাদের যেটুকু উপকার করেছেন সেটুকুও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

দাস, খলজী ও তুঘলক বংশের সুলতানগণ অনেকাংশে ধর্মান্ধ হলেও মোগল আমলের অধিকাংশ সম্রাটই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ। ইতিহাসের সমালোচনা থাক। ইতিহাস থেকে যেটুকু ভাল এবং শিক্ষণীয় শুধু তাই সমালোচনা এড়িয়ে এ গ্রন্থে স্থান দেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে।

আলাউদ্দিন গোঁড়া মুসলমান হয়েও কখনো ধর্মের দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিকে প্রভাবান্বিত হতে দিতেন না। শাসনকার্যে কাজী বা উলেমাদের ধর্মীয় নির্দেশ বা মতামতকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। ধর্মের অনুশাসন শাসনকার্যকে অচল বা ব্যহত করে বলে তিনি মনে করতেন।

তুঘলক বংশের উল্লেখযোগ্য সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক একজন উদার প্রকৃতির ও ধর্মনিরপেক্ষ সুলতান ছিলেন। ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল তাঁকে মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুলতানগণের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। এবং ঈশ্বরী প্রসাদও তাঁকে মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। তুঘলক হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতেন। ইবন্ বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায়—রতন নামে তাঁর একজন হিন্দু কর্মচারী ছিলেন। তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির মূলে ছিল তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতি। মহম্মদ-বিন-তুঘলক হিন্দুদের নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন। তিনি চিতোর ও রণথম্ভোরের রাজপুতগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। তাঁর বিচার যাতে ধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং এবিষয়ে তিনি কাজী বা উলেমাদের একচেটে অধিকারকে আমল দিতেন না। তাঁদের মতামত ধর্মনিরপেক্ষ বা সুবিচারের পরিপন্থী হলে তা নাকচ করে দিতেন এবং অন্যায় দেখলে শাস্তি প্রদানে দ্বিধা করতেন না।

ফিরোজ তুঘলক একজন ধর্মান্ধ সুলতান ছিলেন। তাঁর ধর্মাচরণের পশ্চাতে হিন্দু নির্যাতনের কোনো ইচ্ছে না থাকলেও নিজ ধর্মের প্রতি অত্যধিক গোঁড়ামি দেখাতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অমুসলমান প্রজাবর্গের ওপর অনিচ্ছাকৃত অত্যাচার এবং পরধর্মে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করছেন।

ফিরোজ শাহের প্রজাহিতৈষী সংস্কার হতে বুঝতে পারা যায় যে, হিন্দু নির্যাতনে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। কারণ বিচার ব্যবস্থার কঠোরতা-দূরীকরণ, সেচের জন্য খাল খনন, এবং আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক তুলে দেওয়া

প্রভৃতি জনহিতকর কার্য তিনি যে জনসাধারণের জন্য করেছেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। এছাড়া দরিদ্র ও পীড়িত প্রজাবর্গের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার, বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য 'কর্মসংস্থান সংস্থা' স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্যাবলীর মধ্য দিয়েও সুলতানের মানসিক উৎকর্ষ ও প্রজাহিতৈষণার পরিচয় মেলে। ফিরোজ তুঘলক জ্বালামুখী মন্দিরে প্রাপ্ত তিন শত সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন।

॥ ৪ ॥

"হে আমার পুত্র, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে। তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, নৃপতিদেরও যিনি নৃপতি তিনি-ই তোমার ওপর এই দেশ শাসনের ভার ন্যস্ত করেছেন, সুতরাং তোমার কাছ থেকে আশা করা যাচ্ছে যে—তুমি ধর্মীয় কুসংস্কার দিয়ে তোমার মনকে প্রভাবিত হতে দিবে না, এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে নিরপেক্ষভাবে বিচার করবে ; বিশেষ করে গো-হত্যা থেকে বিরত থাকবে যা তোমাকে ভারত-জনদের হৃদয় জয় করার পক্ষে সহায়ক হবে। এই ভাবে তুমি এদেশের অধিবাসীদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবে; কোনো সম্প্রদায়ের লোকদেরই ধর্মস্থানকে ধ্বংস করবে না ; এবং সর্বদাই ন্যায় বিচার-প্রিয় হবে যাতে রাজা ও প্রজার মধ্যেকার সম্পর্ক মধুর থাকে এবং দেশে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকে , অত্যাচারের অসির বদলে প্রেম ও কৃতজ্ঞতার অসির দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচারের পথই প্রকৃত পক্ষে কাম্য মনে করবে ; সিয়া ও সুন্নীদের মধ্যেকার বিভেদকে সর্বদা তুচ্ছ মনে করবে, অন্যথায় ওই বিভেদ ইসলাম ধর্মকে দুর্বল করে দিবে ; প্রজাবর্গের বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যকে বছরের বিভিন্ন প্রকার ঋতুর মতো মনে করে খাপ খাইয়ে চলবে যাতে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ব্যাধিমুক্ত থাকে।"

—আজ নয়, এক যুগ নয়, অর্ধশত নয়, একশত নয়, বেশ কয়েক শত বছর আগে ভারতবর্ষে এক নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের পথ যিনি সুগম করে দিয়েছিলেন এ তাঁরই উপদেশ তার ভাবী বংশধরের প্রতি। তিনি এই মহান ভারতবাসীদের বৈশিষ্ট্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেই উক্ত ভবিষ্যৎবাণী করে

গিয়েছিলেন যা এখনও বৈজ্ঞানিক সত্যের মতোই ভারতের পক্ষে অতি প্রযোজ্য। এই চিরন্তন বাণী ভারত কোনো দিনই ভুলবে না। ভুলতে পারে না। এ বাণী আর কারও নয়। এ হল মোগল সম্রাট হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে রেখে যাওয়া তাঁর মহান পিতা জহুরুদ্দিন মহম্মদ বাবরের এক গোপন উইলের (দলিলের) নির্দেশ। যে দলিলটি ভূপালের রাজ্য-গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। দি ইণ্ডিয়ান রিভিউ-এর ১৯২৩ সালের আগষ্ট সংখ্যার ৪৯৯ পৃষ্ঠায় উক্ত দলিলটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন ডঃ সৈয়দ মাহমুদ।

এবার মোগল বংশের আদি পরিচয় সম্পর্কে এখানে দু-একটি কথা উল্লেখ করা যাক, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে কেন ভারতের দাসবংশ, খলজীবংশ, তুঘলকবংশ, সৈয়দবংশ, লোদীবংশের সুলতান ও তাঁর সঙ্গে ঔরঙ্গজেব ছাড়া মোগল বংশের প্রায় সকলেই আচার-আচরণে ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুঘেঁষা ছিলেন। এবং সে সম্পর্কে বিষদ বিবরণের আগেই এখানে কিছু কিছু উল্লেখ করা যাক। যেমন—বাবর তাঁর দলিলে হুমায়ুনকে গো-হত্যা নিষেধ করতে বলেছেন। হুমায়ুন নিরামিষ আহার করতেন। আকবর বছরের বিশেষ বিশেষ সময় গো-হত্যা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি কপালে তিলক ধারণ, যজ্ঞানুষ্ঠান ও নানারূপ হিন্দু উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন, এবং শেষ জীবনে জীবহত্যা এমন কি মৎস্য শিকার বর্জন করে নিরামিষভোজী হয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর আকবরের মতো রাজদরবারেও অনেক হিন্দু উৎসব পালন করতেন। তিনি শিবরাত্রের দিন হিন্দু যোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও নানাপ্রকার হিন্দু-উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন। অনুরূপভাবে শাহজাহান অনেক হিন্দু উৎসব যেমন—দশেরা, বসন্ত উৎসব, তুলাদান প্রভৃতি রাজদরবারে পালন করার পক্ষপাতী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই সূর্যোদয়ে ঝরুখা-দর্শন পালন করতেন। এ ছাড়া দারাশিকোর হিন্দু-ধর্মে প্রীতি অনেক গোঁড়া হিন্দুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ করে বেদান্ত শাস্ত্র বিশেষ করে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ভগবদ্গীতা, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, যোগ-বশিষ্ট ও উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন। হিন্দু মুসলমান মিলনস্বরূপ তার 'মজমা-উল-বাহরণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হিন্দু, ব্রাহ্মণ, যোগী ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করেই বেশি সময় কাটাতেন। দারাশিকো তাঁর আংটির ওপর আল্লাহর পবিত্র নামের পরিবর্তে 'প্রভু' এই নাম খোদাই

করে রেখেছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি সর্বদাই বেদান্ত পাঠে নিজেকে মগ্ন রাখতেন। দারাশিকো মনে করতেন—হিন্দুদের বেদ অতি প্রাচীন, সুন্দর, স্বর্গীয় এবং ঈশ্বরের লিখিত বাণী। এমন কি মোগল বংশের শেষ প্রদীপ বাহাদুর শাহের হিন্দুপ্রীতি এবং দেশপ্রেমও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

অনেকে হয়তো বলবেন—হিন্দুগরিষ্ঠ ভারতবর্ষে হিন্দুদের মন জয় করার জন্যই বোধ হয় মোগল বংশের অনেকেই হিন্দু ধর্ম ও আচার-আচরণে বিশ্বাসী ও হিন্দুঘেঁষা ছিলেন। যদি তা-ই হবে তাহলে তাঁদের পূর্ববর্তী মুসলমান বংশের শাসকগণও তো অনুরূপ বিশ্বাস প্রদর্শন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তো তা করেননি। কাজেই আসুন মোগল বংশের প্রায় শাসকগণের হিন্দু-প্রীতির কারণগুলো একবার অনুসন্ধান করে দেখা যাক।

ভারতবর্ষের উত্তরে তিব্বত এবং তার উত্তরে মোঙ্গলিয়া নামক দেশে মোগলদের আদি বাসস্থান ছিল। রস তাঁর ইসলাম নাম গ্রন্থে লিখেছেন—মোগলগণ পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। জানা যায়—মোগলগণ চট্টগ্রাম-বাসীদের মতো শান্ত প্রকৃতির বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন নেপালী ও জাপানীদের মতো দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। খাঁ উপাধি দেখে যদি কেউ চেঙ্গিস খাঁকে মুসলমান বলে মনে করেন তবে তা ঠিক হবে না। মোগল শ্রেষ্ঠ কুবলাই খাঁই চীন দেশে বৌদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন (ব্রাউন—লিটারারী হিষ্টরী অব পারসিয়া, ২য় খণ্ড)। সাইকস এর পারসিয়া নামক গ্রন্থ (পৃঃ ৬৩ ও ৪৫২) থেকে জানা যায়—কুবলাই খাঁর ভ্রাতা হলাকু খাঁ মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন—যা ক্যাস তাঁর 'দি এক্সপ্যানসন অব ইসলাম' নামক গ্রন্থের (৭৪ পৃষ্ঠায়) মধ্যেও সমর্থন করেছেন। এছাড়া ব্রাউন তাঁর 'লিটারারী হিষ্টরী অব পারসিয়া' নামক গ্রন্থে (২য় খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায়) লিপিবদ্ধ করেছেন—কুবলাই খাঁ বাগদাদের মসজিদগুলো অপবিত্র করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আইযেভি তাঁর পারসিয়ান লিটারেচার নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৫৩) লিপিবদ্ধ করেছেন—মোগলগণ পারস্য দেশ জয় করবার পর পারস্যে থেকেই কালক্রমে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এবং হলাকু খাঁর পৌত্র গজন খাঁই প্রথম পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যাহোক, ভারতবর্ষে মোগলগণকে মুসলমান রূপে দেখতে পাওয়া গেলেও তাঁরা কিন্তু বৌদ্ধধর্মের কবল থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেননি। তাই বোধ হয়

মোগল বংশের অনেকেই বিশেষ করে আকবর, জাহাঙ্গীর, দারাশিকো প্রমুখে বৌদ্ধ বৃহত্তর অর্থে হিন্দুধর্ম ও আচরণের প্রতি অপেক্ষাকৃত আসক্তি প্রদর্শন করেছেন।

তাইমুর লঙ, দিগ্বিজয়ী মোগল সম্রাট চেঙ্গিস খাঁর (মোঙ্গলিয়াবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর) এক পৌত্রীর বংশধর বলে দাবী করতেন। তাঁর প্র-পৌত্র আবু-সায়েদের পুত্রের নাম ছিল ওমর শেখ মির্জা। বাবর ছিলেন শেখ মির্জার পুত্র। এই বংশ-পরিচয়ের মধ্য দিয়েই মোগল বংশের সম্রাটগণের হিন্দুঘেঁষা নীতির কারণ পরিলক্ষিত হয় বাবর তাঁর দুই ছেলেকে হিন্দুমেয়েদের (মেদিনী রাও-এর কন্যাদের) সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আকবর প্রপিতামহের আদর্শে বিশ্বাসী ও হিন্দু-মুসলমান বিবাহে বিশেষ আগ্রহী হয়ে শুধু নিজেই যে হিন্দু বিবাহ করেছিলেন তা-ই নয়, পুত্র সেলিমকেও হিন্দু মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। এবং আকবরের সময়কার হিন্দু মুসলমান বিবাহই ওই দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়েছিল। যা তার পূর্বে কারও সময় হয়নি।

মোগল বংশের পূর্ববর্তী মুসলমান বংশের শাসকগণের অনেকেই হিন্দুদের ওপর অনেক সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মোগল বংশের শাসকগণ হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের নিমিত্ত এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এবং বাবরই প্রকৃতপক্ষে তার অনুসূচনা করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই ছিলেন এ বিষয়ে প্রকৃত পথিকৃৎ। আফগান ও রাজপুতেরা যুদ্ধে পরাজিত হলেও বাবর তাঁদের সঙ্গে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতেন না, বরং পরাজিতদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। যার বহুল দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে আকবরের সময় মিলে। ফলে আকবরের সহৃদয় ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে তাঁর খ্যাতি ও মহত্ত্ব বজায় রাখার জন্য রাজপুতেরা হিন্দু হয়েও হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

বাবরের পুত্র হুমায়ুন বারাণসীর জঙ্গমবাদী মঠের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মিরাজপুর জেলার তিনশ একর নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। চিতোরের রাণী পদ্মিনী চূড়ান্ত বিপদের মুখে অপর একজন মুসলমান সুলতানের আক্রমণকে রুখবার জন্য বাদশা হুমায়ুনকে ভাই বলে সম্বোধন করে তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেনও তবে একটু দেরিতে।

॥ ৫ ॥

হুমায়ুনের রাজত্বের সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের যে ছেদ পড়েছিল, তখন শেরশাহ্ মাত্র পাঁচ বছরের জন্য রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ সুলতান।

শেরশাহ একজন গোঁড়া মুসলমান হয়েও পরধর্মের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে কার্পণ্য করেননি। তাঁর সময় সকলে ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ওপরই শেরশাহ্ তাঁর শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। প্রজাবাৎসল্য ও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য শেরশাহ্ ভারত ইতিহাসে শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন এমন একজন মুসলমান সুলতান যিনি বুঝতে পেরেছিলেন —ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থাই ভারতের বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রধান শর্ত। কারণ ভারতের মতো দেশে কেবলমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করলেই চলবে না। এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার না করলে শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থন সম্ভব নয়। তাই হিন্দু মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবহার তিনি পছন্দ করেননি। বহু যোগ্য হিন্দু শেরশাহের শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন শেরশাহের অন্যতম প্রধান সেনাপতি। তাঁর বিচার ব্যবস্থাতেও জাতি, ধর্ম ও ব্যক্তির মধ্যে কোনো প্রকার প্রভেদ করা হত না। শেরশাহের শাসন-ব্যবস্থা ছিল বিজ্ঞানসম্মত ও জনহিতৈষী। তিনি প্রজাবর্গের কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং রাজস্ব নির্ধারণে যথাসম্ভব উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোনো প্রকার প্রাকৃতিক কারণে ফসল না হলে কৃষকদের রাজস্ব মকুব করা হত, এমনকি প্রয়োজনবোধে তাঁদেরকে ঋণও দেওয়া হত। তিনি যাতায়াতের সুবিধার জন্য বহু রাস্তা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। শেরশাহের নির্মিত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আজও তাঁর কার্যের সাক্ষ্য বহন করছে। পথিকদের সুবিধের জন্য তিনি রাস্তায় উভয় পার্শ্বে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ এবং হিন্দু-মুসলমানগণের জন্য পৃথক পৃথক সরাইখানা নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন।

শেরশাহ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে একীকরণ করেননি। তিনি সামরিক বিশেষ করে রাজস্ববিভাগে বহু হিন্দুকর্মী নিয়োগ করেছিলেন। শেরশাহ ধর্মস্থান ও ধার্মিক ব্যক্তিগণকে মুক্ত হস্তে দান করতেন। এছাড়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে দরিদ্র ও অবলম্বনহীন নরনারীদের সাহায্যের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। রাজকর্মচারীদের অবহেলায় ধর্মস্থান, ধর্মজ্ঞানী ও দরিদ্র প্রজাবর্গ তাঁর সাহায্য থেকে যাতে বঞ্চিত না হন সেদিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। শেরশাহ ছিলেন প্রকৃত প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী (Benevolent despot) শাসক। শেরশাহের পরে একমাত্র সম্রাট আকবার ব্যতীত অপর খুব কম মুসলমান শাসকই শেরশাহের মতো জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রজাবর্গের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করেছিলেন। শেরশাহের বিচার এত ধর্মনিরপেক্ষ ছিল যে তাঁর আত্মীয়রাও দোষ করলে তাঁর শাস্তি এড়াতে পারতেন না। এ বিষয়ে কথিত আছে—একবার যখন একটি ঘেরা জায়গায় একজন স্বর্ণকারের স্ত্রী স্নান করছিলেন তখন শেরশাহের এক ভাইপো (দ্বিমতে ভাগ্নে), উক্ত রমণীটির দিকে পান ছুড়েছিলেন। এ ঘটনাটি শেরশাহের দৃষ্টিতে আনা হলে তিনি আদেশ করলেন উক্ত স্বর্ণকার যেন তার ভাইপোর স্ত্রী যখন স্নান করবে তখন তার প্রতি অনুরূপভাবে পান ছুড়ে অপমান করে। তাঁর সে আদেশ পালিত হয়েছিল। একবার মালবের গভর্ণর সুজাতখান মুসলমান হয়েও তাঁর কৃত অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পাননি —এমনই ছিল শেরশাহের ধর্মনিরপেক্ষ সুবিচারের দৃষ্টান্ত। অবশ্য তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে ঘৃণ্য জিজিয়া কর তুলে দেননি। মোটের ওপর শেরশাহের শাসনে হিন্দু মুসলমান উভয়েই তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু আকবরের হিন্দুঘেঁষা নীতিতে হিন্দুরা খুব তুষ্ট হলেও মুসলমানেরা অনেক বিষয়ে রুষ্ট ছিলেন। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন মোগল সম্রাট আকবরের পথপ্রদর্শক; তাঁর অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা, প্রজাহিতৈষণা, স্থাপত্য শিল্পানুরাগ ও প্রজাবর্গের প্রতি পিতৃতুল্য দায়িত্ববোধ তাঁকে ভারত ইতিহাস শ্রেষ্ঠ নৃপতি হিসাবে শ্রদ্ধার আসন দান করেছে।

॥ ৬ ॥

ভারত ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ ও দূরদর্শী হিসাবে শেরশাহের পরে আকবরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সম্রাট আকবর ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতের মতো হিন্দুপ্রধান দেশে ধর্মান্ধতাবশতঃ হিন্দুদের বিরাগভাজন হয়ে

কেবল সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানগণের নেতৃত্ব করলেই চলবে না। ভারতের সম্রাটকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীর স্বাভাবিক আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল জাতীয় সম্রাটের মর্যাদার অধিকারী হতে হবে তাই আকবরের শাসন-ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার, ধর্মনীতি সব কিছুই সর্বধর্মসমন্বয়ের নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এবং তিনি সর্বপ্রকার ধর্মীয় সংকীর্ণতা মুক্ত ছিলেন। পরধর্মে সহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় উদারতাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন না করতে পারলে ভারতবাসীদের এক মহান জাতিতে পরিণত করা যে অসম্ভব হবে—এরূপ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মহামতি আকবর। এছাড়া তিনি আরও বুঝেছিলেন যে, বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ না জানলে লোকের ধর্মান্ধতা কাটে না। তিনি সূফী মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আকবর আবুল ফজলের পিতা সূফী শেখ মুবারক নাগোরীর সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনা করে ধর্মীয় গোঁড়ামি কাটিয়ে উঠে ধর্ম সম্বন্ধে উদার মতবাদ পোষণ করতে আরম্ভ করেন এবং সকল ধর্মের মূলতত্ত্ব জানার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। তিনি ধর্ম-বিষয়ক বিচার বিতর্কের জন্য ইবাদতখানা (পূজা বাড়ী) নামে একটি পৃথক গৃহ নির্মাণ করান। সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত সম্রাট পরম ধৈর্যের সঙ্গে জৈন, হিন্দু, পার্শী ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণের কাছ থেকে বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা পরম আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করে সকল ধর্ম সমন্বয়ে সচেষ্ট হন। আকবর সকল ধর্মের মধ্যেই এক সত্য খুঁজে পান এবং সকল ধর্মমতকেই বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকেন। কারণ তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন বিভিন্ন ধর্ম একই স্থানে পৌছবার বিভিন্ন পথ মাত্র। ফলে তাঁর অন্তরে পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও ধর্মব্যাপারে চরম উদারতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। আকবরের ধর্মনীতির মূল কথাই ছিল সুল্‌হ্‌-ই-কুল অর্থাৎ সহিষ্ণুতা। পরধর্মে সহিষ্ণুতা আকবরের কেবল মুখের কথাই ছিল না। তিনি উহা কার্যকরীও করেছিলেন তাঁর কার্যের মাধ্যমে। আকবর পরস্পরের ধর্ম বিদ্বেষ ও পরধর্মের প্রতি ঘৃণা অসহিষ্ণুতা দূর করার উদ্দেশ্যে 'দীন ইলাহী' নামে এক নূতন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। সকল ধর্মের মূলকথা নিয়েই ওই ধর্মমত গঠিত হয়েছিল। এর প্রধান কথা এই যে, 'ঈশ্বর এক ; তাঁর রূপ কি আমরা জানি না ; জগতের

সূর্য দেবতাই তাঁর বড় কীর্তি ; লোক সূর্যদেবেরই উপাসনা করবে।' অনেক বড় বড় লোক এই ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জোর করে কাউকে এই ধর্ম গ্রহণ করাতেন না। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাবর্গের প্রতি আকবরের উদার ও পরম সহিষ্ণু মনোভাব থেকেও তাঁর ধর্মীয় উদারতার পরিচয় মেলে। সম্রাট আকবরের আমলেই হিন্দু প্রজাগণ সর্বপ্রথম পূর্ণ নাগরিক মর্যাদা লাভে সমর্থ হন। আকবর প্রায় দু'কোটি মুদ্রার ক্ষতি স্বীকার করেও হিন্দুদের ওপর থেকে তীর্থকর তুলে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ঘৃণ্য জিজিয়াকর তুলে দিয়ে মুসলমান ও অমুসলমান প্রজাদের মধ্যেকার কৃত্রিম প্রভেদ দূর করেছিলেন।

আকবর হিন্দুদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ মিলন স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি নিজে অম্বররাজ বিহারী মল্লের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং পুত্র সেলিমকেও রাজপুত কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। আকবর নিজ পরিবারস্থ হিন্দুনারীদের তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন।

সম্রাট আকবর শুধু যে সকল ধর্মমত শ্রদ্ধা করতেন তাই নয়, ওই সকল ধর্মের কোনো কোনো অনুষ্ঠান তিনি নিজে পালন করতেন। আকবর প্রাচীন পারসিক ধর্মের চতুর্দশটি ধর্মোৎসব অনুষ্ঠান করতেন এবং অগ্নি ও সূর্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতেন। তিনি জৈন ধর্মের অহিংস নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আকবর বছরের অর্ধেক সময় পশু হত্যা নিষিদ্ধ করেন। শুধু তাই নয়, শেষ জীবনে তিনি নিরামিষাশী হয়ে মৃগয়া এমন কি মাছধরা পর্যন্ত বর্জন করেন। তিনি সমস্ত দিনে একবার মাত্র আহার করতেন। তাও আবার পরিমাণে খুব বেশি নয়—আর পান করতেন কেবল গঙ্গা জল। আকবর মাংস খেতে ভালবাসতেন না, এবং বলতেন—'মানুষ-শরীরকে কি মরাপশুদের ভাগার করা উচিত?'

আকবর অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা করতেন এবং ব্রাহ্মণের কাছ থেকে রাখী গ্রহণ করতেন। তিনি হিন্দুদের মতো তিলক কাটতেন এবং পূর্ব দিকে মুখ করে উপাসনা করতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—আল্লাহ্ সব দিকেই আছেন। আকবর হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের অনেক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। তিনি দীপালী, দশেরা, রাখীবন্ধন, বসন্ত উৎসব এবং শিবরাত প্রভৃতি

হিন্দু উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন। এবং তাঁর রাজসভায়ও অনেক হিন্দু উৎসব পালিত হত। তিনি হিন্দু আত্মবাদ ও কর্মযোগে বিশ্বাসী ছিলেন। আকবর হিন্দু রাজার মত প্রজাদের সামনে ঝরুখা দর্শনে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি জৈন ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতিও অনুরূপ উদারতা দেখাতেন। এসব করেও স্বধর্মের প্রতি আকবরের শ্রদ্ধার বিন্দুমাত্রও অভাব ছিল না। কারণ তিনি অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং পদব্রজে দশ মাইল পথ অতিক্রম করে আজমীরের পীরের সমাধি দর্শনে যেতেন। একবার একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান মক্কা থেকে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন অঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর এনেছিলেন যা সম্রাট অতিশয় শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কিছুদিন নিজ স্কন্ধে বহন করেছিলেন। আকবর তাঁর ধর্মাচরণের জন্য গোঁড়া মুসলমান সমাজে অপ্রীতিভাজন হলেও সমগ্র ভারতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। তাঁর এ হেন ধর্মীয় আচরণের মধ্য দিয়ে আকবর বৈচিত্র্যময় ভারতে ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতেন না। আচার আচরণের মধ্য দিয়ে আকবর সকল ধর্মের প্রতিই তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। তিনি শুধু মসজিদই নয় তার সঙ্গে অনেক মন্দির এবং গীর্জা নির্মাণেও অর্থ সাহায্য করেছেন। আকবর কাঁংড়ার জ্বালামুখী মন্দিরে একটি সোনার ছাতা উপহার দিয়েছিলেন।

সকল ধর্মের প্রতি আকবর যে সহনশীল ছিলেন এখানে তার একটি ছোট কাহিনীর উল্লেখ না করে পারছি না। সম্রাট আকবর তাঁর মাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং মায়ের আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতেন। তবুও একবার তাঁকে মায়ের অবাধ্য হতে হয়েছিল। কারণ এক সময় কয়েকজন ধর্মান্ধ পর্তুগীজ নাবিক মুসলমান ধর্মের প্রতি অসম্মান দেখাবার উদ্দেশ্যে একখানি পবিত্র কোরান একটা কুকুরের গলায় বেঁধে বাজনা বাজিয়ে আগ্রা শহরের পথে ঘুরিয়েছিল। সম্রাট আকবরের মা একথা জানতে পেরে রেগে গিয়েছিলেন এবং আকবরকে পর্তুগীজ নাবিকদের ওই অন্যায় কাজের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—ওদের বাইবেলকে একটি গাধার গলায় বেঁধে আগ্রা শহর ঘোরানো হোক। আকবর কিন্তু মায়ের সে আদেশ প্রতিপালনে রাজী হলেন না। তিনি মাকে বললেন—সকল ধর্মের লোকই এক ঈশ্বরের আরাধনা করেন। কাজেই কোনো ধর্মের প্রতি ঘৃণা দেখালে পরম করুণাময়

ঈশ্বরের প্রতিই ঘৃণা দেখানো হয়। এ ঘটনাটি সত্যই মহামতি আকবরের পরধর্ম-সহিষ্ণুতার একটি অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আচারে ও ব্যবহারে আকবরকে অনেক সময় হিন্দু বলে মনে হত। তিনি অনেক সময় হিন্দু মনীষীদের মতো গৈরিক বসন পরিধান করে ও কপালে দীর্ঘ তিলক কেটে রাজদরবারে হাজির হতেন এবং মনোবাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে আকবর সূর্যের স্তব পাঠ করতেন ও গৃহকোণে হোমাগ্নি জ্বালিয়ে রাখতেন।

পীর সন্ন্যাসীদাদু দয়াল একবার আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে গভীর অনুভূতির সঙ্গে যে কথা বলেছিলেন তার বাংলা মানে—

—তুমিই রাম আর রহিম,
তুমিই সুন্দর মালিক (প্রভু)
তোমার নাম কেশব আর করিম !

তিনি আরও বলেছিলেন—

দুই ভাই হল—হাত পা, আর দুটি কান,
আর হল দুটি চোখ—হিন্দু, মুসলমান।

আকবরের বিখ্যাত সভাসদ আবুল ফজল বলেছিলেন—একদিন আমি যাই মন্দিরে আর পরের দিন মসজিদে, কিন্তু উভয় দিন এক তোমাকেই খুঁজি।

কথিত আছে অনেক হিন্দু সম্রাট আকবরের মুখদর্শন না করে প্রাতঃকালীন আহার গ্রহণ করতেন না। এর দ্বারাও আকবরের জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আকবরের শাসন-ব্যবস্থাও ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। অম্বররাজ মানসিংহ তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। রাজা টোডরমল ছিলেন আকবরের প্রধান মন্ত্রী। তাঁর ওপর রাজস্ব বিভাগের ভার ছিল। এছাড়া আকবরের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিগণের মধ্যে বহু হিন্দু ছিলেন। তিনি যোগ্য হিন্দু কর্মচারিগণকে রাজ্যের উচ্চতম পদসমূহে নিয়োগ করতেন এবং নিয়োজিত কার্যে তাঁদেরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। ফলে তাঁর সময়ে মুসলমান বিদ্বেষী অনেক হিন্দু বিশেষ করে রাজপুতগণ যাঁদের বিরুদ্ধে আকবরকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল তাঁরাও আকবরের রাজত্বের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন।

সম্রাট আকবরের অধীনে বহু হিন্দু মনসবদার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর সুবাগুলির বেশির ভাগেরই অর্থমন্ত্রী ছিলেন হিন্দু। তাঁর সময়ে কোনো

ধর্মাবলম্বীর ধর্ম সাধনায় কেউ বাধা দিতে পারত না। শুধু তাই নয়, যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো ধর্ম সাধনার অধিকার স্বীকৃত ছিল। সম্রাট বছরের কোনো কোনো সময়ে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করতেন এবং সে আদেশ অমান্যের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। রাজ্য জয়ের সময় সেনাবাহিনী যাতে কোনো ধর্মস্থান কলুষিত না করে তার জন্য আকবর প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আকবরের সহনশীলতা সত্যই প্রশংসনীয়। কারণ যে রাজপুত জাতির সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, আবার সেই রাজপুত জাতির সহযোগিতার ফলেই তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। রাজপুতদিগকে তিনি খুব বিশ্বাস করতেন এবং শাসনব্যবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁহাদেরকে নিয়োগ করে নিশ্চিন্ত থাকতেন। এবং রাজপুতগণও সেই বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতেন।

প্রতিহিংসা বশতঃ বিজিত শত্রুকে নির্মম ভাবে শাস্তিদান করে তাঁর মর্যাদা নাশ করাই ছিল তদানীন্তন প্রায় সকল বিজেতার নীতি। তাঁরা বিজিত শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু মহামতি আকবর তা পেরেছিলেন। বিজিত শত্রুদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে তাঁদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল আকবরের মধ্যে। মোটের ওপর শত্রুকে ক্ষমা করে তাকে বশে আনার মতো সংগুণের অধিকারী ছিলেন সম্রাট আকবর। ভারতবর্ষে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের নিমিত্ত রাজপুত জাতির সহযোগিতা যে অপরিহার্য—এ বাস্তব সত্য আকবর ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই রণথম্ভোর জয়ের পর তিনি রাজপুত জাতির প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে তাঁদের আন্তরিক সৌহার্দ্য অর্জন করেছিলেন। আকবর তাঁর অসাধারণ দূর-দর্শিতা বলে তাঁর চির শত্রু রাজপুত জাতিকে অনুগত মিত্রতে পরিণত করেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা ও যোগ্য মর্যাদা দানে কার্পণ্য করেন নি। যে রাজপুত জাতির বিরুদ্ধে আকবর যুদ্ধ করতে দ্বিধা করতেন না আবার তাদের জন্য তাঁর উদারতারও অন্ত ছিল না। মোটের ওপর তিনি বিজিত শত্রুকে চির মিত্রে পরিণত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। পরাজিত শত্রুর সঙ্গে মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার ও যোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করে আকবর সামরিক জয়কে অন্তর-জয়ে পরিণত করতেন। যেমন মহামতি অশোক যুদ্ধ

জয়ের মাধ্যমে দেশ জয় না করে ধর্মের দ্বারা লোকের মনজয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

আকবর জাতি-ধর্মনির্বিশেষে জনসাধারণের আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে তাঁর সাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ধর্মান্ধতাবশতঃ পরধর্মাবলম্বীদের প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার বা অবিচার এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মস্থান অপবিত্র করণ প্রভৃতির দ্বারা সম্রাট আকবর তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয় নীতিকে ম্লান করতে চান নি।

আকবর যুদ্ধে জয়লাভ করে পরাজিত শত্রুকে ক্রীতদাসে পরিণত করারও পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলে বহু পরাজিত হিন্দু সৈনিক ক্রীতদাসে পরিণত হওয়ার মতো দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। এতে সম্রাট আকবরের উন্নত মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে। আকবর যেসব সংস্কার করেছিলেন তা সবই ছিল জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকল প্রজার মঙ্গলার্থক। তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। আকবরের সময় ধর্ম ছিল ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে নিবদ্ধ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। ভারতের মতো বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের আবাসস্থানে আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ উদার নীতি সত্যই রাজনৈতিক চরম দূরদর্শিতার পরিচয় বাহক ছিল। যার প্রয়োজন আধুনিক ভারতেও সর্বজনস্বীকৃত।

আকবরের অধীনে হিন্দু তথা অমুসলমান প্রজাবর্গ সর্বপ্রথম নাগরিক মর্যাদা-লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। হিন্দুগণ মন্দির স্থাপন করতে এবং উৎসব উপলক্ষে মেলা বসাতে পারতেন। আকবরের রাজত্বে প্রজাদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক বৈষম্য ছিল না। সকল ধর্মের লোক সমান অধিকার ভোগ করতে পারতেন। সম্রাট আকবরের শাসন নীতি ছিল ব্যক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি হিন্দু সমাজের কু-প্রথা যেমন সতীদাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। আকবর বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ সমর্থন করতেন না, ন্যায় ও সততার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা প্রজাদের মন জয়ে সমর্থ হয়েছিলেন। আকবর ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের মতো দেশে স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রধান শর্ত হল হিন্দু-মুসলমানগণের অকপট ও অখণ্ড আনুগত্যলাভ। তাই তিনি কেবল সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেন নি। এবং ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিন্দুদের

প্রতি উদার নীতি অনুসরণ করে ভারতের মতো বিশাল দেশের জাতীয় সম্রাটের মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

পরধর্ম বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকবরের শ্রদ্ধা ও কিছু কিছু হিন্দু ধর্মীয় আচার আচরণ পালনের জন্য কেউ কেউ তাঁর এরূপ শ্রদ্ধা ও ব্যবহারকে রাজনৈতিক কপটতা বলে আখ্যা দিলেও এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় কি? আকবরের এরূপ আচরণকে রাজনৈতিক কপটতার চেয়ে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বলাই কি ভাল নয়? কারণ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আকবর তাঁর এহেন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বলেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমর্থন পেয়েছিলেন। এবং অনেক চিরশত্রুকে চিরমিত্রতে পরিণত করে ক্বাতন্ত্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজত্ব করতে এবং মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে সমর্থ হন।

ভারতবর্ষের মতো হিন্দুপ্রধান ও বহু ধর্মাবলম্বী দেশে আকবরের পরধর্ম সহিষ্ণুতার নীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতাবশতঃ বা রাজনৈতিক কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিন্দু-বিদ্বেষ মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে যে শিথিল করে দিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় কি? আবার কোনো কোনো হিন্দু রাজার মুসলমান বিদ্বেষও অনুরূপভাবে তাঁদের রাজত্বকে ক্ষণস্থায়ী করেছিল। তাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূরীকরণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—মুসলমানগণ তাঁদের অনগ্রসরতা দূরীকরণের জন্য যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু বিশেষ সুবিধের দাবী করে থাকেন তবে তা দেওয়া উচিত। কারণ হিন্দু মুসলমান যতই সমান সুযোগ-সুবিধে ভোগ করে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান তালে উন্নতিলাভ করবেন ততই দেশে অশান্তির চেয়ে শান্তি বৃদ্ধি পাবে এবং ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূরীভূত হবে। বিদ্বেষহীনভাবে অর্থনৈতিক সমতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করাই হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের গোড়ার কথা।

নিজে নিরক্ষর হয়েও আকবর যে নবরত্নের সমাবেশ ঘটান, তাতে অনেক বিদগ্ধ জন সমাদৃত হয়েছেন। আকবর শুধুমাত্র ধর্মীয় চিন্তায় মগ্ন না থেকে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি সাধনাতেও এক অভিনব দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রাজসভা ফৈজী, আবুল ফজল, দেবী, পুরুষোত্তম, ভানুচন্দ্র, হরিবিজয়, বিজয় সেন, মন্‌সেরেট্, একোয়াভাইরা প্রমুখ হিন্দু, পারসিক, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্মাবলম্বী মনীষীদের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। আকবরের রাজসভার

একুশজন প্রথম পর্যায়ের মনীষীর মধ্যে নয় জনই ছিলেন হিন্দু। মিঞা তানসেন শেখ ফৈজী, রাজা মানসিংহ, টোডরমল, আবুল ফজল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর নবরত্নের মধ্যে ছিলেন এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আকবরের রাজসভায় সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন মিঞা তানসেন ও রাজবাহাদুর। আবুল ফজল ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর ভ্রাতা ফৈজী ছিলেন ওই সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি নলদময়ন্তী উপাখ্যান ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আকবর ফারসী ভাষায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্ততঃ তেইশখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করান। তার আদেশে কথাসরিৎ সাগর, রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ববেদ, হরি-বংশ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং সুরদাস, তুলসীদাস প্রমুখ হিন্দি কবিগণ তাঁদের অসাধারণ রচনার দ্বারা হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বীরবল ছিলেন আকবরের অন্যতম সভাকবি। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় তুলসীদাসের রামচরিত মানস, শেখ ফৈজীর সুলেমান, বিলখৈস, নলদমন এবং গুরু অর্জুন মল্লর গ্রন্থ সাহেব, শেখ বদাউনীর মহাভারতের দুই পর্বের অনুবাদ, বত্রিশ সিংহাসনের অনুবাদ, আবুল ফজলের আকবর-নামা, আইন-ই-আকবরী প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই মূল্যবান গ্রন্থগুলি ছাড়াও শেখ ফৈজী কর্তৃক ভাস্করাচার্যের বীজ গণিত ও লীলাবতীর পারস্য ভাষায় অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। এ সকল মূল্যবান সাহিত্য-কীর্তির জন্য আকবরের রাজত্বকাল ভারতবর্ষের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তিনি যে ধর্মান্ধতার দ্বারা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিভার গুণাগুণ বিচার করতেন না, তার প্রমাণ—তিনি একদিকে যেমন কবি হাকিমকে তাঁর অপূর্ব শ্লোক রচনার জন্য এক লক্ষ টাকার পুরস্কার দিয়ে-ছিলেন, তেমনি প্রতিভাধর হিন্দু গায়ক রামদাসকেও এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেন তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ।

আবুল ফজল তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন যে, আকবরের রাজসভায় হিন্দু, ইরাণী, কাশ্মীরী প্রভৃতি ছত্রিশজন সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। এঁদের মধ্যে তানসেন ও অন্ধকবি সুরদাস ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আকবর ভাল নাকাড়া বাজাতে পারতেন। তিনি লাল বলাবক্সের সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। আকবর চিত্রশিল্পেরও অনুরাগী ছিলেন। কিশোর বয়সেই

তিনি ছবি আঁকতে শেখেন। তাঁর সময়ে চিত্রশিল্প চর্চারও উন্নতি হয়েছিল। আকবরের রাজসভার সতেরজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীর মধ্যে হিন্দু ছিলেন তেরজন। এঁদের মধ্যে দাসবন্ধু নামে একজন অতি অখ্যাত পাল্কীবাহক নিজ প্রতিভা বলে একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীর মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবুল ফজল বলেছেন—আকবরের যুগে হিন্দু চিত্রকরদের অঙ্কিত ছবিগুলি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই চিত্রকরদের দ্বারা প্রচলিত চিত্রাঙ্কন শিল্পই পরে রাজপুত চিত্রকলা নামে খ্যাত হয়। আকবরের রাজত্বকালে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প হিন্দু মুসলমান রীতির সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছিল। হিন্দু, জৈন, পার্শী ও খ্রীষ্টানধর্ম সম্বন্ধে আকবরের বেশ ভাল জ্ঞান ছিল। সব ধর্মমতকেই তিনি শ্রদ্ধা করতেন।

সম্রাট আকবর সকল ধর্মের মানুষের প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করতেন। তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দীন দরিদ্রের প্রতি আন্তরিকভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল আত্মসংযমের অসীম ক্ষমতা, সত্য ও সুন্দরের প্রতি আগ্রহ এবং আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। এ সকল গুণের জন্য তিনি মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

জাহাঙ্গীর তাঁর মহান পিতা আকবরের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বারানসীতে অনেক হিন্দু মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন। মথুরার বীর সিং বন্দেলার উজ্জ্বল মন্দির তাঁর আদেশে তৈরী হয়েছিল। তিনি অনেক গীর্জা নির্মাণেও সাহায্য করেছেন। আকবরের মতো জাহাঙ্গীরও রাজসভায় অনেক মুসলমান ও হিন্দু উৎসব পালন করতেন। তাঁর সময় হরিদ্বারে প্রায় পাঁচ লক্ষ তীর্থযাত্রী তীর্থ করতে যেতেন এবং ওই সময় হিন্দু তীর্থযাত্রা খুব জনপ্রিয় ছিল। জাহাঙ্গীরের সময় অনেক হিন্দু-উৎসবের দিন গণ-ছুটির দিন হিসাবে গণ্য করা হত। সবেবরাতের দিন তিনি হিন্দু যোগীদের নিমন্ত্রণ করতেন। শিবরাত্রের দিন তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর দশেরা ও দীপালী উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন এবং হিন্দু পণ্ডিত ও যোগীদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিষয়ে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। তিনি উজ্জয়িনী, মথুরা ও গোবর্ধন তীর্থ দর্শন করতে যেতেন হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে। তাঁর রাজত্বকালে খ্রীষ্টানরাও তাঁদের নানা উৎসব পালন করতে পারতেন স্বাধীনভাবে। এসকল দ্বারা জাহাঙ্গীরের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির

পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দেওয়ান ছিলেন মোহনদাস। এছাড়া জাহাঙ্গীরের বহু উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ কর্মচারী, প্রাদেশিক রাজ্যপাল ও মনসবদার হিন্দু ছিলেন। জাহাঙ্গীর হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের অনুরাগী ছিলেন এবং বাল্মীকি রামায়ণকে 'রাম-নামা' নামে অনুবাদ করিয়েছিলেন। তিনি সুরদাসকে তাঁর সুর সাধনার জন্য সাহায্য করেছিলেন। জেসুইট পাদরীগণ সম্রাটকে আরবী ও ফারসী ভাষার বাইবেল উপহার দিয়েছিলেন। তিনি অনেক হিন্দী কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃত কবিকে সাহায্য করতেন এবং তাঁর সময় অনেক কবি ও সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহানের হিন্দু প্রীতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাইরঘুনাথ তাঁর অর্থমন্ত্রী ও চন্দরভাস তাঁর মুখ্য সচিব ছিলেন। এছাড়া সম্রাটের বহু হিন্দু মনসবদার এবং রাজস্ব ও হিসাব বিভাগে বহু হিন্দু কর্মচারী ছিলেন। তাঁর বহু প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রীও হিন্দু ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের সামরিক বিভাগেও অনেক বিখ্যাত হিন্দু সেনাপতি ছিলেন। তিনি বহু মুসলমান উৎসব জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করতেন এবং তাতে অমুসলমানদেরও আমন্ত্রণ করতেন। শাহজাহান ঈদ উপলক্ষে রাজা যশোবন্ত সিংহ এবং রাজা জয় সিংহকে একটি করে হাতী উপহার দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন ঝরুখা দর্শন ও বাৎসরিক তুলা দান পালন করতেন। শাহজাহান মানসিংহের মাতার সমাধির জন্য বাংলা দেশে দু'শ বিঘা জমি দান করেছিলেন। তিনি শিক্ষা ও স্থাপত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজসভা অনেক হিন্দু পণ্ডিত ও কবিতে পূর্ণ ছিল। কবি সুন্দর দাস, চিন্তামণি ও জগন্নাথ তাঁর মুক্ত হস্তের আস্বাদন পেয়েছেন। অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত শাহজাহানের সময় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নিজে গোঁড়া মুসলমান হয়েও শাহজাহান তাঁর পুত্র দ্বারা সিকো এবং কন্যা জাহানারার হিন্দুধর্মালোচনায় কোনো বাধা দেননি। তিনি হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শাহজাহান বসন্ত-পঞ্চমী, হোলি, দশহারা প্রভৃতি হিন্দু উৎসবের অনুষ্ঠান রাজদরবারে বন্ধ করেন নি। তিনি কাম্বে অঞ্চলে গোহত্যা নিষেধ করেছিলেন এবং উড়িষ্যায় হিন্দুদের পবিত্র ময়ূর বধ তাঁর আদেশেই নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাজমহল যুগ যুগ ধরে শাহজাহানের পত্নী-প্রেম ও বিস্ময়কর স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন বহন করে চলেছে।

শাহজাহানের পরে মোগল পণ্ডিত দারাসিকো হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞানলাভ করেছিলেন এবং বেদান্ত শাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। পরধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে ধর্মান্ধতাকে দূরে রাখাই বোধ হয় তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এবং তিনি ভগবদ্গীতা, অথর্ববেদ, যোগবাশিষ্ঠ ও উপনিষদ, অনুবাদ করেছিলেন। এই উপনিষদের নামকরণ করেছিলেন 'সির-উল আস্‌বার'। হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রধান নিদর্শন স্বরূপ তাঁর 'মজমা-উল-বাহরন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দারাসিকো হিন্দু ব্রাহ্মণ, যোগী ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই বেশি সময় অতিবাহিত করতেন হিন্দু শাস্ত্র আলোচনায়। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর আংটির ওপর 'প্রভু' এই নাম খোদাই করে রেখেছিলেন। উইলিয়ম শ্লিম্যান বলেছেন দারাসিকো ভারতের সিংহাসনে বসলে ভারতের শিক্ষার ধারা ও তার ভাগ্য সম্পূর্ণ আলাদা হত। দারাসিকো নিজস্ব মত কবি হাফিজের ভাষায় যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার বাংলা করলে দাঁড়ায়—

ভালবাসার বাস যদি হয় সারা বিশ্ব মাঝারে,
তবে কেন বিভেদ দেখি, মসজিদে মন্দিরে।

তিনি বলেছেন রাম-রহিম, কৃষ্ণ-করিম, মহাদেব-মহম্মদ এবং মন্দির-মন্দিরের মধ্যে বাইরে বিভেদ থাকলেও অনুভবের মিল আছে।

এবার 'মুসলমানের ঔরঙ্গজেব ও হিন্দুর শিবাজী' এই প্রবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। ঔরঙ্গজেব যে হিন্দুদের দেখতে পারতেন না এবং শিবাজী চরম মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন—ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর সম্পর্কে এখানে লেখা ঘটনাগুলির দ্বারা নিশ্চয়ই তা প্রমাণিত হবে না।

শিবাজী আফজল খাঁকে হত্যা করেছেন এবং ঔরঙ্গজেব চরম ধর্মান্ধতাবশতঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর বসিয়েছেন। এ সকল ঘটনার দ্বারাই কেবল ইতিহাসের ওই দুই দিক্‌পালের চরিত্রের সম্যক বিচার করা সম্ভব নয়। এঁরা রাজনৈতিক কারণেই ওরূপ করেছেন।

ঔরঙ্গজেব একজন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান ছিলেন। শুধু হিন্দুগণের সঙ্গেই নয় অনেক ক্ষেত্রে শিয়া মুসলমানগণের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ হয়েছে। মন্দির

ধ্বংসের বিষয়ে অপবাদ যে শুধু ঔরঙ্গজেব এবং আরও কয়েকজন মুসলমান শাসকেরই প্রাপ্য তা নয়। পরমার হিন্দু শাসক শুভতবর্মণ এবং কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষও অনেক জৈন ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছেন। আবার মুসলমান হয়েও যে মসজিদ ধ্বংস করতে পারে তাও হাল আমলে জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়ার সামরিক জুনতা এক বর্বর আক্রমণ চালিয়ে বাংলা দেশের বহু মসজিদ ধ্বংসের দ্বারা প্রমাণ করে দিল।

ঔরঙ্গজেব রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণে পিতাকে বন্দী এবং ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী পবিত্র ইসলাম ধর্ম কখনও ভ্রাতৃহত্যা ও পিতৃ অমর্যাদাকে অনুমোদন দেবে না। কাজেই এ বিষয়ে ঔরঙ্গজেব ধর্মীয় কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুব সাদাসিধে। নিজের টুপি নিজে সেলাই করে পরতেন এবং মনে করতেন রাজকোষের টাকার ওপর তাঁর কোনো অধিকার নেই। রাজকোষের অর্থকে তিনি জনসাধারণের অর্থ বলে জানতেন। তাই রাজকোষের সম্পদকে তিনি নিজের ভোগ বিলাসের কাজে লাগাতেন না। ঔরঙ্গজেব সুরাপানে আসক্ত ছিলেন না এবং তাঁর কোনো হারেমখানাও ছিল না। তিনি ছিলেন মিতাহারী এবং স্বল্প নিদ্রার পক্ষপাতী। মোটের ওপর ঔরঙ্গজেব দরবেশের ন্যায় খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। শাসন কার্যের খুঁটিনাটি তাঁর দৃষ্টি এড়াত না এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে অপরের দ্বারা অন্যায়ভাবে প্রভাবান্বিত হতেন না। এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও ঔরঙ্গজেব শাসন সংক্রান্ত সকল কাগজ নিজে পড়ে তবে সেগুলোর ওপর প্রয়োজনীয় আদেশ নিজ হাতে লিখে দিতেন। তাঁর সামনে কেউ মিথ্যে কথা বা অশোভন ভাষা উচ্চারণ করতে সাহস পেত না।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব মৃত্যুর পূর্বে আদেশ করে গিয়েছিলেন যে, "তিনি টুপি তৈরি করে যে চার টাকা দু'আনা অর্জন করেছিলেন কেবল তাই যেন তাঁর দেহাবরণের জন্য ব্যয় করা হয়। এছাড়া পবিত্র কোরাণের অনুলিপি করে তিনি যে তিনশত পাঁচ টাকা জমিয়ে গেছেন তা যেন তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় দান করা হয়।" রাজকোষের অর্থ ব্যয়ে তাঁর স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ না করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভ্রাতৃহত্যা, পিতার প্রতি নির্মম ব্যবহার ও চরম ধর্মান্ধতা দিয়ে ঔরঙ্গজেবের চরিত্র বিচার করলে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ

অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলেই বোধ হয়। কারণ ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চরিত্রে এমন কতকগুলো গুণের সমাবেশ ঘটেছে যা অনেক খ্যাতিমান মুসলমান শাসকের ব্যক্তিগত চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায়নি।[১]

মোগল বংশের সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চরিত্র দাস বংশের সুলতান নাসিরউদ্দিনের চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ নাসিরউদ্দিনও বিশাল দেশের শাসক ও প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে দরবেশের ন্যায় সাদাসিধে জীবন ধারণের মধ্য দিয়ে উচ্চ ধারণা পোষণের পক্ষপাতী ছিলেন। জানা গেছে—তিনি অবসর সময়ে মুসলমানগণের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ 'কোরাণ' নকল করে যা আয় হ'ত তা দিয়ে জীবন যাপন করতেন। প্রায় সুলতানেরই একাধিক স্ত্রী ও হারেমখানা ছিল। কিন্তু নাসিরউদ্দিনের মাত্র একজন স্ত্রী ছিলেন যিনি সুলতানের জন্য অতি সাধারণ খাবার নিজ হাতে রান্না করে দিতেন। একবার রান্না করতে গিয়ে তাঁর হাতের আঙ্গুল পুড়ে গেলে বেগম একজন ঝি রাখার জন্য সুলতানকে অনুরোধ জানালেন। এতে সুলতান তাঁর দারিদ্র্যের জন্য ঝি রাখার অক্ষমতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন—'তাঁর ব্যক্তিগত সুখ সুবিধের জন্য তিনি রাজ-কোষের অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না। কারণ ওই অর্থ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখা আছে। তিনি উহার প্রহরী মাত্র। জনসাধারণের ওই অর্থ তাঁর ব্যক্তিগত সুখ সুবিধের জন্য ব্যয় করার অধিকার তাঁর নেই।' এটি নিঃসন্দেহে একটি মহান দৃষ্টান্ত।

মুসলমানগণ ঔরঙ্গজেবকে একজন শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট হিসেবে গণ্য করেন। বার্নিয়ারও তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ ও বিরল প্রতিভা সম্পন্ন প্রবক্তা এবং শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে বর্ণনা করে গেছেন।

শিবাজীর সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বিরোধ ছিল ধর্মীয় কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণে। ক্যাপটেন অলেকজাণ্ডারের মতে ঔরঙ্গজেবের সময় হিন্দু, খ্রীষ্টান, জোরাস্ট্রীয়ানগণ ইচ্ছে মতো তাঁদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারতেন। হিন্দুদের শুধু নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা পালন করতে দেওয়া হ'ত না।

গোঁড়া সুন্নী মুসলমান হয়েও ঔরঙ্গজেব একজন হিন্দু জ্যোতিষীর দ্বারা দিল্লী প্রবেশের শুভদিন ঠিক করেছিলেন বলে জানা গেছে। যদিও তাঁর আদেশে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির, এবং মথুরার কেশব দেবের মন্দির ভেঙ্গে তাদের জায়গায় মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল, তথাপি ঔরঙ্গজেবের সময়েই বাংলা ও

আসামে কয়েকটি হিন্দু মন্দির গড়া হয়েছিল এবং বুদ্ধ গয়ায় অনেক জমি দেওয়া হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের সময় নদীয়া, মিথিলা, মাদুরা, ত্রিহুত, থাট্টা, মুলতান প্রভৃতি জায়গা হিন্দু সংস্কৃতি চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়েছিল।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মহাকরণে অনেক হিন্দু কর্মচারী ছিলেন এবং অনেক রাজপুত তাঁর বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন। রাজা রঘুনাথ সম্রাটের অর্থমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মহারাজা জয় সিংহ ছিলেন ঔরঙ্গজেবের বিশেষ বন্ধু। তাঁর পুত্র রাজারাম সিংহ আসাম আক্রমণের সময় সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহকে কাবুলের গভর্নর পদে নিযোগ করেছিলেন।

জানা গেছে—'যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর পাছে অরাজকতা সৃষ্টি হয় এই ভেবে তাঁর নাবালক ছেলে অজিত সিংহকে ঔরঙ্গজেব যোধপুরের সিংহাসনে বসাতে অরাজী হন। ফলে রানী রামভাতী এবং যোধপুরের সেনাপতি কাজীর মাধ্যমে সম্রাটের নিকট এক আবেদন করেন যে, সম্রাট যদি অজিত সিংহকে সিংহাসনে আরোহণের সুযোগ দেন, তবে তাঁরা যোধপুরের সকল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে অনেক মসজিদ গড়ে দেবেন যাতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের পথ আরও প্রশস্ত হয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেব ওই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তাঁর জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁকে যোধপুরের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। এ বিষয়ে ঔরঙ্গজেব রাজনীতিকে ধর্ম বিস্তারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই রাণী রামভাতীর প্রস্তাবে সাড়া দেননি।

ঔরঙ্গজেবের সময় অনেক বাঙালী হিন্দু মনসব, জায়গীর ও জমিদারী পেয়েছিলেন। তিনি অনেক হিন্দুকে গভর্নর, গভর্নর জেনারেল, ভাইসরয়, সেনাপতি ও সৈন্যাধক্ষ্য পদে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সময় হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারতেন। অবশ্য এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তিনি কোনো কোনো স্থানে হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে হিন্দুদের ওপর যে জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন তার ধর্মীয় কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণই বোধ হয় বেশি ছিল। মুসলমান শাসকগণের অনেকে একদিকে যেমন হিন্দুগণের ওপর জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন তেমনি অপর দিকে মুসলমানগণের ওপর জাকাত বসিয়েছিলেন।

যাহোক, বিভিন্ন জাতি ও নানারূপ ধর্মীয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভারতবর্ষে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহানের হিন্দু প্রীতি ও পরধর্ম সহিষ্ণুতার জন্য মোগল সাম্রাজ্য অনেকদিন টিকে ছিল। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রের হিন্দু বিদ্বেষ মোগল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছিল—এ বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিকই এক মত।

॥ ৭ ॥

শিবাজীর জীবনেও পরধর্ম সহিষ্ণুতার অনেক পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি মুসলমানদের স্বীয় ধর্মসাধনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এবং মুসলমান সাধু (পীর) ও তাঁদের ধর্মস্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে কার্পণ্য করেন নি। তিনি যে শুধু হিন্দু মন্দিরের জন্যই অর্থদান করেছেন তা নয়, মুসলমান পীরদের দরগা নির্মাণের জন্যও অর্থ সাহায্য করতেন। শিবাজী কলসীর বাবা ইয়াকুটের দরগা তৈরী করে দিয়েছিলেন। তিনি মুসলমানগণের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতেন। কোনো সংগ্রামে তাঁর সেনাদের হাতে কোরাণ পড়লে, তিনি তা পড়ার জন্য মুসলমান অনুরাগীদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিতেন। শিবাজী যুদ্ধে বিজিত মুসলমান শিশু, রমণী ও যোদ্ধাদের প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার না করা এবং অসম্মান না দেখানোর জন্য তাঁর সেনাদের প্রতি কঠোর আদেশ জারি করেছিলেন। শিবাজী রাজনৈতিক কারণে মুসলমানদের সঙ্গে সারাজীবন যুদ্ধ করেছেন বটে কিন্তু কখনো তাঁদের ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরাণের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা-প্রদর্শন করেননি। এমনকি মসজিদের খরচ চালাবার জন্য তিনি নিষ্কর জমি পর্যন্ত দিয়েছেন। তাই শিবাজীর বিরোধী মুসলমান লেখকও তাঁর মহৎ চরিত্র এবং উদারতার প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেননি।

শিবাজী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ। হিন্দু হয়েও মুসলমান ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। কতিপয় মুসলমান শাসকের অপরাধের ভার তিনি সাধারণ মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেননি। অর্থাৎ আক্রমণকারী মুসলমান শাসকেরা হিন্দুদের মন্দির ও দেবদেবী ধ্বংস ও তাঁদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা খর্ব করেছিলেন বলে তিনি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মুসলমানদের ধর্মস্থান অপবিত্র ও তাঁদের স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণে বাধা সৃষ্টি করার

প্রয়াস করেননি। ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত ঐতিহাসিক কাফি খাঁ যিনি শিবাজীকে নরকের কীট বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি, তিনিও লিখেছেন—বরং শিবাজী তাঁর সৈন্যদের ওপর কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন কোরাণ বা মসজিদের অবমাননা না করে, অভিযানের সময় কোথাও পবিত্র কোরাণ পাওয়া গেলে তা যেন উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে যথাযোগ্য স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া মুসলমান নারী, শিশু ও ধার্মিক মানুষদের অবমাননার বিরুদ্ধেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। এই নিয়ম ভঙ্গের শাস্তি ছিল কঠোর অর্থাৎ মাথা কাটার হুকুম। তিনি তাঁর সময়কার বিখ্যাত পীর বাবা ইয়াকুটকে নিজ খরচে কলসী নামক জনপদে বসিয়ে তাঁকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। শুধু তাই নয় রায়গড় দুর্গে তিনি মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

বিচারের দিক দিয়েও শিবাজী ছিলেন অত্যন্ত নিরপেক্ষ। অপরাধ করলে নিজের পুত্রও তাঁর শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেত না। এবং তিনি চরিত্রহীনতা কখনও সহ্য করতে পারতেন না। তাই চরিত্রহীনতার অপরাধের জন্য তিনি নিজের বড় ছেলে শম্ভুজীকেও কারারুদ্ধ করেছিলেন। এবং শিবাজীর জীবদ্দশায় শম্ভুজী মুক্তি পাননি।

কথিত আছে—একবার কল্যাণ দখলের পর শিবাজীর এক সেনাপতি সেখানকার মুসলমান সরদারের পরমা সুন্দরী পুত্রবধূকে উক্ত সরদারসহ বন্দিনী অবস্থায় শিবাজীর সম্মুখে নিয়ে এলে রমণীটি তো ভয়ে অস্থির, পাছে শিবাজী তাঁর নারীত্বের অবমাননা করেন; তাঁর প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করেন। তাই তিনি শিবাজীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। শিবাজী রমণীটির প্রতি কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অতি নম্র ও ভদ্রভাবে বললেন—"তোমার দিকে বেহায়ার মতো তাকিয়ে আছি বলে লজ্জা পেয়ো না মা, সত্যি এরূপ রূপ লাবণ্য আমি কখনো দেখিনি।" একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি আরও বললেন—"ভাবছি, আমার মা যদি তোমার মতো সুন্দরী হতেন, তা হলে আমি না জানি কতই সুন্দর হ'তাম!"

শিবাজীর চরিত্রের এই পরিচয় পেয়ে মুসলমান রমণীটি শুধু বিস্মিত হলেন না, অশ্রুধারা বর্ষণ করতে লাগলেন। তখন শিবাজী একখানি মুল্যবান বস্ত্র ও কিছু অলংকার নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—"মা, অপরাধ নিও না, ওরা না বুঝে তোমাকে এখানে বন্দিনী অবস্থায় নিয়ে এসেছে। তুমি সন্তানের

দেওয়া এই বস্ত্র ও অলংকার গ্রহণ করে তোমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। তোমরা দুজনেই আজ মুক্ত।" ওদের মুক্তি দিয়ে শিবাজী সকলকে বললেন—"মনে রেখো আমরা হিন্দু। তাই অন্য ধর্মের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানো প্রত্যেকটি হিন্দুরই প্রাথমিক কর্তব্য। তাছাড়া নারী জাতিকে মা ও আরাধ্যা দেবীর মতো সম্মান করাও হিন্দুদের কর্তব্য। এ কার্যে অবহেলা যে অপরাধ—তা ক্ষমার্হ নয়।" তিনি আরও বললেন,—"সেই দিনই হবে মারাঠা জাতির শেষ দিন যেদিন তাঁরা নারী জাতির অপমান করবে" অর্থাৎ নারী জাতির প্রতি অপমানের মতো ভীষণ অন্যায় কোনো দিনই বরদাস্ত করা হবে না—এই ছিল শিবাজীর কঠোর আদেশ তাঁর অধীনস্থ সকলের প্রতি।

শুধু শিবাজীই নন, তাঁর পরিবারের অন্যান্য লোকেরাও মুসলমানদের প্রতি সহনশীল ছিলেন। শিবাজীর ঠাকুরদাও মুসলমান পরীদের বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তিনি মুসলমান শিক্ষক শাহশরিফের নামানুসারে তাঁর দুছেলের একজনের নাম রাখেন শাহজী অপরজনের নাম রাখেন সরাফজী।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে ধর্মের এক প্রবল বান ডেকেছিল। তুকারাম, রামদাস, বামন পণ্ডিত ও একনাথ প্রমুখ ধর্মগুরু হিন্দুধর্মের সবরকম সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার দূর করে ভক্তিবাদ নামক এক সাম্যবাদী ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। এতে ছিল গভীর জাতীয়তাবাদী আবেদন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শেষ মোগলসম্রাট বাহাদুর শাহও হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য চেষ্টা করে গেছেন। তিনি পরধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন। বাহাদুর শাহ হিন্দু প্রজাদের মন জয়ের নিমিত্ত গো-হত্যা নিবারণ করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্বে গো-হত্যার শাস্তি ছিল খুব কঠোর। হিন্দুদের প্রতি বাহাদুর শাহের শ্রদ্ধাও ছিল গভীর যা তিনি আকবর ও দারাসিকোর কাছ হতে যেন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি রাজ্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভার হিন্দু মন্ত্রী ভোলানাথের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। জানা গেছে—বাহাদুর শাহ বলতেন—

যদি তুমি মুসলমান হও, তবে আমার এক চক্ষু,
আর যদি হিন্দু হও, তবে আর এক চক্ষু।

তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দেশপ্রেমিক। বাহাদুর শাহ ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ করেছিলেন।

॥ ৮ ॥

মোগল আমলে আরবী, ফারসী, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। বাবরের আমলে আরবী, ফারসী, এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলত ওই যুগে উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ সংস্কৃত থেকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। আকবরের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক মনীষীর উদ্ভব ঘটেছিল। চণ্ডীমঙ্গল প্রণেতা বাঙালী কবি মাধবাচার্য আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি আকবরের সাহিত্যানু-রাগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 'তারিখ-ই-আলফি', 'আইন-ই-আকবরী, 'আকবর-নামা', 'মাসির-রহিমী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ আকবরের সময়ে রচিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ, মহাভারত এবং অথর্ববেদ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এছাড়াও এযুগে আরও ঐতিহাসিক গ্রন্থ যেমন—বাবরের জীবনস্মৃতি, জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতি, ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, মা-আসীর-ই-জাহাঙ্গীরী, 'জব্‌দ-উৎ-তোওয়ারিখ্ পাদশাহ-নামা', 'শাহ্‌জাহান-নামা', 'আলমগীর-নামা, 'মুন্তাখাব-উল-লুবাব' প্রভৃতি রচিত হয়েছিল।

মোগল আমলে বাংলা দেশেও সাহিত্য বিশেষ করে বৈষ্ণব সাহিত্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবৎ, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, ত্রিলোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি-রত্নাকর প্রভৃতি বৈষ্ণব সাহিত্য এযুগেরই সৃষ্টি। এ ছাড়াও চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য, কাশীদাসের মহাভারত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি ওই যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। ওই আমলে বাংলা সাহিত্যের যাঁরা উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁদের মধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁ, আলীবর্দী খাঁ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বীরভূমের আসাদুল্লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ ৯ ॥

কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদিন প্রজাদের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভালবাসতেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের সময়কার বিতাড়িত হিন্দুদের দেশে

ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং অনেক হিন্দু মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এছাড়া কাশ্মীরের হিন্দু প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তিনি গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মোটের ওপর জয়নুল আবেদিন প্রজা হিতৈষী, উদারচেতা, পরধর্মসহিষ্ণু ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর সময় সকল ধর্মের লোকই তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম পালনে চূড়ান্ত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতেন। জয়নুল আবেদিনের প্রজা হিতৈষণা ও পরধর্মসহিষ্ণুতা পরবর্তীকালে মোগল সম্রাট আকবরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল। তিনিই প্রথম হিন্দুদের ওপর থেকে জিজিয়া কর তুলে দিয়ে হিন্দু মুসলমান প্রজাগণের মধ্যেকার ধর্মীয় ও অধিকারগত বৈষম্য দূর করেছিলেন। আবেদিন জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজাকে সমান অধিকার ভোগের সুযোগ দান করেছিলেন। তিনি হিন্দী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। জয়নুল আবেদিনের প্রজা হিতৈষণা ও পরধর্ম-সহিষ্ণুতার জন্য তাঁকে "কাশ্মীরের আকবর" নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন বলেই কাশ্মীরে অনেকদিন রাজত্ব করতে পেরেছিলেন।

॥ ১০ ॥

বাংলাদেশে অনেক মুসলমান শাসক দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের সমান চোখে দেখতেন। তাঁরা যোগ্য হিন্দুদের সামরিক বেসামরিক এবং রাজস্ব বিভাগে নিয়োগ করতেন। শুধু তাই নয় অনেক সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন হিন্দু এবং কোনো কোনো সুলতান আবার ব্যক্তিগত চিকিৎসককে 'অন্তরঙ্গ' এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

বাংলাদেশের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি মুসলিম সন্তদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন। আজম শাহ পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন উদার, সাহসী ও দানশীল এবং বহু অর্থ ব্যয়ে মক্কা ও মদিনায় দুটি মাদ্রাসা স্থাপন করে

দিয়েছিলেন। তিনি মক্কা ও মদিনার অধিবাসীদের জন্য কয়েকবার মূল্যবান উপহার পাঠিয়েছিলেন। মুজাফফর শাম্‌স্‌ বল্‌খি নামক এক দরবেশকে আজমশাহ বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এই দরবেশ একাধিক চিঠিতে সুলতানকে হজরত মহম্মদের যে বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তা হল—'এক মুহূর্তের ন্যায় বিচার যাট বছরের প্রার্থনা ও ভক্তি প্রকাশের চেয়েও উৎকৃষ্ট।'

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের ন্যায় নিষ্ঠা সম্বন্ধে 'রিয়াজ'এ একটি সুন্দর কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কাহিনীটি এই—"একবার তীর ছুঁড়তে গিয়ে গিয়াসুদ্দীনের তীর হঠাৎ এক বিধবা মহিলার পুত্রকে আঘাত করে। তখন ওই বিধবা কাজী গিয়াসুদ্দীনের কাছে তার প্রতিকার প্রার্থনা করে সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এতে ন্যায় বিচারে বিশ্বাসী কাজী সিরাজুদ্দীন চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি সুলতানের প্রতি পক্ষপাত দেখালে ভগবানের বিচারে অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন। অপরদিকে সুলতানের জন্য পক্ষপাতিত্ব না করে বিচারের জন্য তাঁকে বিচারালয়ে আহ্বান করাও তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন কাজ হবে। যাহোক, অনেক বিচার বিবেচনার পর কাজী পেয়াদার হাত দিয়ে সুলতানের কাছে সমন পাঠালেন। তিনি নিজে বিচারকের মসনদে বসলেন এবং মসনদের তলায় একটি বেত রেখে দিলেন। পেয়াদা সহজ পথে সুলতানের কাছে সমন নিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে না পেয়ে অসময়ে চীৎকার করে আজান দিয়ে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সুলতান অসময়ে আজান ধ্বনি শুনে মু-আজ্জিনকে (যে আজান দেয়) তাঁর কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। তখন পেয়াদাকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাকে অসময়ে আজান দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।" পেয়াদা সুলতানকে সমন দিয়ে বলল—"কাজী সিরাজুদ্দীন সুলতানকে বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সুলতানের কাছে প্রবেশ লাভ কঠিন বলে আমি এই উপায় অবলম্বন করেছি। আপনি যে বিধবার ছেলেকে তীর মেরে আহত করেছেন, সেই বিচার প্রার্থনা করে আপনার বিরুদ্ধে কাজীর কাছে নালিশ করেছেন। কাজেই আপনি বিচারালয়ে চলুন।" সুলতান তখনই বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করে কাজীর সামনে এসে হাজির হলেন। কাজী সিরাজুদ্দীন সুলতানকে কিছুমাত্রও খাতির না দেখিয়ে বিধবা মহিলাটির ক্ষতিপূরণ করতে নির্দেশ দিলেন। তখন সুলতান প্রচুর অর্থ দিয়ে

মহিলাটিকে শান্ত করে বললেন, "কাজী এখন বিধবা মহিলাটি সন্তুষ্ট হয়েছে।" কাজী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি সুলতানের ক্ষতিপূরণে সন্তুষ্ট হয়েছ?" স্ত্রী লোকটি জানাল—সে সন্তুষ্ট হয়েছে। এতে কর্তব্যনিষ্ঠ কাজী খুবই আনন্দিত হলেন এবং সুলতান তাকে ন্যায়বিচারে সাহায্য করার জন্য তাঁর নির্দেশ পালন করেছেন বলে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। এবং তিনি মহানন্দে মসনদ ছেড়ে উঠে এসে সুলতানকে সসম্মানে মসনদে বসালেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন তখন বগলের নীচে থেকে লুকানো ছোট তলোয়ারটি বের করে কাজীকে বললেন যে, তিনি সুলতান বলে কাজীকে যদি তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে পবিত্র আইনের নির্দেশের প্রতি নিষ্ঠা থেকে এক চুলও বিচ্যুত হতে দেখতেন তাহলে ওই তলোয়ার দিয়ে কাজীর মাথা কেটে ফেলতেন। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সবকিছু যথাযথভাবে পালিত হয়েছে। তখন কাজীও মসনদের তলা থেকে তাঁর বেতটি বের করে বললেন—সুলতান যদি পবিত্র আইনের নির্দেশ বিন্দুমাত্রও লঙ্ঘন করতেন, তাহলে আদালতের বিধান অনুসারে ঐ বেত দিয়ে সুলতানের পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দিতেন। অবশ্য এর জন্য কাজীকে যে বিপদে পড়তে হত তা জেনেও। কারণ কাজীর কাছে নিজের বিপদের চেয়ে আইনের মর্যাদা রক্ষাই বড় কথা। যাহোক, কাজীর ন্যায় বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে সুলতান তাঁকে অনেক উপহার ও পারিতোষিক দিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। এ কাহিনী যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের দেশে মধ্যযুগে এরূপ ন্যায় বিচারের ঘটনা ঘটত বলে আমরা নিঃসন্দেহে গবর্বোধ করতে পারি। এছাড়া কাজী সিরাজুদ্দীনের মতো বিচারক সত্যই যে কোনো দেশের গৌরব। এবং সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের ন্যায়নিষ্ঠাও অতিশয় প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের সুলতানেরা যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনকার্যের ব্যাপারে যে কেবলমাত্র মুসলমানগণের ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন তাই নয়, তাঁরা অনেকেই এ ব্যাপারে হিন্দুদের সাহায্যও নিয়েছিলেন। বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ দিল্লীর পরাক্রান্ত সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলকের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পেরেছিলেন যার পেছনে হিন্দুগণের সাহায্যও অনেকটা কাজ করেছিল। এক-ডালার যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরোজ শাহের বিরুদ্ধে ইলিয়াস শাহের শক্তির প্রধান সহায়ক ছিল হিন্দু পাইকগণ এবং তাদের নেতা সহদেব। গিয়াসুদ্দীন আজম সাহেবকে লেখা মুজাফফর শাম্‌স্ বলখির একটি চিঠি থেকে জানা যায়—আজম

শাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে (অন্ততঃ ৮০০ হিজরা পর্যন্ত) তাঁর রাজ্যে হিন্দুরা বহু উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অনেক মুসলমান ওইসব হিন্দুর অধীনে কাজ করতেন।

বাংলাদেশে একটানা মুসলমান রাজত্ব চলাকালে হঠাৎ রাজা গণেশ তাঁর অসামান্য বুদ্ধিবলে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মত আবির্ভূত হয়ে বাংলা দেশে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে এ রাজত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। রাজা গণেশের বংশধরেরা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন। এবং সুলতান জলালুদ্দীন (যদু সেন) ছিলেন রাজা গণেশের পুত্র।

ঐতিহাসিক ফিরিশতা বলেছেন—রাজা গণেশের অনেক মুসলমান বন্ধু ছিলেন যাঁরা তাকে ভালবাসতেন। এবং বাংলার হিন্দু মুসলমানগণের সমর্থন বলেই রাজা গণেশ হিন্দু হয়েও ভারতে একটানা মুসলমান রাজত্বকালে বাংলা-দেশে রাজত্ব স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। গৌড়ের ফতেখানের সমাধি ভবন নামে পরিচিত একটি সমাধি ভবন এবং পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদ রাজা গণেশের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

মুসলমানগণের প্রতি রাজা গণেশের ব্যবহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ফিরিশতা বলেছেন—রাজা গণেশ বাংলাদেশের মুসলমানগণের সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে কিছুসংখ্যক মুসলমান তাঁকে মুসলমান বলে ঘোষণা করে ইসলামিক প্রথানুসারে কবর দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে অনেকেই একমত নন। অনেক ঐতিহাসিক বলেছেন—রাজা গণেশ রাজনৈতিক কারণে শুধু সেই সকল মুসলমানগণকে শায়েস্তা করেছেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। ঔরঙ্গজেবও অনুরূপভাবে শত্রুতাকারী হিন্দুগণের ওপরই অত্যাচার করেছেন বলে অনেকে রাজা গণেশকে ঔরঙ্গজেবের এক সংস্করণ বলে মনে করেন।[২]

রাজা গণেশের ছেলে জলালুদ্দীন (যদু সেন) ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান. এবং ইসলাম ধর্মে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অতিশয় গভীর তাঁর এ নিষ্ঠা অনেক ক্ষেত্রে জন্ম-মুসলমান সুলতানদেরও অতিক্রম করে গিয়েছিল। জলালুদ্দীন তাঁর মুদ্রায় কলমা খোদাই করেছিলেন যা দুশ বছর ধরে তাঁর পূর্বতন বাংলার মুসলমান সুলতানগণ করেননি। জলালুদ্দীন জাত-হিন্দু হয়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন তা সত্যই বিরল। তিনি তাঁর শেষের

দিকের মুদ্রা ও শিলালিপিতে "খলিফৎ আল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহর খলীফা"- এই উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি নিজেকেই খলীফা বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবী করতেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান জলালুদ্দীন ইসলামের নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর পিতা যে সকল মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন তিনি সেগুলিকে সংস্কার করে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কাতীর্থে কতকগুলি ভবন ও একটি সুন্দর মাদ্রাসা তৈরী করে দিয়েছিলেন। এবং মক্কা বাসীদের দানের জন্য অনেক অর্থও পাঠিয়েছিলেন। মিশর ও দামাস্কাসের বহুলোকের জন্যও জলালুদ্দীন উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এগুলি তাঁর ইসলাম ধর্মে নিষ্ঠারই নিদর্শন। হিন্দুধর্মে বিদ্বেষ বশতঃ জলালুদ্দীন কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করলেও যোগ্য হিন্দুদের যোগ্য রাজপদ ও সম্মানদানে কার্পণ্য করেন নি। কারণ তিনি জগদ্দত্তের পুত্র রায় রাজ্যধরের গুণরাশিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রাজ্যের সেনাপতি পদে নিয়োগে করেছিলেন। এবং এই নিয়োগ উপলক্ষে আড়ম্বরের সঙ্গে এক বিরাট অনুষ্ঠান করে রায় রাজ্যধরকে হাতী, ঘোড়া, সোনা, রূপো প্রভৃতি দান করে তূর্য ও শঙ্খের ধ্বনিতে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন—এ ঘটনা পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের স্মৃতি রত্নহার নামক গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা গেছে। রায় রাজ্যধর শুধু হিন্দু নন, একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের দারিদ্র্য দূর এবং নানারূপ যাগযজ্ঞ করে 'ধর্মপুত্র' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। জলালুদ্দীন সকল হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হলে রায় রাজ্যধরের পক্ষে ব্রাহ্মণগণকে সাহায্য করা সম্ভব হত না। শুধু তাই নয়, গীতগোবিন্দ টীকা, কুমারসম্ভব টীকা, রঘুবংশ টীকা, অমরকোষ টীকা, শিশুপালবধ টীকা এবং স্মৃতি রত্নহার, পদচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে জলালুদ্দীন বিশেষভাবে সম্মানিত করেছিলেন। তিনি বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায় মুকুট' ও 'পণ্ডিত সার্বভৌম' উপাধি দিয়েছিলেন। সুলতান তাঁকে উজ্জ্বল মণিময় হার, রত্নখচিত দশ আঙুলের অঙ্গুরীয় ও দুটি উজ্জ্বল কুণ্ডল দিয়ে হাতীর পিঠে চড়িয়ে এবং সোনার কলসী থেকে জল ঢেলে অভিষেক করিয়ে ছত্র ও অশ্বের সঙ্গে 'রায়মুকুট' উপাধি দেন। অনেকের মতে বারবক শাহই বৃহস্পতি মিশ্রকে বিশেষ সংবর্ধনার সঙ্গে এসব উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত মিশ্র জলালুদ্দীনের কাছেও যথেষ্ট সম্মান পেয়েছেন এবং তাঁর সেনাপতি রায়

রাজ্যধর বৃহস্পতি মিশ্রের শিষ্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জলালুদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিত বৃহস্পতি রঘুবংশ টীকা ও শিশুপালবধ টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রনয়ণে সক্ষম হন এবং গৌরাধিপ যে তাঁকে প্রচুর প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তা সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান। এই গৌড়াধিপ রায় রাজ্যধরের প্রভু জলালুদ্দীন বলেই অনেকের ধারণা। হিন্দুধর্ম-ত্যাগী জলালুদ্দীন ধর্মান্তরিত হয়েও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছাড়তে পারেননি বলেই বোধ হয় পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে এত সম্মান দেখিয়েছেন।

রুকনুদ্দীন বারবকশাহের রাজত্বকালকে বলা হয় বাংলার এক 'গৌরবময় যুগ'। তিনি পরধর্মসহিষ্ণু এবং অতিশয় ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। বারবক শাহ রাজকার্যে জাতিধর্মনির্বিশেষে যোগ্য লোক নিয়োগ করতেন। বৃহস্পতি মিশ্রের পুত্র বিশ্বাস রায় ছিলেন বারবক শাহের মহামন্ত্রী। বিশ্বাস রায়ের ভ্রাতারাও গৌড়েশ্বর বারবক শাহের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মহাভারতের টীকাকার পণ্ডিত অর্জ্জুন মিশ্র গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী বিশ্বাস রায়ের আদেশে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বারবক শাহের রাজ্যের সীমান্তে ঘোড়াঘাট দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন হিন্দু ভান্দসী রায় যাঁর অভিযোগের ফলে বিচারের পর সুলতান পীর ইসমাইল গাজীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এ থেকে বারবক শাহের প্রশাসনিক ব্যাপারে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় মেলে—কারণ মুসলমান পীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইসমাইল গাজীকে রেহাই দেন নি। রিসালৎ-ই-শুহাদা'র বিবরণী থেকে জানা যায়—কামরূপের রাজা কামেশ্বর পীর ইসমাইলের অলৌকিক কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এই কামরূপের রাজার সঙ্গে জোট বেঁধে ইসমাইল গাজী স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন—এটাই ছিল ইসমাইল গাজীর বিরুদ্ধে ভান্দসী রায়ের অভিযোগ। যাহোক, পীর ইসমাইল মৃত্যুর পরে হিন্দু মুসলমানগণের কাছ থেকে অসামান্য সম্মান অর্জন করেন। ইসমাইল গাজীকে তাঁর মুসলমান ভক্তেরা শুধু গাজীর সম্মানই দেননি, তাঁকে পীর বলে পুজো করেছেন। কালক্রমে তিনি হিন্দুদের কাছেও শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। এবং কাঁটাদুয়ার ও মান্দারণে ইসমাইল গাজীর সমাধি শুধু মুসলমানদের নয়, হিন্দুদেরও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল এবং আজও ওই দুই সমাধি স্থান বর্তমান আছে। অনেক কবি মধ্যযুগের বহু মঙ্গল কাব্যের দিক-বন্দনা পালায় বিভিন্ন দেব দেবী ও পীরের সঙ্গে পীর ইসমাইলের

ও বন্দনা করেছেন। ষোড়শ শতকে কবি রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলে তাঁর রচনার প্রারম্ভে হিন্দু মুসলমানদের কাছে শ্রদ্ধেয় পীর ও গাজীর যে বন্দনা গান করেছেন, তা নিচে উল্লেখ করা হল—

মান্দারণ গড়ে বন্দি পীর ইসমাইলি,
পীর ইসমাইলি সঙরিয়া পথ চলি যায়,
মৈষে নাহি মারে তাঁরে বাঘে নাহি খায়,
বন্দিব বড়র্খা গাজী রিসিবাটী গা
নিজ বাটী বন্দিব পেড়োর শুভিখাঁ।

কেদার রায় বারবক শাহের রাজসভায় একজন বিশিষ্ট সভাসদ ছিলেন। সুলতান এঁকে ত্রিহুতে তাঁর নায়েব করে পাঠান, এবং তাঁর ওপর রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। বারবক শাহের সভাপণ্ডিত ছিলেন মুকুন্দ এবং গন্ধব রায় ছিলেন সভাসদদের মধ্যে অন্যতম। সুলতান বাংলা সাহিত্যের অমর গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এর রচয়িতা মালাধর বসুকে 'গুণরাজখান' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বাংলারামায়ণ রচয়িতা সুবিখ্যাত কৃত্তিবাস ওঝা বারবক শাহের কাছে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন।

'পুরাণ সর্বশ্বের' রচয়িতা গোবর্ধন বলেছেন—তাঁর পৃষ্ঠপোষক কুলধরকে বারবক শাহ প্রথমে 'সত্য খান' এবং পরে 'শুভরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। কুলধর যে গৌড়েশ্বরের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। রায়মুকুট উপাধিধারী পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তিনি সুলতানী আমলে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন। বারবক শাহের পৃষ্ঠপোষিত এই পণ্ডিতের অন্যতম উপাধি ছিল—'রাজপণ্ডিত'।

দ্রব্যগুণের বিখ্যাত টীকাকার শিবদাস সেন লিখেছেন—তাঁর পিতা অনন্ত সেন বরাবক শাহের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এবং গৌড়েশ্বর তাঁকে 'অন্তরঙ্গ' এই পদবী দান করেছিলেন। এছাড়া নারাযণ দাসও বারবক শাহের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন এবং 'অন্তরঙ্গ' উপাধি অর্জন করেছিলেন।

কৃত্তিবাস তাঁর আত্মকাহিনীতে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের যে কয়জন সভাসদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেদার রায় এবং নারায়ণ ছাড়াও জগদানন্দ

রায়, 'ব্রাহ্মণ' সুনন্দ, কেদার খাঁ, গন্ধর্ব্য রায়, তরণী, সুন্দর, শ্রীবৎস্য, মুকুন্দ প্রমুখের নাম পাওয়া গেছে। কেদার খাঁ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সভাসদ ছিলেন। তিনি কৃত্তিবাসের মাথায় 'চন্দনের ছড়া' ঢেলে সংবর্ধনা করেছিলেন। সুন্দর ও শ্রীবৎস্য ধর্মাধিকারিণী অর্থাৎ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী ছিলেন। এবং মুকুন্দ ছিলেন 'রাজার পণ্ডিত'।

বারবক শাহের বিভিন্ন শিলালিপি থেকে অনেক উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন। ওই সকল রাজকর্মচারী ও শাসনকর্তাগণের মধ্যে আজমল খান, নসরৎখান, ইকরার খান, মরাবৎ খান, খান জহান, খুর্শীদ খান, উজৈর খান, অজলকা খান, আশরফ খান, ওরাস্তি খান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বারবক শাহ ধর্মনির্বিশেষে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানগণকে বিভিন্ন রাজপদে নিয়োগ করতেন।

বারবকশাহ যে কেবল নিজেই পণ্ডিত ছিলেন তাই নয়, তিনি অপরাপর হিন্দু মুসলমান কবি এবং পণ্ডিতগণেরও বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদেরকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। হিন্দু কবি ও পণ্ডিতগণের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমান পণ্ডিতগণের মধ্যে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী বারবক শাহের সমসাময়িক একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি "ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী" নামে একখানি ফারসী ভাষার শব্দকোষ লিখে গেছেন। এটি 'শরফ নামা" নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। এতে বারবক শাহের অনেক প্রশস্তি লিপিবদ্ধ আছে। ওই শরফ্‌ নামাতে অনেক মুসলমান কবি ও পণ্ডিতের নাম পাওয়া গেছে যাঁদের মধ্যে আমীর জৈনুদ্দীন হারাওয়ী, মনশূর শিরাজী, মালিক য়ুসুফ বিন হামিদ, সৈয়দ জালাল, আমীর শাহাবুদ্দীন হকীম কিরমানী, সৈঁয়দ হাসান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আমীর জৈনুদ্দীন হারাওয়ী বারবক শাহের সভাকবি ছিলেন এবং তিনি "রাজ কবি" আখ্যায় অভিহিত ছিলেন।

বারবক শাহ বাংলার কবি ও পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষণ করে এবং তাঁদের উৎসাহ দিয়ে বাঙালী জাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

শুধু মুসলমান নয়, হিন্দু কবি ও পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষণ করে সুলতান অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন প্রচলিত

রীতি অনুসারে ফারসী ভাষায় নিজের মুদ্রা প্রকাশ করেছেন অপরদিকে আবার সংস্কৃত ভাষাও নিজের মুদ্রা প্রকাশ করেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উচ্চরাজপদে হিন্দুদের নিয়োগ করে তিনি রাজ্য শাসন ব্যাপারেও উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। বারবক শাহ নিজের চিকিৎসার ভারও হিন্দুদের ওপরেই অর্পণ করেছিলেন। কাজেই সুলতানের সভা যে হিন্দু সভাসদে পরিপূর্ণ থাকবে তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। তাঁর বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান অমাত্য ছিলেন এবং রাজসভায় তাঁদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। যা হোক, এককথায় বারবক শাহ ছিলেন উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সুলতান।

সুলতানী আমলে বাংলাদেশে অনেক হিন্দু বহু উচ্চ রাজপদে কাজ করতেন। বাংলার দুই বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও কবি রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী—এ দুভাই সুলতান হুসেনশাহের দু-হাত ছিলেন বললেও অতিশয়োক্তি হবে না। সুলতানের অধীনে সনাতন গোস্বামী ছিলেন ' দবীর খাস''(বর্তমানের প্রাইভেট সেক্রেটারী অর্থাৎ ব্যক্তিগত সচিব) আর রূপ গোস্বামী ছিলেন 'সাকর মল্লিক' অর্থাৎ সর্বাধিকারী (বর্তমানের চীফ সেক্রেটারী অর্থাৎ মুখ্য সচিব)। সনাতন গোস্বামী কিন্তু হুসেনশাহের আগ হতেই গৌড় সরকারের অধীনে কাজ করে আসছিলেন, এবং তাঁর প্রকৃত নিয়োগকর্তা ছিলেন বাংলার হাবশী সুলতান দাতা ফিরোজ শাহ। ফিরোজশাহ যে কি ধরনের দাতা ছিলেন এবং কি পরিপ্রেক্ষিত সনাতনকে নিয়োগ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে দুটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে।

বাংলার এই প্রথম হাবশী সুলতান ফিরোজশাহ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও নানাগুণে ভূষিত। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানগণের অন্যতম ছিলেন এবং বহু প্রজাহিতকর কাজ করেছিলেন। উদারতা ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা হয় না। ফিরোজশাহ এত বেশি দান করতেন যে তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের সঞ্চিত সমস্ত ধন দৌলত তিনি অতি অল্প দিনের ভেতরেই গরীবদের মধ্যে দান করে নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। কথিত আছে—তিনি একবার একদিনেই এক লক্ষ টাকা গরীবদের মধ্যে দান করে দিয়েছিলেন। তার অমাত্যেরা সুলতানের এরূপ মুক্তহস্তে দান পছন্দ করতেন না। তাঁরা ভাবতেন এই হাবশী বিনা কষ্টে ও বিনা পরিশ্রমে বহু টাকার মালিক হয়ে টাকার মূল্য বুঝতে

পারছেন না। এবং তিনি যাতে টাকার মূল্য বুঝতে পেরে যথেচ্ছ মুক্ত হস্তে দান করতে না পারেন তার জন্য অমাত্যেরা একটি উপায় ঠিক করলেন। তাঁরা একলাখ টাকা একটি ঘরের মেঝেতে খোলা জায়গায় মাটির ওপর এমনভাবে রেখে দিলেন যাতে সুলতান নিজের চোখে ওই টাকা দেখে বুঝতে পারেন যে, এক লাখ টাকার পরিমাণ কত বিরাট। ফলে কথায় কথায় তিনি লাখ টাকা দান করতে চাইবেন না। কিন্তু ফল হল উলটো। দানশীল ফিরোজশাহ ওই টাকা দেখে জিজ্ঞেস করলেন—টাকাগুলো মেঝের ওপর পড়ে আছে কেন? উত্তরে অমাত্যেরা বললেন—এত টাকাই আপনি গরীবদের দান করতে বলেছেন। সুলতান বললেন—এত কম টাকায় কি করে কুলোবে? এর সঙ্গে আরও এক লাখ টাকা যোগ করে তা দরিদ্রদের দান করতে বললেন। এতে অমাত্যেরা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে সব টাকাই ভিখারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এমনই ছিল হাবশী সুলতান ফিরোজশাহের দানের বহর। গল্পটি পুরোপুরি সত্য না হলেও ফিরোজশাহ যে উদার ও দানশীল ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। এ ছাড়া তিনি গুণীজনকে সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করতেন না এবং যোগ্য লেখককে জাতিধর্মনির্বিশেষে যোগ্য স্থানে নিয়োগ করতেন। কথিত আছে—পণ্ডিত সনাতনকে তিনিই প্রথম রাজ-দরবারে খুব উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন।

এই নিয়োগ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। এতে আছে—প্রথমে একজন রাজমিস্ত্রী একটি উঁচু মিনার (ফিরোজ মিনার) তৈরী শেষ করে সুলতানকে দেখতে বলল। সুলতান চূড়ার ওপরে উঠলে ওই মিস্ত্রী গর্বকরে বলল —এর চেয়েও উঁচু মিনার সে তৈরী করতে পারত যদি তার কাছে মালমসলা থাকত। সুলতান তখন রেগে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—মালমসলা ছিলনা তো সে সুলতানের কাছে চাইল না কেন?—তখন রাজমিস্ত্রী কোনো উত্তর দিতে না পারায় সুলতান ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তাকে 'মিনারের চূড়া' থেকে নীচে ফেলে দিলেন। এতে রাজমিস্ত্রী মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ হারাল।

সুলতান চূড়া থেকে নেমে এসেই তাঁর প্রিয় ভৃত্য হিঙ্গাকে তখনই মোরগাঁয়ে যেতে বললেন। সে সঙ্গে সঙ্গে মোরগাঁয়ের দিকে রওনা হল। কিন্তু কেন যেতে হবে সে কথা সুলতানকে জিজ্ঞেস করতে হিঙ্গা সাহস পেল না। কারণ তিনি সে সময়ে ভীষণ রেগে রয়েছিলেন। যাহোক, উক্ত গাঁয়ে পৌছে

ভৃত্য হিঙ্গা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল—তাকে কেন সেখানে পাঠানো হল। কিন্তু সে কিছুতেই পাঠানোর কারণ বুঝে উঠতে পারল না এবং হতাশ হয়ে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগল। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা হল একজন ব্রাহ্মণ যুবকের। হিঙ্গা যুবককে তার সমস্যার কথা সব খুলে বলল—যুবক তখন জানতে চাইল, মিনার থেকে রওনা হওয়ার ঠিক আগেই কি ঘটনা ঘটেছিল। হিন্দু যুবককে পুনরায় সবই গোড়া থেকে বলল। যুবক সব শুনে তাকে বলল—সুলতান তোমাকে নিশ্চয়ই ভাল রাজমিস্ত্রী নিয়ে যেতে বলেছেন। কারণ মোরগাঁয়ে সে সময়ে অনেক সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী বাস করত। হিঙ্গা তখন যুবকের কথা যুক্তিপূর্ণ মনে করে কয়েকজন খুব ভাল রাজমিস্ত্রী সংগ্রহ করে তাদের সুলতানের কাছে নিয়ে গেল।

এদিকে সুলতানের মেজাজ এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন—সত্যিই তো হিঙ্গাকে কি করতে হবে তা না বলেই মোরগাঁয়ে পাঠালেন কেন? ঠিক এমন সময়ে হিঙ্গা রাজমিস্ত্রীদের নিয়ে সুলতানের সামনে এসে হাজির হল। সুলতান তো হিঙ্গার সঙ্গে রাজমিস্ত্রীদের দেখেই অবাক্। তিনি হিঙ্গাকে জিজ্ঞেস করলেন—সে কি করে সুলতানের মনের কথা জানল? হিঙ্গা তখন সুলতানকে সব খুলে বলল এবং জানাল যে, এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকের পরামর্শমতই তাঁর পক্ষে সুলতানের মনের কথা না জেনেও এরূপ কাজ করা সম্ভব হয়েছে। ফিরোজশাহ যুবকের প্রশংসা করলেন এবং তাকে ডেকে এনে রাজদরবারে একটি খুব উঁচুপদে নিয়োগ করলেন। ওই যুবক আর কেউ নন, তিনিই ছিলেন বিখ্যাত সনাতন গোস্বামী। হিঙ্গা যেসব রাজমিস্ত্রী এনেছিলেন সুলতান তাদের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত মিনারের উচ্চতা আরও অনেক বাড়িয়েছিলেন। সুলতান পূর্বোক্ত রাজমিস্ত্রীর বাচালতা ও বেয়াদবী সহ্য করতে না পেরেই মিনারের চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে তাকে বধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য ওই মিনারের পাশেই তার কবর দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজমিস্ত্রী বধের মত কাজটি সুলতানের পক্ষে নিষ্ঠুর হলেও তদানীন্তন একজন সুলতানের পক্ষে তা অস্বাভাবিক হয়নি, যদি রাজমিস্ত্রী বধের ঘটনাটি আদৌ ঐতিহাসিক হয়ে থাকে।

পরবর্তীকালে আলাউদ্দীন হুসেনশাহেব অন্যতম মন্ত্রী হয়েছিলেন এই 'সাকর মল্লিক' সনাতন। ফিরোজশাহের রাজত্বের মাত্র চার বছর পরেই হুসেনশাহের

রাজত্বকাল শুরু হয়। এবং এটা খুবই সম্ভব যে, পরম বৈষ্ণব পণ্ডিত রূপ গোস্বামীর অগ্রজ বৈষ্ণব পণ্ডিত সনাতন গোস্বামী হুসেনশাহের সিংহাসন আরোহণের বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই গৌড় দরবারে চাকরি করতেন।

বাংলার হুসেনশাহী আমল জাতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতার এক বিশিষ্ট যুগ। হুসেনশাহের সিংহাসনে আরোহণের সময় হতে বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবজ্জ্বল যুগের সূচনা হয়। এই যুগে বাঙালী জাতির মনীষা ও সৃজনীশক্তি এক চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বাংলার স্বাধীন শাসকবর্গের মধ্যে হুসেনশাহ ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয়। তিনি একদিকে যেমন বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুদক্ষ শাসক ছিলেন অপরদিকে তেমনি উদার, ন্যায়পরায়ণ, শিল্প ও সংস্কৃতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমদৃষ্টি দেওয়ার জন্য এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর প্রজাগণই তাঁকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন। গৌড়ভূমিতে হুসেনশাহের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অস্ত্রশস্ত্রেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁকে কলিকালের কৃষ্ণ বলা হত। এ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে—

নৃপতি হুসেনশাহ হঞে মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যাঁর পরম সুখ্যাতি ॥
অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত, মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার ॥

(বাংলা সরকার, পুঁথি প্রথম অধ্যায়)

মধ্য যুগে বোধ হয় সম্রাট আকবর ছাড়া আর কোনো শাসকের পক্ষে প্রজাদের কাছ থেকে হুসেন শাহের মতো এরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, আন্তরিক ভালবাসা ও আনুগত্য লাভ করা সম্ভব হয়নি। এবং তাঁর মধ্যে যে সব মানবিক গুণের সমাবেশ হয়েছিল তা খুব কম শাসকের চরিত্রেই দেখা গেছে। তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে অনেক প্রজাহিতৈষী কাজ করে গেছন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্যলীলা, ২৫শ পরিচ্ছেদ) লিখে গেছেন যে, রাজা হবার আগে সৈয়দ হুসেন গৌড় অধিকারী গৌড়ের প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকরি করতেন।

হুসেনের কাজে ত্রুটি হওয়ায় সুবুদ্ধি রায় একদিন তাঁকে চাবুক মেরেছিলেন

এ সত্ত্বেও হুসেন সুলতান হয়ে সুবুদ্ধি রায়ের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে অর্থাৎ তাঁর প্রতি কোন প্রকার প্রতিশোধ না নিয়ে বরং তাঁর পদমর্যাদা বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু বেগম একদিন সুলতানের দেহে চাবুকের দাগ আবিষ্কার করে সুবুদ্ধি রায়ের চাবুক মারার কথা জানতে পারেন এবং তাঁর প্রাণ বধ করার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করেন। সুলতান হুসেনশাহ এতে অসম্মতি প্রকাশ করলে বেগম তখন সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করতে বলেন, এতেও তিনি প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেগমের পীড়াপীড়িতে হুসেনশাহ সুবুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়ার (বদনার) জল দেওয়ান। ফলে তাঁর জাতি নষ্ট হয় মাত্র। সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণ বধ না করা ও প্রথমে জাতিনাশে অনিচ্ছা প্রকাশের মাধ্যমে সুলতান হুসেনশাহের সহনশীলতারই পরিচয় মেলে। বাংলার অনেক মুসলমান শাসক হিন্দুদের রাজকার্যে নিয়োগ করেছেন। সুলতান হুসেনশাহ হিন্দুদের শুধু যে রাজকার্যেই নিয়োগ করতেন তাই নয়, তিনি তাঁদের উপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও সৈন্য পরিচালনার ভার দিতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। তাঁর বন্ধু, সভাসদ, মন্ত্রী ও দেওয়ানদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু। বাংলার লোকেরা হুসেন-শাহের গুণগান করে মুখে মুখে ছড়া রচনা করতেন। যেমন—

"বাদশা ছিলেন হুসেনশাহ্ জাতিতে পাঠান,
হিন্দু তার পাত্রমিত্র উজীর দেওয়ান।"

বাংলার দুই বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও কবি রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী—এই দুভাই সুলতান হুসেনশাহের দুহাত ছিলেন বললেও অতিশয়োক্তি হবে না।

সনাতন গোস্বামী যে হুসেনশাহের কছে কত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁরা সরকারের কি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ থেকে জানতে পারা যায়। যেমন—সনাতনের আর রাজকার্য ভাল না লাগায় চৈতন্যদেবের প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে সর্বদা ধর্মালোচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে একবার স্বাস্থ্যভঙ্গের অছিলায় তিনি রাজকার্য ছেড়ে নিজগৃহে বসে শাস্ত্র-আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন এবং বিশ-ত্রিশজন পণ্ডিত নিয়ে ভাগবত পাঠের সভা বসাতে আরম্ভ করলেন। একদিন গৌরাধিপ হুসেনশাহ একজন লোক সঙ্গে নিয়ে সনাতন গোস্বামীর উক্ত সভায় উপস্থিত হলেন। তখন উপস্থিত সকলে সুলতানকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে

রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব পণ্ডিত রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এজন্য হুসেনশাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দান করেছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিকের ধারণা এউপাধি বারবকশাহ দিয়েছিলেন। মালাধর বসুর বংশধরগণ বহুদিন গৌড় দফতরে কাজ করে গেছেন। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' হুসেনশাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল। কবি বিজয় গুপ্তের লেখা 'মনসামঙ্গল' এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য এই সময়কার রচনা।

শ্রীখণ্ড অঞ্চলের বহুবৈদ্য গৌড় সরকারের অধীনে কাজ করতেন। এঁর মধ্যে মহাকবি দামোদরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি সুলতানের দরবার থেকে যশোরাজ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দ দাস কবিরাজ দামোদরেরই দৌহিত্র ছিলেন। যশোরাজ খান তাঁর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতাই বাংলাদেশে সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণ এবং সাধারণ সাহিত্য চর্চা চলতে থাকে। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে সম্ভবতঃ মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারা বাংলাদেশে ভাগবতের প্রসার হয়েছিল। গৌড় দরবারের কর্মচারীদের মধ্যেই প্রথম ভাগবতের আদর হয়। মালাধর বসুর. 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভগবত অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। এবং এই সময় দবীর খাস সনাতনের জন্য লিখিত ভাগবতের পুঁথি পাওয়া গেছে। হুসেন শাহের সমসাময়িক মুসলমান পণ্ডিত মহম্মদ বুদাই উর্ফ সৈয়দ মীর অলাওয়ী ফারসী ভাষায় ধুনর্বিদ্যা বিষয়ক একটি বই লিখেছিলেন। এটির নাম হিদায়ৎ-অল-রামী। লেখক এই বইখানি হুসেনশাহকে উৎসর্গ করেছিলেন। এটির তৃতীয় খণ্ডে হুসেনশাহের সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রশস্তি আছে। এবং এই বইয়ের পুঁথি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এছাড়া সমসাময়িক মুসলমান কবি সেখ কুৎবন তাঁর 'মৃগাবতী' কাব্যে হুসেনশাহের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এই হুসেনশাহের সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

এই সুলতানী আমলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার নিমিত্ত বহুস্থানে টোল বা চতুষ্পাঠি ছিল। সেখানে কাব্য অলঙ্কার, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি পড়ান হত।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকের মতেই সুলতান হুসেনশাহ ধর্মান্ধ ছিলেন না এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। হুসেনশাহের রাজত্বকালেই চৈতন্যদেব ও তাঁর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও পূর্ণবিকাশ লাভ ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, তিনি একবার চৈতন্যদেবের মহিমা স্বীকার করে তাঁর পূর্ণ নিরাপত্তার বিধান করেছিলেন। এর দ্বারা সুলতানের ধর্মনিরপেক্ষতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুগণের নিয়োগও তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় বাহক।

হুসেনশাহের রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামের খুব কাছেই ছিল। সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু কয়েকদিন অপেক্ষা করেছিলেন। সে কয়েক-দিন ভক্তদের মনেও কোনো প্রকার ভয়ের কারণ ছিল না। কিন্তু হুসেনশাহ যদি ধর্মান্ধ বা হিন্দুধর্মবিদ্বেষী হতেন তা হলে এটা সম্ভব হত না।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে লিখেছেন—

"গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে একগ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজতার রামকেলি নাম॥
দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
আসিয়া রহিলা যে কেহো নাহি জানে॥
নিকটে যবন রাজা পরম দুর্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥"

এই রামকেলি গ্রামে আজও চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন যুগল ভক্তগণ দ্বারা পূজিত হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয়—নিকটেই গৌড়ের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ও অনেকগুলি মসজিদ আছে। এখানেই কদম রসুল নামে একটি বিখ্যাত ভবনের প্রকোষ্ঠে একটি কালো কারুকার্য খচিত মর্মর বেদীর ওপর হজরত মহম্মদের পবিত্র পদচিহ্ন উৎকীর্ণ একটি পাথর আছে যা প্রতি দর্শকই বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দর্শন করেন। এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমান ধর্মে পদচিহ্ন পূজোর একটি অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

নীলাচল থেকে গৌড়ে এসে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। তিনি গৌড়ের অনতিদূরে রামকেলি গ্রামে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন এবং সর্বদা ভক্তদের নিয়ে হরিগুণগানে বিভোর থাকেন। হুসেনশাহ রামকেলি গ্রামে চৈতন্যদেবের আগমনের কথা জানতে পারেন। এবং এক কটোয়াল গিয়ে

সুলতানকে এক অতি উচ্ছ্বসিত ভাষায় চৈতন্যদেবের রূপগুণ ও আচরণের বিবরণ দেন। সুলতান তাঁর কথা শুনে কেশব খানকে ডেকে বললেন—"তোমরা চৈতন্য বলে যাকে বলছ তার কথা কেমন এবং সে কি ধরনের মানুষ। তুমি অবশ্যই বল সে কেমন গোসাই যাকে দেখবার জন্য চতুর্দিক থেকে লোক আসছে এবং কি জন্যে আসছে তা আমাকে ভালভাবে বল।" তখন পাছে সুলতানের কাছে চৈতন্যদেবের গুণগান করলে সুলতানের ঈর্ষা হয় সেই নিমিত্ত পরম সজ্জন কেশব খান ভয় পেয়ে আসল কথা লুকিয়ে বলেন—

কে বলে গোসাঞি, এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরীব বৃক্ষের তলবাসী॥"

এ কথা শুনে সুলতান হুসেনশাহ্ যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হল—

"রাজা বোলো গরিব না বোলো কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলেও কানে॥
হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ' খোদায় যবনে।
সেই তিহোঁ নিশ্চয় জানিহ সর্বজনে॥"

উক্ত অধ্যায়ে সুলতান আরও বললেন—"তার নিজের রাজ্যে কত লোক তাঁকে মনে মনে মন্দ করতে চাইছে অথচ সকল দেশের লোকেরা চৈতন্যদেবের আজ্ঞা পালন করছে কায়মনবাক্যে।" কাজেই তিনি যদি ঈশ্বরই না হবেন তবে বিনা কারণে লোকে তাঁকে ভজনা করবেন কেন? অতএব তিনি খাঁটি ঈশ্বর তাঁকে যেন কেউ গরীব না বলে।

সুলতান আরও বললেন—"কেউ যেন চৈতন্যদেবকে উপদ্রব না করে। তিনি যেখানে খুশী সেখানে থাকুন এবং নিজের শাস্ত্রমতো বিধান দিন। ইচ্ছা করলে তিনি সকলকে নিয়ে কীর্তনও করতে পারেন অথবা মনে করলে নির্জনেও কাল কাটাতে পারেন। কাজী বা কোটাল বা অন্য কোনো জনে তাঁকে যদি কিছু বলে তাহলে তিনি তার জীবন সংহার করবেন।" এই প্রসঙ্গেই বৃন্দাবন দাস মশায় চৈতন্য ভাগবতের উক্ত অধ্যায়ে লিখেছেন—

"রাজা বোলো, এই যুক্তি বলিল সভারে।
কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে॥

যেখানে তাহান ইচ্ছা করুন কীর্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয়, তাঁর মন ॥
কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোনো জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে ॥"

চূড়ামণি দাস তাঁর গৌরাঙ্গ বিজয়ে লিখেছেন—"হুসেন শাহ চৈতন্যদেবকে নিজের চোখে দেখেছিলেন। তাঁর মতে, মহাপ্রভু যখন পিতার পিণ্ড দিতে গয়া যাচ্ছিলেন তখন তিনি গৌড় হয়ে যান। এবং এক অজুত পদ্ম কিনে এনে মন্ত্র উচ্চারণ সহ সেই পদ্মগুলি গঙ্গায় উৎসর্গ করলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গঙ্গা আরও অসংখ্য পদ্মে ছেয়ে যায় এবং একটু ও ফাঁকা থাকে না। বহুলোক সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সুলতান হুসেনশাহও এ সংবাদ শুনে পাত্রমিত্র সহ গঙ্গায় এসে ওই অলৌকিক দৃশ্য দেখে অবাক্ হয়ে যান। তখন—

সুলতান কহে শুন অহে পাত্রমিত্র।
এসব মানুষি নহে, গোসাঞী চরিত্র ॥
এক এক পদ্ম হৈল লাখ লাখ দলে।
দেখি পদ্মময় গঙ্গা ন দেখি এ জলে ॥

এ কাহিনীটি অনেকটা গল্পের মতো মনে হলেও এটা আংশিক সত্য। এবং চৈতন্যদেব গয়া যাবার পথে যে গৌড় হয়ে গিয়েছিলেন তার উল্লেখ জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলেও আছে। এ ছাড়া এটা সত্য যে. হুসেন শাহ চৈতন্যদেবের কোনো ক্ষতি করেননি এবং তাঁর চলার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়—তিনি তা চাননি। তবে বৃন্দাবন দাসের মতে চৈতন্যদেবকে কাজী কোটাল বা অন্য কেউ কিছু বললে হুসেনশাহ যে তাকে বধ করবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন এ কথা একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ সুলতান হুসেনশাহ ধর্মোন্মাদ ছিলেন না। তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ প্রচারে তাঁর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না বরং তাঁকে বাধা দিলে এবং তাঁর হিন্দু প্রজারা অসন্তুষ্ট হলে রাজ্যের ক্ষতি হতে পারে—এ কথা বোঝার মতো দূরদর্শিতা সুলতানের ছিল। কাজেই তিনি হিন্দু প্রজাদের মনজয়ের উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেবের নিরাপত্তাবিধান করারই পক্ষপাতী ছিলেন। তবে বৃন্দাবন দাসের লেখা অনুসারে হুসেন শাহ চৈতন্যদেবকে ভগবান বলে স্বীকার করুন আর

নাই করুন, মহাপ্রভু যে হুসেনশাহের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

হুসেনশাহই হিন্দু মুসলমান প্রীতির নিমিত্ত সত্যনারায়ণ এবং পীরের মিলিত নাম অর্থাৎ সত্যপীরের পূজা প্রবর্তন করেন বলে অনেকে মনে করেন। তবে এ বিষয়ে অনেক মতানৈক্য আছে। নগেন্দ্র নাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষে' (অষ্টাদশভাগ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৬০) লিখেছেন—"…সত্যনারায়ণের কথায় যে 'আ:লা' বাদশাহের উল্লেখ আছে, তাহাকে আমরা আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বলিয়া মনে করি। হুসেনশাহ হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখতেন; তাঁহার উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহারই যত্নে সত্যপীরের পূজা প্রবর্তিত হয়।"

সত্যপীর হিন্দুদেবতা সত্যনারায়ণের যে বিকল্প সংস্করণ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। আজও বাংলা দেশের হিন্দুগণ সত্যনারায়ণের 'সিন্নি' কথাটা ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়—অন্য দেবদেবীর প্রসাদকে কিন্তু সিন্নি বলা হয় না। দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' নামক বইয়ে লিখেছেন—হুসেনশাহই সত্যপীর পূজোর প্রবর্তক। তবে এবিষয়ে মতানৈক্য আছে। যাহোক, সুলতান হুসেনশাহ যে ধর্মান্ধ ছিলেন না তাও রমেশ মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ পৃঃ ৯৪) থেকে জানা যায়। এতে অছে—"হুসেনশাহ যে উৎকট রকমের হিন্দু বিদ্বেষী বা ধর্মোন্মাদ ছিলেন না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদি ধর্মোন্মাদ হইতেন, তাহা হইলে নবদ্বীপের কীর্তন বন্ধ করায় সেখানকার কাজী ব্যর্থতা বরণ করার পর স্বয়ং অকুস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং বলপূর্বক কীর্তন বন্ধ করিয়া দিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে কয়েকজন মুসলমান হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্য চরিত গ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় যে, শ্রীবাসের মুসলমান দর্জি চৈতন্যদেবের রূপ দেখিয়া প্রেমোন্মাদ হইয়া মুসলমানদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া হরিনাম কীর্তন করিয়াছিল; উৎকল সীমান্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের ভক্ত হয়ে পড়েছিল; ইতিপূর্বে নির্যাতিত যবন হরিদাস হুসেনশাহের রাজত্বকালে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং নবদ্বীপে নগর সংকীর্তনের সময়ে সম্মুখের সারিতে থাকিতেন।

তাহার পর হুসেনশাহেরই রাজত্বকালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও তাঁহার পুত্র ছুটি খান হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারত শুনিতেন। হুসেনশাহের রাজধানীর খুব কাছেই রামকেলি, কানাই নাটশালা প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করিতেন। ত্রিপুরা অভিযানে গিয়া হুসেনশাহের হিন্দু সৈন্যরা গোমতী নদী তীরে পাথরের প্রতিমা পূজা করিয়াছিল। হুসেনশাহ ধর্মোন্মাদ হইলে এ সব ব্যাপার সম্ভব হইত না। আসল কথা—হুসেনশাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতি চতুর নরপতি। হিন্দুধর্মের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষের পরিচয় দিলে অথবা হিন্দুদের মনে বেশী আঘাত দিলে তাহার ফল যে বিষময় হইবে, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই তাঁহার হিন্দুবিরোধী কার্যকলাপ সংখ্যায় অল্প না হইলেও তাহা কোনদিনই একেবারে মাত্রা ছাড়াইয়া যায় নাই।[৯]

হুসেনশাহের পুত্র নসরৎশাহ পিতার ন্যায় উদার ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি পিতার সুকীর্তি ও ঐতিহ্য সর্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মীয় উদারতা এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা তিনি পিতার সুযোগ্য পুত্র হিসেবেই পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর আদেশে চট্টগ্রামের রাজকর্মচারী ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর লিখেছেন—

শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরৎখান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান॥

কবিশেখর দেবকীনন্দন সিংহ নসরৎশাহের অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। নসরৎশাহ ও হুসেনশাহ যে কি ধরণের প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন সে সম্পর্কে শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের কোনো কোনো পুঁথিতে নিম্নলিখিত দুধরনের উক্তি পাওয়া গেছে।

(ক) নসরৎশাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেনশাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

(খ) নসরৎশাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা॥

নৃপতি হুসেনশাহ্ তনয় সুমতি।
সামদান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

হুসেনশাহের বংশধরদের আমলেও বাংলার আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিশেষ ব্যহত হয়নি। ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁরা মোটামুটি সহনশীলতারই পরিচয় দিয়েছেন। সাতগাঁওর জামী মসজিদের অনতিদূরেই চৈতন্যদেবের ভক্ত ও ও নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদ উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট অবস্থিত ছিল এবং এখনও আছে। নসরৎশাহের রাজত্বকালে উদ্ধারণ দত্ত ও সাতগাঁওএর অনেক বণিক নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে দিবারাত্র বিনা বাধায় কীর্তন করতেন। চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার।
শত বৎসরেও তার নারি বর্ণিবার॥

নসরৎশাহের রাজত্বকালে ধর্ম বিষয়ে যে উদার নীতি পালিত হত তার আর একটি প্রমাণ—ওই সময়ে অনেক মুসলমানও স্বেচ্ছায় নিত্যানন্দের কাছে শরণ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের নয়নের প্রেমবারি দেখে ব্রাহ্মণগণও নিজেদের ধিক্কার দিয়েছিলেন। উক্ত অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন ধিক্কার॥

কিন্তু ওই সকল মুসলমানকে এবং জামী মসজিদের অনতিদূরে কীর্তন করা সত্ত্বেও কীর্তনকারীদের কোনো প্রকার শাস্তি দেওয়া হয়নি।

নসরৎশাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজশাহ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অল্পকাল রাজত্ব করলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ফিরুজশাহ শ্রীধর ব্রাহ্মণকে দিয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লিখিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি শ্রীধর কবিরাজকে দিয়ে 'কালিকা মঙ্গল' কাব্যও লিখিয়েছিলেন। এতে কালীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত ছিল। গিয়াসুদ্দীন মাহমুদশাহের রাজত্বকালে ফরাস খান নামে একজন রাজপুরুষ একটি সেতু নির্মাণ করিয়েছিলেন তার ওপর সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি উৎকীর্ণ করা ছিল।

ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড় শহরে অনেক হিন্দু মন্দির ও দেববিগ্রহ পাওয়া গেছে।

এগুলির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সুলতানী আমলে গৌড়ে হিন্দুদের ধর্মচর্চার অবাধ অধিকার ছিল। শুধু তাই নয়, গৌড়ের নিকটেই রামকেলি গ্রাম ছিল হিন্দুধর্মচর্চার বিশিষ্ট স্থান এবং এটি এখনও বিদ্যমান আছে।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, হুসেনশাহী বংশের সুলতান সহ বাংলার অধিকাংশ সুলতানই ধর্মবিষয়ে গোঁড়া মনোভাব পোষণ করেননি। কিছুসংখ্যক মুসলমান শাসক হিন্দুরাজাদের রাজ্যে যুদ্ধাভিযানের সময় যে সব মন্দির ও দেববিগ্রহ ধ্বংস করেছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষই তার একমাত্র কারণ ছিল না। তখন মন্দিরে ও দেবতার মূর্তিগুলির মধ্যে যে সকল ধনরত্ন থাকত সেগুলি হস্তগত করার জন্যও অনেক সময় মন্দির ধ্বংস করা হত। তবে এই ধ্বংস সম্পর্কে কখনও কখনও অতিরঞ্জিত সংবাদও লিপিবদ্ধ হয়েছে; যেমন, হুসেনশাহ থেকে আরম্ভ করে অনেক সুলতান ওড়িশার অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বলে যে সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে তা আদৌও সত্য নয়। কারণ তাঁরা ওই সকল মন্দিরের গায়ে সামান্য আঁচড় কাটার চেয়ে আর বেশী কিছু করতে পারেননি। এবং তখন ওই সকল মন্দির ধ্বংস করার জন্য যত মজুরের দরকার তা পাবার কোনো উপায় ছিল না। এ ছাড়া সুলতানগণ যদি ওড়িশার অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করতেন তবে বর্তমানে সেখানে আর এত অধিক সংখ্যায় মন্দির পরিলক্ষিত হত না। বাংলার তদানীন্তন সুলতানদের মধ্যে দুএকজন বাদে আর কেউই নিজেদের রাজ্যে মন্দির ও দেববিগ্রহ ধ্বংসের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না বলেই মনে হয়। কারণ মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে আঘাত দিয়ে হিন্দুপ্রজা ও হিন্দু রাজকর্মচারীদের মন বিষিয়ে দিলে তার সুদূর প্রসারী ফল যে মোটেই ভাল হবে না একথা তাঁরা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এছাড়া বাংলার সুলতানী আমলে অধিকাংশ হিন্দুগন্ধী জায়গার নাম অপরিবর্তিত ছিল অর্থাৎ সেগুলিকে মুসলমানী নাম দেওয়া হয়নি। কাজেই এসকল বিষয়ে সুলতানগণের সহিষ্ণু মনোভাবেরই পরিচয় মেলে।

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বিশেষ করে হুসেনশাহী সুলতানদের সময়ে বাংলার হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যেকার তুচ্ছ বিভেদ ও ঘৃণ্য বৈরীভাব দূরীভূত হয়ে ক্রমেই সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ধর্মান্ধ কাজী ও গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতরাও তাঁদের বিভেদ ভুলে গিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রাতির স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গ্রাম সম্পর্কীয় আত্মীয়তা স্থাপিত হতে

থাকে। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে লেখা আছে—নবদ্বীপের কাজী চৈতন্যদেবকে বলেছিলেন—

গ্রাম-সম্বন্ধে (নীলাম্বর) চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায়—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যেকার সম্প্রীতির জন্যই অনেক মুসলমান হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করে অশ্রুবিসর্জন করতেন। এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাস উক্ত ভাগবতের মধ্য খণ্ডের ৩য় অধ্যায়ে লিখেছেন—

যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে॥

তিনি চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও লিখেছেন—

যবনেহ যার কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে।
ভজ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে॥

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে সৈয়দ সুলতান লিখে গেছেন—হুসেনশাহের রাজত্বকালে লস্কর পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলা ভাষায় যে মহাভারত রচনা করে গিয়েছিলেন তা বাংলার অনেক মুসলমানের ঘরে ঘরে পড়া হত। তিনি লিখেছেন—

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি॥
হিন্দু-মুসলমান তা এ ঘরে ঘরে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ রমেশ মজুমদার মশায়ের বাংলা দেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) থেকে জানা যায়—যে সকল নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা আরবী জানত না এবং যদিও কেউ কেউ সামান্য ফারসী জানত, তথাপি মুসলমান ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে এই অবস্থা ছিল তা দুজন মুসলমান লেখকের রচনা থেকে

জানা যায়। একজন লিখেছেন যে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা না বোঝে আরবী না বোঝে নিজের ধর্ম—গল্পকাহিনী প্রভৃতি নিয়ে তারা মত্ত থাকে। আর একজন মহাভারতের বাংলা অনুবাদ সম্বন্ধে লিখেছেন—

হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে॥

এ সকল ঘটনার দ্বারা এটা ভালভাবেই প্রমাণিত হয় যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয়েছিল তার সূচনা হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমল থেকেই। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদকুলী খানের নবাবী আমলে বাংলা দেশে হিন্দু জমিদারের উৎপত্তি হয়েছিল। তিনি গুণের আদর করতেন। তাঁর আমলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর অনেক হিন্দু ফারসী ভাষায় উত্তররূপে অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজেদের কর্মকুশলতার বলে অনেক উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ফলে নবাবী আমলে হিন্দুদের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার নবাবের বিশেষ অনুগ্রহে জমিদারী লাভ করে অথবা বিশেষ কর্মদক্ষতা দেখিয়ে বহুধন অর্জন করে রাজা মহারাজা প্রভৃতি খেতাবে ভূষিত হতেন। ফলে জগৎ শেঠের ন্যায় ধনী হিন্দুরা ক্রমে নবাবের দরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলীর পরবর্তী নবাবরাও এই নীতি অনুসরণ করে চলার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হিন্দুদের মধ্যে এক অভিজাত গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।

নবাব মুর্শিদকুলী খানের অধীনে ছোট বড় জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে বক্সী, সরকার, চাকলাদার, তরফদার, হালদার, লস্কর, দস্তিদার, কাননগো প্রভৃতি উপাধিধারী যে সকল লোক দেখা যায় তাঁদের পূর্বপুরুষগণ নবাবী আমলে ওই সকল রাজকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

নবাব আলীবর্দীর শাসনকালে হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছিল। তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরাও নবাবের খুব অনুগত ছিলেন এবং নবাবকে রাজ্যের স্থিতি ও শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করতেন। এঁদের মধ্যে দুর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, কিরীট চাঁদ, জানকী-রাম, রামনারায়ণ, উমিদরায়, রামরাম সিংহ এবং গোকুল চাঁদের নাম বিশেষ

ভাবে উল্লেখযোগ্য। আলীবর্দী বহু হিন্দুকে উচ্চ সামরিক পদে নিয়োগ করেছিলেন এবং কেউ কেউ সাতহাজারী মনসবদার পদেও উন্নীত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে অনেক হিন্দু সেনানায়ক নবাব আলীবর্দীকে ওড়িশার যুদ্ধে ও আফগান বিদ্রোহ দমনে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে কিছু হিন্দু রাজা ও ধনী ব্যক্তি যেমন রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ প্রমুখের সঙ্গে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত ঘটেছিল। তবে মুসলমান হয়েও মীরজাফর স্বার্থান্বেষী কূটচক্রী ইংরেজদেব সঙ্গে ষড়যন্ত্রপূর্বক বিশ্বাস-ঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে বাংলার স্বাধীনতা সূর্যকে অস্তমিত করতে সাহায্য করলেও মোহনলালের মতো বিশ্বস্ত হিন্দু সেনানায়ক সিরাজের পাশে থেকে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের অনেক নবাবের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তাই অনেকে হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। আলীবর্দীর ভাইপো শাহমত জং ও সওলাল জং একবার সাতদিন মতিঝিলের বাগানে হোলি উৎসব পালন করেছিলেন। এতে প্রচুর রঙিন আবির ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

আলি নগরের সন্ধির পর সিরাজদ্দৌলা মনসুরা গঞ্জের প্রাসাদে হোলি উৎসব পালন করেছিলেন.। মিরজাফরও হোলি উৎসবে যোগদান করেছিলেন এবং মৃত্যুশয্যায় কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করেছিলেন বলে জানা গেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ ২য় খণ্ড পৃঃ ৯৫৬—৯৫৭ : "বৌদ্ধযুগে শিক্ষা সার্বজনীন ছিল। যে কোন জাতির লোক শ্রমণ হইতে পারিতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু সর্বজনের মধ্যে দৃষ্ট হইত। বৌদ্ধ সংস্কারগুলি কতক পরিমাণে এখনও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যে কোন জাতি এখনও বৈষ্ণব হইতে পারেন। মুসলমানদের জন্যও তাঁহারা অর্গল বন্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতন্য যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী যুগেও এই উদারতা অনেক পরিমাণে বজায় ছিল এবং এখনও আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গারাম মৈত্র নামক কুলীন ব্রাহ্মণ এক মুসলমানী ও তাহার ভ্রাতা আবদুলকে বৈষ্ণব করিয়া ভূষণা ও রূপদয়াল নাম রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহা লইয়া বৈষ্ণব সমাজে কোন বিবেশ গোলমাল হয় নাই। (সামাজিক

ইতিহাস, ১৫৪ পৃঃ) মুসলমান হরিদাস, মুসলমান ভাবাপন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতিচ্যুত রূপ সনাতন বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। মুসলমান সেনাপতি এবং আরবী ফারসী প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিজলী খাঁ, শ্রীবাসের বাড়ীর মুসলমান দরজী প্রভৃতির বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ চৈতন্য প্রভুর সময়েই তাঁহার প্রভাবে ঘটিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্যামানন্দ ধারেন্দা বাহাদুরপুর নামক স্থানে শের খাঁ নামক শক্তিশালী মুসলমান দস্যুকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিম্নজাতি বৈষ্ণবদলে এত ঢুকিয়াছিল যে, তাহারাই এখন 'জাত-বৈষ্ণব' দলের প্রধান শক্তি। সহজিয়া বৈষ্ণব দলে হিন্দু ও খৃষ্টান, মুসলমান সর্ব্বজাতির একটা উৎকট সমন্বয় হইয়াছিল। সমাজের নিম্নস্তরে সহজিয়ারা বৌদ্ধ সংস্কার এখনও বজায় রাখিয়াছে। সহজিয়াদের গুরু অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ঢাকা জেলায় রোয়াইল গ্রামের নিকট থারারবাসী পঞ্চুফকির মুসলমান—শত শত হিন্দু তাঁহার শিষ্য। সহজিয়াদেরসাহেব ধনী সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন মুসলমান। তাঁহারই নামে সম্প্রদায়টির নাম হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের নিকট সালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের প্রধান আড্ডা। ইহারা জাতিভেদ একেবারেই মানেন না। হিন্দু ও মুসলমান এক থালায় বসিয়া খান। ইহারা বিগ্রহ পূজা করেন না এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ গাঢ় রূপে অনুরক্ত যে পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইতে পারেন। দরবেশী সম্প্রদায় সনাতন কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ প্রবাদ আছে। রামকেলীর নিকট চৈতন্যের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হুসেনশাহের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া পলায়নপর সনাতন কিয়ৎকালের জন্য দরবেশের ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এই হেতুতে প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। দরবেশী সম্প্রদায়ের মুল শিক্ষা—

"কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান,
মিল জুলকে কর সাঁইজীকো নাম।"
(হিন্দুই বা কি, মুসলমানই বা কি,
একত্র মিলিত হইয়া সাঁইজীর নাম কর)।

এখানে সাঁইজী শব্দ সনাতন গোস্বামীকে বুঝাইতেছে। সাঁইজি গোঁসাইজি শব্দের অপভ্রংশ। হজরতি সম্প্রদায়ের নেতা হজরতের বাড়ী ছিল

বাঁশবেড়িয়া। পাগলমাথী ও গোবরা সম্প্রদায়ের উক্ত নামধেয় নেতৃদ্বয়ও মুসলমান ছিলেন। প্রথমোক্তের বাড়ী মুরাদপুর এবং দ্বিতীয়টির নিবাস ছিল নাগদা গ্রামে। রামবল্লভী সম্প্রদায় জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তা ছাড়া প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে তাঁহারা সর্বধর্ম সমন্বয়ের কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি গান এইরূপ—

"কালী-কৃষ্ণ-গড-খোদা,
কোন নামে নাহি বাধা,
বাদীর বিবাদ দ্বিধা,
তাতে নাহি টল,
মন কালী-কৃষ্ণ-গড-খোদা বলরে।"

ইহারও পূর্বে বঙ্গের ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন—

"মগে বলে ফারা,
তারা, 'গড' বলে ফিরিঙ্গী যারা,
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।"

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ঔদার্য এবং সম্পূর্ণ রূপে সংস্কার শূন্যতা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।"

"অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও আমরা বহু হিন্দুকে শাসন বিভাগের শেখর দেশে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ঢাকার দেওয়ান যশোবন্তরাও নবাব সরফরাজ খাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি এই সময়ের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ চরিত্র। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি পূর্ববঙ্গে প্রবাদ বাক্য হইয়া আছে। তাঁহার রাজধানী রাজনগরের অপূর্ব কীর্তিরাশি—দোলমঞ্চ, নবরত্ন, একুশরত্ন প্রভৃতি বহু হর্ম্ম কীর্তিনাশার অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী দুর্লভরামের ভ্রাতা রাসবিহারী পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া কর্মকুশলতার দ্বারা নবাবের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ঐ নবাবের (সওকৎজঙ্গ) অন্যতম প্রিয়পাত্র কায়স্থ শ্যামসুন্দর তাঁহার কামান ও অস্ত্রশস্ত্র বিভাগের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলার সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময়ে সওকৎজঙ্গ তাঁহার মুসলমান সেনাপতিদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা গ্রামের মত দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? দেখছ না হিন্দু শ্যামসুন্দর অগ্রগামী

হইয়া কেমন যুদ্ধ করিতেছে।" *** রাজা রামনারায়ণ ও সুন্দর সিংহ পূর্ণিয়া ও মুর্শিদাবাদের যুদ্ধবিগ্রহে প্রধান কর্মীরূপে নবাবদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। মুতক্ষরিনে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত আছে। আলমচাঁদ রায়রাঁয়ার পুত্র দেওয়ান রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়রাঁয়া নবাবের রাজস্ব বিভাগের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জগৎ শেঠ ও বর্ধমান রাজার এককোটী কয়েক লক্ষ টাকার হিসাব আলীবর্দ্দীর দপ্তরে বহুদিন যাবৎ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, উহার অস্তিত্বও নবাব সরকারের বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্র এই হিসাব ধরাইয়া দিয়া উহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আলিবর্দ্দীর রাজভাণ্ডারে প্রদান করেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহার খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। দুর্লভরাম রাজস্ব বিভাগে আলিবর্দ্দীর সরকারে অনেক ভাল কাজ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার অসামান্য যোগ্যতার জন্যই ইনি প্রধানমন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন। তরুণবয়স্ক মোহনলাল সিরাজের সর্ব্ববিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতেন। দুঃসহ অভিমানে দুর্লভরাম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন; মুতক্ষরিনে লিখিত আছে, মোহনলাল পলাশীর ক্ষেত্রে বন্দী হইয়া ইঁহারই করতলগত হইয়া নিহত হন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দীর জামাতা, ঘেসেটি বেগমের স্বামী নবিসমহম্মদ খাঁন দয়াদাক্ষিণ্যের অবতার ছিলেন। তিনি মাসিক ৩৭ হাজার টাকা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে গরীব, বৃদ্ধ ও দুঃস্থদিগের মধ্যে দান করিতেন, তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আজিব রায়, এই বিশ্বাসী দেওয়ানের সহযোগে পুণ্যবান নবাব সর্ব্বজনপ্রিয় আদর্শ নৃপতি হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান মানিকচাঁদকে নবাব ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ৯০০০ পদাতিকের নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই দুর্গ-রক্ষার ভার দিয়া চলিয়া যান। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যসময়ে আরও বিস্তর হিন্দু রাজকর্ম্মচারীর কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, ইঁহারা শান্তিপ্রিয় হইলেও রণক্ষেত্রে সিংহ বিক্রান্ত ছিলেন। আলিবর্দ্দী যখন মারাঠাদের হাতে পড়িয়া দুর্গতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন এক বন্য প্রদেশের হিন্দু রাজা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়া ভ্রমবশতঃ বিপথে লইয়া গিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে তিনি এতদূর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজের তরবারি দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। সীতারাম

রায় নামক এক হিন্দু কর্ম্মবীর, অতি অল্প বেতনের কর্ম্মচারীর পদ হইতে আজিমগঞ্জের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়াছিলেন। ইংরেজের পক্ষ হইয়া ইনি ফরাসীদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার ও তদীয় সেনানীদিগের সাহস ও রণকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা গোলাম হুসেন করিয়াছেন (মূতক্ষরিন, ১৫০ পৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড)। ইনি ক্লাইভকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অমিত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের কথা মূতক্ষরিনে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। ইনি আজিমগঞ্জের ফলফুলের বাগানগুলির উন্নতি সাধন ও সাধারণকে বিনা ব্যয়ে তাহাদের উৎপন্ন ফল ভোগ করিবার সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা সুন্দর সিংহের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইনিও সেই যুগের একজন সর্ব্বজনবিদিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এক নর্ত্তকীর পুত্র গোলাম খোউস্ ইঁহারই প্রাসাদে বড় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ইঁহাকে নিহত করেন। বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দীর অতি বিশ্বস্ত জানকীরামের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। এখানে বলা উচিত বঙ্গ দেশের এই যুগে কায়স্থগণই অধিকাংশ সময়ে বড় বড় রাজপদবী ও সমর কুশলতার খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।" (শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯২-৮৯৩)

"হিন্দু ও পাঠান প্রভৃতি মুসলমান শ্রেণীর সহিত রক্তের সম্বন্ধ একটা প্রবাদ বাক্য নহে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহুল। আকবর মোগল রক্তের সঙ্গে রাজপুতের রক্ত সংস্রবের পথ দেখাইয়া দুই জাতিকে মিলনের দিকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানের যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধহয় ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। পল্লীগীতিকায় এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

মুসলমান বাদশাহেরা সময়ে সময়ে হিন্দু সাধুদের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও ভক্তি দেখাইতেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মুসলমান ঐতিহাসিকগণই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একটির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গাধিপ ইলাইস খাঁ (সামসুদ্দিন, ১৩৫৩ খৃঃ) তখন দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। ফিরোজ পাণ্ডুয়া হইতে একডালা দুর্গ অবরোধ করিলেন। সামসুদ্দিন সেই দুর্গে ছিলেন। এই একডালা দুর্গের

সন্নিকটে ভবানী নামক এক হিন্দু সাধু ছিলেন, সামসুদ্দিন তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত। তিনি শুনিলেন সাধুবাবার দেহত্যাগ হইয়াছে, তখন সমস্ত বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া তিনি ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে একাকী বাহির হইয়া সাধুর মৃতদেহের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হন, পথে সম্রাটের শিবির। সামসুদ্দিন তাঁহার গুরুদেবের শবের প্রতি শেষ সম্মান দেখাইয়া সেই ছদ্মবেশেই ফিরোজশার দরবারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন, তৎপর শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেম। সম্রাট যখন শুনিলেন তাঁহার প্রবল শত্রু, যাঁহাকে ধরিবার জন্যে তিনি ২২ দিবস যাবৎ একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি ফাঁকি দিয়া তাঁহার মৃত গুরু দর্শন করিয়া, এমন কি তাঁহার শিবিরে ঢুকিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া গেলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তিনি সামসুদ্দিনের দুর্দ্দান্ত সাহসিকতা এবং অচলা গুরুভক্তির প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। পূর্ব্ব বঙ্গ গীতিকায় মুসলমান গায়কগণ যে সৌভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি কি করিয়া এই দুই জাতি, মত ও ধর্ম্মের এতটা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী পরস্পরের চালে চালে ঠেকাঠেকি করিয়া বাস করিতেছেন। পীর বাতাসীর মুসলমান গায়েন স্বীয় গুরু জিন্দাগাজীর নিকট বর প্রার্থনা পূর্ব্বক "মক্কা মদিনা বন্দুলাম কাশী গয়াথান" ইত্যাদি বন্দনাগীতে হিন্দুর তীর্থগুলির প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৪১-৩৪২)। নেজাম ডাকাইতের গীতিকার মুসলমান কবি তদ্দেশীয় (চট্টগ্রামের) সমস্ত গ্রাম্য দেবতাকে পর্যন্ত প্রণাম করিয়া গীতি আরম্ভ করিয়াছেন, উপসংহারে তিনি "সীতা শক্তি (সতী) মাকে মানি, রঘুনাথ গোঁসাই" প্রভৃতি পদ গাহিয়া "দুনিয়ার সার" পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিয়াছেন (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩২৫)। চৌধুরীর লড়াই গীতিকায় মুসলমান গায়েন পশ্চিমে মক্কা মূল স্থানের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া 'জগন্নাথ দেউ' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ। ভেদ নাই, বিচার নাই, বাজারে বিকায় ভাত। চণ্ডালে রাঁধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায়। এমন সুধন্য দেশ জাত নাহি যায়। ভাত লইয়া তারা মুণ্ডে মুছে ভাত। সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১০)। শেষের দুইটি ছত্র পড়িয়া পরবর্তী ভারতচন্দ্রের—

"চল ভাই নীলা চলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মুথায় মুছিব হাত, নাচিব গাহিব কুতুহলে" প্রভৃতি কবিতার কথা সহজেই মনে হয়। আর একজন মুসলমান পল্লী কবি লিখিয়াছে—"হিন্দু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি— কেহ বলে আল্লা রসুল, কেহ বলে হরি।"

আফগান প্রাধান্যের সময় হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, দুই জাতির মধ্যে আত্মীয়তা হইলে যদিও হিন্দুগণ সমাজ-বহির্ভূত হইয়া পড়িতেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ও হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরাগ বিস্মৃত হইতেন না। হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ মহাভারত কাব্যের বাংলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন, উক্ত বাদসাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন; সঙ্কলয়িতার নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ (চট্টগ্রামের শাসনকর্তা) শ্রীকরনন্দী নামক কবি দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর সামসুদ্দিন ইউসুফ গুণরাজ খাঁ উপাধিধারী বসুবংশীয় মালাধর নামক কবির (কুলীনগ্রামবাসী) দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি সুলতানের উৎসাহ পাইয়াছিলেন। এই গায়েসুদ্দিন কবি হাফেজকে পারস্য দেশ হইতে বাঙ্গলায় লইয়া আসিতে লালায়িত ছিলেন। মিথিলার রাজসভার দীর্ঘায়ু কবি একাধিক গৌড়েশ্বরের আনুকূল্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—"সে যে নসিরা সাহ জানে, যারে হানিল মদন বানে, চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভানে।" যশোরাজ খাঁ নামক কবি হুসেন সাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সাহ হুসেন জগতভূষণ, ভণে যশোরাজ খানে।" সুদূর চট্টগ্রাম হইতে এই সুরে সুর মিলাইয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন সাহকে কলিযুগের কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ উদাহরণ অসংখ্য। আমার এ সকল কথা এখানে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাদসাহের পরিবারে হিন্দুললনার আমদানী হওয়াতে এবং এদেশের বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদসাহী দরবারে বাঙ্গালা ভাষা আদর লাভ করিয়াছিল। হয়ত হিন্দুরাজত্ব থাকিলে এটি ঘটিতে পারিত না। বিদ্যার অর্ণবযানসদৃশ, দেব ভাষার প্রতি অতি-

মাত্রায় শ্রদ্ধাবান টুলো পণ্ডিতগণের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুন আমাদের দেশের ভাষা যে কোন কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না, পাঠান প্রাধান্য কালে বাদসাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্রও অনেক সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইত। শের সাহের কামানের উপর বাঙ্গলা অক্ষরে তাঁহার নাম ও উপাধি পাওয়া গিয়াছে। ২/৩ শত বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের তাম্র শাসনগুলি বঙ্গভাষায় ও বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ হইত। সে সময়ে মুসলমানেরাই বাঙ্গলার এই বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা হিন্দু পুরাণ ও অপরাপর শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গলা তাঁহাদের কথ্য ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল। এজন্য তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জ্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুর গান ও উৎসবাদি মুসলমান বাদসাহের দরবারে অবিরত উৎসাহ পাইত। এইভাবে কীর্ত্তন শুনিবার স্পৃহাবশতঃ গৌড়ের কোন সম্রাট আমাদের কবি সম্রাট চণ্ডীদাসের হত্যার কারণ হইয়াছিলেন। পাঠানেরা তরবারি লইয়া এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এদেশে তরবারি তাহারা একদিনও পরিত্যাগ করেন নাই। ইহারা কৃষির কোন ধার ধারিতেন না। সুতরাং ধনশালী হিন্দুরাই তখন কৃষিপ্রধান বাঙ্গলার একরূপ মালিক ছিলেন; শুধু কৃষি নহে, ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহা কিছু তাহা সমস্তই হিন্দুদের হাতে ছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, "অধিকাংশ আফগানই তাহাদের জায়গীরগুলি ধনবান্ হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন, গৃহসুখ তাঁহাদের কপালে বড় থাকিত না, কারণ প্রায়ই তাঁহাদের নেতাদের আহ্বানে তাঁহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত, বিশেষ করিয়া ইঁহাদের বাণিজ্যাদি কার্য্যের প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইঁহারাই ব্যবসায় বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।" (ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালা ইতিহাস, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৯১০ খৃঃ পৃঃ ১৯০)। এই সকল কারণে বঙ্গ দেশে কোন স্বর্ণখনি না থাকিলেও মহাসমৃদ্ধির জন্য এদেশ 'সোনার বাঙ্গলা' উপাধি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছিল।" (শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের বৃহৎবঙ্গ ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৫৫—২৫৭)

বৃহৎ বঙ্গ (পৃঃ ৬৫২) : "যদিও আমরা মহম্মদ ইক্তিয়ারুদ্দিন বক্তিয়ারের আগমন হইতে ১৫৭৬ খৃঃ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টা পাঠান যুগ নামে মূলতঃ পরিচিত করিয়াছি, তথাপি এই যুগের রাজগণের মধ্যে সকলেই আফগান ছিলেন না, কেহ বা আরব দেশের কেহ বা খোঁজা, কেহ বা হাবসী, এবং কেহ বা হিন্দু ছিলেন। মোটামুটি এই সময়টাকে পাঠান প্রাধান্যের যুগ বলা যাইতে পারে। এই সকল রাজাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে হিন্দুরক্ত বহমান ছিল। সুলতান গায়েসুদ্দিনের বিমাতা, সমসুদ্দিনের নিকাসূত্রে স্ত্রী ফুলমতী বেগম—একসময়ে নুরজাহান দিল্লীতে যাহা করিয়াছিলেন—বঙ্গ দেশের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সেইরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। ফুলমতী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার সুবিখ্যাত বজ্রযোগিনী গ্রামের এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা, সমসুদ্দিন সুবর্ণ গ্রামে যাওয়ার পথে নদীর ঘাটে এই অসামান্যা রূপসী ষোড়শীকে দর্শন করিয়া বলপূর্বক তাহাকে স্বীয় অন্দরমহলে লইয়া আসেন। সমসুদ্দিনের নিকট তথাকার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও অপরাপর শ্রেণীর বিশুদ্ধ হিন্দুরা উপস্থিত হইয়া এই কার্যের প্রতিবাদ করেন। বাদসাহ বলিলেন, আচ্ছা বেশ ! ফুলমতীকে আমি ছাড়িয়া দিতেছি, ইহার সমান ঘরের কোন সৎব্রাহ্মণ ইহাকে বিবাহ করুন, নতুঁবা গণিকা-বৃত্তি করিবার জন্য এবং সমাজচ্যুত হইয়া নিরাশ্রয়া হইয়া থাকিবার জন্য আমি এমন সুন্দরী মহিলাকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিব না।" বাদসাহের কথায় কেহ অবশ্য রাজী হইলেন না, তখন তিনি স্বয়ং তাহাকে নিকা করিলেন। এই রমণী যেরূপ অপূর্ব্বসুন্দরী ছিলেন তেমনি বুদ্ধিমতী ছিলেন, তৎসময়ের আফগান দরবারে আসিয়া তিনি বিলাস কলা ও কূটনীতি শিখিয়াছিলেন। সমসুদ্দিনের উপর ফুলমতী বিবির প্রভূত ক্ষমতা ছিল।"

শুধু যে সমাজে ও ধর্মেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয়েছিল তাই নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলানগণের মধ্যে এক অপূর্ব ঐক্য ও সংহতির বাঁধন গড়ে উঠেছিল। এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা যে অবদান জুগিয়েছেন তা হিন্দু লেখকেরাও দিতে পারেন নি। কারণ তাঁরাই ধর্ম নিরপেক্ষ এবং সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে লৌকিক ও বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হিন্দুগণ যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তা প্রায় সবই ধর্মমূলক এবং তাঁরা সাহিত্যকেই

ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু মুসলমান লেখকগণের ধারণা ছিল তার উলটো। কারণ তাঁরা সাহিত্যকে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার বিশেষ কোনো প্রয়োজন অনুভব করেন নি। এবং ধর্মমূলক বিষয়ের সঙ্গে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক বিষয় অবলম্বন করে অনেক কাব্য রচনা করেছেন।

বাংলা রচনার ক্ষেত্রে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই মূলতঃ মুসলমান লেখকগণের সাক্ষাৎ মেলে। এই সময়ে শারিবিদ খান নামক একজন মুসলমান কবি সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন, যাতে প্রাচীন ভাষার সঙ্গে কবি কল্পনাতে অনেক অভিনবত্ব সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই কাব্যের মধ্যে লেখকের সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয়ও বেশ ফুটে উঠেছে। উক্ত শতাব্দীতে চট্টগ্রামের পরাগলপুর নিবাসী কবি সৈয়দ সুলতানও একজন উল্লেখযোগ্য বাঙালী মুসলমান কবি ছিলেন। তিনি যোগসাধনার তত্ত্ব নিয়ে জ্ঞানপ্রদীপ, বারজন নারীর জীবন কাহিনী নিয়ে নবীবংশ এবং হজরত মহম্মদের জীবন কাহিনী অবলম্বনে 'শবেমেয়েরাজ' নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর শিষ্য মোহাম্মদ খানও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে কারবালার করুন কাহিনী অবলম্বনে 'মঞ্জুল হোসেন' নামে একখানি কাব্য লিখেছিলেন। এই কাব্য হতে বুঝা যায় মোহাম্মদ খান ভাল সংস্কৃত জানতেন এবং হিন্দু পুরাণসমূহ তিনি ভালভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। এছাড়া তিনি সত্যযুগ ও কলিযুগের কাল্পনিক বিবাদের বর্ণনা দিয়ে সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ নামে আর একটি কাব্য লিখেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি দৌলত কাজী ও আলাওল। এঁরা আরাকানের রাজধানী রোসঙ্গ নগরে বসবাসকালে আরাকান রাজের অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করে কাব্য রচনা করেছিলেন। দৌলত কাজী আরাকানরাজ শ্রীসুধর্মার সেনাপতি লস্কর উজীর আশরফ খানের পৃষ্ঠ পোষণ লাভ করে তাঁর আদেশে 'সতী ময়নামতী' নামে একখানি অতি সুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। আলাওলের পাণ্ডিত্য ও সঙ্গীত নৈপুণ্যের কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে আরাকান রাজ্যের প্রধান কর্তা মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুর তাঁকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল

পদ্মাবতী নামে একখানি সুন্দর কাব্য লিখেছিলেন। এটি ছিল জায়সী নামক উত্তর ভারতীয় সুফী মুসলমান কবির লেখা 'পদমাবৎ' নমক কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ। এই কাব্যে আলাওলের হিন্দু পুরাণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়; শুধু তাই নয়, এই কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও বিদ্যমান রয়েছে। পদ্মাবতী কাব্য ছিল আলাওলের সার্থক ও শ্রেষ্ঠ রচনা। এরপর তিনি মাগনঠাকুরের অনুরোধে 'সৈফুল মুলুক্ বদি উজ্জামাল' নামে একটি ফারসী কাব্যের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু মাগন ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যুতে এই কাব্য রচনা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেলেও পরে তিনি সেটি সম্পূর্ণ করেন। এছাড়া আরাকান রাজের মহাপাত্র সোলেমানের অনুরোধে আলাওল দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য 'সতী ময়নামতী' সম্পূর্ণ করেছিলেন। এবং তাঁরই অনুরোধে তিনি য়ুসুফ গদার আরবী গ্রন্থ 'তোহ্‌ফা' বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এ ছাড়া কবি আলাওল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনার সঙ্গে 'রাগনামা' নামে একটি সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও লিখেছিলেন। কুৎবনের 'মৃগাবতী' নামক হিন্দী রোমান্টিক কাব্য অবলম্বন করে যে কয়েকজন মুসলমান কবি বাংলা কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ খাতের ও করিমুল্লার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনোহর ও মধুমালতীর প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত হিন্দী কাব্যগুলি নিয়ে বাংলা কাব্য রচনা করেছিলেন মুহম্মদ কবীর, সাকের মামুদ ও সৈয়দ হামজা। এছাড়া 'লায়লি মজণু' এবং ইউসুফ জোলেখার প্রেমোপাখ্যান অবলম্বন করে ফারসী ভাষায় যে সব রোমান্টিক কাব্য রচিত হয়েছিল সেগুলি অবলম্বন করে অনেক মুসলমান কবি বাংলা কাব্য রচনা করেছিলেন। বাংলা 'লায়লি মজনু' রচয়িতাদের মধ্যে কবি বাহরাম খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হরিবংশ এবং মহাভারত অনুসরণ করে অনেক মুসলমান কবি বহু কাব্য রচনা করেছেন। এই শ্রেণীর কাব্যগুলির মধ্যে পয়গম্বরদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'নবী বংশ' এবং 'রসুল বিজয়' হজরত মহম্মদের কাহিনী ও জঙ্গনামা যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে লেখা কাব্যগুলি উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হায়াৎ মামুদ 'মহরম পর্ব' নামে যে বইটি লিখেছেন তার মধ্যে কারবালা কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলার মুসলমান কবিগণ পীর ও গাজীদের মাহাত্ম্যমূলক অনেক কাব্য লিখেছেন। এগুলির মধ্যে 'গরীব ফকীর'-এর 'মানিক পীরের গীত', ফয়জুল্লার 'গাজী বিজয়' এবং এ ছাড়া সত্যপীরের পাঁচালী বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবী রাখে। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের উপাসনার মধ্য দিয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়কে কাছে টানার একটা বিশেষ প্রয়াস লক্ষণীয়। হিন্দুদের সত্যনারায়ণ ও মুসলমানদের সত্যপীর আসলে একই উপাস্যের দুটি রূপ। সত্যনারায়ণের পূজা কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত, কিন্তু সত্য-পীরের পূজা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। এই উভয় উপাস্যের প্রসাদকেই সিরনি বলা হয় এবং হিন্দুদের দেব-দেবীর প্রসাদের মধ্যে কেবল সত্যনারায়ণের প্রসাদকেই সিরনি বলা হয়। সত্যনারায়ণ যদি প্রাচীনতর হন তবে বলতে হবে হিন্দুদেবতা পরবর্তী কালে মুসলমান প্রভাবে পীর-এ পরিণত হয়েছেন। আর যদি সত্যপীর প্রাচীনতর হন তবে বুঝতে হবে পীর হিন্দুর প্রভাবে দেবতা হয়েছেন। তবে এ বিষয় মতানৈক্য আছে। সত্যনারায়ণের যেমন পাঁচালী আছে এবং তা পূজার সময় পাঠ করা হয়ে থাকে, সেরূপ সত্যপীরেরও পাঁচালী আছে। সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, দেবকীনন্দন, গঙ্গারাম, জয়নারায়ণ সেন, রামেশ্বর প্রমুখ কবিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। আর সত্য-পীরের পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণহরিদাস, কবিকর্ণ, শঙ্কর, ফয়জুল্লা আরিফ ও নায়েক ময়াজ গাজী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

হিন্দু মুসলমান মিলিত ভাবে যে শুধু সত্যপীরের উপাসনা করেন তা নয়, তাঁরা আরও কয়েকটি দেবতার উপাসনা করে থাকেন বিভিন্ন নামে। হিন্দুরা যেমন ঠাকুর গোরাচাঁদ, কালুরায় (কুমীরের দেবতা), বনদুর্গা ও সিদ্ধা মৎস্যেন্দ্র নাথের পূজা করেন, সেরূপ মুসলমানেরা ওই সব দেবতাই ভিন্ন নামে যেমন, পীর গোরাচাঁদ, কালুশাহ, বনবিবি ও মোছরা পীররূপে উপাসনা করেন। এ সকল দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই বহু পাঁচালী রচনা করেছেন। এগুলি সত্যই হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির পরিচয় বাহক। শুধু এই নয়, হিন্দু কবিগণের অনুসরণে বাংলার মুসলমান কবিগণও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অনেক পদ রচনা করেছেন। এ সকল পদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কীয় পদের সংখ্যাই বেশি। ওই সকল মুসলমান কবিগণের

মধ্যে কয়েকজনের অন্তরে যে রাধাকৃষ্ণের জন্য প্রকৃত ভক্তি ছিল তা বুঝতে পারা যায় তাঁদের পদের ভাব ও আন্তরিকতা দেখে। পদাবলী রচনাকারী মুসলমান কবিগণের মধ্যে সৈয়দ মূর্তজার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'শ্যামবঁধু আমার পরাণ তুমি' নামক পদটি ভাবের গভীরতার দিক দিয়ে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরাপর মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে নাসির মামুদ, শাহ্‌ আকবর, গরীব খাঁ, গরীবুল্লা, আলীরাজা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া কোনো কোনো মুসলমান কবি আবার চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেও পদরচনা করেছেন।

বাংলার মুসলমান কবিগণ প্রণয় বিষয় নিয়েই অধিকাংশ গাথাকাব্য লিখেছেন, যেগুলির মধ্যে সরুফের 'দামিনী চরিত্র' কোরেশী মাগনের 'চন্দ্রাবতী' এবং খলিলের চন্দ্রমুখী পুঁথি উল্লেখ করার মতো। এ ছাড়া বাংলার কোনো কোনো মুসলমান কবি সাধনতত্ত্ব বিশেষ করে বাউল-দরবেশী সাধনতত্ত্ব নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে আলীরাজা কর্তৃক রচিত 'জ্ঞানসাগর' ও 'সিরাজকুলুপ' উল্লেখযোগ্য।

আধুনিককালে কবি নজরুলের ভক্তিমূলক শ্যামা সঙ্গীতগুলোও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন—

শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে জপি আমি শ্যামের নাম
মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম।

বল রে জবা বল।
কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল !

*　　*　　*　　*

তোর সাধনা আমায় শেখা জীবন হোক সফল।

মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকগণের অবদান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি। এ অবদান যুগ যুগ ধরে সংস্কারহীন উদার ও ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের পরিচয় বহন করে চলেছে।

॥ সাত ॥

মধ্যযুগে যখন ধর্মে ধর্মে হানাহানি, হিন্দু মুসলমানে বিভেদ, চরম ধর্মীয় কুসংস্কার ও কঠোর জাতিভেদ প্রথা দেখা দিল এবং ধর্মীয় পণ্ডিতগণ প্রচার করলেন—নীচু জাতের লোকেরা মন্দিরে গেলে মন্দির অপবিত্র হবে, মুসলমানের ছোঁয়া খেলে জাত যাবে ঠিক সেই সময়ে রামানন্দ, নামদেব, কবীর, শ্রীচৈতন্য, নানক ও দাদু প্রমুখ ধর্মপ্রচারকেরা হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় নি য়ে এক অভেদ ধর্মপ্রচারের জন্য ভক্তি আন্দোলন শুরু করলেন। ভগবানে ভক্তি ও অহিংসা এবং সৎজীবন-যাপন করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য।

এঁদের মধ্যে নামদেব ছিলেন নীচু জাতের ছেলে, কবীর ছিলেন মুসলমান, শ্রীচৈতন্য ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে, আর নানক জন্মেছিলেন বণিকের ঘরে। দাদু ছিলেন ধুনকর বংশজাত।

রামানন্দ ছিলেন রামের উপাসক। তাঁর ধর্মপথ ভক্তিবাদ নামে পরিচিত। তিনি ধর্মের বাহ্য আচার-আচরণ ত্যাগ করার উপদেশ দিতেন। রামানন্দের বার জন শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কবীর ছিলেন জোলা, রুইদাস বা রবিদাস ছিলেন মুচি, সৈনা নাপিত ছিলেন। রামানন্দ হিন্দু মুসলমান, নারী পুরুষ, ধনী গরীব সকলকেই ধর্মসাধনার অধিকার দিয়েছিলেন।

নামদেব ও নানকের হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই শিষ্য ছিল। এদিকে চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন যবন হরিদাস। এঁদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বিরোধ দূর করে মিলন ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা। তাই কবীর বলেছেন :

"পুরিব দিশা হরীকা বাসা, পছিম অলহ মুকামা। দিল হী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ইহা রাম রহিমানা"—অর্থাৎ পূর্বদিকে হরির বাস আর পশ্চিম দিকে আল্লাহর মোকামা, কিন্তু নিজের দিল্ বা অন্তরের মধ্যে খোঁজ করলে দেখা যায় যে, রাম রহিমের বাস সেইখানেই।

রামানন্দের বিখ্যাত শিষ্য কবীর গোঁড়া হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের ওপর কঠোর আঘাত হেনেছিলেন। তাঁর মতে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ

ক'রে পবিত্রভাবে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের নাম জপ করলেই মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি হিন্দু-মুসলমান ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না। কবীর তাঁর দোঁহা ও ভজনের মধ্যে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী প্রচার করেন। তিনি বলতেন—হিন্দু ও তুরকগণ একই মাটির দুটি পাত্র। তিনি গোঁড়া হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

পণ্ডিত বুঝ পিয়াতুম পানী।
তোহে ছুত কহাঁ লপটানী॥

পণ্ডিত বুঝে জলপান কর। কিভাবে জল ছুঁত লাগল ?

শুধু গোঁড়া হিন্দুদেরই নয়, গোঁড়া মুসলমানদের উদ্দেশ্যেও তিনি লিখেছেন—

দিনমে রোজা রহতো হ্যায়, রাত হন ত হ্যায় গায়।
ইয়া খুন ওয়া বন্দেগী, কহ ক্যায়সে খুস হয় খোদায়॥

অর্থাৎ দিনে রোজা করছ আর রাত্রে গাভী বধ করছ। এদিকে খুন, ওদিকে বন্দনা। খোদা কিভাবে খুশি হবেন ?

কবীর সমন্বয় ধর্ম্ম প্রচার করার জন্য বলেছেন—

"অলখ ইলাহী এক হ্যায় নাম ধরায়া ধোয়।
রাম রহিমা এক হ্যায় নাম ধরায়া ধোয়॥
কৃষ্ণ করিমা এক হ্যায় নাম ধরায়া ধোয়।
কাশী কাবা এক হ্যায়—একৈ রাম রহিম॥
ময়দা এক পকবান বহু বৈঠী কবীরা জীম॥"

—এর বাংলা মানে—অলখ-আল্লা, রাম-রহিম, কৃষ্ণ-করিম, কাশী-কাবা এক, শুধু দুই নাম। যেমন—একই ময়দা পাকিয়ে নানা খাদ্যবস্তু করা হয়, তেমন—একই ঈশ্বর নানা সাজ করেন।

কথিত আছে—কবীর জাতিতে জোলা ছিলেন। তিনি সব সময়ে ধর্মচিন্তা করতেন। তাঁর লেখা অনেক ধর্মীয় উপদেশমূলক কবিতা বা দোঁহা আজও জনপ্রিয়। তাঁর একটি কবিতার বাংলা অনুবাদ :

"তুমি আমায় কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ ? দেখ
আমি তোমার কাছেই আছি।
আমি মন্দিরে নেই, মসজিদেও নেই ; মক্কায়
আমাকে পাবে না, কৈলাসেও নয়।

আচার অনুষ্ঠানেও আমি নেই। কঠোর তপস্যায়
আমাকে পাওয়া যায় না। তুমি যদি সত্যিই
আমাকে চাও, এক মুহূর্তে আমার
দর্শন পাবে।"

গঙ্গাস্নান করলে কোনো ফল হয় না, যদি মনে পাপ থাকে, মন পবিত্র না থাকে। অর্থাৎ মনে পাপ নিয়ে গঙ্গাস্নান করলেও কোনো পুণ্যি হয় না—এটাই ছিল কবীরের ধারণা। তিনি বলতেন—হিন্দু ও মুসলমান একই মাটির দুটি পাত্র। তিনি আরও বলতেন—রাম ও আল্লাহর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই—এ হল একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম। কবীর দেবদেবীর মূর্তি পুজোর বদলে এক ঈশ্বরের আরাধনাতেই বিশ্বাসী ছিলেন।

তিনি হিন্দু মুসলমান ধর্মের মূলনীতিগুলো প্রচার করে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অভেদ সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াস করেছিলেন। কবীর এই দুই ধর্মের অর্থহীন আচার আচরণের তীব্র নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন ভগবান বা আল্লাহ মন্দিরেও নেই, মসজিদেও নেই। কৈলাসেও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কাবায়ও নয়—মানুষের মনের মধ্যেই ভগবান বা আল্লাহ বাস করছেন। কবীর বলতেন সাধুলোকের হিন্দু ও মুসলমান বলে কোনো ধর্ম বা জাত নেই। সাধু সাধুই। হিন্দুদের দেবতা রাম ও মুসলমানদের দেবতা আল্লাহকে তিনি অভেদ বলে জানতেন। তিনি বলতেন আল্লাহ যেমন শুধু মসজিদে আবদ্ধ থাকতে পারেন না সেরূপ রামও শুধু মন্দিরে থাকেন—একথাও ঠিক নয়। আল্লাহ বা রাম এক এবং অভিন্ন। তিনি পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে বিরাজমান।

কবীরের গুরু রামানন্দ। একবার রামানন্দ কবীরকে দেখতে গেলে কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন:

"প্রভু জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।"

রামানন্দ বললেন, এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন
চিত্ত আমার ধুলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।

কথিত আছে—কবীরের দেহত্যাগের পর তাঁর হিন্দু শিষ্যগণ তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন নিয়ে বারাণসীর কবীরচৌরা নামক স্থানে দাহ করেন এবং মুসলমান শিষ্যগণ মজহরের দরগায় সমাধি দেন।

দাদু বলেছেন—আল্লাহ ও রামের ভ্রম আমার ছুটেছে, হিন্দু, তুর্কীতে বা মুসলমানে কোন ভেদ নেই। তাই তিনি লিখেছেন—

"অলহ রাম ছুটা ভ্রম মোরা
হিন্দু তুরক ভেদ কুছ নাহি।"

অনেক হিন্দু যেমন মুসলমানদের এককালে যবন বলত ও তাঁদের ছোঁয়া খেত না, সেরূপ অনেক মুসলমানও আবার হিন্দুর ছোঁয়া খেত না। হরিদাস বলেছিলেন—সকল জাতির ঈশ্বরই এক। তাই তিনি মুসলমান হয়েও কৃষ্ণ নাম করতেন। ঠাকুর হরিদাস বলেছিলেন—

শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর,
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে
পরমার্থ এক কহে কোরানে পুরাণে।

সুফীবাদের সাহায্যেও ভারতে হিন্দু মুসলমান মিলনের চেষ্টা হয়েছিল। এই মিলনের ফল স্বরূপ ভারতের বুকে গড়ে উঠেছে সাধুপূজা ও পীরপূজা। সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, পাঁচপীর, বদরপীর প্রভৃতি পূজা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। মুসলমান পীরগণের অলৌকিক কার্যকলাপ দেখে অনেক হিন্দু তাঁদের শিষ্য হয়েছিলেন। এ বিষয়ে মুইনুদ্দীন চিশ্‌তি ও নিজামউদ্দীন আউলিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুফী আদর্শে বাংলাদেশে বহু মুসলমান, বৈষ্ণব-কবি, আউল-বাউল, দরবেশ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ নেই। লালন, হাসন, মদন প্রমুখ অনেক নামকরা বাউল মুসলমান ছিলেন। মদনের একটি বিখ্যাত গান—

"বল্ তো গুরু কোথায় দাঁড়াই,
অভেদ সাধন মরল ভেদে।
তোর দুয়ারেই নামান তালা,
পুরাণ-কোরান-তসবী-মালা।"

রামকৃষ্ণদেবও ধর্মের বিভেদ মানতেন না। তিনি সকল ধর্মকেই

সমান মনে করতেন। তিনি তাই মসজিদে গিয়েও আরাধনা করেছিলেন।

বৈদিক, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসরণেই ব্রাহ্ম-ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। এই ধর্মমতে মূর্তিপূজা এবং জাতিভেদের স্থান নেই।

শুধু যে কিছু মুসলমান সুলতান হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন তাই নয়, অনেক হিন্দু রাজাও নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে মুসলমানদের ধর্মাচরণে যোগদান করেছেন। শেষ চেরুরল পেরুমল স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ-ছাড়া, নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি মুতাসীম খলিফার সময় কাশ্মীর ও মুলতানের মাঝে অবস্থিত উসায়ফানের রাজার মুসলমান ধর্ম গ্রহণের কাহিনীও কৌতূহলোদ্দীপক। রাজা যখন মূর্তিপূজা করে তাঁর পুত্রের জীবন-রক্ষা করতে পারলেন না, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে মন্দির আক্রমণ করে বিগ্রহ ধ্বংস করেন। পরে তিনি একদল মুসলমান ব্যবসায়ীকে আহ্বান করেন ব্যবসায় বাণিজ্য করতে। তাঁরা রাজার কাছে একেশ্বরবাদের মহিমার কথা বললে রাজা তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন।

॥ ২ ॥

বিখ্যাত সুফী খাজা মুইনুদ্দীন চিশ্‌তি আজমীরে হিন্দুদের পবিত্র স্থান পুষ্করের কাছে বসবাস করতেন। তাঁকে ভারতীয় পীরদের শাহানশাহ বা সম্রাট বলা হয়। তাঁর দরগায় হিন্দু-মুসলমান তীর্থযাত্রীর ভিড় লেগেই থাকে। মহামতি আকবর পায়ে হেঁটে ওই দরগায় তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে হিন্দু মন্দিরের মতোই দরগার নহবতখানায় প্রহরে প্রহরে নহবত বাজে। গায়িকারা যাত্রীদের অনুরোধে গান করেন। সেখানে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে একদল ব্রাহ্মণ দেখা যায়, যাঁদের হুসেনী ব্রাহ্মণ বলে। এঁরা ঠিক হিন্দুও নন, বা ঠিক মুসলমানও নন। তাঁরা হিন্দু মুসলমানের মিলিত আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করেন এবং বলেন,—"তাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁদের বেদ অথর্ববেদ।" অথর্ব-বেদে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের মতের মিল আছে। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণাচার ও মুসলমানাচার উভয়ই আছে। রোজার দিনে এঁরা উপবাস করেন, আবার হিন্দু উপবাস ব্রতাদিও পালন করেন। হুসেনী ব্রাহ্মণ নারীদের বেশভূষা

হিন্দু নারীদের মতো। বিবাহিতা নারীরা হিন্দু সধবাদের মতো চিহ্ন ধারণ করেন, পুরুষেরা ভিক্ষার সময় হুসেনের নাম ব্যবহার করেন।

সুফী সাধক মখদুম সৈয়দ আলি অল হুজুরী হিন্দু ও মুসলমানের কাছে সমান প্রিয়। লাহোরে ভাটী দরওয়াজার কাছে তাঁর সমাধি দর্শন করতে মুসলমান ছাড়াও বহু হিন্দুও আসেন। চিশ্‌তিরা সুফী সম্প্রদায় ও ভারতবাসীদের বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন খ্বজা আবু আহমদ আবদাল চিশ্‌তি। তাঁর মত ভারতে প্রচার করেছিলেন খ্বজা মুইন অলদীন চিশ্‌তি।

সুফী সাধক শাহ করীম ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি জীবিত ছিলেন। তিনি এক বৈষ্ণব সাধুর সংস্পর্শে ধর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং তাঁর জপের মন্ত্র ছিল 'ওঁকার' ধ্বনি। শাহ ইনায়ত বহু হিন্দু পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে সিন্ধের কলহোরা রাজগণের তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভগবান কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নন।

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের শাহ লতীফ ছিলেন সিন্ধের শ্রেষ্ঠ কবি ও গায়ক। তাঁর সাধনার স্থান বা ভীটে মুসলমান ছাড়া হিন্দুরাও সাধনা করেন। সেখানে ধর্ম নির্বিশেষে নানক, কবীর, দাদূ, মীরাবাঈ সকলেরই গান হয়।

কাংরা রাণীতালে বাবা ফত্তুর দরগাহ। ইনি হিন্দু-সাধক সোধী গুরু গুলাব সিংহের আশীর্বাদে সিদ্ধ হন।

সিন্ধে প্রায়ই দেখা যায়—মুসলমানের গুরু হিন্দু আর হিন্দুর গুরু মুসলমান। পাঞ্জাবে শাহপুর জেলায় গিরোট তীর্থ হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই পবিত্র স্থান। সেখানে মুসলমানেরা জমালী সুলতানের ও হিন্দুরা দয়াল ভাবনের নামে মিলিত হন। পাঞ্জাবের ঝাঙ্‌ জেলায় হিন্দু সাধক বাবা সাহানার স্থান। তার পূর্ব নাম ছিল মিহ্‌র। তিনি এক মুসলমান সাধকের চেলা হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, ফলে তাঁর নাম হয় মিহ্‌রশাহ। এখন সেখানে হিন্দু-মুসলমান শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে মিলিত হন।

কাশ্মীরের প্রায় প্রত্যেকটি জিয়ারত পুরাতন হিন্দুতীর্থে স্থাপিত। কথিত আছে—মুলতানের শামস্‌-ই-তবরেজ মন্ত্রবলে সূর্যতেজ ও অগ্নিকে আয়ত্ত করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর তীর্থযাত্রীরাই সেখানে যান। মধ্যপ্রদেশের বাহাদুরপুরে মহম্মদ শাহদুল্লা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একটি সম্প্রদায় স্থাপন

করে হিন্দু ও মুসলমানদের সাধনাকে মিলিত করতে প্রবৃত্ত হন। তিনি হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্র হতে বহুবচন বেছে নিয়ে একটি সমন্বয়-শাস্ত্র রচনা করেন। তাঁর মতবাদীদের নাম 'পীরজাদা'। তাঁরা বলেন বিষ্ণুর দশম অবতার 'নিষ্কলঙ্ক' হলেন তাঁদের উপাস্য দেবতা।

গুজরাটের ইনাম শাহের সম্প্রদায় 'পীরানাপন্থ' বা কাকাপন্থ নামে পরিচিত। এঁরা মুসলমান গুরুর শিষ্য, কিন্তু হিন্দুর মতো জীবনাচরণ করেন। নরসারী প্রভৃতি স্থানে এঁরা এখন ক্রমশঃ হিন্দুমতে ফিরে যাচ্ছেন।

তাজ নামক জনৈকা মুসলমান নারী ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে বহু গান রচনা করেছিলেন।

ইসলামিয়া সম্প্রদায়ের এক গুরু হিন্দুদের দীক্ষা দিতেন। এই সম্প্রদায়টি তাঁদের গুরুকে কৃষ্ণের অবতার মনে করতেন। এই সম্প্রদায়ের বর্তমান নাম 'খোজা'। কাঠিয়াওয়াড় গঢ়ড়ায় এই খোজা সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াইশোটি পরিবার স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে মালিক মহম্মদ জায়েসী কবীরের উপদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ে 'পদুইমাবতী' নামে এক রূপক কাব্য রচনা করেন। তিনি এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মালিক মহম্মদের কথা তবু অনেক বৎসর আগেকার, কিন্তু যাঁর কথা এখনও বেশী পুরানো হয়নি তিনি হলেন হসন নিজামী, যিনি নিজামুদ্দীনের বংশধর এবং তাঁর দরগাহের হাফিজ ছিলেন। তিনিও তাঁর রচিত 'হিন্দুস্থান কে দো পয়গম্বর রাম ও কৃষ্ণ, সলাম অল্লাহী অলই হিমা'তে লিখেছেন,—"কোরানে আছে সকল দেশেই ভগবান তাঁর পয়গম্বর পাঠান। ভারতের মতো বিশাল দেশে কি সে কথা মিথ্যা হবে? অতএব, রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ সত্যই এদেশে সত্যস্রষ্টা পয়গম্বর এবং এঁদের উপদেশ প্রামাণিক।"

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন সৈয়দ ইব্রাহিম। তিনি বৈষ্ণব ভাবে ও বৈষ্ণব পদাবলীতে মুগ্ধ হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করেন। তাঁর শিষ্য কাদির বক্‌য্‌ও প্রেমভাব পূর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন। সৈয়দ বংশের শেষ রাজা শের আলম ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে নামদেব নামক এক ব্যক্তিকে মঠের জন্য ভূমি দান করেন এবং মঠ তৈরী করে দেন।

কবীর ছিলেন জোলার পুত্র। তিনি যে ধর্মে মুসলমান ছিলেন, তা বহু

গ্রন্থ ও বহু সাক্ষ্য অনুসারে প্রমাণিত। তিনি গুরু রামানন্দের নিকট থেকে নবচেতনা লাভ করে তাঁরই নিকট ধর্ম সাধনা গ্রহণ করেছিলেন। কবীর বাদশাহ শিকন্দর শাহ লোদীকে বলেছিলেন, "হিন্দু মুসলমানকে মিলানোই আমার লক্ষ্য। সবাই বলত তা অসম্ভব, আজ তা সম্ভব দেখলাম।" কবীরের কন্যা কমালীর একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কবীরের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ নিয়ে হিন্দু রাজা বীরসিংহের সঙ্গে মুসলমান বিজলী খাঁ পাঠানের কলহ হয়। বীরসিংহ মৃতদেহ দাহ করতে চেয়েছিলেন। আর বিজলী খাঁ চেয়েছিলেন শব কবর দিতে। পরে মৃতদেহের আবরণ উন্মোচিত হলে দেখা যায়, সেখানে গুটিকতক ফুল পড়ে আছে। অর্ধেক ফুল মুসলমান শিষ্যেরা মগহরে কবর দেন এবং বাকী অর্ধেক হিন্দুরা কাশীতে দাহ করেন। যদিও হিন্দু শাস্ত্রমতে সাধকদের শব দেহ দাহ করা নিষিদ্ধ।

নানক লাহোরের নিকট তলবণ্ডীতে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যখন যুবক তখন বৃদ্ধ কবীরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। নানক কবীরের ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কথিত আছে—বাগদাদে নানক স্থানে তাঁর বাণী সংগ্রহ আরবী ভাষায় পাওয়া গেছে। তা যদি সত্য হয়, তবে তাঁকে সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যেতে পারে। তাঁর জপজীর বাণীগুলি হিন্দু ভাবাপন্ন। যদিও তিনি জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরোধী ছিলেন।

নারায়ণ দাদুর শিষ্য রজ্জব বলেছিলেন, "সকল বসুধাই বেদ, পরিপূর্ণ সৃষ্টিই কোরান।"

কনস্টান্টিনোপল সহরে জন্মগ্রহণ করেন বুল্লেশাহ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে। ইনি জাতিতে সৈয়দ। আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মিটাতে তিনি ভারতে আসেন। পাঞ্জাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সাধনার সাধক ইনায়ত শাহ ও কয়েকজন হিন্দু সাধকের সঙ্গ লাভ করেন। বুল্লেশাহ বলতেন, "খোদাকে না পাবে মসজিদে, না পাবে কাবায়, না কোরান কেতাবে, না নিয়মবদ্ধ নমাজে।" তিনি আরও বলেছিলেন, "মুক্তি তখনই মিলবে, যখন অহমকে লুটিয়ে দিবে।" এ ধরনের বহু মুসলমান সাধকই আপন ধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেন নি। তাঁরা অন্য ধর্ম ও অন্য জাতির মানুষকে আপন করে নিয়েছিলেন।

গুরু রামানন্দ হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকে একত্র করে জাতি ধর্ম

নির্বিশেষে সকলকে উপদেশ দান করতেন। অনেক মুসলমান তাঁর ভাবধারা গ্রহণ করেছিলেন।

কোনো এক বৈষ্ণব সাধক সুফী শাহ করিমকে ধর্মজীবনে প্রবেশ করতে সহায়তা করেন। এই সাধু করিমকে হিন্দুধর্মের পবিত্র 'ওঁকার' ধ্বনি জপ করতে শিখিয়েছিলেন। সিন্ধে হিন্দুদের মুসলমান হতে দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে—পাঞ্জাবের ঝাঙ্ জেলার হিন্দু সাধক বাবা সাহানা এক মুসলমানের চেলা হয়ে সিদ্ধি লাভ করেন। এখন বাবা সাহানার স্থানে হিন্দু মুসলমান সকলেই যান। আমেঠির হিন্দু রাজা ছিলেন মালিক মহম্মদ জয়েসীর ভক্ত। তিনি জয়েসীর দরগাহ তৈরী করে দিয়েছিলেন।

১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে সকলকে এক ভাবধারায় প্লাবিত করেছিলেন। আসামের শঙ্করদেব ছিলেন ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার। তাঁর নাগা, মিকির ও মুসলমান শিষ্য ছিল। তাঁর মতে দেবদেবী পূজা করা, মন্দিরে যাওয়া, প্রসাদ গ্রহণ এ সকলই মিথ্যাচার।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন সহজানন্দ। তিনি ধর্মের সহজ, সরল রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বল্লভ সম্প্রদায়ের সমস্ত ব্যাভিচার দূর করে 'নারায়ণী সম্প্রদায়' স্থাপন করেন। বহু মুসলমান এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। 'নারায়ণী সম্প্রদায়ের' ব্রহ্মানন্দ, দেবানন্দ প্রভৃতি সাধকরা মুসলমানদের সাধনা করতে সুযোগ দিয়েছেন। এটা তাঁদের উদার মনের পরিচয়।

নদীয়ার সন্তরাম সাধক ছিলেন অপৌত্তলিক। তাঁর সাধনা মুসলমানেরাও গ্রহণ করতে পারে।

শিখদের গ্রন্থসাহেবে লিখিত আছে, গুরু রামানন্দ বলেছেন, "আর কেন ভাই মন্দিরে যেতে ডাক, তিনি বিশ্বব্যাপী, আমার হৃদয় মন্দিরেই তাঁর দেখা পেয়েছি।" গুরু রামানন্দ জাতিভেদ ও মূর্তিপূজা মানতেন না।

জগজীবন জাতিতে ছিলেন চন্দেল ছত্রী। ইনি এক নূতন সাধনার প্রবর্তন করেছিলেন। যার নাম "সত্যনামী" বা "সৎনামী"। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে মৈত্রী ও সাধনার দ্বারা এক করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিষ্য তুলমদাসজী ও জলালীদাসজীর মুসলমান শিষ্য ছিল। আজমগড় জেলার খানপুর বোহনা গ্রামে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ভীখা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশজাত।

তিনি মুসলমান শিক্ষাধারায় দীক্ষিত গুলাল সাহবের শিশুত্ব গ্রহণ করেন।

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বালিয়া জেলার চন্দ্রবার গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শিবনারায়ণ। ইনি জাতিতে রাজপুত। শিবনারায়ণ সম্প্রদায়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মীয় ভাবের সমন্বয় দেখা যায়। শিবনারায়ণ তীব্রভাবে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। সকল ধর্মের ও সকল জাতির লোক শিবনারায়ণ সম্প্রদায়ে যোগদান করতে পারে। বলী আল্লাহ, আবরু, নাজি প্রভৃতি শিবনারায়ণের সমসাময়িক কবিরা তাঁর সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যে অনেক মুসলমান আছেন।

কাঠিয়াবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাণনাথ। ইনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মকে মিলিত করা, তাঁর বাসনা ছিল। প্রাণনাথের বাণীতে মুসলমান সাধনার শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। প্রাণনাথীরা অত্যন্ত উদার। এই সম্প্রদায়ে হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যরা এক পংক্তিতে ভোজন করেন। এঁদের গ্রন্থ 'কুলজুম' হিন্দু-মুসলমান উভয়ধর্মীয় ভাবে পূর্ণ।

১৭৬৩ হইতে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন তুলসী সাহেব। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ও সাধনা জানতেন। তাঁর মতে বাহ্য আচার, কর্মে কিছু নেই। সব সাধনাই অন্তরে।

মধ্যযুগের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন ভক্ত দেধরাজ। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। দেধরাজ হিন্দু মুসলমান সব সাধকের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। দেধরাজ মতাবলম্বীরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সাধনার প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান। রামমোহন রায়ের অল্প পূর্বের এই সম্প্রদায় বর্তমান যুগের শিক্ষা না পেয়েও জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা না মেনে সকল ধর্ম সমান বলে স্বীকার করেন। এক অপ্রতিম ভগবানের উপাসনার কথা ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের কর্তাভজা বা সত্যধর্মবাদীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান এই দুই ধর্মের লোকই আছেন। এই সম্প্রদারের ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

এইসব হিন্দু-মুসলমান সাধকদের কাছে জানা যায় যে, যাঁরা প্রকৃত উপাসক ধর্ম বা জাতি তাঁদের কাছে নেই। তাঁরা সকল মানুষকেই ভালবেসেছেন,

ধর্ম জাতি তুচ্ছ জ্ঞান করে সকলকেই আলিঙ্গন করেছেন। হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীর নিকট মুসলমানগণ অস্পৃশ্য হননি। মুসলমান সাধকেরাও হিন্দুদের দূরে সরিয়ে রাখেন নি।

॥ ৩ ॥

কেরলের শেষ চেরুমল পেরুমলের ইসলাম ধর্মগ্রহণের পর হতেই কেরলে ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করে। কথিত আছে—তিনি মক্কায় গিয়ে হজরত মহম্মদের আশীর্বাদ লাভ করেন। কিন্তু ফেরার পথে রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হওয়ার সময় তিনি তাঁর অনুগামীদের কেরলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে বলেন।

ভারতের প্রথম মসজিদ তৈরী হয় কোট্টুং-গল্লুরে হিন্দু রাজাদের টাকায়। এখানে ভারতের প্রথম গীর্জাও তৈরী হয়েছিল হিন্দু রাজাদের অর্থানুকুল্যে। কেরলে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান একে অপরের ভাইয়ের মতো পাশাপাশি বাস করেন। কন্নুর জেলার নামকরা মুতপ্পন (শিব) মন্দিরে মুসলমান নাবিক ভক্তিভরে পূজা নিবেদন করেন। অপরদিকে যাঁরা শাবরিমল শাস্তা মন্দিরে তীর্থ করতে যান তাঁদের কাছে কোট্টয়ম জেলার এক মসজিদে মাথা ঠেকিয়ে যাওয়া অবশ্যপালনীয়। এ ছাড়া সকল ধর্মের কেরলবাসী ছেলেমেয়ে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জ্যোতিষীর কাছে হাজির হন নবজাতকের ঠিকুজী-কোষ্ঠী তৈরীর জন্য।

অনেক হিন্দু জমিদারকে মুসলমানদের তাজিয়ায় চাঁদা দিতে ও অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। তাজিয়ার মিছিলে যোগদান করা ছাড়াও অনেক হিন্দু আবার শ্রদ্ধাভরে মাথা নীচু করে ভক্তি জানিয়েছেন। গোলকুণ্ডার কুতুব সাহের অধীনে শিয়াদের মহরম উৎসবে হিন্দুগণ যোগদান করেছেন এবং মহরমের সময় সন্তান জন্মালে হোসেনের নাম অনুসারে তাদের নাম রেখেছেন। বিহারের পুর্নিয়ায় দুর্গোৎসবের মতো জাঁকজমক করে বাজনা বাজিয়ে (বাংলা দেশের মতো) তাজিয়া পালন করা হয়। তাতে বহু হিন্দু অংশ গ্রহণ করেন, যদিও পাটনায় ও বিহারের অন্যত্র তাজিয়া বাংলার মতো তত বড় হয় না তবু প্রদর্শনীর সংখ্যা হয় প্রায় দেড় হাজার, আর দৃশ্য তৈরী করেন হিন্দুগণ। তাজিয়ার সঙ্গে দুর্গাপূজা ও মহরমের সঙ্গে রথযাত্রা তুলনীয়। দুর্গাপূজার মতো তাজিয়া দশ দিন ধরে চলে। দুর্গাপূজার শেষে যেমন মিছিল

করে বাজনা বাজিয়ে মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় সেরূপ তাজিয়ার গম্বুজও মিছিল করে বাজনা বাজিয়ে নিক্ষেপ করা হয়।

॥ ৪ ॥

ইসলাম ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্ম কোনো কোনো বিষয়ে অধিক আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু ধর্ম ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ মতবাদ থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে নিজেকে আরও শক্তিশালী ও প্রগতিশীল করার প্রয়াস করেনি। উপনিষদীয় একেশ্বরবাদের অনুকরণে বহু পূর্বেই মূর্তিহীন পূজার প্রচলন করে আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীদের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে পারত যদি না গো-হত্যা মুসলমান ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত।

প্রাচীন ভারতে একই পরিবারে কেউ বা বৌদ্ধ ধর্ম, কেউ বা জৈন ধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁরা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারতেন, কিন্তু মধ্য যুগে অর্থাৎ ভারতে ইসলাম আগমনের পর কোনো কোনো হিন্দু কতিপয় ধর্মান্ধ মুসলমান শাসকের অত্যাচারের হাত বা হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কঠোরতা থেকে মুক্ত হবার আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে এই ধর্মান্তর গ্রহণই তাদের হিন্দু সমাজে সামাজিক মৃত্যু ঘটাত। অর্থাৎ তারা আর হিন্দু বলে পরিচয় দিতে পারত না। এবং ওই সমাজের সঙ্গে কোনো প্রকার সামাজিক সম্পর্ক রাখতে পারত না। এককালে জাতিভেদের কঠোরতা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর এক বিরাট অংশ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে এঁদের বংশধরগণ আবার নানা কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ওই দুটি ধর্মেই জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ পৃঃ ২৪৫)"-এ বলেছেন—'ব্রাহ্মণগণের অত্যাচারে সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত প্রাক্তন বৌদ্ধগণ মুসলমানদিগের হিন্দুর উপাস্য দেবতার স্থানে বসাইয়াছিলেন অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" মোটের ওপর বৌদ্ধগণ বাংলা দেশের যে স্তরের জনসাধারণকে ধর্মান্তরিত করেছেন পরবর্তী কালে মুসলমানগণ প্রধানতঃ সেই স্তরের লোকদেরই ধর্মান্তরিত করেছিলেন। গ্রাম দেবতার মৃত্যু নেই। তাই বোধহয় তাদের ধর্মান্তর গ্রহণের পরেও গ্রামের ছোট ছোট বৌদ্ধ মৃত্তিকা ও প্রস্তর স্তূপগুলি পরবর্তীকালে পীঠস্থান বা বিবিমাতলায় পরিণত হয়েছে।

অনেক হিন্দু মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাই হয় স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, না হয় তাঁদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। কেউ কেউ একথাও বলে থাকেন যে, কতিপয় মুসলমান শাসক ও মোল্লাগণ যদি জোর করেই হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে থাকবেন তবে তাঁরা শুধু নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের বেছে বেছে ধর্মান্তরিত করলেন কেন? এর উত্তরে আবার অনেকে বলেছেন—উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ সমাজে পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে এবং অধিকাংশই আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে বসবাস করছিলেন। ফলে তাঁরা বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম (যাতে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই) গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। যেখানে তাঁদের ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করবার চেষ্টা চলেছে সেখানে তাঁরা তাঁদের জনবল ও ধনবল দিয়ে তা বাধা দিয়েছেন এবং ব্যর্থ হলে পালিয়ে জাজনগর (ওড়িশা) এবং কামরূপে (আসামে) গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ তদানীন্তন কঠোর জাতিভেদের ফলে সমাজের চোখে ছিলেন অপাঙক্তেয় এবং তাঁদের অর্থ ও জনবলও তেমন ছিল না যা দিয়ে তাঁরা মুসলমান ধর্মান্তরীকরণ বাধা দিতে পারতেন বা গৃহ ছেড়ে চলে যেতে পারতেন। ফলে তাঁরা মুসলমানদিগকে ত্রাণকর্তা বলেই মনে করতে লাগলেন। তাঁদের বিশ্বাস হল যে, সামাজিক অমর্যাদার হাত থেকে তাঁদের রক্ষার নিমিত্তই দেবতারা মুসলমানের মূর্তিতে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন। যেমন—"গণেশ হইলেন গাজী, কার্তিক কাজী, চণ্ডিকা দেবী হায়্যা বিবি, ও পদ্মাবতী বিবি নূর হইলেন (মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ—২৪৫ পৃঃ)।

এরূপ ধারণা করলে বোধ হয় ভুল হবে না যে—কিছুসংখ্যক লোকের হিন্দু থেকে মুসলমানে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যেকার ব্যবধান কমে গিয়ে ওই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। কারণ ধর্মান্তরগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা হতে তাঁদের সুপ্রাচীন সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পারেন নি। ফলে তাঁরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে একটা সামাজিক সেতুবন্ধন হিসেবেই অবস্থান করতে থাকেন, কারণ ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ তাঁদের হিন্দু ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণ এবং ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মুসলমান সমাজে আসার ফলে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম বিশ্বাসে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ হিন্দু-মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবেই অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন দশেরা,

হোলি, মহরম, সবে-বরাত প্রভৃতি বহু উৎসবে। ওই সকল উৎসব উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হতে এবং খোলাখুলিভাবেই একে অপরের সঙ্গে মিশতে থাকেন। এবং ওই সকল উৎসবে একে অপরেব সুখদুঃখের ভাগীদার হন। শুধু তাই নয়, উভয় সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহণের ফলে ওই উৎসবগুলির প্রকৃতিও প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়। যেমন সবে-বরাত মুসলমান উৎসব হওয়া সত্ত্বেও এতে অগ্নির কাজ হিন্দু ধর্মের শিব-রাত থেকেই ধার করা বলে মনে করা হয়। এছাড়া মহরমের সময় তাজিয়া বহন সম্ভবতঃ হিন্দু উৎসব জগন্নাথের রথযাত্রা, কৃষ্ণলীলা এবং মহানবমী হতে ধার করা হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস।

যুগ যুগ ধরে সুফী, পীর, ফকির, যোগী, দার্শনিক, কবি প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

ইতিহাসের দিকে তাকালে যেমন দেখা যায়—কতিপয় মুসলমান সুলতান জোর করে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেছেন আবার এও দেখা যায়—অনেক হিন্দু ও হিন্দু রাজা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কারণ এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন—ঈশ্বরে ঈশ্বরে কোনো ভেদ নেই। এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসার মধ্যেই ঈশ্বরকে-ভালবাসা লুকিয়ে আছে।

কর্ণাটকের বীর শৈবেরাও ছিলেন একেশ্বরবাদী। তাঁরা কোনো প্রকার জাতিভেদ মানতেন না। ইসলাম ধর্মের সামাজিক সাম্যবাদের সামনে এসব সাধকগণ যদি তাঁদের মানবপ্রেম প্রচার না করতেন, তবে হিন্দু ধর্ম এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে টিকে থাকতে পারত কিনা সন্দেহ। অপরদিকে ভারতের সুফী, সাধক ও পীরগণ যদি শান্তি ও মৈত্রীর পথ অনুসরণ না করতেন তাহলে ইসলাম ধর্মও মোল্লাদের গোঁড়ামির ফলে এক চরম আঘাত পেত। কাজেই বর্তমানের এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দিনে ওই ভক্তিবাদ, সুফীবাদ, বৈষ্ণব ধর্মের মানবতাবাদ ও জাতিসাম্যের আদর্শকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করে তা আরও ভালভাবে প্রচার করা উচিত। সে দিনের চরম কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে ওই সকল মতবাদ যতটা সফল হয়েছিল আধুনিক কালের অনেকাংশে সংস্কারমুক্ত সমাজে তা আরও সফল হবে বলে মনে করলে বোধ হয় ভুল করা হবে না। কাজেই ওই সকল আদর্শ ও মতবাদ পুনঃ প্রচারে ব্রতী হওয়া উচিত বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে।

॥ আট ॥

বাংলার গ্রামীণ মানুষের শুভবুদ্ধি—হিন্দু-মুসলমানদের পাশাপাশি ভাই ভাইয়ের মতো বসবাস ও ভালবাসার মধ্য দিয়েই সত্যপীরের পরিকল্পনা এসেছিল। এরই ফলস্বরূপ গ্রামবাংলার লৌকিক দেবতা যেমন, বনবিবি, বিবিমা, মাণিকপীর, ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবি, গাজীসাহেব, সাতবোন বা সাতবিবি, পীর গোরাচাঁদ, রংকিনী দেবী, শীতলা, মনসা, বিষহরি, ধর্মঠাকুর, বাবাঠাকুর ও দক্ষিণরায় প্রভৃতি পূজা পেয়ে আসছেন হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছ থেকেই। কোনো গোঁড়া পণ্ডিত পারেন নি একে বন্ধ করতে, শেষ পর্যন্ত গোঁড়া মোল্লারাও বাধ্য হয়েছেন হাল ছেড়ে দিতে। খ্রীষ্টান পাদরীরা হয়েছেন ব্যর্থ। কারণ গ্রাম বাংলায় আজও অনেক খ্রীষ্টান নানারকম লৌকিক পূজায় অংশ গ্রহণ করেন, বিশ্বাস করেন অনেক লৌকিক দেবদেবীকে। অপর দিকে এখনও ডালহৌসী পাড়ার হাজার হাজার অফিসযাত্রী একবার মাথা নুইয়ে যান বউবাজারের সেই ফিরিঙ্গী কালীকে, যাঁকে স্থাপন করেছিলেন এণ্টনী ফিরিঙ্গী নামে একজন খ্রীষ্টান। কথিত আছে—তিনি বাগবাজারের ভোলা ময়রাকে কালীমূর্তি দেখিয়ে বলেছিলেন—

> "খ্রীষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নেইরে ভাই,
> শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এ কথা তো শুনি নাই।
> আমার খ্রীষ্ট যে, হিন্দুর হরি সে।
> ওই দেখ শ্যামা দাঁড়িয়ে আছে,
> আমার মানব জনম সফল হবে
> যদি তার রাঙাচরণ পাই।"

মনসামঙ্গল হতে জানা যায়—মনসার কোপ থেকে লক্ষীন্দরকে রক্ষার জন্য যে লোহার সিন্দুক তৈরী করা হয়েছিল তার মধ্যে অপরাপর পবিত্র গ্রন্থের সঙ্গে কোরাণও রাখা হয়েছিল। এটা সপ্তদশ শতকের শেষের কথা।

চট্টগ্রামের হামিদুল্লা তাঁর বেহুলা সুন্দরী কবিতায় লিখেছেন—বীরদের বিদেশে যাওয়ার সময়ে ব্রাহ্মণগণ আগে কোরাণ দেখতেন তারপর দিন তারিখ ঠিক করতেন। আবার হিন্দু বনেদী বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও বিদেশে

যাওয়ার আগে অনেক হিন্দু বীর নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন।

ঢাকায় অনেক মুসলমান জন্মাষ্টমীর মিছিলে যোগদান করেন। যশোহরে অনেক মুসলমান বেল ও তুলসী গাছকে হিন্দুদের মতো শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং জামাইষষ্ঠী, নবান্ন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় অংশ গ্রহণ করেন। পাবনায় মনসা ও বিষহরি পূজায় হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে যোগদান করেন।

বাংলার মুসলমান কবিরা হিন্দু কবিদের অনুকরণে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অনেক পদ রচনা করেছেন এ বিষয়ে সৈয়দ মূর্তজার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁর একটি পদে আছে—"শ্যাম বধূ আমার পরাণ তুমি।"

আলাউলের শিব-সঙ্গীত ও মীর্জা হোসেনের কালীস্তোত্র উল্লেখ করার দাবী রাখে। করম আলি বা করিমুল্লার কালীস্তোত্রও বিশেষ নামকরা। এ ছাড়া বহু মুসলমান কবি হিন্দুদের দেবদেবী নিয়ে অনেক কাব্য রচনা করেছেন।

পূর্ববাংলায় (বাংলাদেশে) বহু মুসলমান পীর ও দরগাহ হিন্দুদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। হিন্দুগণ বহু মুসলমান পীরের সরলতা এবং উদার ধর্মীয় মতবাদ ও অলৌকিক কার্যকলাপের পরিচয় পেয়ে তাঁদের কবরভূমি শ্রদ্ধাভরে পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তাঁদের উদ্দেশ্যে ফুল ও মিষ্টি উৎসর্গ করেন। এই সকল স্থানে যে মেলা বা উৎসব হয় তাতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই যোগদান করেন।

দূরদেশ হতে অনেক হিন্দুতীর্থ যাত্রীও ওই সকল দরগাহ পরিদর্শন করতে যান। ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামে পাঁচপীরের দরগাহের সঙ্গে পীর জলীল সাহেবের সম্পর্ক আছে। তিনি প্রায় ৩৮০ জন দরবেশ নিয়ে ওই স্থানে এসেছিলেন। মাঘীপূর্ণিমার দিন কোন্দাগ্রামের খোন্দকারের দরগাহ এবং বস্তার গ্রামের মাদার ফকিরের দরগাহ, মীরপুরের শাহ আলি সাহেবের দরগাহ শত শত হিন্দু দর্শন করতে যান, এছাড়া আজীমপুরার মহম্মদ দেওয়ান এবং বিক্রমপুরের হামবের আলম গাঁজির দরগাহ, বাগেরহাটের খান জাহান আলির দুই শিষ্যের দরগাহও বহু স্থানীয় হিন্দুর কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান।

বাংলাদেশে একতারা বাজিয়ে বাউলগান হিন্দু মুসলমানদের কাছে অতিশয় প্রিয়। অধিকাংশ বাউলগানই মুসলমানগণ রচনা করেছেন। তাঁদের

মতে মুক্তির জন্য মানুষের নিজের মনের মানুষকে চিনতে হবে, কারণ ভগবান মানুষের মধ্যেই আছেন, তাঁর জন্য পুরী বা মক্কায় যাওয়ার দরকার নেই। হিন্দুরাও মুসলমান বাউলদের বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। হিন্দুবাড়ীতে অপদেবতা বিতাড়নের জন্য মুসলমান ফকিরদের ওই সকল গান বিশেষ ভক্তি সহকারে গাওয়া হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রোগাক্রান্ত শিশুদের রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে তাদের রোগশয্যায় হিন্দুদের পদ্মপুরাণ পাঠের কথাও শোনা যায়। পালাগান, মহুয়া, চাঁদসদাগর ও বেহুলার নাট্যাভিনয় বা যাত্রাও হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছেই বিশেষ উপভোগ্য। ওই সকল যাত্রায় হিন্দু মুসলমান উভয়েই অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া শ্যামাসংগীত ও নৃত্য ধর্মনির্বিশেষে অনেকের কাছেই প্রিয়।

ময়মনসিংহের ঘটুগানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ গান বিশেষ করে রাধা-কৃষ্ণকে নিয়েই রচিত। যখন ধর্মনির্বিশেষে শতশত গ্রামবাসী এই সঙ্গীত শোনার জন্য জমায়েত হন তখন একটি সুদর্শন ছেলেকে ভালভাবে সাজিয়ে এই গান গাওয়ানো হয়। অনুরূপভাবে হজরত ইমাম হাসান হোসেনের করুণ কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত জারীগান যখন সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় তখন বহু হিন্দু এতে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেকে আবার ওই করুণ সঙ্গীত শুনতে শুনতে অশ্রু বিসর্জন করে থাকেন। নৌকো বাইচের সময়ে সাড়ীগানও হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছে বিশেষ উপভোগ্য। সাড়ীগানের মনমাতানো সুর নীল আকাশের নীচে নদীগর্ভে ভাসমান নিঃসঙ্গ নৌকোর মাঝির মনে এক অপরূপ প্রাণবন্ত সাড়া জাগিয়ে চলেছে যুগযুগ ধরে। এ ছাড়া ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি স্থানের রঙীন বোড়ো উৎসবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কলাগাছ দিয়ে তৈরী ভেলা (নৌকা) ছোট ছোট মাটির প্রদীপ বা জলের মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয় ঝাঁকে ঝাঁকে, ওইদিন নদীগর্ভে নৌকাগুলিতে ছোট ছোট দীপ জেলে সাজানো হয়। ওই মনোরম দৃশ্য এবং তার সঙ্গে মাঝিদের অনাবিল প্রাণখোলা উদাত্ত গলায় গাওয়া ভাটিয়ালী গান যে শুনেছে সে তা জীবনে ভুলতে পারবে না। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে লোকই এতে অংশ গ্রহণ করেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই সঙ্গীতকালে গোপীযন্ত্র, দোতারা, একতারা, সারেঙ্গী, করতাল, খোল, কাঁসি এবং বাঁশী প্রভৃতি ব্যবহার করেন।

বাংলাদেশে মুসলমান বাড়ীতে বিবাহ-সঙ্গীতে হিন্দুমেয়েরা অংশ গ্রহণ

করেন। চট্টগ্রাম জেলায় বিয়ের দিন মহিলারা প্রায় সারারাত গৃহের মধ্যে গান করেন এবং পুরুষেরা করেন গৃহের বাইরে। বর ও বধূর স্নান করবার ও পোশাক পরবার সময় পৃথক্ পৃথক্ গান গাওয়া হয়। কোথাও এরূপ নিয়ম আছে যে, মুসলমান গৃহে যখন বিবাহ হবে তখন একদল অন্তজ শ্রেণীর হিন্দু যুবতী গান গাইবে এবং তার পরিবর্তে তারা খাদ্য ও অর্থ পাবে। বিবাহ ও উৎসব উপলক্ষে সাজসজ্জা হিন্দু ও মুসলমানদের বাড়ীতে প্রায় একই রকম। এতে আমের পাতা ও পল্লব, মাটির ঘট ব্যবহার করা হয়। এই উপলক্ষ্যে দেয়াল চিত্রিত করা এবং মেঝেতে আলপনা দেওয়া হয়। গ্রামের দিকে এটা যেন একটি সাধারণ নিয়ম যে, হিন্দু মেয়েরা মুসলমান বাড়ীতে মেঝেতে আলপনা এঁকে দেবেন। অনুরূপভাবে হিন্দু বাড়ীতে বিবাহে মুসলমানগণের অংশগ্রহণও একটি সাধারণ দৃশ্য।

তাজিয়া বহনে হিন্দুগণও অংশগ্রহণ করেন এবং এই উপলক্ষে তরবারী খেলায়ও তাঁরা যোগদান করেন। মুসলমানগণও অনুরূপভাবে দুর্গাপূজা উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। বিজয়া দশমীর দিনে হিন্দু মুসলমান একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা একই সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পকর্ম যেমন সোনারূপার অলঙ্কার তৈরী, মাটির পাত্র তৈরী, কাঁচের, কাগজের, শঙ্খের, বাঁশের, ফুলের, তামার, জরির ও সুতোর কাজ করেন। মুসলমান শিক্ষকগণ হিন্দুবাড়ীতে পড়ান। হিন্দু রাজমিস্ত্রী মসজিদ এবং মুসলমান রাজমিস্ত্রীকে মন্দির তৈরী করতে দেখা যায়। এখানে হিন্দু উৎসব উপলক্ষে যে মেলা হয় তাতে মুসলমান এবং মুসলমানদের উৎসব উপলক্ষে যে মেলা হয় তাতে হিন্দুগণ যোগদান করেন। এককালে ঢাকায় জামাইষষ্ঠী মিছিলে এবং অশোকাষ্টমী মেলায় হাজার হাজার মুসলমান যোগদান করতেন। শুধু তাই নয়, চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষে (১লা বৈশাখ) ঢাকা জেলায় বহু মেলা হয়। তাতে জাতিধর্মনির্বিশেষে বহু লোক অংশ গ্রহণ করেন।

চাঁদ সদাগরের গল্প এবং মনসা পুজোর প্রচলন কাহিনী অনেক হিন্দু মুসলমান খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। বাংলাদেশের অনেক মুসলমান শাসকের আনুকূল্যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দুগণের চৌধুরী, পাত্রনবিশ, খান প্রভৃতি উপাধি মুসলমানগণের দেওয়া। এখানে হিন্দু কবিগণ মুসলমানদের এবং মুসলমান কবিগণ হিন্দুদের

বিষয়ে লিখেছেন। মুসলমান আমলে বাংলাদেশে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছে, এবং তখন অনেক সুলতানের ধর্মান্ধতা ছিল না বলে হিন্দুদের ধর্মাচরণে পুরো স্বাধীনতা ছিল। বাংলাদেশে অনেক জৈনমন্দির, শিখদের গুরু দওয়ারা, বৌদ্ধমন্দির ও খ্রীষ্টানদের গীর্জাও আছে। ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সালে স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানগণের অবদানও কম উল্লেখ্য নয়। বহু মুসলমান তখন হিন্দুদের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছেন। পাবনা জেলার বাজ সিরাজগঞ্জের খ্যাতনামা বক্তা ইসমাইল সিরাজী তাঁর 'অনল প্রবাহ' পুস্তক প্রণয়নের জন্য দুবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের সময়ে এবং বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির ঐতিহ্য কিছুটা ব্যাহত হলেও তা পুনরায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে তার পূর্বাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এটাই সকলের কাম্য।

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা গরীব বা শিল্পী শ্রেণীর তাঁদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত নিচুজাতের হিন্দু যাঁদের অধিকাংশই শিক্ষাদীক্ষায় ছিলেন ভীষণ অনগ্রসর এবং তাঁদের মধ্যে মুসলমান শিক্ষিত মোল্লারা প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। যার ফলে ধর্মান্তরগ্রহণের পর তাঁরা অনেক হিন্দু আচার-ব্যবহার ও পূজা-পার্বণ এখনও ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁরা আরবী জানতেন না। কেউ কেউ দু-একটু ফার্সি জানলেও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের বিষয়ে বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না এঁদের। এছাড়া ভিন্ন জায়গায় এঁদের অনেক আত্মীয় স্বজন আবার অধর্মান্তরিত রয়ে গিয়েছিলেন তখনও। কারণ মুসলমান সৈন্যরা ঝড়ের গতিতে হাতের কাছে যাদের পেয়েছিল তাদেরকেই ধর্মান্তরিত করেছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে অবস্থা ছিল সে বিষয় দুজন মুসলমান লেখকের রচনা হতে জানা যায়—একজন লিখেছেন—বাঙালী মুসলমানেরা আরবি না বুঝার জন্য মুসলমান ধর্ম অনুকরণ করতে পারতো না। ফলে তারা গল্প, কাহিনী নিয়েই মত্ত থাকত। আর একজন লিখেছেন মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ সম্বন্ধে—

"হিন্দু মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে॥

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে আচার অনুষ্ঠান, দেবতা ইত্যাদিতে অনেক

পার্থক্য আছে। কিন্তু একই স্থানে দুই ধর্মের লোক বহুদিন বসবাস করার ফলে বাংলার অনেক স্থানেই এই দুই ধর্মের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। প্রায়শঃই এখানে এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। তাই ধর্মান্তরিত হয়েও নিজ ধর্মের আচার অনুষ্ঠানগুলি ত্যাগ করেননি। বহু হিন্দু চাষী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের নাম বদলেছেন, মন্দিরের বদলে তাঁরা মসজিদে গিয়েছেন। কিন্তু হিন্দু আচার অনুষ্ঠানগুলি বর্জন করা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই ধর্মান্তরিত মুসলমানদের অনেকে এখনও হিন্দুদের মতো গঙ্গাস্নান করেন, জন্মোৎসব, শ্রাদ্ধ করেন, তাবিজ-মাদুলি ব্যবহার করেন। বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরে এই ধরনের কিছু মুসলমান এখনও বসবাস করছেন।

বীরভূম জেলার বারাগ্রাম। এই গ্রামখানি পূর্বে বৌদ্ধ প্রধান গ্রাম ছিল। হিন্দুর সংখ্যাও এখানে কম ছিল না। বর্তমানে গ্রামখানি মুসলমান প্রধান। এখন এখানে হিন্দুর সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই গ্রামে আগে কিছু ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। বর্তমানে গ্রামখানি প্রায় ব্রাহ্মণ শূন্য। এখানকার মুসলমানরা প্রায় সকলেই ধর্মান্তরিত মুসলমান। এখানে মুসলমান পীরের সমাধি আছে। গ্রামে প্রবেশ করলে প্রথমেই দেখা যায় লোহাজঙ্গ পীরের সমাধি। এই সব পীরেরা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাহচর্যেই সিদ্ধ পুরুষ হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।

বীরভূম জেলার নলহাটি গ্রামে হিন্দু মুসলমান পরস্পরে বিদ্বেষ-হীন হয়ে পাশাপাশি বসবাস করেন। সেখানে হিন্দুর পার্বতী মন্দিরের কাছেই মুসলমানের মসজিদ। এখানকার মুসলমানেরা দ্বিধাহীন ভাবে হিন্দুদের উৎসবে যোগ দেন। বিষ্ণুমূর্তি, সূর্যমূর্তি, গণেশমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি প্রভৃতি মুসলমান চাষীরাও যত্ন করে করে ঘরে রাখেন। এখানে হিন্দু মুসলমানে সম্প্রদায়গত কোনো ভেদ বুদ্ধি নেই।

বীরভূমের মতো বর্ধমান জেলাও হিন্দু মুসলমানের মিলন দেখা যায়। বহু মুসলমান পীর ও হিন্দু সাধক এবং তাঁদের সঙ্গে বহু ধর্মান্তরিত মুসলমান ও খ্রীষ্টান হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের লোকদের মধ্যে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে যুগ যুগ ধরে এক অসাধারণ সেতুবন্ধনের কাজ করেছেন। এর সঙ্গে আছেন কিছু লৌকিক দেবদেবী যাঁরা সর্ব সংস্কারমুক্ত উদারতার প্রতীক এবং বাংলার নিজস্ব মানবধর্মের প্রতিমূর্তি।

জানা গেছে—পীর বহরম বাংলা দেশের বর্ধমান শহরে এলে সেখানকার

একজন বিখ্যাত সাধক জয়পালের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁরা পরস্পরের গুণে মুগ্ধ হন, এবং আধ্যাত্মিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। সাধক জয়পাল মুসলমান পীরের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বর্ধমান শহরের এক প্রান্তে এই দুই সাধকের একাত্মতার স্মৃতিচিহ্ন আজও বর্তমান আছে এবং তাঁদের নাম এখনও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেন।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্যদেবের সময়কার একটি চিত্র পাওয়া যায়। যাতে চৈতন্যের ধর্মভাবের প্রতি যে কিছুসংখ্যক মুসলমান আসক্ত হয়েছিলেন এবং ওই আসক্তি যে হিন্দু ব্রাহ্মণগণের চেয়েও বেশী ছিল তার কিছু আভাষ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে মেলে। যেমন—

অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥

মুসলমান সুলতানের অত্যাচারী মদমত্ত বিষ্ণুদ্রোহী কর্মী জগাই মাধাই নিত্যানন্দ হরিসংকীর্তনে বের হলে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করলেও তিনি সংকীর্তনে বিরত, হলেন না। তখন প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যরও ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিল। তিনি জগাই মাধাইকে শায়েস্তা করতে এলে নিত্যানন্দ চৈতন্যের পা ধরে ওদের ক্ষমা করতে বললেন। এতে জগাই মাধাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং মুখে হরির নাম উচ্চারণ করে। নিত্যানন্দের এহেন দয়ার জন্য বলা হয়—

"নিতাই মার খেয়ে দয়া করে
এমন দয়া আর দেখি নাই।"

পীর বহরম এবং জয়পালের যে মিলনের কথা বলা হল তা হিন্দুর মুসলমান গুরু বা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের দ্যোতক। পীর বহরমের স্থানকে হিন্দু মুসলমানের মিলনভূমি বলা চলে। এই জেলায় অম্বিকা কালনাও হিন্দু মুসলমানের মিলনের উল্লেখযোগ্য ভূমি।

অম্বিকা কালনায় গৌরাঙ্গ পূজার প্রথম প্রবর্তন হয়। ষোড়শ শতকের প্রথমে কালনা মুসলমান প্রধান শহর ছিল। মুসলমান ধর্মের এত প্রাধান্য সত্ত্বেও

চৈতন্য নিত্যানন্দ ও পারিষদবর্গ এখানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। মুসলমানদের হৃদয়ও এই ধর্মের প্রভাবে বিগলিত হয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—

"যবনের নয়নে দেখিয়ে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনারে জন্মায় ধিক্কার॥"

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটেও হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিলন সাধন হয়েছে। বর্ধমানে অনেক পীরস্থান আছে। এইসব পীরস্থানে হিন্দুরাও পূজা মানত করেন। আবার হিন্দুদের ধর্মরাজ, মনসাদির মন্দিরে মুসলমানরাও পূজা দেন, পাঁঠাবলি দেন। শুধু বর্ধমান নয়, বাংলার অন্যত্রও এরূপ মিলনভূমি বিদ্যমান। যেমন মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা। এখানেও হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে হিন্দুদের দেবী সর্বমঙ্গলা, রঙ্কিনী, চম্‌কিনী প্রভৃতি বনদেবী মুসলমানদের দ্বারাও পূজিত হন। গড়বেতার রাজকোটা দুর্গের চারিদিকে চারটি দেবতার মূর্তি আছে—গোরাখাঁ পীর, ওলাইচণ্ডী, বাঘ রায়, বারভূঞা। পীর এবং চণ্ডী—মুসলমান এবং হিন্দু ধর্মের দেবতার পাশাপাশি অবস্থান ক'রে দুই ধর্মের মিলনের সাক্ষ্য হয়ে আছেন।

সাগরদ্বীপের সম্মুখে মেদিনীপুর জেলার কসবা হিজলী। হিজলীতে তাজ-খাঁ মসনদ-ই-আলার মসজিদটি ভাগিরথী নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশকালে সকলেরই চোখে পড়ে। জাতিধর্মনির্বিশেষে এ দেশীয় হিন্দু-মুসলমান মাঝিরা সকলেই তাঁদের যাতায়াতের পথে এই মসজিদটিকে পীরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান।

এখানে পীর, গাজী, মুসলমান ফকির সকলেই পূজা পেতেন উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে। ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে পীরদের উল্লেখ আছে। হিন্দু কবিরা এই সব কাব্যে পীরদের বন্দনা করেছেন।

হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে এক মসজিদের গায়ে বুদ্ধ মূর্তি খোদিত আছে। মসজিদের ছয়টি স্তম্ভের প্রত্যেকটিতে আছে একটি করে বুদ্ধ মূর্তি। এখানে বড়খাঁ গাজীর সমাধির কাছে একটি মূর্তির খানিকটা চিহ্ন আছে, সেখানে একটি নাগের কুণ্ডলী ছাড়া আর কিছুই বোঝা যায় না। এই মূর্তিটিকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছিলেন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি।

মসজিদে নাগ এবং বুদ্ধ মূর্তি দেখে মনে হয়, এখানকার মুসলমানেরা ধর্মসম্বন্ধে অনুদার ছিলেন না।

ত্রিবেণীর একটি স্মরণীয় নাম জাফর খাঁ গাজী। জাফর খাঁ গাজীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দু'জন হিন্দু নৃপতির নাম—মান নৃপতি ও ভূদেব নৃপতি। জাফর খাঁর মসজিদ ও সমাধিস্তম্ভে মুসলমান শিলালিপি এবং হিন্দুর মন্দির, মূর্তি ভাস্কর্য—উভয়েরই নিদর্শন পাওয়া যায়।

হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের মসজিদেও ত্রিবেণীর মসজিদের মতো হিন্দু ভাস্কর্যের নিদর্শন রয়েছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই শান্তিতে বসবাস করতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই গাজীর দরগায় পূজো দিতে যেতেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার শুরু করেন। এর দুশো বছর আগে জাফর খাঁ সপ্তগ্রামে মুসলমান ধর্ম প্রচার করেছিলেন। যদিও জাফর খাঁর সময় সপ্তগ্রামে বিষ্ণুপূজা এবং সূর্যপূজা হত। নিত্যানন্দের যুগে অনেক মুসলমানই ছিলেন বিষ্ণুদ্রোহী। এই মুসলমানেরাই কিন্তু নিত্যানন্দের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের উদার নীতি হিন্দু মুসলমানকে প্রীতির বন্ধনে বেঁধেছিল।

বাংলার নাথ ধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল হুগলী জেলার মহানাদ গ্রামে। এই মহানাদের ঈশানকোণে মাইল তিনেক দূরে আছে 'যোগীডাঙ্গা' নামে একটি গ্রাম। প্রাচীন মহানাদ মৌজার অন্তর্গত এই গ্রাম। প্রাচীনকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এমন গোঁড়া হয়ে উঠেছিল যে, তা হিন্দুর এক বৃহত্তর অংশকে অপাংক্তেয় করেছিল। ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে এক উদার গণতান্ত্রিক আবেদন আছে, এই সব অবজ্ঞাত হিন্দুরা সেই আবেদনকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তাঁরা ইসলামধর্মের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন এবং এই ধর্ম গ্রহণ করলেন। হুগলীর নাথ যোগীরা এই রকম ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং এই ধর্মান্তরের স্মৃতি বহন করে হুগলীর যোগীডাঙ্গা। নাথযোগীরা সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মুসলমান হলেও নাথধর্মের আচার আচরণকে ত্যাগ করতে পারেন নি। কিন্তু ধর্মের খাতিরে মুসলমান পীরদের মতো কিছু আচরণ তাঁদের পালন করতেই হয়। তাই এঁদের এক কথায় বলা হয় 'যোগী পীর'। সুতরাং বোঝা যায় হিন্দু নাথযোগী এবং মুসলমান পীরের ধর্মাচরণের

সংমিশ্রণ হয়েছিল। এই সংমিশ্রণের প্রমাণও রয়েছে বাউড়িয়ার নাথমঠের পূজারীদের জপ, ধ্যানমন্ত্র এবং ধর্মাচরণে।

চব্বিশ পরগনায় বারুইপুরও হিন্দু-মুসলমানের এক মিলনস্থল। বারুইপুরের জমিদার মদনমোহন রায়চৌধুরীর জমিদারী প্রাপ্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী শোনা যায় যে, তিনি বাকী খাজনার দায়ে মুর্শীদকুলী খাঁর কাছে বন্দী ছিলেন। নবাব গাজী সাহেবের স্বপ্নাদেশে মদনমোহনকে মুক্তি দেন এবং জমিদারী দান করেন। কিংবদন্তী যাই হোক না কেন, তবে দেখা যায় যে, রায়চৌধুরীদের জমিদারীর অনেকটা অংশই পীরোত্তর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু মুসলমান মিলন এই দক্ষিণবঙ্গের মতো আর কোথাও দেখা যায় না। বারুইপুরের রায়-চৌধুরীদের জমিদারীর অন্তর্গত ঘুটিয়ারী শরিফ। এই ঘুটিয়ারী শরীফ মুসলমানদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। পীর গাজী মোবারক আলীর দরগাহ ও মসজিদ এখানে অবস্থিত। রায়চৌধুরীরাই এই দরগাহ তৈরী করেন। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই এখানে শিরনি দিয়ে থাকেন। মুসলমান তীর্থক্ষেত্র অথচ তার প্রধান উদ্যোক্তা হিন্দু জমিদার এবং হিন্দু মুসলমান সবাই আসেন এই তীর্থে।

বারুইপুরে 'ওলাবিবি' বা 'বিবিমা' আছেন। রায়চৌধুরী জমিদাররাই এঁর পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু এঁর পুরোহিত মুসলমান ফকির। কলেরা বসন্তের সময়ে হিন্দু-মুসলমান সকলেই এখানে পূজা দেন। আবার বিবিমার পাশেই আটিসারাতে গৌর নিতাই-এর পূজা হয়। চব্বিশ পরগনা জেলার খাড়িগ্রাম। মুসলমান যুগেও এখানে একচ্ছত্র মুসলমান রাজত্ব সম্ভবপর হয় নি। পাঠান আমলেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় হিন্দু সামন্তেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন। হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি ভেদবুদ্ধিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাধারণ লোকদের কোনো সমর্থন ছিল না। কৌলিন্য প্রথায় জর্জরিত হিন্দু সমাজে যে সব হিন্দুরা অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই লাভ করেননি, তাঁরা মুসলমান ধর্মের গণতান্ত্রিক আবেদনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের এই জাতিভেদ নীতির ফলেই মুসলমান গাজীসাহেব এবং খ্রীষ্টান পাদরী সাহেবদের পক্ষে সহজ হয়েছিল মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করা। যদিও খাড়িগ্রামে আজও নারায়ণী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না এবং সিংহবাহিনীর পূজার প্রচলন আছে। নারয়ণীর পাশেই আছেন খাড়ির গাজী সাহেব। এঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমান।

চব্বিশ পরগনার আর একটি হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্থান করঞ্জলি গ্রাম। এখানে এক লোকদেবী আছেন, তিনি দুই সম্প্রদায়ের নিকটই পূজা পেয়ে থাকেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে ওলাইচণ্ডী। মুসলমান আমলে ইনি হলেন 'ওলাইবিবি'। এর গ্রাম্য নাম 'বিবিমা', । দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বাবাঠাকুর, শীতলা এবং গাজী সাহেব প্রত্যেকের প্রতিপত্তিই সমান। কোনো কোনো স্থানের বনদেবীদের নাম 'রণকিণী', 'চমকিণী', 'সনকিণী' ইত্যাদি। এই বনদেবীদের সাত বোন রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মুসলমান যুগে এই সব বনদেবীরাই হয়েছেন 'বনবিবি'। এই বনবিবিরাই 'সাতবিবি' নামে পূজিত হন। রঙ্কিণী দেবীকে আবার অনেকে ভৈরবী বলেন। এঁদের কাছে হিন্দু ও মুসলমান সকলে সমান।

পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে একশ্রেণীর চিত্রকর আছেন। এঁরা আধা হিন্দু আধা মুসলমান। এঁরা হিন্দুর বহু আচরণ মানেন আবার মুসলমানের মতো নমাজ পড়েন। এঁদের পূর্বপুরুষেরা সীমন্তবর্তী নিষাদজাতির কোনো শাখা ছিলেন বলে মনে হয়। পরে এঁরা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। এই সময়ে চিত্রকরেরা নমাজ পড়তেন না এবং সম্পূর্ণ হিন্দুই ছিলেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এঁদের ঘৃণা করতেন। তখন চিত্রকরদের অনেকে সামাজিক কারণে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর বৌদ্ধ প্রভাব কমে আসলে এঁদের অনেকে মুসলমান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। নমাজ পড়লেও এঁরা কিন্তু হিন্দুদের আচার আচরণ ত্যাগ করতে পারেন নি। এই চিত্রকর শ্রেণীর মেয়েরা শাঁখা সিঁদুর পরেন। চিত্রকরেরা হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকেন।

বীরভূমের এই চিত্রকরদের মতো মেদিনীপুরের পটিকাররাও আধা হিন্দু আধা মুসলমান। কুমীরমারা গ্রামের পটিকাররা নমাজ পড়েন, কিন্তু মসজিদে যান না। বিবাহ দেন নিজ পটিদার সমাজে। মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ প্রচলিত ছিল না, যদিও মুসলমান মৌলানারাই কলমা পড়াতেন। নির্ভয়পুরের চিত্রকর পল্লী ব্যতীত আর কোনো চিত্রকর পল্লীতে মসজিদ দেখা যায় না। বিশ্বকর্মার পুত্র চিত্রকরেরা বিশ্বকর্মার পূজাও করেন। মেয়েরা করেন লক্ষ্মী পূজা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই চিত্রকরদের অনেকেই সেবাশ্রম সঙ্ঘের শুদ্ধি অন্তে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। অবশ্য একদল চিত্রকর এখনও মুসলমানই থেকে গেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় একই ভাবে দিনাতিপাত করেন।

মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত আমদাবাদ গ্রাম। এখানে

'কাকমারা' উপজাতির বাস। এই 'কাকমারা' উপজাতির সব কিছুই অদ্ভুত ধরনের। নামটি পর্যন্ত অদ্ভুত। কাক যারা মারে তারাই 'কাকমারা'। কাকের মাংসই এদের প্রিয় খাদ্য। এরা সব জন্তুর মাংস খায় কিন্তু গো-মাংস নিষিদ্ধ। হিন্দুদের মতো এদের নিজস্ব পুরোহিত আছে। আবার মুসলমানদের মতো এরা মৃতদেহ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত রাখে।

মেদিনীপুরের কল্‌মাদরা আর একটি উপজাতি। কাঁথি, নন্দীগ্রাম এবং খেজুরী থানাতেই এদের অধিক বাস। এরাও আধা হিন্দু আধা মুসলমান। এরা পীরের পুজো করে এবং নমাজ পড়ে। মুসলমানদের সঙ্গে আহার চলে কিন্তু বিবাহ চলে না। বিবাহ হয় নিজেদের মধ্যে। বিবাহে হিন্দুদের মতো গায়ে হলুদ হয়, কিন্তু বিবাহের অন্যান্য রীতি মুসলমানদের মতো। মৃতদেহও মুসলমানদের মতোই সমাধি দেওয়া হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রীতি নীতি নিয়ে এক বিচিত্র সমাজ গড়ে তুলেছে এই কল্‌মাদার উপজাতি।

মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির বিনিময় হয়েছিল, এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠেছিল। মুসলিম দরগা, মেলা, উৎসব পার্বণে উভয়েই যোগ দিত। জঙ্গীপুরের কাছে রঘুনাথ গঞ্জে সৈয়দ কাশিমের দরগা, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই তীর্থক্ষেত্র। মুর্শিদাবাদের ছাপাখাটিতে আছে মর্তুজা হিন্দের দরগা এবং হিন্দুদের ভৈরবী আনন্দময়ীর আশ্রম। কথিত আছে—ছাপাখাটির দরগায় পুজো দেওয়ার সময় হিন্দুরা বলেন, 'আল্লা হো আকবর' আর মুসলমানেরা বলেন 'জয় মা কালী'।

এই বাংলায় ভাগীরথী নদী বিভক্ত হয়েছে দুই ধারায়—পদ্মা ও ভাগীরথী, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মিলিত সংস্কৃতি বাংলায় অবিভক্তই আছে এবং এখনও এই যুগ্ম ধারা মিলিত হয়েই প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামের একজন মুসলমান চাষীর গাভীর বাছুর বিয়োনের পরেই বাছুর মরে যেত। বেশ কয়েকবার এরূপ ঘটনা ঘটাতে ওই চাষী মানত করে—আবার তার গাভী বিয়োলে প্রথম দুধটুকু সে তারকেশ্বরের মন্দিরে দিয়ে আসবে। সেই দুধ নিয়ে গেলে মন্দিরের মোহন্ত মুসলমানের দেওয়া দুধ তারকেশ্বরকে দিতে অস্বীকার করলে চাষী মনোদুঃখে বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় পথে তারকেশ্বর মানুষের বেশে তার হাতের দুধটুকু খেয়ে ফেলেন এবং চাষীকে পরের দিন আবার দুধ নিয়ে

যেরেত বলেন এবং বলেন—এবার দুধ নিয়ে গেলেই মোহন্ত তার দুধ নেবে। এতে মুসলমানটি প্রথমে বিশ্বাস না করলেও পরে সে যেতে রাজী হয়। এদিকে তারকেশ্বর ওই দিন রাতেই মোহন্তকে ওই মুসলমান চাষীর দুধ পুজোয় দেওয়ার জন্য তাকে স্বপ্নাদেশ করেন। পরের দিন চাষী দুধ নিয়ে গেলে মোহন্ত তা গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, পুজোর বাতি ওই মুসলমানের হাতে জ্বালিয়ে নেন। আজও নাকি তারকেশ্বরের পুজোয় প্রথম বাতি একজন মুসলমান দিয়ে জ্বালান হয়ে থাকে। তারকেশ্বরের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"বাবা মক্কায় মক্কেশ্বর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর,
কলি যুগে জীব তরাতে নাম তারকেশ্বর।"

॥ ২ ॥

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মে পার্থক্য থাকলেও আচার আচরণে প্রচুর সামঞ্জস্য দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ সিঁদুর ব্যবহারের কথা বলা যেতে পারে। হিন্দু নারীদের সিঁদুর সধবার চিহ্ন স্বরূপ। সিঁথির সিঁদুর হিন্দু রমণীকে পতি গর্বে গরবিনী করে তোলে। এই সিন্দুরপ্রিয়তা মুসলমান রমণীদের মধ্যেও দেখা যায়। হিন্দুনারীর মতো অনেক মুসলমান নারীও সিঁথিতে সিন্দুর দেন। এই সব মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হিন্দু। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পরও হিন্দুর অনেক আচার আচরণ তাঁরা ছাড়তে পারেন নি। সিন্দুর ব্যবহার তারই একটি উদাহরণ। মুসলমান সমাজে সিঁদুর সম্বন্ধে অনেক গানও প্রচলিত আছে। যেমন—"বিবির সিন্দুর লইয়্যারে বিদেশী দামান। চান ফেরে নদীর কুলে। কার লইগ্যা কেনলাম সিন্দুর রে'—ইত্যাদি। অনেক মুসলমান বিবাহও দেন হিন্দু রীতিতে।

গ্রামে কোনো কোনো মুসলমান বিষহরির পূজা করেন হিন্দুদের মতো। এঁরা হিন্দুদের সঙ্গে ধর্মপূজায়ও যোগ দেন। বৃক্ষ-পূজা, গ্রাম্য দেবতার পূজা হিন্দু মুসলমান একই সঙ্গে করেন। হিন্দু দেবতার নামে অনেক মুসলমানের নামকরণও হতে দেখা যায়। অন্য দিকে হিন্দুরাও মুসলমানদের দরগায় শিন্নি দেন। মহরম, জন্মাষ্টমী-অনুষ্ঠান, সত্যপীর, শীতলা, মনসার পূজায় দুই সম্প্রদায়ই যোগ দেন। আবার হিন্দুদের তারকেশ্বরের মন্দিরে চেরাগ জ্বালান মুসলমান। সুতরাং ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও হিন্দু মুসলমান সকলেই প্রায় সমান।

হিন্দু মুসলমানের সাহিত্য, পোষাক, রুচি প্রভৃতিও প্রায় একরকম। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যেও বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। অনেক উৎসব, আচার অনুষ্ঠানও এই দুই সম্প্রদায়ের প্রায় একই রকমের। যেমন, শিশুর জন্মের ছয় সাত দিন পরের একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি হিন্দু সমাজে কখনও কখনও শিশুর ষষ্ঠী পূজার দিনও অনুষ্ঠিত হয়। এটি হয় শিশুকে শিক্ষিত ও বিজ্ঞ করার বাসনা নিয়ে। এই অনুষ্ঠানে হিন্দুরা গান করেন—"কলম রাখছি কালি গো রাখছি, রাখছি সিসের কাজল রে। জামা রাখছি, জোড়া রাখছি, আরও রাখছি কমুড়ের তাগা রে। আরু রাখছি, উরু রাখছি—রাখছি পঞ্চ ঘিওরের বাতিরে, দেবদারু ঘিইরা রাখছি নবীনা জাঙ্গল রে।" বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে এই অনুষ্ঠানটি হয় নবজাতকের জন্মের সাতদিন পরে। উদ্দেশ্য হিন্দুদের মতোই—শিশুকে বিজ্ঞ করার বাসনা। এই অনুষ্ঠানে শিশুর মাথার কাছে দোয়াত কলম রাখা হয়। আত্মীয় পাড়াপড়শীরাও সারারাত প্রসূতির ঘরে আমোদ ও গান করে। নবজাতক ও তার মা নূতন বস্ত্র পরে। তারপর প্রসূতি সন্তানকে কোলে নিয়ে হাতে লোরা বা পাত্র নিয়ে ঘর থেকে বাইরে আসে উঠানে। বাড়ীর অন্য কোনো মেয়ে একটি ঘটে করে জল নিয়ে আসে। এই ঘটে আম্রপল্লব দেওয়া থাকে। এই ঘটের জল শান্তির জলের মতো ছিটিয়ে দেওয়া হয় শিশু ও মায়ের ওপর। এরপর মা শিশুসহ একটি ধানছড়ানো চাটাইয়ের কাছে যায়, সেখানে কুলোয় পান, সুপারি, ধান, দূর্বা সাজানো থাকে পূর্ব দিকে মুখ করে। প্রসূতি এই কুলোকে নমস্কার ক'রে উত্তর ও পশ্চিম দিককে নমস্কার করে। তারপর প্রসূতি শিশুকে নিয়ে চাটাইয়ের ধান পা দিয়ে নাড়তে থাকে। তারপর দুজনের মাথার ওপরে একটি ছাতা ধরা হয়। ছাতার ওপর বাতাসা, পিঠা, সুপারি, পান ফেলা হয়। তখন সবাই একসঙ্গে গান করে, "আশমান ছাউয়ালিয়া, আরে ছাউয়ালিয়া—জমিনে ঘিরিল রে। ছাউয়ালিয়ার নছিবের লেখন, আল্লাজী দু' লেখুইন রে, ছাউয়ালিয়ার শিরের লেখন, আল্লাজী দু'লেখইন রে। আশমানের ছাউয়ালিয়া, আরে ছাউয়ালিয়া—জমিনে ঘিরিল রে। ছাউয়ালিয়ার রিজিকের কলম, আল্লাজী দু ধরুইন রে, ছাউয়ালিয়ার টপরনের কলম, আল্লাজী দু' মারুইন রে ইত্যাদি।

॥ ৩ ॥

হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী খুব বেশী দেখা গিয়েছিল আলিবর্দীর রাজত্বে। নবাব তাঁর রাজকার্যে হিন্দুদের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি হিন্দুর পরামর্শ ব্যতীত কোনো কাজ করতেন না। আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র সহমৎ ও মৌলৎ জুঙ এবং সিরাজ ও মীরজাফর হিন্দুদের সঙ্গে দোল খেলায় যোগ দিতেন, আবির মাখতেন।

হিন্দু মুসলমান উভয়েই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় শিরনি দান করতেন। নবাব আলিবর্দীর রাজত্বে সৈয়দরা শিরনি বিলোতেন, হিন্দু মুসলমান সকলেই সকলের জুঠা খেতেন। এর পরিচয় পাই দরবেশদের কথা থেকে—'সঅদ সেরনী বিলই, সককো জুঠ সবে খাই।' মীরজাফর মরণাপন্ন অবস্থায় কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত পান করেছিলেন। সুতরাং দেবতার প্রসাদ গ্রহণে কোনো ধর্মেই বাধা নেই, সে দেবতা যে কোনো ধর্মেরই হোক। মুসলমানদের পাঁচ পীরের মধ্যে দুজন ছিলেন হিন্দু—রামগাজী ও মাছন্দনাথ।

ভারতবর্ষে যে মুঘলেরা রাজত্ব করে গেছেন, তাঁদের ধর্ম ছিল ইসলাম। কিন্তু মুসলমান হয়েও হুমায়ুন নিরামিষ আহার গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট আকবর গো হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। শা-জাহান-পুত্র দারাশিকোও হিন্দুর বেদান্ত পাঠ করতেন। যবন হরিদাস হিন্দুদের কাছে পরিণত হয়েছিলেন ব্রহ্ম হরিদাসে। হরিদাসের মৃত্যুতে ঠাকুর শ্রীচৈতন্য কেঁদে ছিলেন তাঁর মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে এবং ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ অদ্বৈত আচার্য করেছিলেন তাঁর পিণ্ডদান।

কথিত আছে—নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন ব্রাহ্মণ। পরে ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন (মৈত্রেয় অক্ষয়কুমার,"মীরকাশিম")। মৌলবী সেরাজ-উল হক বলেছেন, "বাঙলার লক্ষ লক্ষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ভিতর সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জাঠ, রাজপুতের রক্তপ্রবাহ বিদ্যমান। সুতরাং তাদের সম্মুখে প্রাচীন হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, কাব্য, মহাকাব্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান রচনার জ্ঞানের যে গৌরব, সে গৌরবের কাছে প্রাচীন গ্রীক ব্যতীত প্রাচীন ফিনিসিয়া, মিডিয়া, জুডিয়া, বাকট্রিয়া কার্থেজ, রোম, মিশর, কালডিয়া, ট্রয়, ব্যাবিলনীয়া ও পার্থিয়া প্রভৃতি সকলেরই মাথা নত অথচ সেই প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের মহাজ্যোতি হতে দেশীয় মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করলে মুসলমান কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।" মৌলনা আকরম খাঁ

বলেছেন—"এই ভারতবর্ষ হিন্দুর স্থায় মুছলমানেরও মাতৃভূমি। যুগ যুগ অতিবাহিত করে এদেশের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে আমরা নিজদিগকে মিশিয়ে দিয়েছি। দুনিয়ার অন্য সমস্ত দেশে আমরা বিদেশী। একমাত্র এই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি জোড় করে বলি—এই আমার দেশ, এই আমার মাতৃভূমি।" এঁদের উক্তি থেকে বোঝা যায়, হিন্দু এবং বহু মুসলমানের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত, উভয়ের মাতৃভূমিও এক। সুতরাং একমাত্র ধর্মীয় শাস্ত্র ছাড়া দুই সম্প্রদায়ে বিশেষ কোনো পার্থক্যই চোখে পড়ে না।

হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মিলন প্রচেষ্টা দেখা যায় মুসলমানদের সত্যপীর কাহিনীতে। এই কাহিনীতে সত্যপীরকে 'সত্য নারায়ণ'রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সত্যপীর জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা ও পূজা পেয়েছেন। মনে হয় সত্যপীরের কাহিনী দুই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সমন্বয় থেকেই উদ্ভূত। হিন্দু দেবদেবীর কাহিনীকে পীরের কাহিনীতে পরিণত করার চেষ্টাও অনেকে করেছেন। যেমন পীর মছন্দলী, পীর গোরাচাঁদ, পীর মাণিক ইত্যাদি। পীর মাণিক হলেন ছদ্মবেশী শিব, পীর মছন্দলী মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতিরূপ। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই সব পীর কাহিনী রচনা করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাঙালীকে ডেকে বলেছেন, হৃদয়কে সর্বত্র প্রেরণ কর। শঙ্খ মুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী এসেছে, তাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে যে মুসলমান নমাজ পড়ছে, তাকেও সম্ভাষণ কর। কবিগুরুর এই কথা থেকে বোঝা যায়, তিনি হিন্দু-মুসলমানকে সমান মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। অন্য দিকে আবার মুসলমান কবি নজরুল ইসলাম শক্তিময়ী শ্যামা মায়ের নামে সকলকে অভয় দিয়েছেন—

"নাই ওরে ভয় নাই,
জাগে উর্ধ্বে দেবী জননী শক্তিময়ী"

অহিন্দু বাঙালী দরাফ খাঁ রচনা করেছেন গঙ্গাস্তোত্র (পৃঃ ২৩), যেমন—

"যৎ ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্‌বান্ধবৈঃ

যস্মিন্ পান্থদৃগন্ত—সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্গে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো স্বীকুর্বতী পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথি ॥
অচ্যুতচরণ-তরঙ্গিণি, শশিশেখর-মৌলী-মালতীমালে।
ত্বয়ি তনুবিতরণ-সময়ে দেয়া হরতা ন মে হরিতা ॥
শূন্যীভূতা শমননগরী নীরবা রৌরবাখ্যা
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিনমহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ ॥

*　　　　*　　　　*

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্বম্।
যদি তু গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিহ তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্ ॥ ('স্তবকবচমালা',
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪র্থ সং, পৃঃ ৪১২-১৩)

উক্ত সংস্কৃত স্তোত্রের সহজ বাংলা করলে দাঁড়ায়—যে মৃতদেহ জননীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে এবং যা সুহৃদ ও বন্ধুগণ কর্তৃক স্পৃষ্টও হয় না, যা পথিকগণেরও চক্ষুর এক প্রান্তে পড়লে তারা শ্রীহরির স্মরণ করে—এইরূপ মৃত নরদেহ তুমি নিজ অঙ্গে গ্রহণ কর। হে ভাগীরথি! তুমিই প্রকৃতপক্ষে করুণাময়ী মাতা।

হে বিষ্ণু পাদোদ্ভূত তরঙ্গময়ি, শিবের মস্তকের মালতী মালার স্বরূপে! তোমাতে দেহ বিসর্জনের সময়ে তুমি আমাকে শিবত্ব দিও, আমাকে বিষ্ণুত্ব দিও না (কারণ শিব হলে তুমি মাথায় থাকবে আর বিষ্ণু হলে পাদমূলে থাকবে)।

তোমার কৃপায় যমপুরী শূন্য হয়েছে, রৌরব প্রভৃতি নরক নীরব হয়েছে। প্রতিদিন যাতায়াতের দরুণ ব্যোমযান সমূহ ভগ্নপ্রায় হচ্ছে। হে মা গঙ্গে! স্বর্গে সিদ্ধগণের সঙ্গে দেবতাগণ এক হাতে অর্ঘ্য পাত্র নিয়ে যে পর্যন্ত তোমার প্রবাহ চলে সেই পর্যন্ত তাঁরা আসেন।

হে মুনি তনয়ে গঙ্গে! যদি পুণ্যবানকে তুমি ত্রাণ কর, যে নিজ পুণ্য বলেই ত্রাণ পায়—তা হলে তাতে তোমার কী মহত্ব। যদি গতিহীন আমার মতন পাপীকে তুমি পরিত্রাণ কর তবে তোমার সেই মহত্বই শ্রেষ্ঠতম মহত্ব। (অনুবাদক—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম, এ, ডি, লিট, ভাটপাড়া, ২৪ পরগনা)।

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষায় দরাফখাঁ গাজীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য যুগ যুগ ধরে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

॥ ৪ ॥

সমাজ, ধর্মাচরণ ও সাহিত্যের মাধ্যমে যেমন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা চলেছে যুগ যুগ ধরে, অনুরূপ প্রচেষ্টা চলেছে আবার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। একথা সত্য যে, প্রথমদিকের মুসলমান আক্রমণকারীগণ তাদের সঙ্গে রমণীদের নিয়ে আসে নি এবং অমুসলমান রমণীদের বিয়ে করাও মুসলমান ধর্মে কোনো বাধা ছিল না। তাই প্রথম অবস্থায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে হিন্দু পুরুষগণ নিহত হলে তাদের স্ত্রী-কন্যাগণকে চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলমান সৈনিকদের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হতে হত। এছাড়া তদানীন্তন-কালে যুদ্ধ জয়ের পর মুসলমান বিজেতাগণ হিন্দুনারীদের আইনানুগ প্রাপ্তি হিসেবেই মনে করত। যুদ্ধের পর বিজিত হিন্দু ও বিজেতা মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য বিশেষ শর্ত হিসেবে মুসলমান বিজেতার হাতে হিন্দু রমণীদের প্রদান করার ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। এর অবশ্য প্রধান কারণ ছিল—মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের অভাব অথচ তাদের প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বেশি। তাই মুসলমান সৈনিক ও সুলতানগণ বাধ্য হয়েই বিভিন্ন শর্তে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে হিন্দু রমণীদের গ্রহণ করত। প্রথম দিকে এই গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল জৈব কারণ এবং পরবর্তীকালে এর প্রয়োজন দেখা দেয় ভারতবর্ষে চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের নিমিত্ত অর্থাৎ জৈব ও সাংসারিক—এই দুই কারণেই। অবশ্য অনেক হিন্দু রমণী আবার অত্যাচারী মুসলমান শাসকদের হাত থেকে আত্মীয়স্বজন বা দেশের জনসাধারণকে রক্ষার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় বিয়ে বসতে সম্মতি দিতেন। কথিত আছে—একজন ভাটি রাজকন্যা মহম্মদ বিন-তুঘলকের সঙ্গে বিয়েতে সম্মতি দিয়ে তিনি তাঁর রাজ্যের প্রজাসাধারণকে তুঘলকের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

উপযুক্ত সংখ্যক মহিলার অভাবেই প্রথম দিকে মুসলমান শাসকগণ যেমন অনেকটা জৈব চাহিদা মেটাতে এবং পরে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অনেকটা পারিবারিক কারণে হিন্দু রমণী গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাঁরা হিন্দুনারী গ্রহণের ধারণা অনেক পরিমাণে পরিত্যাগ করেছিলেন।

প্রথম দিকে হিন্দু সামাজিক বিধি এমনই কঠোর ছিল যে, কোনো হিন্দু রমণীকে যদি কোনো মুসলমান জোর করে নিয়ে যেত বা কোনো হিন্দু রমণী স্বেচ্ছায় কোনো মুসলমানের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হত, তাহলে উক্ত রমণীকে যে শুধু হিন্দু সমাজচ্যুত হতে হত তাই-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত পরিবারকেই সমাজচ্যুত করা হত। ফলে একে কেন্দ্র করে অনেক অঘটন ঘটত এবং পাছে কোনো মুসলমান জোর করে হিন্দু রমণীকে গ্রহণ করলে জাতি বা সমাজচ্যুত হতে হয় এই ভয়ে অনেকেই বিশেষ করে গৃহে বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকলে বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে জাত বা ধর্ম বাঁচাবার প্রয়াস করতেন। অনেক সময় একে কেন্দ্র করে অনেক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও ঘটত। পক্ষান্তরে কোনো হিন্দু যদি মুসলমান রমণী বিয়ে করতেন তাহলে তাঁকেও জাতিধর্মচ্যুত হতে হত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—মুসলমান সুলতান ও সম্রাটগণের যে হারেমখানা থাকত সেখানে বহু হিন্দু রমণীকে জোর করে রাখা হত। ইতিহাসের পাতা এখনও বহু হারেম রমণীর করুণ কাহিনী বহন করে চলেছে। তদানীন্তন কালে মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে ও জাতিধর্ম রক্ষার নিমিত্ত অনেক হিন্দু রমণী আবার আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ পদ্মিনীর কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কথিত আছে—যখন চিতোর অবরোধ চলছিল তখন আলাউদ্দীন প্রস্তাব করলেন—তিনি চিতোর দখলের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে পারেন যদি রাণা রতন সিং কেবল আয়নার মাধ্যমে আলাউদ্দীনকে রানী পদ্মিনীর মুখ দেখতে দেন। রাণা রতন সিং আলাউদ্দীনের উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যেই তাঁকে আয়নার মাধ্যমে রানীর মুখ দেখালেন অমনি আলাউদ্দীনের মধ্যে রানীকে পাওয়ার বাসনা আরও প্রবল হয়ে উঠল। তিনি রতন সিংহকে বন্দী করে পদ্মিনীকে সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁর স্বামীকে মুক্ত করা হবে যদি তিনি আলাউদ্দীনের হারেমে আসতে রাজী হন। তখন

পরিচারিকাদের নিয়ে যাচ্ছেন বলে সংবাদ পাঠিয়ে পদ্মিনী সাতশ শিবিকা নিয়ে হাজির হলেন। শিবিকাগুলির মধ্যে পরিচারিকারা আছে বলে ওইগুলি আলাউদ্দীনের তাঁবুতে প্রবেশ করানো হল, কিন্তু ওগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ছিল বেশ কিছু সংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা। তারা রতন সিংকে উদ্ধার করে আলাউদ্দীনকে বোকা বানিয়ে দিল। এর পর দীর্ঘ সংগ্রাম হল। আলাউদ্দীন চিতোর দুর্গ দখল করলেন। কিন্তু পদ্মিনী ও তাঁর সঙ্গে অনেক রাজপুত মহিলা মুসলমানদের হাতে অত্যাচারিত না হয়ে বরং অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করলেন। অনেকের মতে তাঁরা জহর ব্রত করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

আলাউদ্দীন, ফিরোজশাহ, এমনকি আকবর ও জাহাঙ্গীর প্রমুখেরও হারেমখানা ছিল। ফিরোজ তুঘলক হিন্দুমায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রী খান-ই-জাহান প্রথম দিকে একজন তেলেঙ্গানা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর হারেমখানায় বিভিন্ন জাতের প্রায় দু-হাজার রমণী ছিলেন এবং তাঁদের দ্বারা তিনি বহু সন্তান সন্ততির অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী-কালে এই হারেম পদ্ধতি একটি বর্বরোচিত ব্যবস্থা বলেই পরিগণিত হয়েছে।

হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল কেবল জৈব বা সাংসারিক কারণেই নয়, অনেকটা সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেও। হিন্দু-মুসলমান বিবাহ পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি না করে বরং সম্প্রীতি স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল, এবং হিন্দু রমণীদের মাধ্যমেই মুসলমান সমাজদেহ ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল অনেকটা সকলের অলক্ষেই। শুধু তাই-ই নয়, অনেকে যে, ভারতীয় মুসলমানদের হিন্দুমায়ের সন্তান বলে থাকেন তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মোগল আমলে হিন্দু-মুসলমান বিবাহ বহু ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি মোগল সম্রাটগণের ধর্মীয় সহনশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা গঠনের সহায়ক হয়েছিল। এমন কি এরূপ বিবাহের ফলেই পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ ও তাঁদের বংশধরদের মধ্যে মোগল রক্তের চেয়ে রাজপুত রক্তের প্রাবল্যই ছিল বেশি।

আকবরের আগে থেকেই হিন্দু-মুসলমান বিবাহ চালু হয়েছিল তবে তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে ততটা সহায়ক হয়নি যতটা হয়েছিল আকবরের

আসলে আকবর ও তাঁর পুত্রের হিন্দুরমণীর বিবাহের সময় থেকে। অবশ্য আকবরের আগেই বাবর তাঁর দুই পুত্রকে মেদিনী রাও-এর কন্যাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। আকবর বিয়ে করেছিলেন জয়পুররাজ বিহারীমলের কন্যাকে আর পুত্র সেলিমকে বিয়ে দিয়েছিলেন রাজা ভগবানদাসের কন্যার সঙ্গে এবং খসরুখান ছিলেন এই বিবাহজাত সন্তান। এ ছাড়া জাহাঙ্গীর আরও অনেক রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর হারেমে স্ত্রীর সংখ্যা আট শতেরও বেশি ছিল বলে জানা গেছে। হিন্দু মায়ের গর্ভে জন্ম হয়েছিল শাহজাহানের, এছাড়া ঔরঙ্গজেবের মাও ছিলেন একজন হিন্দুরমণী। বিজাপুরের সুলতান ইউসুফ আদিল খাঁ হিন্দুরমণী বিয়ে করেছিলেন এবং তিনি হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। তাঁর শাসন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ।

॥ ৫ ॥

পাঠানযুগের দিকে তাকালেও আমরা হিন্দু-মুসলমান বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সুলতান ইলিয়াস শাহ বর্তমান বাংলা দেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের ফুলমতী নামক এক বিধবা ব্রাহ্মণ রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। পক্ষান্তরে বাংলার হিন্দু রাজা গণেশ ফুলজানি নামক একজন মুসলমান বিধবা রমণীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আজমশাহের স্ত্রী। এছাড়া তাঁর কন্যা অশ্বস্তরার বিবাহ হয়েছিল রাজা গণেশের পুত্র যদু সেনের (জালালুদ্দিনের) সঙ্গে। সুলতান হুসেন-শাহের এগারটি কন্যার বিয়ে হয়েছিল মদন ভাদুড়ির এগারজন ভাইপোর সঙ্গে। মদন ভাদুড়ির পুত্র কন্দর্পদেবের বিয়ে হয়েছিল হুসেনশাহের এক কন্যার সঙ্গে।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলপাঁজি থেকে জানা যায়—হুসেনশাহ মুসলমানগণের মধ্যে আরবের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান হওয়াতে তিনি তাঁর ছেলে ও কন্যাদের আরবদের চেয়ে নিম্নস্তরের আফগান ও তুর্কী মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াকে অধিক পছন্দ করতেন, যদিও ইসলামের চোখে সকল মুসলমানই সমান তা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যেও যে বিভেদ নীতি ছিল তা এ থেকেই বুঝতে পারা যায়।

হুসেনশাহের সভাসদ চতুরঙ্গখান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি তাঁর বৃদ্ধ

বয়সে একজন মুসলমান রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। এবং সেই মুসলমান স্ত্রীর গর্ভেই সুবিখান ও সুচিখান নামক তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাই খুলনা জেলায় সেনের বাজারের কাজী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

খুলনা জেলায় বাগের হাটের পীর আলি ব্রাহ্মণগণ তাহের আলি খানের বংশোদ্ভূত বলে জানা গেছে। তিনি পীরখান জাহান আলি কর্তৃক ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁরই হিন্দু স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা পীর আলি ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এবং তাঁর মুসলমান স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা তাহেরিয়া নামে পরিচিত। এছাড়া পীরখান জাহান আলিও হিন্দু রমণী বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর তাঁর হিন্দু স্ত্রী সোনামণি পরিচিত হয়েছিলেন সোনাবিবিরূপে। তিনি এত স্বামী অনুরাগিনী ছিলেন যে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর বিয়োগ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে পুষ্করিনীর জলে ডুবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরার মইচামোয়া অথবা চম্পাবতী ছিলেন হিন্দু রাজার কন্যা। উক্ত রাজাকে হত্যা করেই তবে তাঁর কন্যা চম্পাবতীকে একজন ফকিরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই রমণী অত্যন্ত পতিপরায়ণা ছিলেন, তাই স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন হয়ে এক অলৌকিক শক্তির অধিকারিনী হয়েছিলেন। তাঁর সমাধিস্থল আজও হিন্দু মুসলমান—এই উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তীর্থস্থানস্বরূপ। এই স্থানটি সাতক্ষীরা থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত এবং মৈচম্পার দরগাহ নামে খ্যাত। গৌড়ের ইউসুফ সাহেবের হিন্দু স্ত্রী মীরাবাঈ মুসলমান হওয়ার পর লোটন নামে পরিচিত হন। তিনি একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

কথিত আছে—মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুরের সৈয়দ মুর্তজার সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ কন্যার প্রণয় হয়েছিল। উক্ত ব্রাহ্মণকন্যা এখনও স্থানীয় মহিলাগণের নিকট আনন্দময়ীরূপে পরিচিতা, যেহেতু তিনি ছিলেন একজন বৈষ্ণবী তাই তাঁর মৃতদেহ মুর্তজার সমাধির পাশেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। তিনি সৈয়দ মুর্তজা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

দক্ষিণ বাংলায় বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে গাজী মিঞার বিবাহকে কেন্দ্র করে মুসলমানগণ অনেক উৎসব পালন করেন। কালুগাজী ও চম্পাবতী নামক বিশেষ জনপ্রিয় লোকগীতি সিকন্দর শাহের পুত্র কালুগাজী ও মুকুট রায়ের কন্যা

চম্পাবতীর বিবাহকে কেন্দ্র করেই বর্ণিত হয়েছে। গ্রামের লোকেরা আজও এই লোকগীতি পালাগান হিসাবে গেয়ে থাকেন যা স্থানীয় মুসলমানদের কাছেও বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

॥ ৬ ॥

আধুনিককালে পরিবর্তিত ও অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দু রমণীর বিবাহ হলে হিন্দু পরিবারকে আর সমাজচ্যুত হতে হয় না। বর্তমানে এরূপ শত শত দৃষ্টান্তের মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যাক। যেমন—কাজী নজরুল বিয়ে করেছিলেন প্রমীলা সেনকে, স্বর্গত হুমায়ুন কবীর একটি সম্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। পাতৌদির নবাব বিয়ে করেছেন বিখ্যাত চিত্রতারকা শর্মীলা ঠাকুরকে। এসব-ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হিন্দু পরিবারকে আর জাতিচ্যুত হতে হয়নি, বরং এ ধরণের বিবাহ আন্তর্সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করেছে এবং তা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণের পথে অন্তরায় না হয়ে বরং সহায়ক হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বোধ হয় আকবর হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাতে তিনি অনেকটা সফলকাম হয়েছিলেন। ফলে যে রাজপুতগণ আকবরের সময়ে তাঁর মানমর্যাদা ও প্রতিপত্তি রক্ষায় সহায়ক হয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ভিত্তিকে মজবুত করে তুলেছিলেন, যার ফলে আকবর হিন্দুদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে সমর্থ হয়েছিলেন, অথচ সেই রাজপুতগণই ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা বা ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন।

যাহোক, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, আন্তর্জাতিক বিবাহ যেমন জাতিভেদ সমস্যা দূর করতে সমর্থ হবে বলে বর্তমানে কয়েকটি প্রদেশে ঠিক হয়েছে—উঁচু জাতের লোক যদি নীচু জাতের মেয়েকে বিয়ে করে তবে তাকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের বেলায়ও যদি অনুরূপ-ভাবে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে বোধহয় তা সাম্প্রদায়িক বিভেদ ঘুচিয়ে বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের সহায়ক হবে। কাজেই হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক যত বেশি স্থাপিত হবে ততই ওই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিভেদ দূরীভূত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা গড়ে

ওঠায় ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে সহায়ক হবে। বর্তমানের অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত ও আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজে হিন্দু রমণীর মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ হলে আর তাকে সমাজচ্যুত হতে হয় না বলেই বোধহয়—আজকাল বিভিন্ন জাতের ও ধর্মের লোকদের মধ্যে বিবাহ ও খাওয়া-দাওয়া চালু হয়েছে এবং একে অপরকে আর আগের মতো ঘৃণা করে না। তাই বোধহয় একটু আধুনিক রুচিসম্পন্ন অনেক হিন্দুও মুসলমান মেয়ে বিয়ে করে সম্মানের সঙ্গেই সমাজে বসবাস করছেন। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি বা তাঁদেরকে আগের মতো আর জাতিচ্যুতও হতে হচ্ছে না। অপরদিকে হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মুসলমানদের বিবাহের প্রচলন তো শত শত বছর পূর্ব হতে চলে আসছে। তাই বোধ হয় ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন শত শত বর্ষের আন্তর্জাতিক বিবাহের দরুণ মুসলমান নৃপতিগণের বংশধরেরা পর্যন্ত আর গর্ব করতে পারেন না যে, তাঁদের দেহে অবিকৃত বৈদেশিক রক্ত রয়েছে। ভারতের প্রায় মুসলমানের ধমনীতেই হিন্দু রক্ত প্রবাহিত। অরুণা আসফ আলি, গৌরী আয়ুব, প্রমিলা ইসলাম, নিলীমা ইব্রাহিম, কাজী অনিরুদ্ধ, কাজী সব্যসাচী, প্রমুখ আরও অনেকে হিন্দু-মুসলমান বিবাহের ফলশ্রুতি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে পতৌদির নবাবের বিবাহে সংশ্লিষ্ট ঠাকুর পরিবারের মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এ প্রসঙ্গে মধ্যযুগের দুটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যাক যার দ্বারা প্রমাণিত হবে—তখন অন্যধর্মীয় লোকের সঙ্গে বিবাহ সমাজের চোখে কিভাবে দেখা হত এবং জাতিভেদ কত প্রকট ছিল। ওই কাহিনী দুটির একটি হল—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মশায়ের 'বৃহৎ বঙ্গে' লিখিত কালাপাহাড়রূপী কালাচাঁদের ঘটনা। অবশ্য কালাপাহাড় সম্পর্কে লেখা কাহিনীটি যদি আদৌ সত্য হয়, তাহলে সে সময়ে জাতিভেদ ও আন্তর্ধর্মীয় বিবাহের চরম পরিণতি যে কীভাবে হিন্দুধর্ম তথা হিন্দু জাতিকে আঘাত হেনেছিল তা এ ঘটনা থেকে অতি সহজেই যে প্রতীয়মান হবে সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। যদিও এর সত্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে।

দুর্গাচরণ সান্ন্যাল মশায় তারিখ-ই খাজেহান, তারিখ-ই শেরশাহী প্রভৃতি পারসী ইতিহাস এবং রাজসাহী জেলার কিংবদন্তী অবলম্বনে কালাপাহাড়ের

যে জীবন চরিত লিখেছেন তা থেকে জানা যায় কালাপাহাড়ের আসল নাম ছিল কালাচাঁদ রায়। তাঁর বাল্যকালে সকলে তাঁকে রাজু বলে ডাকত। তাঁর বাড়ি ছিল রাজসাহীর অন্তর্গত মান্দা থানার অধীনে বীর জাওন গ্রামে। কালাচাঁদ প্রসিদ্ধ একটাকিয়া-জমিদার বংশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি জগদানন্দ রায়ের বংশজাত ('জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুঙর'-কৃত্তিবাস) এবং এঁর উপাধি ছিল ভাদুড়ী। কালাচাঁদের পিতার নাম ছিল নয়নচাঁদ রায়। তিনি গৌড়েশ্বরের ফৌজদারী বিভাগে উচ্চপদে কাজ করতেন। তাঁর উপাধি ছিল 'ভুঁইয়া'। কালাচাঁদের অল্প বয়সে তাঁর পিতা পরলোকগমন করায় তিনি মাতামহের অভিভাবকত্বে মানুষ হতে থাকেন। তাঁর মাতৃকুল ছিল বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী। ফলে কালাচাঁদ অল্প বয়স থেকেই হরিভক্ত হয়েছিলেন। শ্রীপুর গ্রামের রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

কালাচাঁদ ছিলেন বলিষ্ঠ, উজ্জ্বলবর্ণ ও সুদর্শন। মোটের উপর তিনি দেখতে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশের রীতি অনুসারে কালাচাঁদ রায় বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার এবং অশ্বচালনায়ও বীরোচিত গুণের অধিকারী হয়েছিলেন। সেই সময় গৌড়াধিপ ছিলেন নাসের শাহের পুত্র বরাবক শাহ। গৌড়েশ্বর কালাচাঁদের নানারূপ সদগুণের পরিচয় পেয়ে তাঁকে দরবারের উঁচুপদে চাকরি দিলেন। কালাচাঁদ রায় বাদশাহের প্রাসাদের অনতিদূরে অপরাপর উচ্চ হিন্দু আমলাদের সঙ্গে একটি গৃহে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন অতি ভোর-বেলায় মহানন্দা নদীতে স্নান করতে যেতেন। সুলতান বরাবক শাহের সপ্তদশবর্ষীয়া এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন। সেই নবাবকন্যার নাম ছিল-'দুলারী বিবি'। কালাচাঁদের বলিষ্ঠ দেহ ও সৌম্যকান্তি দুলারী বিবির দৃষ্টি এড়ালো না। এতে যা ঘটবার তাই ঘটল। নবাব কুমারী রাজপ্রাসাদে তাঁর শয়নকক্ষ থেকে প্রত্যহ প্রাতে ওই রূপবান সুদর্শন যুবক কালাচাঁদকে স্নান করে ঘরে ফিরে যেতে দেখতেন। ফলে ওই সুদর্শন যুবককে তাঁর ভাল লেগে গেল। শুধু তাই নয়, তিনি মনে মনে ওই যুবককে ভালবেসেও ফেললেন। এবং একদিন তাঁর সহচরীদের বললেন ওই যুবক ছাড়া তিনি আর কাউকেই বিয়ে করবেন না। সহচরীরা তখন বলল—অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি ওরূপ

অনুরাগ প্রদর্শন মোটেই উচিত নয়। উত্তরে নবাবকুমারী বললেন—ওঁর গলায় পৈতে, অতএব উনি যে ব্রাহ্মণ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এছাড়া পেছনে ছাতাবরদার এবং হাতে সোনার কোষা দেখে মনে হয় যুবকটি নিঃসন্দেহে ধনী পরিবারের সন্তান। যুবকটি সুকণ্ঠে যেরূপভাবে স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে যান তাতে মনে হয় উনি মূর্খ নন। তারপর ওঁর মনমাতানো অপরূপ রূপের সাক্ষী হলো তাঁর নিজের দুটি চোখ যাকে নবাবকুমারী কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারেন না। কাজেই ওই যুবকের আর অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন বলেই তিনি মনে করেন। নবাবকুমারীর এরূপ যুক্তির পরে সহচরীদের আর বলার কিছুই থাকল না। কিন্তু এসবই ঘটে চলল সুলতান বরাবক শাহের অগোচরে এবং অজ্ঞাতসারে। ঘটনা কখনও চাপা থাকে না। ফলে সুলতান বরাবক শাহ ও তাঁর বেগম উভয়েই তাঁদের কন্যার মনোভাবের কথা জানতে পারলেন। এছাড়া সুলতান অনুসন্ধান করে জানলেন—কালাচাঁদ একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশজাত, যে বংশের অনেক যুবকের সঙ্গেই পাঠান মুসলমানদের কন্যার বিবাহ হয়েছে। কাজেই বাদশাহের ওই বিবাহে অসম্মতির কারণ রইল না। তিনি কালাচাঁদকে ডাকিয়ে তাঁকে মুসলমান ধর্মগ্রহণ পূর্বক নবাব কন্যাকে বিয়ে করার কথা বললেন। শুধু বললেনই না, তিনি যুবকটির প্রতি কন্যার অনুরাগের কথা শুনে এরূপ বিয়ে দেওয়ার জন্য জেদ ধরে বসলেন। এদিকে কালাচাঁদ অতিশয় তেজের সঙ্গে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বসলেন। এতে সুলতান অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে কালাচাঁদকে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করার আদেশ দিলেন। যখন শূলে দেওয়ার সকল প্রকার আয়োজন শেষ হয়েছে তখন বিরহে কাতরা দুলারী বিবি বিদ্যুৎগতিতে রাজপ্রাসাদ হতে অবতরণ করে বধ্যভূমিতে এসে কঠোরভাবে আদেশ করলেন—"আগে আমায় হত্যা করে তারপর এঁর অঙ্গস্পর্শ কর।" তখন নবাবকন্যার অসামান্য রূপ এবং তাঁর প্রতি অপূর্ব অনুরাগে মুগ্ধ হয়ে কালাচাঁদ মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সকল প্রকার গোঁড়ামি জলাঞ্জলী দিয়ে নবাবকুমারীকে বিয়ে করার সম্মতি প্রকাশ করলেন। এ যেন ফুলশরের আঘাতে ধর্মবেদী বিদীর্ণ হল। অবশ্য কালাচাঁদ দুলারী বিবিকে বিয়ে করলেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম ত্যাগ করলেন না। ফলে হিন্দু-সমাজের চোখে তিনি অপরাপর শত সহস্রের মতোই হলেন অপাংক্তেয় এবং

জাতিচ্যুত। তারপর তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করেও তদানীন্তন গোঁড়া হিন্দু সামাজিক অত্যাচার ও নিপীড়ন হতে রেহাই পেলেন না। জাতে উঠবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্তব্য তার প্রত্যাদেশের জন্য তিনি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়ে সাতদিন অনাহারে অনিদ্রায় ধর্ণা দিয়ে রইলেন। কিন্তু কোনো আদেশ পেলেন না। অপরদিকে মন্দিরের পাণ্ডারা তাঁকে অত্যন্ত অপমান করে শ্রীমন্দির হতে বিতাড়িত করলেন। ফলে তাঁর মন গেল ভীষণভাবে বিষিয়ে—বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির প্রতি। তিনি লজ্জায় ও ক্ষোভে মন্দির থেকে চলে এলেন। এবার এলো এই অপমান, গ্লানি ও হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। সে যে কি ভয়ানক প্রতিশোধ তা সমগ্র পূর্ব ভারত যেমন ওড়িশা, বাংলাদেশ ও আসামের কিয়দংশ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। যাহোক, অবশেষে কালাচাঁদ বাধ্য হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হল মহম্মদ ফর্মুলি। এবং এরপর থেকে তিনি সকলের কাছে হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর ভয়ানক অত্যাচারের জন্য কালাপাহাড় নামে পরিচিত হলেন। এই নাম অবশ্য তাঁকে হিন্দুরাই দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ কালাচাঁদ নাম হতেই তাঁর এই নামের উদ্ভব হয়েছে। এই নাম হিন্দুদের দেবতা ভগ্নকারীদের পক্ষে যোগ্য বলেই বিবেচিত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কালাপাহাড় বাদসাহের সৈন্যের সাহায্যে হিন্দুধর্মকে জগৎ থেকে একেবারে বিলোপ করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। ওড়িশার পাণ্ডাদের কথা কালাপাহাড় ভুলতে পারলেন না। তাই প্রথমেই শুরু হল তাদের প্রতি প্রতিশোধের পালা।

বাদশাহের সৈন্য নিয়ে কালাপাহাড় প্রথমেই উৎকল অভিযান করে উৎকলপতিকে যুদ্ধে নিহত করলেন। আবুলফজল তাঁর আইন-ই-আকবরিতে লিখেছেন—"কালাপাহাড় তাঁর লোকদের পুরীর জগন্নাথদেবের চন্দন কাঠের মূর্তিটিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর লোকেরা বিরাট বিরাট কাঠের গুঁড়ি দিয়ে এক মস্ত বড় শ্মশান তৈরী করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে জগন্নাথের মূর্তিটি নিক্ষেপ করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ওই বিরাট কাঠের খণ্ডগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কিন্তু জগন্নাথদেবের কাঠের মূর্তি পুড়ে যাওয়া তো দূরের কথা তাতে একটু আঁচড়ও লাগল না। সকলে এতে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু কালাপাহাড়ের ক্রোধ কমল না। তিনি তখন মূর্তিটিকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ

করার হুকুম দিলেন। উপস্থিত অনেকেই চীৎকার করে কান্না করতে করতে মূর্তিটিকে জলে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করলেন। তাঁরা আগুনে নিক্ষেপ করার আগেও বুক চাপড়িয়ে কান্না করেছিলেন এবং মূর্তিটিকে দগ্ধ না করার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই কালাপাহাড় তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে বরং তাঁদের প্রতি ভীষণভাবে উপহাস করেছিলেন। যাহোক, মূর্তিটি উত্তাল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলেও তা পুনরায় অতি আশ্চর্যজনকভাবে ঘাটে ফিরে এলো। কালাপাহাড় তখন ব্যর্থ হয়ে জগন্নাথের মূর্তি ধ্বংস করার সংকল্প পরিত্যাগ করলেন এবং শ্রীক্ষেত্রে এক রোমহর্ষক অত্যাচার চালালেন। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে গৌড়ে ফেরার পথে তিনি শত শত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে দেবমূর্তিগুলিকে অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করলেন। এবং বহু হিন্দুর উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। ভারতীয় চিত্রশালাগুলিতে রক্ষিত চূর্ণবিচূর্ণ মন্দিরস্তম্ভ, এবং ক্ষত-বিক্ষত দেবমূর্তিগুলি আজও কালাপাহাড়ের হিন্দু বিদ্বেষের জলন্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। গৌড়ের পরে কালাপাহাড় ভাদুড়িয়া ও পূর্ববঙ্গে কয়েকটি জায়গায় অত্যাচার অভিযানে উদ্যত হলেন, কিন্তু ভাদুড়িয়ার রাজা কালাপাহাড়ের দুই পত্নীকে তাঁর প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছেন শুনে কালাপাহাড় তাঁর অভিযানের মুখ আসামের দিকে ঘোরালেন। এরপর তিনি রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার ও আসামের কামরূপে ভীষণ অত্যাচার চালালেন। শোনা যায়—হিন্দুদের উপর কালাপাহাড়ের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা দেখে মুসলমানগণ ব্যথিত হয়ে প্রাণ ভয়ে পলায়নপর বহু হিন্দুকে প্রাণরক্ষার জন্য নিজেদের গৃহে গোপনে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

কথিত আছে—বহলোল লোদীর সেনাপতি হয়ে কালাপাহাড় জোয়ান-পুরাধিপতিকে পরাস্ত ও নিহত করে সেখান হতে ফেরার পথে বহু দেব মন্দির ভঙ্গ করেছিলেন। কাশীধামের এক কেদারেশ্বরের লিঙ্গ ব্যতীত একটিও দেবমূর্তি তার হাত থেকে রেহাই পায়নি। পাণ্ডারা কালাপাহাড়ের ভীষণ অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে নানা দিকে পালিয়েছিলেন। অবশ্য কেদারেশ্বরের লিঙ্গ রক্ষা পাওয়ার পেছনে একটি ঘটনা আছে। তা হল—কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীতে বাস করতেন। কালাপাহাড়ের দুরাচার সৈন্যরা তাঁর উপর পাশবিক অত্যাচার করায় ওই মহিলা বিষপানে

দেহত্যাগ করলেন। এতে কালাপাহাড় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং সেই দিন থেকে হিন্দুদের উপর সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করলেন। ফলে কেদারেশ্বরের লিঙ্গটিও রক্ষা পেল। আরও কথিত আছে—সেই দিনেই কালাপাহাড় একটি সুরক্ষিত গৃহে শয়ন করলেন এবং পরের দিন থেকে তাঁকে আর দেখা গেল না। কালাপাহাড়ের অন্তর্ধান সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেউ বলেন—কালাপাহাড় মনে ভীষণ অনুতাপ পেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন—তিনি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন। কারও মতে নিদ্রিত অবস্থায় কালাপাহাড়কে কাশীর পাণ্ডারা হরণ করে হত্যার পর মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। কারও মতে তিনি বিনাশরূপী রুদ্রের অংশে জন্মেছিলেন বলে সেই বিশ্বেশ্বরেই লীন হয়েছিলেন। আবার কেউ বলেন—তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে বহলোল লোদী তাঁকে গুপ্তঘাতক দিয়ে গোপনে হত্যা করিয়েছিলেন। যাহোক, কালাপাহাড় এগারো বছর হিন্দুধর্ম বিনাশে ব্রতী হয়েছিলেন। এবং কাশীর অত্যাচারের তৃতীয় দিন থেকেই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। বরাবক শাহের কন্যা দুলারী বিবির গর্ভে তাঁর যে কন্যা হয়েছিল তার নাম রাখা হয়েছিল 'ফতেমা'। তবে কালাপাহাড়ের উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেক মতানৈক্য আছে।

মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান প্রেম ও তার পরিণতি সম্পর্কে আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাক। পণ্ডিত দারাশিকোর জীবনের স্বপ্ন ছিল—সর্বধর্মের ভ্রাতৃত্ব, সর্বমানবের মৈত্রী। তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর জীবনের সব সংকল্প অপূর্ণ রয়ে গেল। দারা যে কেবল হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের কথা ভাবতেন তা নয়। শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা এবং ধর্মে পুরুষ ও নারী পরস্পরে বাধাস্বরূপ না হয়ে কী করে পরস্পরের সহায়ক হতে পারে তিনি সে দিকে প্রয়াস চালাতেন। দারাশিকো তত্ত্বজ্ঞ সাধক, সুফী ও সন্ন্যাসী, হিন্দী, আরবী, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় পণ্ডিত, গ্রীক ও বেদান্ত দর্শনের মর্মজ্ঞদের নিয়ে দিল্লীর প্রাসাদে যে উৎসবসভা বসাতেন তাতে নারীদেরও যোগদানের ব্যবস্থা ছিল। ওই সভায় রসগঙ্গাধর রচয়িতা জগন্নাথ মিশ্র তাঁর সংস্কৃত কাব্য শুনাতেন। উক্ত সভায় মোগল প্রাসাদের একজন বাদশাজাদীও নিয়মিত যোগদান করে কবি জগন্নাথ মিশ্রের সংস্কৃত কাব্যরসে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি অনুরাগিনী হয়ে পড়েন। কবির অজ্ঞাতসারেই যে বাদশাজাদী তাঁর প্রতি

অনুরাগিনী হয়েছেন—একথা জানতে পেরে কবি জগন্নাথও দূর হতেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

কবি জগন্নাথের কাব্যরসে প্রীত হয়ে দারাশিকো একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার কী প্রার্থনা বল, তুমি যা চাও তাই তোমাকে দেব।' তখন কবি বললেন—'আমি ওই বাদশাজাদীকে চাই'। দারাশিকো তখন জিজ্ঞেস করলেন—বাদশাজাদী কি তোমার প্রতি অনুরাগিনী? কবি জগন্নাথ তখন তাঁকে সে ঘটনার সত্যতা খোঁজ করে জানতে বললেন। দারাশিকো সন্ধান করে জানলেন—কবির কথা সত্য। তখন তিনি জগন্নাথ মিশ্রকে বললেন—'তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব, কিন্তু তোমাকে দিল্লী ছাড়তে হবে।' জগন্নাথ মিশ্র তাতেই রাজি হলেন। তখন দারা উভয়কেই অশ্বযোগে দিল্লী থেকে বহু দূরে একস্থানে পৌঁছে দেওয়ালেন। কবি বাদশাজাদীকে নিয়ে কাশীতে গেলেন কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন—কোনো মন্দিরেই তাঁর প্রবেশাধিকার নেই। কারণ কাশীর লোকেরা জেনেছিল যে, জগন্নাথ মিশ্র এক বিধর্মী মুসলমান মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন। মনের দুঃখে তখন জগন্নাথ দেখলেন—তাঁদের কাছে তীর্থ বলতে শুধু খোলা রইল—একমাত্র গঙ্গা। তখন তিনি কাশী ছেড়ে বিন্ধ্যপর্বততলে গঙ্গা তীরে দুর্গাখোহে গিয়ে বাস করতে থাকেন। এঘটনাকে কেন্দ্র করেই কবি জগন্নাথ মিশ্র লিখলেন—'গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিণী' গঙ্গাস্তব যা ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ইতিমধ্যে দারাশিকোর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু জগন্নাথ ও তাঁর স্ত্রীকে আর বেশিদিন দারার বিরহ ব্যথা সহ্য করতে হয়নি। কারণ দারাশিকোর তিরোধানের অল্পকাল পরেই দুর্গখোহতে তাঁদেরও মৃত্যু ঘটে। জগন্নাথের 'ভামিনী-বিলাস' উক্ত বাদশা কন্যার সৌন্দর্য রসকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছে।

॥ নয় ॥

সব মানুষের সৃষ্টি রহস্য যেমন এক, সব ধর্মের মূল কথাও তেমন এক। মানুষে মানুষে যেমন বিভেদ থাকা উচিত নয়, তেমন ধর্মে ধর্মেও কোনো বিভেদ থাকা উচিত নয়। জাতিভেদ ও ধর্মভেদ-এ দুটিই সমাজদেহের দুষ্ট ক্ষত। তাই যুগ যুগ ধরে সকল ধর্মীয় মহামানব উদার ও সংস্কারমুক্ত কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ সকলেই জাতিতে জাতিতে ও ধর্মে ধর্মে বিভেদ ঘোচানোর কথা তাঁদের উপদেশাবলী, কার্যকলাপ ও লেখনীর মধ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের ধারণা—মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভেদ ঘোচাতে পারলে ধর্মে ধর্মে বিভেদও ঘোচানো সম্ভব হবে। তাই তাঁরা জাতিভেদ ও ধর্মভেদ দূর করে জাতিধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব গঠনে দেশবাসীদের সর্বদা উদ্বুদ্ধ করেছেন। অবশ্য শুধু জাতিভেদ ও ধর্মভেদ দূর করলেই হবে না তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপনের ব্যবস্থাও করতে হবে। কারণ অর্থনৈতিক বিভেদের ফলেই সৃষ্টি হয় শ্রেণীভেদ। আর এই শ্রেণীভেদের রন্ধ্র দিয়েই সমাজদেহে প্রবেশ করে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যা ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা গঠনে অন্তরায় ঘটায়। কারণ সমাজে একশ্রেণীর লোক যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশি সুযোগ সুবিধে ভোগ করে, আর এক শ্রেণীর লোক যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষিত হয় তবে একই ধর্মভুক্ত লোক হওয়া সত্ত্বেও শোষক ও শোষিতের মধ্যে বিভেদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর পর যদি আবার ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন জাতের লোকের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকে তা হলে তো কথাই নেই। এবং সেরূপ ক্ষেত্রে কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। তাই বোধ হয়—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও কবি নজরুল জাতিভেদ ও ধর্মভেদ দূর করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর করতে বলেছেন। দূর করতে বলেছেন—শ্রেণীভেদ।

অপর দিকে একদেশের ভিন্ন ধর্মের লোকেরা যদি অপর দেশ, অপর দেশবাসী ও তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভালবাসেন তা হলে দেশে দেশে যে বিভেদ আছে তাও অনেক সময় দূরীভূত হয়। ফলে বিদেশী হলেও অনেকেই তাঁদের শ্রদ্ধা করে এবং আপন করে নেয়। এ ক্ষেত্রে বিদেশীকে নিজ

দেশের মধ্যে আপন করে নেওয়ার মানসিকতা অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা গঠনে সাহায্য করে। তাই বোধহয় এ্যণ্টনী ফিরিঙ্গী, দীনবন্ধু এণ্ডুজ, ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ন, সেণ্ট মার্গারেট নোবল (ভগিনী নিবেদিতা), ফরাসী মহিলা শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যা ও সাধন সঙ্গিনী শ্রীমা, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ অনেকে আজও ভারতীয়দের কাছে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। এঁরা বিদেশী হয়েও ভারত এবং তার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিজের দেশের মতো ভালবেসে ফেলেছিলেন। এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা গঠনে সহায়ক হয়েছিলেন।

আধুনিককালে কথায়, কাজে ও আচরণে জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূরীকরণের জন্য চেষ্টা করেছেন মৌলভী রাজা রামমোহন, মৌলনা গিরিশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, গান্ধীজী, দেশবন্ধু, নেতাজী, বাদশাখান, মুকুন্দদাস, অতুলপ্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সহীদুল্লা প্রমুখ আরও অনেকে। অনেকেই জাতিধর্মের ও শোষক শোষিতের বিভেদ ঘুচিয়ে সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করে জাতিধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব গঠনের কথা বারবার বলে গেছেন।

॥ ২ ॥

হিন্দু হয়েও যাঁরা মুসলমান ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বুঝেছিলেন যে, সব ধর্মই এক। তাই সর্বধর্মসমন্বয় ছিল তাঁর চিন্তা এবং ধর্মাদর্শের মূল কথা। রামমোহন মুসলমান ধর্মের মূল ভাবধারার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্থাপন করার জন্য তিনি আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মুসলমান ধর্মের একেশ্বরবাদ দ্বারা অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়েই তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন বলে জানা যায়। অবশ্য একেশ্বরবাদ বেদেরও মূল কথা। ভারতের বেদান্ত শাস্ত্রের সঙ্গে সুফীবাদের অনেক মিল থাকায় সুফীদের লেখা গ্রন্থাদি রামমোহনের অতিশয় প্রিয় ছিল। আরবী ও ফারসী ভাষার কবিতা রামমোহন প্রায় সর্বক্ষণই পাঠ করতে ভালবাসতেন। তিনি মুসলমানদের মহান ধর্মগুরু হজরত মহম্মদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। জানা গেছে—তিনি নাকি মহম্মদের পবিত্র জীবন কাহিনী লেখার জন্য কলম

ধরেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সে গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়নি। তিনি প্রধানতঃ মুসলমান পাঠকগণের জন্য মীরাৎ-উল-আকবর নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, পৌত্তলিকতা বা প্রতীক উপাসনা অসার কিন্তু একেশ্বরবাদই সার। তিনি পারসী ভাষায় তুহফাৎ-উল-মুয়াহিদ্দীন (একেশ্বরবাদীগণকে প্রদত্ত উপহার) নামক একখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। মুসলমানেরা রামমোহনকে খুব শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতেন। এবং তাঁরা তাঁকে একজন জবরদস্ত মৌলভী বলতেন। কারণ মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে রামমোহনের জ্ঞান কোনো মুসলমানের চেয়ে কম ছিল না। ধর্ম সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় খুব উদার ছিলেন বলেই বোধহয় খ্রীষ্টানদের একেশ্বরবাদ পদ্ধতি অনুসারে যে উপাসনা হত তাতে সপরিবারে যোগদান করতেন। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার জন্য তাকে অদীক্ষিত খ্রীষ্টান বলা হত। রামমোহন বলেছিলেন—যেমন বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা দেখি গাভীগুলি নানা বর্ণের, কিন্তু তাদের প্রদত্ত দুধের রং একটিই—অর্থাৎ শ্বেত, তেমনি বাহ্য দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের আচরণগত নানা পার্থক্য দেখা গেলেও সকল ধর্মেরই অন্তর্নিহিত সত্য এক। সকল জাতি ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষমতাই হল মানব সভ্যতার আসল মাপকাঠি। আর সংঘর্ষ হল মানবপ্রকৃতির পাশবিক দিক। এবং তা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অবশ্য সংঘর্ষ সব সময়ই যে মানুষকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে তা নয়, সংঘর্ষের পরে বা মধ্য দিয়েই মানুষ অনেক সময় সমন্বয়ের পথ খুঁজে বেড়ায়। নানারূপ ঐতিহাসিক কারণেই যখন বিভিন্ন ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রভাব একই স্থলে এসে সমবেত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব। তখন ওই সংঘর্ষের মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে পারলেই সভ্যতা ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। অন্যথায় অগ্রগতি হয় ব্যাহত। ভারত ইতিহাসের এরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে যখন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা যেমন, হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান একই স্থলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইল, তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই এক বিরাট সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই যেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে আবির্ভূত হলেন ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়। বহুত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ছিল তাঁর আন্তরিক

প্রচেষ্টা। রামমোহন ছিলেন হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ সমন্বয়ের এক জলন্ত প্রতীক। শুধু ধর্ম সমন্বয়ই নয়, তার সঙ্গে সমাজকে অর্থহীন আচার ও কুসংস্কার মুক্ত করার মধ্যেও তাঁর মূল প্রতিভা নিহিত ছিল। এবং এর মধ্য দিয়েই হয়েছিল নূতন যুগের সূচনা।

সকল ধর্মের মূলতত্ত্ব না জানলে ধর্মান্ধতা কাটে না। তাই সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের জন্য রামমোহন প্রথমেই ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান বারাণসীতে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পাটনায় আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। এবং পরবর্তীকালে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। তারপর তিনি বেদ উপনিষদ কোরান ও বাইবেল ভালভাবে পাঠ করে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণে সমর্থ হন। তিনি পাশ্চাত্য মনীষিগণ যেমন, বেকন হতে আরম্ভ করে লক, নিউটন, হিউম, ভলটেয়ার প্রমুখ আরও অনেকের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কাজেই রামমোহনের চরিত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মনীতির এক মহাসমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের বিপ্লবী মন হিন্দু ধর্মের অসার ও অর্থহীন আনুষ্ঠানিক দিকটা বর্জন করে বেদান্ত ও উপনিষদের ভিত্তিতে উহাকে বিপ্লববাদী ও কুসংস্কার মুক্ত করতে চেয়েছিল।

রামমোহন রায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে সকল ধর্মই মূলতঃ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস যে মূল্যহীন তা তিনি বেদ ও উপনিষদ হতে প্রমাণের আন্তরিক চেষ্টা প্রথমে করেছেন। শুধু যে হিন্দু ধর্মকেই সংস্কারমুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তাই নয়, তিনি শিক্ষা-সংস্কার, রাজনীতি ও দেশ-প্রেমের ক্ষেত্রে ও এক নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন। রামমোহনের সংস্কার-মুক্ত মন ভালভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, ইংরেজী ভাষা না জানলে পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর হবে না, এবং আমাদের জ্ঞানের পরিধি থাকবে সীমাবদ্ধ, তাই তিনি বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সর্বপ্রথমেই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সব মানুষ এবং সব ধর্মই এক।

॥ ৩ ॥

রামমোহন রায়ের পর আর একটি স্মরণীয় নাম গিরিশচন্দ্র সেন। ইনি ছিলেন উনবিংশ শতকের একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি। তিনি রামমোহনের ন্যায় মুসলমান ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রাজা রামমোহন যেমন আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্যের ও তুহফাৎ-উল-মুয়াহহিদীন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য মুসলমান সমাজে জবরদস্ত মৌলভী নামে পরিচিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রও উক্ত দু'ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ইসলামিক সংস্কৃতির উপর নতুন আলোকপাত করার জন্য মৌলানা উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় কোরান শরীফের অনুবাদ করেছিলেন। তিনি হাফিজ, রুমী প্রভৃতি কবিগণের কবিতার বিশেষ প্রশংসা করেন। গিরিশচন্দ্রও রামমোহনের মতো সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। সকল ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে ধর্মান্ধতা যায় না। পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে যত নৃশংস বর্বরতা চলেছে তার প্রধান কারণই ধর্মান্ধতা। তাই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর তাপস মালা গ্রন্থে মুসলমান সাধু সন্তদের বাণী সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁদের চরিত কথা লিখেছেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের সেতু হিসেবে।

॥ ৪ ॥

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন—"নব বিধানের আদর্শ প্রচারের জন্য তুমি বিধাতা কর্তৃক আদিষ্ট, ইসলাম ধর্ম ও তার ঐতিহ্য প্রচারের ভার তোমার ওপর অর্পিত।"

তিনি বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা সভায় মহিলাদের অবধি আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং উপবীতধারী ব্রাহ্ম ছাড়া অপরেও ব্রাহ্মদের আচার্য হতে পারেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। কারণ আচার্য কেশবচন্দ্র বিশ্বাস করতেন –দেশে ধর্মের গ্লানি ঘটলেই শ্রীভগবানের বাণী প্রচারের জন্য কোনো প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব হয়। পৃথিবীতে এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের কোনো মৌলিক বিরোধ থাকতে পারে না। পৃথিবীতে ধর্মের নামে যে সংঘর্ষ, নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতা চলে তার মূলে হল ধর্মান্ধ ব্যক্তিগণের বিচার মত্ততা ও পরধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা। যেহেতু বিভিন্ন ধর্মের সম্বন্ধে কিছু না জানলে

মানুষের ধর্মান্ধতা কাটে না সেইহেতু কেশবচন্দ্র তাঁর অনুগামীদের মধ্যেই উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায়, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও মৌলানা গিরিশচন্দ্র সেনের ওপর যথাক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম প্রচারের ভার অর্পণ করেছিলেন। এঁরা গ্রন্থরচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের ভার গ্রহণ করেছিলেন।

কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে নতুন উপাসনা মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে তরুন ব্রাহ্মেরা দলে দলে গান করতেন—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতিবিচার।"

॥ ৫ ॥

সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণের ব্যাপারে রামমোহন রায়ের অবদান দেশ কোনো দিন ভুলতে পারবে না। জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ, স্ত্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, ঘৃণ্য সতীদাহ-প্রথা দূরীকরণ, সাগরে সন্তান বিসর্জন প্রথা বন্ধ করা, হিন্দু বিধবাগণের সম্পত্তিতে অধিকার রক্ষা, হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি মানবহিতৈষী কাজের সঙ্গে তাঁর নাম চিরদিন জড়িত থাকবে। মোটের ওপর ভারতীয় সমাজ সংস্কারের তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। জমিদারের অত্যাচার থেকে কৃষক সমাজের দুরবস্থা দূরীকরণের নিমিত্ত তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রামমোহন অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণ। ধর্মীয় গোঁড়ামি ত্যাগ করতে বলেছেন এবং পৌত্তলিকতা অসার প্রমাণ করার চেষ্টা করেও কিন্তু তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত উপবীত ধারণ করেছেন। তিনি ছিলেন জাতীয় আন্দোলনে প্রথম উদ্যোক্তা। মোটের ওপর জাতীয়তা, বিশ্বমানবতা ও মানবপ্রীতি এই ত্রিধারায় রামমোহনের মন অভিষিক্ত ছিল। তাঁর ধর্মমতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের মূলগত একেশ্বরবাদেরই প্রকাশ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তাঁর আরব্ধ কাজ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিপ্লব করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পর্দাপ্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ প্রথা বিলোপ এবং বিধবাবিবাহ, স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তন, জাতিভেদ প্রথা বিলোপ, সকলজাতির সঙ্গে বসে খাওয়া

দাওয়া ও সম্বন্ধ পাতান যা আজকাল হিন্দু সমাজে সর্বজন সম্মত হয়ে উঠেছে। এটা কিন্তু রামমোহনের উত্তরসূরীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের একচ্ছত্র দাবী ছিল।

॥ ৬ ॥

বাংলার নবজাগরণের ভাবধারায় অন্যতম হিউম্যানিক বা মানবিক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন-যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রভাবগুলোর সংমিশ্রণে নবযুগের সূচনা হয়েছিল। তার উত্তরসূরী হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করা যায়। খাঁটি হিন্দু পণ্ডিত হিসাবে এবং শাস্ত্র ও শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা অবহেলা করেন নি। তাঁর মধ্যেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সমাজকে কুসংস্কার হতে মুক্তি, বিধবা বিবাহ প্রচলন, সমাজের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতের মুক্তিসাধন প্রভৃতি রামমোহনী প্রভাব বিদ্যাসাগরের চরিত্র জুড়ে বসেছিল। বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তা থেকে এসেছিল তাঁর মধ্যে মানবপ্রেম। মানবের দুঃখে দুঃখী এই মহাপুরুষ মানুষের সেবা করতে গিয়ে নানাভাবে নিজেকে নিজেই বিব্রত করে তুলেছিলেন বটে, কিন্তু মানবসেবা ও সমাজসংস্কার থেকে বিরত হননি।

॥ ৭ ॥

ভগিনী নিবেদিতা একজন বিদেশিনী হয়েও ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভালবেসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষালাভের পর নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে প্রায় দুমাসের অধিককাল ভারতের নানাস্থানে পর্যটন করে এদেশ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজে তার পরিচালন ভার নেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করে আনতেন। ছাত্রীদের তিনি আপন সন্তানের ন্যায় যত্ন করতেন। নিবেদিতা সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শেই নারীশিক্ষা ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়েদের ভারতের মহান আদর্শে অনুপ্রাণীত করার জন্য তিনি প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের আদর্শ নারী—গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, পদ্মিনী, রানী ভবানী, গান্ধারী, অহল্যা, সঙ্ঘমিত্রা প্রমুখের অপরূপ জীবনকাহিনী বর্ণনা করতেন। স্বামীজীর দেহাবসানের

পরে জাতীয়তা মন্ত্র প্রচারে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করায় বিদ্যালয় পরিচালনার ভার নিবেদিতা ভগিনী খৃষ্টীনের উপর ন্যস্ত করেছিলেন—কিন্তু অবসর সময় তিনি বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করতেন নিয়মিতভাবে।

॥ ৮ ॥

যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে যে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে সে ভারতবর্ষ কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ভারতবর্ষ নয়। সে হল সর্বধর্মীয় ভারতবর্ষ। এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর মধ্যে ছিল না কোনোপ্রকার সংকীর্ণ ধর্মীয় সংস্কার। তিনি ধর্ম বলতে নিষ্কলুষ মনুষ্যত্বকে বুঝতেন। তাঁর মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা সুফীবাদের সপ্তর্ষিস্নিগ্ধ প্রেমাবিষ্ট ভাবটিই বেশি পরিস্ফুট হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই একেশ্বরবাদী। ঠাকুর পরিবারের এই একেশ্বরবাদীতার জন্য হিন্দু সমাজ তাঁদের বলতেন পীরালি (পীর এবং আলি)—এর অর্থ হিন্দু সমাজ বহির্ভূত এবং মুসলমান সমাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমদিকে মুসলমান আচার ঘেষা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা আহার বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইতেন না। এবং ঠাকুর পরিবারকে তাঁরা মুসলমানের সমকক্ষ বলে গণ্য করতেন। ঠাকুর পরিবারের লোকদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাহেবীয়ানাই বেশি পরিলক্ষিত হত।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ের প্রচ্ছদপটে বাংলা অক্ষরকে অতি সযত্নে আরবী রূপদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই আপন মনে হাফিজের বয়েৎ আওড়াতে ভালবাসতেন। এছাড়া তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ দেখলেও তাঁকে একজন মৌলানা বলে মনে হত।

রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন হাফিজের কাব্যের বিশেষ অনুরাগী। সেই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম এবং একেশ্বরবাদী। মুসলিম বিদ্বেষ তাঁর মধ্যে ছিল না বলেই তিনি কোথাও তাদের নিন্দা করেন নি। তাঁকে সুফী কবিও বলা চলে। তিনি অতি সযত্নে লালন করতেন দাড়ি এবং টুপি, ইজার ও আলখাল্লা পরতেন। ঠাকুর পরিবারের নবাবী পরিবেশ ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রায় আধা মুসলমান। যেমন কবি নজরুল ছিলেন প্রায় আধা হিন্দু।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে মুসলমান চরিত্র কোথাও হীনমানের হয়নি। রবীন্দ্র-মানসে হিন্দু গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত মুসলমানকে হীনবর্ণে চিত্রিত করার প্রয়াস কোথাও নেই, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনা সমূহ সম্বন্ধে এই কথাই বলে গেছেন —মুসলমানদের সমালোচনা না করে হিন্দুদের দোষত্রুটি সমালোচনা ও সেগুলো শোধরাবার চেষ্টাই কবিমানসে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাই বোধহয় কবি হিন্দুধর্মের অকারণ আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। বিসর্জিত প্রতিমা দেখে কবি বলেছিলেন—"গেছে পাপ"। ধর্মের নামে ধর্মান্ধতাকে কবি কোনোদিনই ধর্মসাধনা বলে মনে করেন নি। সভ্যতা, জনকল্যাণ, শান্তি এবং অনাবিল আনন্দকেই তিনি ধর্ম বলে মনে করতেন।

হজরত মহম্মদ এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি কবি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন সেরূপটি বাংলা ভাষায় আর দেখা যায় নি। সত্যই বিজিত জাতি হয়ে বিজেতা জাতীর প্রতি এত উদারতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত বিরল—গোলাম মুস্তাফা তাঁর বিশ্বকবি গ্রন্থে একথা উল্লেখ করে গেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুল—দু-জনেই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সুখ দুঃখের কথা বলেছেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মান্ধতা কাউকেই বশ করতে পারেনি। তাই বোধহয় দুজনেই মুসলিমলীগের সবুজ পতাকা হতে দূরে ছিলেন। কারণ তাঁরা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন —স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রামকে সম্প্রদায়িকতারূপ দুষ্ট সামাজিক ক্যানসার বিপন্ন করবে এবং জনগণের সংহতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাঁরা ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। বহু বাঙালী শহিদের পবিত্র রক্তের বিনিময়ে ধর্মান্ধ ও দ্বিজাতি-তত্ত্বে বিশ্বাসী এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মুসলমানের কবল হতে ধর্ম নিরপেক্ষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম সত্যই কবি নজরুলের অসাম্প্রদায়িক দূরদর্শীতার প্রমাণ। তাই নজরুল সংগীত, "চলরে চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল" স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশে সামরিক সংগীতরূপে আর রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় ভূষিত হল। এতে দ্বিজাতিতত্ত্বের মৃত্যু এবং সকল মানুষই যে একজাতি—এই চিরসত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল কবি নজরুলের সাধের জন্মভূমি বঙ্গভূমিতে।

বিশ্বকবি বলেছেন—"যে ধর্ম অপরকে অবমাননা করে তা মিথ্যা"। যে চিন্তা ধর্ম-সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন এবং অপরজাতির স্বাধীনতা হরণ করতে

চায়—ধর্মের নামে এরূপ হীনমন্যতার উর্দ্ধে থাকতে কবি সকল জাতি ও সকল ধর্মের লোককে অনুরোধ জানাতেন। বিশ্বের সকল ধর্মই সত্য, এবং সকল ধর্মই এক ভগবানের কাছে পৌছানোর বিভিন্ন পথ মাত্র। তাই কোনো ধর্ম মতই হীন নয়। সকল ধর্ম সম্বন্ধেই কিছু না কিছু জ্ঞান সকলেরই থাকা উচিত এবং তা না থাকলে ধর্মান্ধতা কাটে না। এবং ধর্মের নামে যে সংঘর্ষ, হত্যাকাণ্ড ও নৃশংস বর্বরতা চলে তার মূলে থাকে ধর্মান্ধ ব্যক্তিগণের বিচার মূঢ়তা এবং পরধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা—এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন অনেক মহামানব। জনসাধারণ যাতে বিভিন্ন ধর্মমত জেনে ধর্মান্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে এজন্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের উপর হিন্দুধর্ম, সাধু অঘোরচন্দ্র গুপ্তের উপর বৌদ্ধধর্ম, রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উপর খ্রীষ্টধর্মের ও মৌলনা গিরিশচন্দ্র সেনের উপর ইসলাম ধর্ম প্রচারের ভার অর্পণ করেছিলেন। জনসাধারণের মধ্য হতে ধর্মান্ধতা কাটানোর ইহা নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট পন্থা ছিল।

রবীন্দ্রনাথও ঐকান্তিকভাবে চেয়েছিলেন- এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মকে সম্মান দিক এবং এক জাতির লোক অন্য জাতির লোকদের ভালবাসুক। হিন্দু ও মুসলমান হল ভারতবর্ষের দুটি বৃহৎ ধর্মীয়গোষ্ঠী। তাই কবি বিশেষ করে এই দুটি ধর্মের মিলনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। অবশ্য কবি হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের ত্রুটি ও যে লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন নি তা নয়। কবি বলেছেন—খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম নিজের ধর্মকে পালন করেই তুষ্ট নয় অন্য ধর্মকে সংহার করতেও উদ্যত। এইজন্য তাদের সঙ্গে মেলার অন্য কোনো উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমানদের মিলনে বাধার দিকটা অতি স্পষ্ট এবং নিরপেক্ষভাবেই তুলে ধরেছেন। এই বিষয়ে তিনি ডঃ কালিদাস নাগকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানদের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথ অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান হিন্দুকে প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি।

হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি একত্র আছে, হিন্দু ধর্মে হিন্দুর বাধা প্রবল নয় ধর্মমতে প্রবল ও এক পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার

কন্ধ। হিন্দু ধর্মকে ভারতবাসী একান্ত একঘরের মতো করেই তুলেছিল। কবির মতে হিন্দু মুসলমান মিলনের পথে উভয় ধর্মের বাধা থাকলেও হিন্দু ধর্মের বাধাই প্রবলতর। বিশ্বকবি বলেছেন হিন্দুরা দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের তত কাছে টানতে পারেনি শুধু কতকগুলো সংকীর্ণ কুসংস্কার ও অকারণ আচার বিচারের জন্য। এ সম্বন্ধে তিনি একবার দুঃখ করে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন—'ফরাস পাতা রয়েছে উচ্চ জাতের হিন্দু ও ব্রাহ্মণের জন্য, আর মুসলমানেরা ভদ্রলোক হলেও দাঁড়িয়ে থাকবে, নয়তো ফরাস তুলে বসবে। আমি বললুম সে হবে না, সবাই ফরাসে বসবে'। কবির এই উক্তি থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায়—তাঁর দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সমান মর্যাদার অধিকারী।

হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করে কবি বলেছেন, "মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদের জাতি রক্ষা করিতে হইবে পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছর অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে (সদুপায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৫)।" হিন্দু মুসলমানের বিরোধ দেখে কবি বলেছেন—"হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে, এ পাপ অনেক দিন থেকেই চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা ভোগ না করিয়া আমাদের কোন নিষ্কৃতি নাই"। এই সকল উক্তির দ্বারা কবি কিন্তু হিন্দু মুসলমান কাউকেই হেয় প্রতিপন্ন করতে চাননি, বরং এইভাবে হিন্দু মুসলমান এই দুই জাতিকে সর্বদা সজাগ করেছেন এবং সর্বদা এঁদের মিলিত করতে চেয়েছেন। এক দেশে সকলকে পাশাপাশি বাস করতে হবে অথচ হৃদ্যতা থাকবে না—তা হয় না, এবং দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যদি এতখানি ব্যবধান থাকে তবে তা একদিন আকাশ ভেদ করে উঠবে অমঙ্গলের জয়তোরণ হিসেবে। তাই কবি সর্বদা দুই সম্প্রদায়কে মিলিত করার চেষ্টা করেছেন। যেখানে শুধু ধর্মীয় বিভিন্নতা ছাড়া আর কোনো বিভেদ নেই সেখানে এই দুই বৃহৎ মানব গোষ্ঠী পরস্পরের মধ্যে বিভেদ করে শক্তি ক্ষয় করুক এবং নিজেদের ক্ষতিসাধন করুক—কবি তা কখনই চাইতেন না। সত্যসন্ধ ও দূরদর্শী কবি ভালভাবেই বুঝতে পেরে-

ছিলেন—হিন্দু-মুসলমান মিলিত না হলে ভারতবর্ষ কোনোদিনই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কবি যে সকল গান, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছিলেন সে সবের মধ্যেই তিনি হিন্দু মুসলমান মিলনের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। ১৯৩৫ সালের ৬ই আগষ্ট কলকাতা টাউন হলে দেশবাসীর সামনে কবি বলেছিলেন—"হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় জীবনে দুইজনেই সমান অধিকারী, তাই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সব সময়ে সহযোগিতা সহমর্মিতা হবে উভয়ের মিলনের একমাত্র পথ।"

রবীন্দ্রনাথ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—সাম্প্রদায়িকতার জন্যই জনগণের একতা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাই স্বাধীনতা সংগ্রাম বার বার বিপন্ন হয়েছে। কাজেই এই সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করতে না পারলে স্বাধীনতাও হবে অর্থহীন। হিন্দু মুসলমান মিলনের কোনো বিরোধী সমালোচনাই কবি কর্ণপাত করেন নি। রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সম্বন্ধে যেরূপ আশান্বিত ছিলেন হিন্দুদের সম্বন্ধে সেরূপ ছিলেন না। তাই ১৯১৫ সালে কবি তাঁর জীবনস্মৃতি পুস্তকে লিখেছেন—"আমাদের প্রজাদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে। হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের মূলে এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে, যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। হিন্দুদের সমালোচনা করে তিনি তাদের শোধরাতে চেয়েছিলেন। এটা তিনি পরোক্ষভাবে হিন্দুদের মঙ্গলের জন্যই চেয়েছিলেন।

মুসলমানদের সম্বন্ধে কবি এ আশা পোষণ করতেন যে, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, এবং এ বৈশিষ্ট্যটুকু খুঁটিয়ে তুলতে পারলে এদেশের জাতীয়তা বৃদ্ধি পাবে। তাই মুসলমানরা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি করলে অনেকে তা অসমর্থন করলেও, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এতে তাঁর সমর্থন জানালেন, কারণ তিনি ভাবলেন—এতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটুকু বিদ্যমান থাকবে এবং একের মধ্যে বহুর যে সাধনা তাও ফুটে উঠবে। এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে মিল—এটাই তো ভারত ধর্ম।

মুসলমানদের সম্বন্ধে কবির যে উচ্চ ধারণা ছিল তা কবি তাঁর সঞ্চয় প্রবন্ধে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন—মুসলমান

নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে। এই ইচ্ছাই মুসলমানদের সত্য ইচ্ছা। মুসলমানেরা তাদের মুসলমানিত্ব নিয়েই প্রবল হতে চায়। মুসলমানেরা হিন্দুদের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হওয়ার কারণ হলো তারা যথাসময়ে তাদের কাছে টানতে পারেনি এবং মুসলমানদের ছোট করে রেখে উচ্চ জাতের হিন্দুরা নিজেদের গৌরব প্রচারেই রত থাকত। যাহোক, মুসলমানেরা যখন বুঝতে পারল যে তারা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বিষয়েই অনগ্রসর আছে তখন এই অনগ্রসরতা দূর করতে মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে সকল বিষয়েই বেশী অধিকার দাবি করতে আরম্ভ করল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তাদের এই দাবীতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাহারা হিন্দুদের সমান হইয়া ওঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।" মহাত্মা গান্ধীও এই পথেই হিন্দু মুসলমানদের ঐক্য চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন মুসলমানগণও ভারতের অধিবাসী। কাজেই সকল বিষয়ে তারা আত্মচেতনা লাভ করতে পারলে ভারতই সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী হবে। মহাত্মাজীও আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন যে, মুসলমানগণ তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ধার্মিকভাবে মহত্ত্ব লাভ করুক। ধর্মকে বাদ দিয়ে মুসলমান সম্প্রদায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। তাই তিনি মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন— রাশিয়ায় এসেছি, না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। পৃথিবীতে অন্ততঃ এই একটি দেশের লোক স্বজাতির স্বার্থের উপরও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। স্বজাতির সমস্যা সমগ্র মানুষের সমস্যার অন্তর্গত—এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে। রাশিয়ার এই উদার মানবধর্মের পরিচয় আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি। কারণ বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক যখন পাক অপশাসনের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হবার আশায় সংগ্রামে রত হল তখন ভারতের সঙ্গে রাশিয়াও ওই মুক্তিকামী লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে সাহায্য করেছে।

একবার কোররানিকে কেন্দ্র করে যে ঘৃণ্য দাঙ্গা দেখা দিয়েছিল তারই প্রতিবাদ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের উদারপন্থী নায়ক জমিদার নিখিলেশের মুখ দিয়ে হিন্দুর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—নিজের

ধর্ম আমরা রাখতে পারি। পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কি? মুসলমানকে নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। এই সহজ সত্যটি প্রথম হতে বুঝে যদি সেইভাবে চলা যেত তবে অনেক ঘৃণ্য রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হত।

দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলিম প্যাকট সাম্প্রদায়িক কারণে গৃহীত না হওয়ায় রবনীন্দ্রনাথ খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। পূর্ববাংলার একশ্রেণীর ধর্মান্ধ মুসলমান বাংলা ভাষাকে শুধু হিন্দু সংস্কৃতির ঘোষণা বলেই মনে করল না, তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতি হিসেবে মনে করতে লাগল। এবং ওই শ্রেণীর মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে সাম্প্রদায়িকরূপদানের নিমিত্ত ওই ভাষায় সাধারণ হিন্দু মুসলমানের কাছে দুর্বোধ্য কতকগুলো প্রতিকূল আরবী, ফরাসী ও উর্দ্দু শব্দ আমদানি করতে শুরু করল। এতে রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত হলেন। তিনি লিখলেন—সর্বপ্রথম বলে রাখি—আমার স্বভাবে ও ব্যবহারে হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশের অগৌরব বলে মনে করে থাকি…। বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার ফরাসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যে সব ফরাসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত, অথবা হয়তো কোনো এক শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ তাকে বাংলাভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। তিনি আরও বলেছেন—"আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করার যে চেষ্টা চলছে তার মত বর্বরতা আর হতে পারে না। এ যেন ভাই ভাইএর উপর রাগ করে বস্তিঘরে আগুন লাগানো।" রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর সমর্থন আমরা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলনের মধ্যে দেখতে পাই।

১৩১৮ সালের প্রবাসীর শ্রাবণ সংখ্যায় হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিষ্পত্তির নিমিত্ত কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানদের ত্রুটি বিচারটা থাক—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্য যেন লজ্জা বোধ করি।" ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ একথা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে—মুসলমানদের অস্বীকার

করে দূরে সরিয়ে রাখলে ভারতবর্ষের মঙ্গল কোনোদিনও হবে না। কারণ এদেশের উন্নতির জন্য হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সমান দায়িত্ব নিতে হবে। শুধু হিন্দুর ক্ষমতায় এত বড় মহান কাজ করা সম্ভব নয়। তাই যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে কবি হিন্দু মুসলমানদের মিলন চেয়েছিলেন। যদিও কবি এই মহামিলন দেখে যেতে পারেননি তথাপি এই মিলনের আশা তাঁর মনে জাগ্রত থাকত। সেরূপ ধারণা কবি নজরুলও মনে প্রাণে পোষণ করতেন। বিশ্বকবি অধ্যাপক কালিদাস নাগকে লিখেছিলেন—আমাদের মানস প্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে, তাকে ঘোরাতে না পারলে আমরা কোন রকমের স্বাধীনতা পাব না। হিন্দু মুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গুটি থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। যেদিন আমরা মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসবো সেইদিনই হিন্দু মুসলমানের মহামিলন সার্থক হবে।

॥ ৯ ॥

সকল ধর্ম সমন্বয় ও মানুষকে ভালবাসার কথা উল্লেখ করতে গেলে একজন বিদেশী হলেও দীনবন্ধু এণ্ডরুজের নাম মনে পড়ে।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজের আসল নাম চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ভারতের এক অতি অকৃত্রিম বন্ধু। ঈশ্বর প্রেমের পাশাপাশি ভারতপ্রেমকে স্থান দিয়েছিলেন বলেই বোধ হয় এই খ্রীষ্টান পাদ্রী যেদিন তাঁর স্বপ্নের ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন সে দিনকে তিনি তাঁর জন্মদিন বলে মনে করতেন। তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন—ইংরেজগণ ভারতে যে পথ ধরে চলেছে তা খ্রীষ্টপ্রদর্শিত পথ নয়। তাই এই খ্রীষ্টভক্ত দীনবন্ধু ভারত ও আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি মাতৃভূমি ইংলণ্ডের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবশে সেই দেশের কল্যাণের জন্যই ভারতে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়ে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছিলেন তদানীন্তন শ্বেতসাশকদের। শুধু তাই নয়, ভারতের

প্রতিটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মীকযোগ। দীনবন্ধু আন্তরিকভাবেই ভারতের স্বাধীনতা কামনা করেছেন এবং ভারতবাসীর সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে লয় করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবাদর্শে দেবতুল্য দীনবন্ধুর অন্তরের গুরু আর গান্ধীজি ও দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম সুহৃদ। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের দুঃখে তিনি আপনজনের মতোই মর্মাহত হয়ে পড়তেন।

একজন বিদেশী ইংরেজ হয়েও তিনি তাঁর স্বজাতি ইংরেজদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে সেই স্বাধীন ভারতের সঙ্গে বৃটেনের মৈত্রীর চেয়ে বৃটেনের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর আর কিছুই হতে পারে না। অর্থাৎ স্বাধীন ভারতবাসীদের সকলপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগের আশু ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁদেরকে মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধলে সেটা সমগ্র ইংরেজ জাতির পক্ষে কল্যাণকর হবে। পক্ষান্তরে তাঁদেরকে বঞ্চিত রাখলে তা সম্ভব হবে না এবং বিরোধ আরও বেশি হবে। তাই একজন বিদেশী হয়েও দীনবন্ধু ভারতবাসিদের অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন এবং তাদের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার ধর্মীয় সংকীর্ণতাও ছিল না। সকল ধর্মকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং সকল ধর্মের লোককেই তিনি ভালবাসতেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ফিজিতে ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে মর্মাহত হয়ে সেখানে ভারতীয়দের উদ্ধারের জন্য ছুটে গিয়েছিলেন। জালিনওয়ালাবাগে ইংরেজদের বর্বর অত্যাচারের জন্য তিনি এত মর্মাহত হয়েছিলেন যে, সেখানে গিয়ে তিনি অত্যাচারিত লোকদের পায়ে হাত দিয়ে সমগ্র ইংরেজ জাতির হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

তিনি সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজের অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্রের অধীনে কাজ করতেন। ইংরাজ রাজত্বে এ কথা চিন্তাও করা যায় না। তবুও তা সম্ভব হয়েছিল এণ্ডরুজের অতুলনীয় উদারতা ও সহৃদয়তার জন্য। এণ্ডরুজের কাছে সব মানুষই ছিল সমান। তিনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সব ধর্ম গ্রন্থই পাঠ করেছিলেন। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। অপর দিকে মুসলমান মৌলভী সাধকদের জন্যও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসীম।

প্রত্যেক ভারতীয়ের প্রতিই এণ্ডরুজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এণ্ডরুজের "গুরুদেব"। এণ্ডরুজ ছিলেন তাঁর পরম ভক্ত ও

শিষ্য। প্রথম দর্শনেই গুরুদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্মায় এবং তা ক্রমশঃই দৃঢ়তর হয়।

কবিগুরুর নোবেল পুরস্কার লাভের কথা শুনে এণ্ডরুজ অত্যন্ত আনন্দিত হন. এবং কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কবি তাঁকে আলিঙ্গন করেন আর এণ্ডরুজ নতজানু হয়ে কবিকে প্রণাম করেন।

এণ্ডরুজ ডারবানে পৌঁছালে ডারবানের জাহাজঘাটে হেনরি-পোলক এবং আরও অনেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। দীনবন্ধু সেখানে মহাত্মা গান্ধীকে প্রণাম করেন। এইভাবে ভারতীয়দের প্রণাম করার জন্য অনেক ইংরাজ তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়।

ডারবানে থাকার সময়ে এণ্ডরুজ খবর পেলেন—তাঁর মা আর ইহ জগতে নেই। এ সংবাদের পর তিনি কস্তুর বাঈ এবং অন্যান্য ভারতীয় মহিলাদের মাতৃ-সুলভ ব্যবহারে অনেক স্বান্তনা পেয়েছিলেন। এঁরা এণ্ডরুজকে বলেছিলেন, "আমরাই এখন থেকে আপনার মা হলাম।" এণ্ডরুজের মায়েরও ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। মায়ের অনুপ্রেরণাই এণ্ডরুজকে ভারতীয়দের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছিল, ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মনে করতে শিখিয়েছিল। এণ্ডরুজ বলতেন, ভারতবর্ষ তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েই তিনি বলেছিলেন, "আমার দ্বিতীয়বার জন্মলাভ হল।"

প্রশান্ত মহাসাগরের একটি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ হল ফিজি। এখানে বহু ভারতীয় শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। এদের জীবন ছিল অত্যন্ত দুঃখে ভরা। অনেক অন্যায় অবিচার এদের ভোগ করতে হত। দুঃখ-কষ্ট অসহ্য হলে অনেকে আত্মহত্যাও করত। ভারতীয়দের এই দুর্দশার কথা জানতে পেরে এণ্ডরুজ ফিজি যান। সেখানে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে ভারতীয়দের বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগ এবং তাদের সম্মান দাবী করেন। ১৯১৭ সালে ফিজিবাসী ভারতীয়েরা এণ্ডরুজকে "দীনবন্ধু" আখ্যা দিয়ে তাদের অন্তরের ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল।

চাঁদপুরে কলেরা-মহামারীর খবর পেয়ে দীনবন্ধু সেখানে গিয়ে অবিশ্রাম পরিশ্রম করে রোগীদের সেবা করেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দীনবন্ধু সেখানে ছুটে গেলেন দুর্গতদের সেবা করতে।

দক্ষিণ ভারতে মালাবার, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি জায়গায় অস্পৃশ্যতা ছিল ভীষণ প্রবল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিভেদ। দীনবন্ধু সেখানে গিয়েছিলেন অস্পৃশ্যতা দূর করে মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে। ভারতবাসীদের জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতা এণ্ডরুজ কখনই সমর্থন করতেন না। ধর্মের গোঁড়ামী আর জাতিভেদ দূরীকরণের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি বলতেন, "স্বাধীনতা কখনই আসবে না যদি না লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত অস্পৃশ্যদের মুক্তিলাভ হয়। ·· ভারতবর্ষ কোনো দিনই আপনাদের সেই সাধের ভারতবর্ষ বা আমার সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ হবে না, যদি ভারতের নিপীড়িত বঞ্চিত জাতি 'স্বরাজ' না পায়"।

১৯২৩ সালে এণ্ডরুজ কেনিয়াবাসী ভারতীয়দের সমস্যা সমাধান করতে আফ্রিকায় যান। সেখানে ভারতীয়দের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করায় তাঁকে শ্বেতাঙ্গদের হাতে নানাভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়।

ওড়িশায় বন্যা হলে এণ্ডরুজ সেখানে গিয়েছিলেন, বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য।

১৯২৫ সালে এণ্ডরুজ আবার আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। এই সময়ে ডারবান শহরে ভারতীয়দের মধ্যে বসন্তরোগ মহামারীরূপে দেখা দিলে দীনবন্ধু রোগীদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করলেন। নিজেও সেবা করতে লাগলেন। এণ্ডরুজের নিঃস্বার্থ সেবা আফ্রিকার ইংরেজ শাসকগণের মনে অনেক পরিবর্তন আনল। ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার, তাদের সুখ-সুবিধার দিকে শাসকগোষ্ঠী দৃষ্টি দিলেন। ১৯২৭ সালে এণ্ডরুজ আবার ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে স্বাগত জানালেন। বললেন—"তুমি পরমাশ্চর্য, তুমি মহান"।

কবি রবীন্দ্রনাথের সংগে এণ্ডরুজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কবি বলতেন, "এণ্ডরুজের সংগে আমার আত্মার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।" গুরুদেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য-লাভের অনুপ্রেরণাতে এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিনীতি অনুসরণ করতেন। ধুতি চাদর পরতেন। অধিকাংশ সময়ে খালি পায়ে থাকতেন, মাঝে মাঝে চটি পরতেন। গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। তিনি সেখানকার ছাত্রদের একাধারে শিক্ষক, অভিভাবক এবং বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর তত্ত্ব আলোচনাও হত। তাঁরা বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। এইভাবে এণ্ডরুজ

হিন্দুশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেছিলেন। গুরুদেবের প্রতি তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা এতই গভীর ছিল যে, গুরুদেবের অন্তরের ভালবাসা দিয়ে গড়া যে শান্তি-নিকেতন তার কোনো অভাবকষ্টই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শান্তি-নিকেতনের জন্য তিনি ভারতের এক স্থান থেকে অন্য-স্থানে অর্থ সংগ্রহ করে বেড়াতেন। এণ্ডরুজের নিঃস্বার্থ সেবা শান্তিনিকেতনবাসীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর পরিচয়ের যোগসূত্রও এই এণ্ডরুজ।

গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় এণ্ডরুজ ছিলেন তাঁর সমর্থক ও সহায়ক। দেশের সরকার অচ্ছ্যুত শ্রেণীর নাম রাখলেন 'সিডিউলড কাস্ট'। গান্ধীজী নাম দিলেন হরিজন। এই হরিজন সেবার কাজেও গান্ধীজীকে সহায়তা করেছেন এণ্ডরুজ।

পরাধীন ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার জন্য তাঁর স্বজাতি ইংরাজেরা দায়ী—একথা মনে করে দীনবন্ধু অত্যন্ত লজ্জা বোধ করতেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের লাহোরে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ওই মর্মান্তিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান শুরু হলে এণ্ডরুজ পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এর কারণ অনুসন্ধান করতেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে দেখে ভয়ে কিছু বলতে রাজী হোত না। পরে এক শিখ অত্যাচারের নিদর্শন হিসাবে গায়ের জামা খুলে অনাবৃত দেহ দেখালেন দীনবন্ধুকে। নিষ্ঠুর সেই আঘাতের চিহ্ন দেখে এণ্ডরুজ তাঁর পায়ে পরে বলেছিলেন "আমি সমস্ত ইংরেজ জাতির হয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি ক্ষমা কর।" তুমি সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ক্ষমা কর"।

এণ্ডরুজ ভারতে এসেছিলেন মূলতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এদেশে দুর্গত জনসাধারণেকে দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে, এদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে যীশুর বাণী প্রচার করা সার্থক হবে। তাই তিনি শাসক গোষ্ঠীকে বোঝা-বার চেষ্টা করতেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ব্যতীত ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে কখনই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভের অধিকার সকলের আছে। এবং সে অধিকার ইংরেজের মেনে নেওয়া কর্তব্য। ভারতবাসীর মঙ্গলের চিন্তায় এণ্ডরুজ যতটা চিন্তিত ছিলেন অনেক ভারতবাসীও ততটা চিন্তা করতেন না।

দীনবন্ধু তাঁর রোগশয্যাতেও ভারতবর্ষের মঙ্গল ও ভারতবাসীর কল্যাণচিন্তা করতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ব্যাকুল ভাবে চিন্তা করতেন যে, কবে

ভারতবাসীর পরাধীনতা শেষ হবে। তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় গান্ধীজীকে বলেছিলেন, "মোহন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসবেই, তুমি দেখ মোহন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসবেই"। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "কেবলমাত্র তাঁর জীবনের যা শ্রেষ্ঠ দান তাই তিনি আমাদের জন্য এবং সকল মানুষের জন্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে রেখে গেলেন। মরদেহ ধুলিস্মাৎ হবার মুহূর্তে—এই কথাটি আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়ে গেলাম।"

দীনবন্ধু এণ্ডরুজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বিপ্লবী যোদ্ধা আসফাককে। জানা গেছে যে, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পরায় স্বাধীনতা প্রেমী চরম অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন আসফাকের ফাঁসীর হুকুম হলে একজন মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেট ও সি আই ডি তার মধ্যে মুসলমান জাতীয়তা বোধ জাগিয়ে স্বীকারোক্তি করে মুক্তি নেওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আসফাক তাঁদের কথায় কান দেন নি। তাঁরা আসফাককে সাম্প্রদায়িকতার কুমন্ত্র দেওয়ার উদ্দেশ্য বলেছিলেন, "তুমি মুসলমান হয়ে কেন কাফেরদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের ও স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছ? তোমার গুরু রামপ্রসাদ ও তাঁহার সহকর্মীরা তো সব হিন্দু। ওরা হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।"

সেদিনের সেই মহান শহীদ আসফাক শুধু ঘৃণা ভরেই সে কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেননি, তিনি বলেছিলেন—"আমার কাছে রামপ্রসাদ হিন্দু নয়, ভারতবাসী। রামপ্রসাদের লক্ষ্য হিন্দুর স্বাধীনতা নয়, ভারতের স্বাধীনতা।" তিনি আরও বলেছিলেন, "এমনকি রামপ্রসাদ যদি শুধু হিন্দু স্বাধীনতার জন্য লড়তেন তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতাম, তার কারণ আমাকে যদি হিন্দু প্রভু ও বৃটিশ প্রভুর মধ্যে কাউকে বেছে নিতে হয় তাহলে আমি নিঃসন্দেহে হিন্দু প্রভুকেই বেছে নিতাম। শত হলেও তারা ভারতবাসী।"—এমনই ছিলেন শহীদ আসফাক। তাঁর ছিল অসাধারণ দেশভক্তি ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী এবং নেতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অচল আনুগত্য। তাই ফাঁসির আগে ওই বীর সন্তান আত্মীয়দের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন "তোমরা দুঃখ না করে ক্ষুদিরাম ও কানাইলালের কথা মনে কর, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পেরে আমি তৃপ্ত ও গর্বিত। তোমাদের গর্বিত হওয়া উচিত যে, তোমাদেরই এক একটি আত্মীয় দেশের জন্য হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করেছে।"

॥ ১০ ॥

যে সব বিদেশী ভারতকে নিজের দেশের মতো করে ভালবেসেছিলেন ডেভিড ম্যাক্কাচিয়ান তাঁদের মধ্যে একজন। ভারতের সংস্কৃতি ও স্থাপত্যশিল্প তাঁর জিজ্ঞাসু মনকে নাড়া দিয়েছিল অতিশয় গভীরভাবে। তাই কেমব্রিজের পড়া শেষ করে প্রথমে শান্তিনিকেতনে এবং পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে অধ্যাপনা করবার সময় এদেশে বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে নিজেকে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেন।

ভারতের পূর্বাঞ্চল ও বাংলাদেশের মন্দির মসজিদগুলোর স্থাপত্য ও কারু-শিল্প ডেভিডকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে তিনি এদেশকেই নিজের দেশের মতো মনে করে এখানেই অকালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ডেভিড শুধু পূর্বাঞ্চলেই নয়, ভারতের মধ্যপ্রদেশের মন্দির মসজিদগুলোতেও একাধিক বার গিয়েছেন। দেখেছেন, ছবি তুলেছেন। নিজের রোজগারের পয়সা বাঁচিয়ে ডেভিড তাঁর জিজ্ঞাসু মন ও একটি ঝোলানো থলি নিয়ে পাজামা ও পাঞ্জাবি পরে কোথাও পায়ে হেঁটে কোথাও বা সাইকেলে করে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। গ্রাম বাংলার টেরাকোটা ও ভগ্নপ্রায় মন্দিরগুলি রক্ষা করবার জন্য স্লাইড দেখিয়ে এবং কাগজে লিখে জনসাধারণকে সজাগ করতে চেয়েছেন বারবার। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত "আরলি মিডাইভ্যাল টেমপল অব বেঙ্গল" পুস্তকটিকে রবীন্দ্র পুরস্কারে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে।

অনেক মন্দির বিশেষজ্ঞ একথা স্বীকার না করে পারেননি যে, বাংলার মন্দির মসজিদ সম্পর্কে ডেভিডের মতো গবেষক এদেশে আজও কেউ জন্মাননি।

॥ ১১ ॥

কবি নজরুল হিন্দুর ঐতিহ্য নিয়ে রচনা লিখলেন, আর রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের সুখ-দুঃখের অনেক কথা লিখলেন এবং হিন্দুদের সঙ্গে মুসল-মানদেরও যে একই সঙ্গে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন তার কথাও জোর করে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তিনি মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে কিছুই লিখলেন না। এর কারণ কি এই নয় যে—হিন্দুর ঐতিহ্যে মুসলমানের উত্তরাধিকার আছে কিন্তু মুসলমানের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে হিন্দুদের সংস্পর্শের বাইরে। তাই মুসলমান ঐতহ্যে রবীন্দ্রনাথ তথা হিন্দুদের উত্তরাধিকার দাবি

করার অধিকার নেই। একথা কি অস্বীকার করা যাবে যে, প্রাণের যোগ নেই বলে বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য? কিন্তু যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এই দেশেই গড়ে উঠেছে তা এদেশের জলবায়ুর মতোই সহজ। এবং তা লিখতে হয় না, নিজে থেকে লিখিয়ে দেয়। কেউ টেরও পায় না যে, স্বদেশের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য তাকে নিয়েও গড়ে উঠেছে।

যে সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যে হিন্দুর উত্তরাধিকার আছে তাতে যে এদেশী মুসলমান ও খ্রীষ্টানদেরও উত্তরাধিকার আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ এদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ধর্মের অনেক কিছুই মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ শুধু যে জানেন তাই নয়, উপভোগও করেন। এই জানার পেছনে যে কারণ আছে তা হল—(ক) সব মুসলমান আরব, ইরান ও তুরস্ক থেকে আসেননি, অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ জন হিন্দু থেকে ঘটনার বিবর্তনে মুসলমান হয়েছেন। (খ) যাঁরা বিদেশ থেকে এসেছেন তাঁদের মধ্যে আবার অনেকেই এদেশের মেয়েদের পত্নী হিসাবে গ্রহন করেছেন। এছাড়া হিন্দুদের আচার-আচরণ, উৎসব, যাত্রা-পাঁচালী, কবিগান ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে মুসলমানগণ হিন্দুদের অনেক কিছুই জেনেছেন এবং নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির মধ্যে আমদানি করেছেন। ফলে হিন্দু সংস্কৃতি ও সাহিত্য মুসলমান মানসে প্রবেশের পথ খুঁজে পেয়েছে। নজরুল ইসলামের হিন্দু ঘেঁষা রচনা লেখার কারণ ওইখানেই নিহিত। এটা নজরুলের উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রাপ্তি। বরং মুসলমান ধর্ম হতে তাঁর বিচ্যুতি নয়। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ না করে আরব দেশে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তিনি আরবী ভাষায় কাব্য রচনা করতেন এবং হিন্দুদের সম্বন্ধে লিখলেও মুসলমান প্রভাব মুক্ত হতে পারতেন না। দীর্ঘ দিন মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে হিন্দুগণ যে মুসলমান আদব কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি, সাম্যবাদী ধর্মমত দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি সেকথা বলা চলে না। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যা হিন্দু মুসলমান মিলনের পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং সহায়কই হয়েছে অনেকাংশে। ধর্মীয় পার্থক্য ছাড়া হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার বিভেদের রেখা টানা দুঃসাধ্য। কারণ চেহারা, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে হিন্দু মুসলমান এক ও অভিন্ন। তাই সংস্কারমুক্ত পণ্ডিতপ্রবর ডঃ শহিদুল্লাহ বলেছিলেন—আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনো

আদর্শের কথা নয়। এটি একটি বাস্তব কথা—প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা তিলক-টিকিতে কিম্বা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।

সাম্প্রদায়িকতা সমাজ দেহের যে একটি মস্তবড় ব্যাধি এ কথা নজরুল অতি সহজেই উপলব্ধি করে তিনি বার বার এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বাংলা কাব্যে নজরুলের মতো এত উচ্চ কণ্ঠে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা বোধ হয় আর কেউ করেননি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল —একদিন জাগরিত গণশক্তি সাম্প্রদায়িকতার মতো ঘৃণ্য পশুশক্তির বিনাশ সাধন করবেই। তাই তিনি 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িকতার বিষময় পরিণাম সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে দিয়েছেন।

ধর্মের আহফিন সেবন করে যখন একদল আল্লার ও অপরদল মা কালীর সম্মান রক্ষার জন্য ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক কলহে মেতে উঠে একে অপরকে আঘাত হানে তখন কিন্তু আল্লা বা কালী কেউই সশরীরে এসে এদের রক্ষা করেন না। শুধু তাই নয়, হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি আহত অবস্থায় পড়ে থেকে যখন বাবা গো, মা গো বলে করুণ আর্তনাদ করে তখন মনে হয় একই মাতৃ পরিত্যক্ত দুটি শিশু একস্বরে কেঁদে তাদের মাকে ডাকছে।

নজরুল শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকার কথাই বলেন নি। তিনি মৈত্রীর বাণীও উচ্চারণ করেছেন। মিলনের গান কবিতায় তিনি বলেছেন— এই দুই সম্প্রদায় যদি মিলিত শক্তিতে এগিয়ে আসে তবে তারা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। নজরুল দুই সম্প্রদায়কে একই মায়ের দুটি সন্তান হিসেবে দেখতেন। তাই তিনি লিখেছেন—

(তোরা) করলি কেবল অহরহ
নীচ কলহের গরল পান।
(আজো) বুঝলি না হায় নাড়ী-ছেঁড়া
মায়ের পেটের ভায়ের টান।

নজরুল তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাসে ভারতবর্ষের যে ছবি তুলে ধরেছেন সেরূপ আর কেউ পেরেছেন বলে মনে হয় না। এতে আছে—

"আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ। কত অশ্রু সাগরে চড়া পড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষে। ওরে এ ভারতবর্ষ

তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়, এ আমার মানুষের—মহা-মানুষের মহাভারত।" নজরুলের দৃষ্টিতে ছিল হিন্দু মুসলমান সহ সকল সম্প্রদায়ের ভারতবর্ষের কল্পনা। ইসলামের সাম্যবাদ তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। উমর ফারুক কবিতায় তিনি বলেছেন—"ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা।" অন্যত্র তিনি বলেছেন—

"ইসলামের এ নহে ধর্ম,
নহে খোদার বিধান,
কারো মন্দির গীর্জারে করে
ম'জিদ মুসলমান॥"

ইসলাম ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তিনি সমান ভাবে সোচ্চার ছিলেন। এক কথায় তিনি ধর্মান্ধতাকেও বরদাস্ত করতেন না। এবং সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাছাড়া সমাজে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ আছে তা তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তার এই মানবতা বোধের মধ্যেই নিহিত ছিল সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর বাণী। হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টানের মধ্যেকার ব্যবধান তিনি স্বীকার করেননি। তাই নজরুল লিখেছেন—

"গাহি সাম্যের জয়গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে
সব বাধা ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।

নজরুলের জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জাতীয়তাবাদ। তিনি ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষ কবি, এবং রবীন্দ্রনাথের মতোই ভারততীর্থের সাধক। নজরুল একাধারে ইসলামী সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত ও কৃষ্ণলীলার গান রচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে তা বাদ দিলে বাংলা ভাষায় অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরাজী সাহিত্য হতে গ্রীক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়ের সাহিত্য, এতে হিন্দু দেবদেবীর নাম দেখলে মুসলমানের

রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। "আমি হিন্দু মুসলমান মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাঁদের সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেবদেবীর নাম নিই" একথা কবি বলেছেন। বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারত উপ-মহাদেশের সকল ধর্মীয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল কবি দ্বিধা-হীন চিত্তে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মোহম্মদ প্রমুখ নবীদের একাসনে বসিয়েছেন। মানুষে মানুষে ঐক্য সাধনের জন্য যেখানে ধর্মীয় উদারতার দরকার সেখানে সংস্কারমুক্ত মনে ধর্মকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু ধর্মীয় কুসংস্কার আবার প্রগতি ও ঐক্যের পথে বাধা হলে কবি সেখানে ধর্মকে আঘাত করতেও দ্বিধা করতে নিষেধ করেছেন। তাই তিনি লিখেছেন—

"ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ,
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত,
এক মানবের একই রক্ত মেশা।
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা।

নজরুল ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির মূলে আঘাতের উদ্দেশ্যে তাঁর কবিতা যাতে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এজন্য তিনি একই সঙ্গে আল্লাহ-ঈশ্বর, মসজিদ-মন্দির-গীর্জা, মোহম্মদ-কৃষ্ণ ও খালেদ-অর্জুন, কোরান-বেদ-বাইবেল প্রভৃতি রূপক উপমা ব্যবহার করেছেন। কবির এহেন আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলা চলে। তিনি মনে করতেন—কোনো মুসলমান হিন্দুর দেবদেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে না। নজরুল কৃষ্ণকে অত্যাচারী কংস হন্তা, অর্জুনকে সব্যসাচী ও দুঃসাহসী যৌবন ধর্মের প্রতীক, মোহম্মদকে সাম্যবাদী, খালেদকে মজলুম মানুষের সেনাপতি, খলিফা ওমরকে সাম্য ও মানবতার প্রতীক বলে মনে করতেন।

নজরুল মানুষকে ধর্ম ও জাতীয়তার উর্ধ্বে স্থান দিতেন। হিন্দু নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে এবং স্ত্রী ও পুত্রদের নামকরণের মধ্য দিয়েও তিনি এক অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। নজরুল নিজগৃহে আল্লাহর পরিবর্তে ভগবান এবং পানির বদলে জল বলতে বলতেন। এবং

তাঁর বাড়ীতে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক হত। তাঁর স্ত্রী নামে ও কাজে হিন্দু ছিলেন। তাঁর পুত্রদের সুন্নৎ হয়নি এবং পুত্ররা কালী-বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় হাত জোড় করে কালীকে প্রণাম করতেন। কবি নিজেও হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যোগসাধনা করতেন। মোটের ওপর নজরুল নামে মুসলমান হলেও আচার আচরণে অনেকটা হিন্দুঘেঁষা ছিলেন এবং এরূপ আচার আচরণের মধ্য দিয়েই কবি হিন্দু মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ভাঙবার একটা আন্তরিক প্রয়াস করে গেছেন।

ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত কবি বৈষম্য-জর্জরিত মানব সমাজের ভেদাভেদে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। তাই তিনি সাম্যের গান গেয়েছিলেন—

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্।
নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি ;
সব দেশ, সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

কবি নজরুল তাঁর গান, কবিতায় যেখানে যেমন পেরেছেন মানুষে মানুষে তুচ্ছ বিভেদের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ধর্মের ও জাতির ব্যবধানকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করেছেন।

কবি নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমান ধর্মই নয়, তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের প্রতিও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি ইসলাম হোক বা হিন্দুই হোক কোনো ধর্মের নামে ভণ্ডামী বা কুসংস্কার কোনো দিনই সহ্য করতে পারতেন না। আপন ধর্মের প্রতি কবির অন্ধমোহ ছিল না বলেই বোধ হয়—অপর ধর্মসম্বন্ধে কবি ছিলেন খুব উদার। তিনি লিখেছেন—

"মৌ-লোভী যত মৌলবী আর মোল্লারা ক'ন হাত নেড়ে,
দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!"

কবি নজরুল ইসলাম যে আপন ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না তা কবির লেখা উপরের এই ব্যাঙ্গাত্মক উক্তি থেকে ভাল ভাবেই বোঝা যায়। মুসলমান হয়ে হিন্দুর দেব দেবীর নাম মুখে আনলেই যে গুণা (পাপ) হবে একথা কবি কোনো দিন স্বীকার করতেন না, এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে কোনো প্রকার সত্যিকার বিরোধ আছে বলে তিনি মনে করেন না। মোটের ওপর ধর্মের কোনো প্রকার গোঁড়ামিকেই কবি কোনো দিন বরদাস্ত করেননি

বলেই বোধ হয় সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। নজরুল ইসলাম ছিলেন আধুনিক যুগের এক মহান ধর্ম-নিরপেক্ষ কবি। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি ছিলেন ভারততীর্থের এক পরম সাধক। ভারতীয় ধর্ম কোনো বিশেষ ধর্মের ধর্মমত নয়। এ হল মানব ধর্ম বা সকল ধর্মের সকল মতের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে সমৃদ্ধ ধর্ম। এ ধর্মের প্রাণ হল—সহনশীলতা আর সমন্বয়। ভারতধর্মের মর্মবাণী এর মধ্যেই বিধৃত। ভারতের জাগরণ শান্তি ও সমৃদ্ধিকে কেন্দ্র করেই যুগ যুগ ধরে আবর্তিত হচ্ছে। এই ধর্মকে আশ্রয় করেই ভারতের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। যে শাসক এই ভারত ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়েছেন তিনি তাঁর অনিবার্য পতন ডেকে এনেছেন। আর যিনি তা হননি তিনি দীর্ঘ দিন রাজত্ব করেছেন।

জনশ্রুতি আছে, তারাপীঠে মানত করে কবি নজরুলের জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর মা তাঁকে ছেলেবেলায় ক্ষেপা বলে ডাকতেন। তাই বোধ হয়, কবি অনেক গান ও গজল লিখতে লিখতে একদিন লিখে বসলেন—শ্যামা সঙ্গীত ও তার সঙ্গে স্বীকার করে নিলেন ভক্তিপ্লুত চিত্তে রাধাশ্যামকে। কবি লিখলেন—

"আমার শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে জপি আমি শ্যামের নাম
মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু, ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম।"

নজরুল ইসলাম একাধারে ইসলামী সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত ও কৃষ্ণ লীলার গান রচনা করেছেন। তাঁর লেখা শ্যামের বাঁশী, ছিন্নমস্তা চণ্ডী, ক্ষ্যাপা দুর্বাশা, বিশ্বামিত্র শিষ্য প্রভৃতি থেকে অতি সহজেই বুঝতে পারা যায় হিন্দু ধর্ম ও পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি কবির সংস্কারমুক্ত মন কতটা আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে কৃষ্ণ ও মোহম্মদকে একাসনে বসিয়েছেন। ধূমকেতুর শারদীয় সংখ্যায় নজরুল ইসলাম দশভুজা দুর্গার বন্দনা গীতিও লিখেছেন, যেমন—

"আর কতকাল রইবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?"

* * *

দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী।"

এ সব থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবির ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত উদার মনে 'আল্লাহ' এর বদলে হিন্দুদের মতো ভগবান বলতে কোনো সংকীর্ণতা বোধ ছিল না। তাই কবি ফরিয়াদের সর্বহারা কবিতায় বলেছেন—

"আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ—
এতদিনে ভগবান !"

নজরুল ইসলামের জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত জাতিয়তাবাদ। কবি মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বলেই বোধ হয় ১৯০৫ সাল থেকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত মুসলিম লীগ থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। কবি শুধু কাজে নয় এমনকি তাঁর ধর্মীয় কবিতা গানেও এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বিশেষ ভাবে প্রকাশ করেছেন। নজরুলের ধর্মীয় চেতনায় হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্মের ঐতিহ্যই যে এক আশ্চর্যভাবে সংশ্লেষিত হয়েছে তা স্বীকার করেছেন মুস্তাফানুরুল ইসলাম। ভবিষ্যতে সমৃদ্ধশালী আলোকোজ্জ্বল ভারত গঠনে হিন্দু ও মুসলমানগণের মৈত্রী ও যৌথ প্রচেষ্টা যে একান্ত প্রয়োজন একথা রবীন্দ্রনাথের মতো কবি নজরুলও সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কবি একখানি চিঠিতে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"আমি হিন্দু ও মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী, তাই তাদের এ সংস্কার আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেবদেবীর নাম নেই।" কবির এই যুক্তির পেছনে সত্যই সমাজ বিজ্ঞানের একটি অভ্রান্ত সত্য লুকিয়ে আছে। তা হল—বিভিন্ন ধর্মের লোক যতই একের ধর্মের ও আচার আচরণের প্রতি অপরে শ্রদ্ধাশীল হবে ততই সমাজবন্ধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ়তর হবে। পক্ষান্তরে যতই অপরের ধর্ম বলে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করবে ততই সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। হিন্দু মুসলমানের মিলনের উদ্দেশ্যে তাঁর "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" আর "হিন্দু মুসলমান দুটি ভাই ভারতের দুটি আঁখি তারা"—এই দুটি গান বিশেষ ভাবে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির প্রেরণা জোগায়। যে রাজ্যে মানুষে মানুষে কোনো ধর্মীয় ব্যবধান থাকবে না সেরূপ একটি সাম্য রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা ছিল কবির মনে। তাই তিনি লিখেছেন—

"এই সে স্বর্গ, এই সে বেহেশ্‌ত্‌, এখানে বিভেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাত রেখে মিলিয়াছি ভাই ভাই।
নাইকো এখানে ধর্মের ভেদ, শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরী-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।"

ধর্মনিরপেক্ষ ও সত্যসন্ধ কবি নজরুল ধর্মীয় ভেদাভেদহীন এক মিলিত সমাজ

ব্যবস্থায় হিন্দু মুসলমানকে দেখতে চেয়েছিলেন। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা হতে যতই ধর্মান্ধতা কেটে যাবে ততই প্রতিভাত হয়ে উঠবে কবি নজরুলের পরিকল্পিত সেই ধর্মীয় বিভেদহীন সমাজের ছবি।

কবি নজরুল যে কেবল হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাই নয়, হিন্দুদের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা বা ভালবাসা কম ছিল না। তাঁর রচিত বড়র পিরীত, বালির বাঁধ প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে বলেছেন—"বিশ্ব কবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে; যেমন করে ভক্ত তার ইষ্ট-দেবতাকে পূজা করে।" কবি মনের এই উদারতা যে একদিন সংকীর্ণ ধর্মান্ধতাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। মহাত্মা গান্ধীও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবর্গের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। রাজসন্ন্যাসী দেশবন্ধু যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে রাজার জীবন হতে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন আরম্ভ করলেন তখন কবি নজরুল ওই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে নিয়ে কবিতা লিখলেন। একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, কবি নজরুলের মানবপ্রেম ও সাম্যবাদী চিন্তাধারায় হিন্দুর প্রভাব আছে। তিনি গোবিন্দ দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবেও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

কবে নজরুল শুধু যে হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাই নয়, তিনি হিন্দু মেয়ে বিবাহ করেছিলেন। এবং তাঁর পুত্রদের নামকরণের বেলাতেও হিন্দু নাম ব্যবহার করেছেন। নজরুলের এই হিন্দু প্রীতি দেখে বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে মুসলমান সমাজ তাঁকে কাফের বলে নিন্দা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু এ নিন্দে বোধ হয় কবির সংস্কারমুক্ত উদার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি। কারণ মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা তাঁর অন্তরকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। যে মুসলীম লীগ কবিকে যুক্তিতর্কে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি সেই দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী মুসলীম লীগের প্রবর্তক জিন্না একদিন অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করে বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য নয় শুধু ভারতের মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান চেয়েছিলেন তা পঁচিশ বছর পূর্ণ না হতেই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল। কারণ পাকিস্তানের দ্বিজাতি তত্ত্বের বিনাশ হয়ে নতুন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম লাভ যেন নজরুলের মানবধর্মেরই জয় ঘোষণা করেছে।

নজরুলের লেখনীর ভিতর দিয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। কবি নজরুল শুধু যে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তাই নয়, তিনি শ্রেণীহীন ও সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই কবি নগ্ন ভাষায় ধনী বণিকদের শোষণ পদ্ধতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল তাঁর সর্বহারায় (কৃষাণের গানে) লিখেছেন—

(আজ) চারিদিক হ'তে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত,
(ও ভাই) জোঁকের মতন শুষছে রক্ত বাড়ছে থালার ভাত।

তিনি আরও লিখেছেন—

যত শ্রমিক শুঁষে নিঙড়ে প্রজা,
রাজা-উজির মারছে মজা,
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দল্‌বি রে আয় মজুর দল।
ধর্‌ হাতুড়ি, তোল্‌ কাঁধে শাবল।

কবি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করে তার সাম্যবাদীর 'চোর ডাকাত' অংশে লিখেছেন—

রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইঁটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছে খল কল্‌ও'লা মানুষ-পেষানো কল,
আখ্‌ পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল।

হাজার হাজার শ্রমিকের রক্ত ও অশ্রু দিয়েই বর্তমান সভ্যতার সুষম্য সৌধের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। শোষণকারী বণিকের দল কোটি কোটি গরীবকে ভিটেমাটি ছাড়া করে গড়ছে কারখানা কিন্তু তাদের নায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়নি। অথচ হাজার হাজার শ্রমিকের রক্তক্ষয়ী শ্রমের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে কলকারখানা। রেল ষ্টীমার। বর্তমান মূলধন গড়ে উঠেছে শ্রমিক ও কৃষক ঠকানো মূলধনকে ভিত্তি করে। তাই কবি কলকারখানাকে মানুষ পেষা কল বলে অভিহিত করেছেন। এখানে শ্রমিকদের নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটা হয়ে থাকে। তাই কবি বলেছেন—

বেতন দিয়াছ?—চুপরও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল?

কবি নজরুল ধনীর প্রাসাদে শ্রমিকের রক্ত দেখতে পেয়েছেন। তাঁর সাম্যবাদী দিব্যদৃষ্টি দিয়ে। তাই কবি তাঁর সাম্যবাদীর কুলি-মজুর অংশে লিখেছেন—

তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? —ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইঁটে আছে লেখা!

কবি তাঁর অগ্নিবীণার কামাল পাশা অংশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের তিনি জলদস্যু ও ডাকাত বলে তিরস্কার করেছেন। কবি লিখেছেন—

পরের মুলুক লুট করে খায়
ডাকাত তারা ডাকাত।

তিনি সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক শোষণকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে তাঁদের বিরুদ্ধে নগ্নভাবে কলম চালাতে দ্বিধা করেননি। কবি তাঁর চোর ডাকাত কবিতায় লিখেছেন—

বিচারক। তব ধর্মদণ্ডধর,
ছোটদের সব চুরি ক'রে আজ বড়রা হয়েছে বড়।
যারা যত বড় ডাকাত-দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানীগুণী জাতি সঙ্ঘেতে আজ।

॥ ১২ ॥

মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে শুধু নজরুলই নন আরও অনেকে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির জয়গান গেয়েছেন।' যেমন—বিষাদসিন্ধুর লেখক মীর মশারফ হোসেন। তিনি একজন মুসলমান হয়েও গোজীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর "গোজীবন" প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলমান সমাজকে গোহত্যা নিবারণে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানিয়েছেন। মৌলবী মুন্সী ও সুফিগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে হোসেন সাহেবে লিখেছেন—"শাস্ত্রে একথা লিখা নাই যে গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধঃ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে, বরং যাহা অখাদ্য,—যথা বরাহ—সে বিষয়ে পবিত্র কোরান শরিফে স্পষ্টভাবে বরাহ নাম উল্লেখে "খাইও না" (হারাম) লেখা আছে। খাদ্য সম্বন্ধে বিধি আছে যে, খাওয়া খাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গোমাংস না খাইলে মোসলমানি থাকিবে না,

মহাপাপী হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে—একথা কোথাও লিখা নাই। তিনি আরও লিখেছেন—"খাইবার অনেক আছে। ঘোড়া খাইতে পারি—খাই না। ফরিং ধরিয়া ঘৃতে ভাজিয়া টপাটপ্‌ গিলিতে পারি—শাস্ত্রের কথা—গিলিনা। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটেও যাই না। উট এদেশে নাই, থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়া যাইত না। কারণ শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ডা হয়।" এই প্রবন্ধের উপসংহারে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মন নিয়ে হোসেন সাহেব লিখেছেন—"এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে ও কর্মে এক, সংসারকার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই।……—এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি? পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চির সহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধর্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বারবার বলিব না, যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি? এই লেখার মধ্য দিয়ে লেখকের উদার মানসিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় মেলে।

॥ ১৩ ॥

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির জন্য চারণকবি মুকুন্দদাস বহু চেষ্টা করেছেন। তিনি এবিষয়ে যাত্রায় গেয়েছেন—

রাম রহিম না জুদা কর ভাই
মাটি খাঁটি রাখজী,
দেশের কথা ভাব ভাইরে
দেশ আমাদের মাতাজী।
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে
তফাৎ কেন করজী,
দু-ভায়াতে দু-বের বেঁধে
করি একই দেশে বসতি॥

এই গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এছাড়া কবি দেশের অনেক সামাজিক কুপ্রথা

দুর্নীতি ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে ও অনেক গান গেয়ে লোকের মনে উহা সম্বন্ধে ধিক্কার জন্মাবার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করেছেন। তিনি গেয়েছেন—

কামার কুমার চামার মুচি
তারাই কাজের তারাই শুচি,
ধর জড়িয়ে গলা তাদের ভুলে আপন পর ॥

॥ ১৪ ॥

ইসলাম ধর্ম শিখিয়েছে—ঈশ্বর জগতের পিতা আর জগতের সকল মানুষ একে অপরের ভাই। এই পবিত্র সাম্যবাদমূলক ধর্মে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। এর মতে সকলে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে খোদার নিকট প্রার্থনা করতে ও একসঙ্গে আহার করতে পারেন। খ্রীষ্টানগণও জাতিভেদ মানেন না।

হিন্দুগণের পূর্বপুরুষ আর্যদের মধ্যেও জাতিভেদের কোনো প্রকার কড়াকড়ি ছিল না। ওই সময় যাঁরা পূজা অর্চনা করতেন তাঁদের ব্রাহ্মণ বলা হত। যাঁরা যুদ্ধ বিগ্রহ করতেন তাঁদের বলা হত ক্ষত্রিয়, আর যাঁরা ব্যবসায় বাণিজ্য করতেন তাঁদের বৈশ্য এবং যাঁরা ওই তিন শ্রেণীর সেবা করতেন তাঁদের বলা হত শূদ্র। সেই সময়ে একজন অব্রাহ্মণ যাগ-যজ্ঞ বা পূজা-অর্চনা করে ব্রাহ্মণ হতে পারতেন। রাজা বিশ্বামিত্র অনেকদিন সাধনা করে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মে জাতিভেদের কড়াকড়ি অনেক পরে প্রবেশ করেছে।

জাতিভেদের বিষয়ে নজরুল বলেছেন,—"হিন্দুধর্ম নরকে নারায়ণ বলে অভিহিত করেছে। কি উদার সুন্দর কথা! মানুষের প্রতি কি মহান পবিত্র পূজা! আবার সেই ধর্মের সমাজেই রয়েছে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করার মতো হেয় জঘন্য ছুঁৎমার্গ বিধি, কি ভীষণ অসামঞ্জস্য!"

জাতিভেদের হাত থেকে যেমন হিন্দু সমাজ মুক্ত নয়, সেরূপ মুক্ত নয় মুসলমান সমাজ। মুসলমান সমাজেও নানাপ্রকার জাতিভেদ প্রচলিত আছে। যেমন—সৈয়দ (যাঁরা হজরৎ মহম্মদের বংশধর বলে দাবি করেন), আলি (পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী), শেখ (পীর বা উঁচু শ্রেণীর মুসলমান), পাঠান ও মোগল ইত্যাদি। নীচু শ্রেণীর মুসলমানগণের মধ্যে পেশা অনুসারে অনেক বিভাগ আছে। যেমন—গোলা, জোলা, মুকেরি, পিঠেরি, কাবাড়ি, সানাকার, হাজাম, তীরকর, কাগজী, দরজী, কোটো, রংরেজ, হালাল ও কসাই। মহম্মদ ইকবাল আলি

বলেছেন,—১৯৩৩ সনে মুসলমানগণকে শেখ, সৈয়দ, আলি, মোগল, এবং পাঠান ছাড়াও ছোট বড় আশীটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও মুসলমান সমাজে দেখতে পাওয়া যায় না। হিন্দুদের সেরূপ পেশা অনুসারে কামার, কুমোর, ছুতোর, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, জেলে, তাঁতি, চামার প্রভৃতি ছোট বড় প্রায় একচল্লিশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নীচু জাতের লোকের ছোঁয়া খেলেই উঁচু জাতের জাত যেত। মুসলমান সমাজে এত কড়াকড়ি নেই। মহাত্মা গান্ধী জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে সমান চোখে দেখতেন। কিশোর বয়সেই তাঁর মধ্যে এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল। কিশোর মোহনদাস বলত, শ্রীরামচন্দ্র যখন চণ্ডালগুহককে আলিঙ্গণ করেছেন তখন ছুত আর অছুত বলে কিছু নেই। হিন্দুধর্মে অস্পৃশ্যতা মানার মুলে কোনো কারণ নেই। গান্ধীজী বলেছিলেন—"অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের এক মহা কলঙ্ক। হিন্দুধর্মকে বাঁচাতে হলে অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন করতে হবে। জাতিভেদের মধ্যে ছোট বড়োর কথা নেই। যে ব্রাহ্মণ নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাববেন এবং অন্যকে অবজ্ঞা করবার জন্য তাঁর জন্ম—এরূপ মনে করবেন তিনি ব্রাহ্মণ নহেন।" মানুষের এই জাতিভেদ প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিভেদ। চামড়ার কাজ যে করে সে চামার, চিকিৎসার কাজ যে করে সে বৈদ্য, যে চুবড়ি বোনে সে ডোম, যে করনিকের কাজ করে সে কায়স্থ ইত্যাদি। অতএব এই ভেদ প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিভেদ। যা পরে বর্ণভেদ নামে পরিচিত হয়েছে। সারা দেশের লোকদেরই এই বর্ণ-ভেদকে বড় বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। আর এই বর্ণভেদ থেকেই ছুত অছুত সৃষ্টি হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—যতদিন পর্যন্ত অস্পৃশ্যতা আমাদের মধ্যে থাকবে, ততদিন সকলের মনে রাখতে হবে—এই পবিত্র ভারত ভূমিতে আমরা যতপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করি না কেন, তা এই মহাপাপের ফল।"

অস্পৃশ্যদের 'হরিজন' নাম গান্ধীজিরই দেওয়া। গান্ধীজি সেবাগ্রামে থাকাকালীন একদল হরিজন তাকে দেখতে এলে তিনি সকলকে বললেন "না এরা অছুত নয়, অভাজন নয়। এরা ভগবানের ও সকলের প্রিয়জন, এরা হরিজন।" সেই থেকে অস্পৃশ্যরা হরিজন নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে জগতে যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জাতিভেদ মানেন নি। তাঁদের কাছে মানুষই মানুষের একমাত্র পরিচয়। ভগবান বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য উপালি ছিলেন জাতিতে নাপিত। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধদেব তাঁর অস্পৃশ্য ভক্ত

চন্দের গৃহে রান্না করা মাংস খেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সকল জীবে হরিদর্শন করতেন। বেদের পুরুষ সূক্তে একটি মন্ত্র আছে, যাতে বলা হয়েছে—ঈশ্বর এক বিরাট পুরুষ। তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্র জন্মগ্রহণ করেছে। মুখ থেকে জন্মগ্রহণ করার জন্য ব্রাহ্মণ বড়, আর পা থেকে জন্ম হওয়ার জন্য শূদ্র ছোট, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে জন্ম যে পতিতপাবনী গঙ্গা সেই গঙ্গার জলেই আমরা পবিত্র হই। তবে জগতে 'অচ্ছুত' কে? আমরা ভগবানের চরণে প্রণাম করি, গুরুজনের চরণে প্রণাম করি, সুতরাং যারা ভগবানের শ্রীপাদ থেকে জন্মলাভ করেছে তারাই ত সবচেয়ে প্রণম্য! আচার্য শঙ্কর বিশ্বাস করতেন—জগতে সমস্ত জীবেই ভগবান আছেন। এমন কি রাস্তার কুকুরকেও তিনি অবজ্ঞা করতেন না। একবার আচার্য রামানুজ পথে এক অস্পৃশ্য নারীকে দেখে সরে যেতে বললেন। নারী জানতে চাইল—সব দিকেই তো ভগবান আছেন, সে কোন দিকে যাবে? একথা শুনে রামানুজ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং লজ্জিত হলেন। বিষ্ণুময় জগৎ উপলব্ধি করে তিনি রমণীর নিকট ক্ষমা চাইলেন।

উপনিষদে বলা হয়েছে—"সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ—" অর্থাৎ সর্বদা সকলের হৃদয়েই ভগবান বিরাজ করেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন। অতএব, এতকাল উঁচু জাতের লোকেরা নিচু জাতের লোকদের অপমান করে স্বয়ং ভগবানকেই তারা অপমান করেছে। তাই কবিগুরু তাঁর 'অপমানিত' কবিতায় লিখেছেন—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অহংকে বলি দেবার জন্য বলেছেন, "দে মা আমাকে অস্পৃশ্যদের সেবক করে দে। আমি যে দীনতমের চেয়েও দীন—এই বোধ আমায় জাগিয়ে দে মা। আমার অভিমান ভেঙ্গে দে, সবার সঙ্গে আমাকে সমভূমি করে দে।" সকলের সঙ্গে নিজেকে সমান করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অস্পৃশ্যদের উচ্ছিষ্ট মুখে দিতেন। নর্দমা পরিষ্কার করতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। গুরুর কাছ থেকে তিনিও সকল মানুষকে সমান চোখে দেখার দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। একবার পশ্চিম

ভারতের রাজস্থানের খেতড়ী রাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দ দু'দিন ধরে ধর্মকথা আলোচনা করলেন। ওই দু'দিন ধরেই তিনি উপবাসী, তাঁর উপবাস লক্ষ্য করল এক মুচি। সে তৃতীয় দিনে বিবেকানন্দের কাছে এসে খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করল। স্বামীজি তাকে খাবার আনতে বললেন। কিন্তু মুচি ভয় পেল, কারণ সে অস্পৃশ্য। স্বামীজি ছাড়বার পাত্র নন। শেষে মুচি নিজের বাড়ি থেকে রুটি এনে দিল। স্বামীজি সেই রুটি খেয়ে তৃপ্ত হলেন। এই সময়ে সারা দেশ ছিল ছুত অচ্ছুতের চিন্তায় বিভোর। ঠিক তখনই বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে শোনা গেল—"হে ভারত ভুলিও না, তোমার সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার ছাযামাত্র। ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

ভারতবর্ষে কয়েক কোটি মানুষ অস্পৃশ্য। এরা চিরকালই অত্যন্ত দরিদ্র ও অপমানে নতশির। এবং দেবতার মন্দিরে প্রবেশাধিকার পায় না। পূজার সময় মন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকার এদের নেই। উচ্চবর্ণের কূয়া থেকেও পিপাসার জল তুলে নিতে এরা অনধিকারী। শুধু তাই নয়, কিছুদিন পূর্বেও এদের ছায়া মাড়ালে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দেহ অপবিত্র হত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নীচ জাতের প্রতি অপমান সহ্য করতে পারেন নি। তাই তিনি তাঁর "অপমানিত" কবিতায় বলেছেন—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

কালের যাত্রার অন্তর্গত 'রথের রশি' নাটিকায় শূদ্রদের কবি যে সম্মান দিয়েছেন তা থেকে মনে হয়—তিনি মানবদেবতাকে শূদ্রের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন। 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হার মানার পর শূদ্র হাত লাগাতেই রথ চলতে লাগল—এই সংকেত কাহিনীতে মানব ধর্মের জয় ঘোষণা করা হয়েছে।

'মানুষের ধর্ম' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতা) ও 'পুনশ্চ' কাব্য এই বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা। কবীর, কিরাত মাধব, রামানন্দ, নাভা, রবিদাস, ভাজন মুচি প্রমুখ এবং বাংলার বাউলদের জীবন ও সাধনাকে তিনি 'পুনশ্চ' কাব্যে রূপ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে অন্ত্যজদের মধ্যে মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধিক্কার দিয়েছেন ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ও অন্ধতাকে, সমালোচনা করেছেন সংকীর্ণতা ও আচারানুগত্যকে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'জাতির পাঁতি' কবিতায় জাতিভেদ দূর করে বিশ্বের সকল মানুষকে শুধু একজাতি হিসেবেই দেখতে বলে লিখেছেন—

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।

* * *

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল,
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।

* * *

বর্ণে বর্ণে নাই রে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় !

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে শুধু একজাতি আছে যার নাম মানুষ জাতি। তারা একই পৃথিবীতে একই চন্দ্র সূর্যের নীচে প্রতিপালিত। সুতরাং মানুষে মানুষে বা জাতিতে জাতিতে কোনো বিভেদ থাকা উচিত নয়। এছাড়া, তথাকথিত মনুষ্য সৃষ্ট সকল জাতির বা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একই ব্রহ্ম বিদ্যমান। এবং বাইরের রঙ কালো বা ফর্সা যাই হোক না কেন, সকলের মধ্যে একই লাল বর্ণের রক্ত প্রবহমান। সুতরাং গায়ের বর্ণে যে পার্থক্য আছে তা অতি তুচ্ছ।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের মতে—বনেদী আর গরবনেদী বলে বংশে বংশে কোনো প্রভেদ থাকা উচিত নয়। কারণ সকলের বুনিয়াদ এই দুনিয়ার সঙ্গে গাঁথা অর্থাৎ এই দুনিয়াই সকলের জন্মভূমি। তিনি লিখেছেন—

বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর-বনেদী,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ্
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।

বঙ্গের কৈবর্তরা ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত নন। তাঁরা জাতে জেলে এবং দেশ অজও কৈবর্ত রাজার যশোস্তম্ভ বক্ষে ধারণ করে আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, চন্দ্রগুপ্ত এক শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। যাহোক, কবির মতে মুচি কসাই জাতির লোকেরাও ছোট নয়, কারণ ওই সকল জাতিতেই জন্মেছেন—মুচি রুইদাস ও সুদীন কসাই প্রমুখের মতো ভক্ত সন্তানেরা। কাজেই কবি মনে করেন—কোনো লোকই হেয় নয়, সকলে একই আদি জননীর সন্তান। অতএব, মিথ্যে কলহ বাড়িয়ে জাতি নিয়ে তর্ক করা সমীচীন কী? এ প্রসঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

বঙ্গে ঘরানা কৈবর্ত্তেরা,
বামুন নহে গো—কায়াৎও নহে,
আজো দেশ কৈবর্ত্ত রাজার
যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে।

* * *

রুইদাস মুচি, সুদীন কসাই,
গণি শুকদেব-সনক-সাথে,

মুচি ও কসাই আর ছোটো নাই
হেন ছেলে আহা হয় সে জাতে।
কেউ হেয় নাই, সমান সবাই
আদি জননীর পুত্র সবে,
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল
জাতির তর্ক কেন গো তবে?

কবি সত্যেন্দ্রনাথের মতে—যেহেতু জাতির কুসংস্কারের দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে, অতএব, সকলের উচিত –বিশ্বের সকলজনকে পরস্পরের সাথী ভেবে বুকে টেনে নিয়ে বাহুর সঙ্গে বাহু এবং মনে মন মিলিয়ে এক হওয়া। তাই এ সম্পর্কে কবি লিখেছেন—

জাতির পাঁতির দিন চ'লে যায়,
সাথী জানি আজ নিখিল জনে।
সাথী বলে জানি বুকে কোলে টানি,
বাহু বাঁধে বাহু মন সে মনে।

১৯৩৩ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী, ওই তারিখে মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'হরিজন পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মেথর' কবিতার ইংরেজী অনুবাদটি প্রকাশ করেন। ইংরেজীতে অনুবাদ করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কবিতাটির কয়েকটি পঙ্ক্তি এখানে দেওয়া হল, যেমন—

"কে বলে তোমারে বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।"

এই কবিতাটি ইংরেজীতে প্রকাশ করে গান্ধীজি অস্পৃশ্যদের প্রতি তাঁর সুগভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

জাতিভেদ প্রথাকে ঘৃণা করে কবি নজরুল ইসলাম হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান আমীর উভয়কেই নিন্দা করে লিখেছেন—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবিস্‌ এতেই বুঝি জাতের জান,
তাই তো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ' খান।"

তিনি বলেছেন—'হিন্দুদের মধ্যে জাত ভাঙ্গিয়ে একদল লোক অন্য দলকে ঠকাত।' উঁচু জাতের হিন্দু বাড়িতে মুসলমান এবং নীচু জাতের লোকেদের জন্য আলাদা হুঁকোর ও বসার ব্যবস্থা থাকত। নীচু জাতের লোককে রান্নাঘরে ঢুকতে দেওয়া হত না বা তাঁদের নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া হত না। এইভাবে ধর্মীয় পণ্ডিতগণ একজাতিকে ভেঙ্গে জাতির বেড়া দিয়ে অনেক ভাগ করেছেন, একে অপরকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রাচীনকালে জাতিভেদ প্রথা কঠোর ছিল না বলেই বোধহয় —সেই সময় যে কোনো লোক অতি সহজেই কর্মের মাধ্যমে তাঁর জাতি পরিবর্তন করতে পারতেন। পরশুরাম জন্মে ব্রাহ্মণ হলেও কর্মে ছিলেন ক্ষত্রিয়। অনুরূপভাবে বিশ্বামিত্র জন্মে ক্ষত্রিয় হয়েও দীর্ঘ সাধনার ফলে ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন। দ্রোণাচার্য পেশায় শিক্ষক হলেও তিনি তাঁর সময়ে একজন খ্যাতনামা সৈনিকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন যা একজন ক্ষত্রিয়ের হওয়ার কথা। আবার ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও রাজা জনক তাঁর সময়ে একজন পরম বেদজ্ঞ পণ্ডিতরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত ঋষি বশিষ্ঠ ছিলেন একজন পতিতার পুত্র এবং মহাভারতকার ব্যাসদেব ছিলেন একজন জেলে রমণীর পুত্র। আইনের বিধানদাতা বিখ্যাত আইনজ্ঞ পণ্ডিত ঋষি পরাশর ছিলেন শূদ্রদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের যে চণ্ডাল সেরূপ একজন চণ্ডালের পুত্র।

হিন্দুধর্মের আকর-গ্রন্থগুলিতে এরূপ দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভেদ থাকা উচিত কী? এবং মনুষ্য সৃষ্ট এই কৃত্রিম বিভেদ থাকা উচিত নয় বলেই বোধহয় রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি প্রমুখ অনেক মহামানব ও মনীষী সমাজদেহকে জাতিভেদ নামক দুষ্ট ক্ষত থেকে মুক্ত করার জন্য বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন; এ প্রয়াস তাঁরা করেছেন শুধু কথায় নয়, কাজেও। বিবেকানন্দ এই ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। নীচু জাতের জন্য রাখা আলাদা হুঁকো খেয়ে বালক নরেন

একদিন বাবাকে বলেছিলেন—"কই আমার জাত তো গেল না? মুসলমান জাতিভেদ প্রথাকে নিন্দা করে কবি নজরুল ইসলাম লিখেছেন—

"আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি' জাহান,
নাই বড় ছোট—সকল মানুষ একই সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি, জাগালে হায়
ইসলামে তব সন্দেহ॥"

ইসলাম ধর্মে সকলেই সমান। এতে প্রকৃতপক্ষে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। কিন্তু বাদশার প্রাসাদে আমীর সকল কালের কলঙ্কস্বরূপ। কারণ সে ইসলামে সন্দেহ অর্থাৎ ঘৃণ্য ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। অবশ্য বর্তমানে প্রগতিশীলতার হাওয়ায় জাতিভেদের কঠোরতা অনেক কমে গেছে।

ভারতের অহিংস ধর্ম সম্পর্কে কবি অতুলচন্দ্র সেন লিখেছেন—

ভোলেনি ভারত ভোলেনি সে কথা;
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা;
নানক, নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারতনন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ,
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে।

এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান;
মিল হে মায়ের চরণে।

ভারতের পবিত্র ভূমিতে নানক, নিমাই যে অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন ভারতবাসীরা তা ভোলেনি। কবি আশা করেছিলেন—ধর্মের দ্বন্দ্ব ও জাতির অভিমান ভুলে তদানীন্তন ত্রিশ কোটি মানুষ প্রেমবন্ধনে এক জাতি ও এক প্রাণ হবে। কবি হিন্দু মুসলমান, পারসী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানগণকে ভারত মায়ের চরণে মিলিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

॥ ১৫ ॥

আধুনিক কালে হিন্দু পণ্ডিতের গোঁড়ামির শিকার হলেন সংস্কার মুক্ত আচার্য শহীদুল্লাহ। বেদের অধ্যাপক প্রখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী শহীদুল্লাহকে সংস্কৃত পড়াতে অস্বীকার করায় তাঁর পক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংস্কৃতে এম, এ, পাশ করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যথেষ্ট আলোড়ন হয়। রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে "The Bengalee" পত্রিকায় লিখেছিলেন "The Pandits should be thrown into the holy water of the Ganges". অবশেষে ভাষা পিপাসু, সংস্কার-মুক্ত, সংস্কৃত-প্রেমিক শহীদুল্লাহ্ হরিনাথ দের পরামর্শ ক্রমে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম, এ পাশ করেন। অবশ্য তিনি সংস্কৃতে অনার্স সহ বি, এ পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। এবং বেদের প্রশ্ন পত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। মুসলমান ছাত্র হিসাবে শহীদুল্লাহ্ই প্রথম সংস্কৃতে অনার্স পাশ করেন। পরবর্তীকালে আরবী ও ফারসীতে তাঁর জ্ঞানের অগাধ পরিধি বিচারে আজানগাছের পীরশাহেব তাঁকে 'বাহার-উল-উলুম' (বিদ্যাসাগর) খেতাব দেন। অপরদিকে সংস্কৃত ভাষায় শহীদুল্লাহর গভীর জ্ঞান, হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে ১৯৫২ সালে ঢাকা সংস্কৃত পরিষদ তাঁকে "বিদ্যা বাচস্পতি" উপাধিতে ভূষিত করেন। এবং তিনি পূর্ব বঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা উপদেষ্টা সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। আচার্য শহীদুল্লাহ একদিকে যেমন 'কত্তমী যবানের' কথা বলেছেন, তেমনি অপর দিকে সংস্কৃত ভাষারও চর্চা করেছেন। তিনি একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মীয় আদর্শের কথা বলেছেন, অপর দিকে তেমনি হিন্দুধর্ম, বেদ ও গীতার ওপরেও চিন্তামূলক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। আচার্য শহীদুল্লাহের এই সংস্কার মুক্ত মনের পরিচয় পেয়ে কবি জসীমউদ্দীন তাঁর সম্পর্কে একটি কবিতায় লিখেছেন—

"তোমারে আমারা তসলিম করি,
হে জ্ঞান তাপস মুসলমান,
একহাতে তব বেদ, ভাগবত
আর হাতে তব পাক কোরাণ।"

শহীদুল্লাহের মধ্যে ছিল গভীর ধর্মবোধ, কিন্তু ধর্মীয় ছুৎমার্গী সংস্কার তাঁর মধ্যে মোটেই পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর ধর্মচর্চার আসল কথা সকল ধর্মের মধ্যে

ঐক্য সাধন। তিনি বলেছেন—"ধর্মের উদ্দেশ্য—ধার্মিক নিজে শান্তি পাবে আর পাবে তার হাতে সমস্ত দুনিয়া শান্তি। যা অশান্তি ঘটায়, তা ধর্ম নয়, পরম অধর্ম। ইসলাম শব্দের দুটি মানে—আত্মনিবেদন আর একটি শান্তি স্থাপন। রামকৃষ্ণ মিশনের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন—"I shall appeal to my Hindu and Muslim brethren to forgive the minor difference of their religions, to feel them, after all they are the spiritual children of the land of the universe and to love each other and to live in peace. (November, 1933)। প্রেম এবং ভালবাসাই যে ধর্ম সাধনার মূল—একথা তিনি অতি স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন। মুসলমান সমাজের জড়তা বা ধর্মের নামে অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধেও শহীদুল্লাহ লেখনী ধারণ করেছিলেন। ধর্মের অনুশাসনের দোহাই দিয়ে যাঁরা পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি ও নারী-জাতিকে অশিক্ষিত করে রাখার পক্ষপাতী তাদের বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পুরুষের সঙ্গে নারীও যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমান অধিকার ভোগ করতে পারেন এবং মসজিদ ও ময়দানে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও নমাজ পড়তে পারেন তা তিনি কোরাণ শরিফ থেকে প্রমাণ করেছেন। শহীদুল্লাহ সাহেব মেয়েদের সঙ্গে খোলা জায়গায় একত্রিত হয়ে নমাজ পড়া ধর্মের বিধান বলে ঘোষণা করেছিলেন। আচারসর্বস্ব-ধর্ম জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে, প্রেমহীন ধর্ম মানুষকে হিংস্রতার পথে টেনে নেয় এবং জ্ঞানহীন ধর্ম মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। আচার্য শহীদুল্লাহ হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় অতিশয় ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই তিনি ধর্মের স্বরূপটি উভয় সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরে বলেছিলেন—'এই যে ঝগড়া বিবাদ, একে আমি ধর্মের জন্য বলি না। এমন কোনো কথা হিন্দুর বেদ-পুরাণে নেই যে, এক মিনিটের জন্য মসজিদের সামনে বাজনা থামালে মুসলমানদের ধর্মকর্ম পণ্ড হয়ে যাবে। এমন কথা মুসলমানদের কোরাণে নেই যে, বিধর্মী মসজিদের সামনে বাজনা বাজালে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। দাঙ্গায় তৃতীয় পক্ষই লাভবান হয়।' তিনি বলতেন—ধর্মের নামে দাঙ্গাহাঙ্গামা ধর্ম নয়, তা হল পরম অধর্ম। খোদার দোয়ায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্শী, খ্রীষ্টান সব এদেশে বাস করবে। কেউ কাউকেও দূর করতে পারবে না। ধর্মান্ধতা দূর করতে হলে

শিক্ষা বিস্তার করতে হবে। তিনি আরও বলছেন—সকল কাজের ওপর শিক্ষা-বিস্তার। মূর্খ জাতির কোনো ধর্ম নাই, কর্ম নাই, উদার শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের মিলন চাই।

॥ ১৬ ॥

অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হক তাঁর স্বধর্মালম্বীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—"ক্রমশঃ তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, মুসলমানগণের পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর বা সংরক্ষণ ব্যবস্থার আবশ্যকতা নাই। তিনি বলেছিলেন—বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দু বংশোদ্ভব। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের লোকই যে পাশাপাশি ঐক্য এবং সদ্ভাবে বসবাস করিবেন এরূপ আশা করা খুবই স্বাভাবিক (বঙ্গবাণী ২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৯)। শ্রীহট্টের দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী সাহেব লিখেছেন—"* * * আমি ব্যক্তিগত ভাবে ভরদ্বাজ গোত্রীয় বলিয়া মনে করি এবং এইজন্য আরও অহঙ্কার করি যে, আমারই পূর্বপুরুষ কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন বিচার শক্তির সাহায্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (প্রবাসী মাসিক পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৩৩ সাল, ৭৯০ পৃষ্ঠা)। কলকাতা টাউন হলে বক্তৃতা দেওয়ার সময় (১৩ই আশ্বিন, ১৯৪১) খাঁ আবদুল গফুর খাঁ (সীমান্ত গান্ধী) বলেছিলেন—হিন্দুস্থান কেবল হিন্দুরই নহে, পরন্তু ইহা হিন্দুস্থানবাসী সকলেরই; হিন্দুর পক্ষে হিন্দুস্থান যেরূপ, মুসলমানের পক্ষেও তদ্রূপ। হিন্দু ও মুসলমান একই দেশের সন্তান (আনন্দ বাজার পত্রিকা ১৫ই আশ্বিন, ১৯৪১)। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দের হেতু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তদানীন্তন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দলের নেতা কমরেড, জেড, আমেদ বলেছিলেন -"কি সাম্প্রদায়িক সমস্যা, কি জাতিগত সমস্যা, বস্তুতঃ জাতি হিসাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ভারতের অধিকাংশ মুসলমানগণের পূর্বপুরুষই ছিলেন হিন্দু। তবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা কি একটা কৃষ্টিগত সমস্যা? তাহাও নহে কারণ, মূলতঃ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা কি? সমস্যা অর্থনৈতিক এবং তাহার উপরই রাজনৈতিক প্রভাবও রহিয়াছে (আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৪৫)।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের তদানীন্তন সদস্য মিঃ আসফ আলী দিল্লীর

প্রাদেশিক ছাত্রসম্মেলনে একদা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"ভারতীয়গণ (ভারতীয় মুসলমানগণ) একই আর্য বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; সুতরাং ধর্ম সম্পর্কিত প্রশ্ন লইয়া তাঁহাদের পক্ষে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া উচিত নহে। (দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা মফঃস্বল ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫)। ঢাকা কার্জন হলে হিন্দু-মুসলমানের একত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মিঃ সৈয়দ হোসেন বলেছেন—"হিন্দু আসলে একটা ভৌগলিক নাম; পূর্ব্বে ইহা বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইত না। পরে ইহা ধর্ম্মবাচক শব্দে পরিণত হয়, এখনও ভারতের বাইরে প্রত্যেক ভারতবাসীই 'হিন্দু' নামে পরিচিত। ভারতে হিন্দু কেন্দ্র, মুসলমান কেন্দ্র বলে কিছু নাই। ভারতীয় মুসলমানদের শতকরা ৯৫ জনের ধমনীতে হিন্দু রক্ত প্রবাহিত। ঐতিহাসিক দিক দিয়া, ভৌগলিক দিক দিয়া, জাতীয়তার দিক দিয়া এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়া উভয়ের মূলই এক (আনন্দবাজার পত্রিকা)। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের একবিংশতিতম অধিবেশনে (১লা ফাল্গুন, ১৩৪৪) বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ কুদ্‌রত-এ-খুদা বলেছিলেন—"অতীতের সভ্যতার কাহিনী মনে জাগিতেই স্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠে চারিটি দেশের কথা; গ্রীস, মিশর, চীন ও আমাদের বাসভূমি এই ভারতবর্ষই আদিম যুগের কৃষ্টির প্রচারক ও রক্ষক ছিল।" পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উৎসবের সভায় লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল স্যার হাসান সুরাবর্দী বলেছিলেন—"আমরা হিন্দী, হিন্দুস্থান আমাদের মাতৃভূমি। * * * আমরা সকলেই ভারতমাতার সন্তান। হিন্দুস্থান আমাদের সকলেরই মাতৃভূমি" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৩৯)।

পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের ২য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি কবি কায়কোবাদ বলেছিলেন—"বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা—আমাদের জন্মভূমির ভাষা। * * জগতের মধ্যে যত ভাষা আছে, আমি মনে করি—মনে করি কেন স্পর্ধার সঙ্গে বলিতে পারি, আমাদের মাতৃভাষা—জন্মভূমির ভাষা সৌন্দর্য্যে, গৌরবে, লালিত্যে, ভাব ও শব্দ সম্পদে দুনিয়ার কোন ভাষা হইতেই হীন নহে। * * * আমাদের মাতৃভাষা ও জন্মভূমির উত্থান পতন আমাদের উপরেই নির্ভর করে। আপনারা যদি জননী জন্মভূমির মুখের দিকে না চান তবে আর কে চাহিবে? ...হিন্দু মুসলমান, ভারতমাতার যুগল সন্তান, ইহারা পরস্পর ভাই ভাই। (আনন্দবাজার পত্রিকা ৬ই বৈশাখ, ১৩৪৩)। হাফিজুদ্দীন আহম্মদ লিখিত—

"হিন্দুর নিকট মুসলমানের ঋণ"—শিক্ষা ও সাহিত্য থেকে জানা যায়—"এদেশের মুসলমানের দেহে এদেশী হিন্দুরই রক্তধারা প্রবাহিত—একই দেশের একই আবহাওয়ায়, ফলশস্যে হিন্দু-মুসলমান লালিত পালিত, পরিবর্দ্ধিত। মুসলমান জাতি হিসাবে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও মাদ্রাজী এবং দেশ হিসাবে ভারতবাসী। ভারতবর্ষই আজ মুসলমানের প্রিয় জন্মভূমি।"

সৈয়দ নৌশের আলি বলেছিলেন—"আমি বাঙ্গালার লোক,—বাঙ্গালার মাটী আমার যেমন প্রিয়, বাঙ্গালার মানুষও আমার নিকট তেমনই প্রিয়। আমার কাছে হিন্দু কি মুসলমান বলিয়া কোন কথা নাই,—আমি আগে বাঙ্গালী, তারপর হিন্দু বা মুসলমান মনে করি (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০শে চৈত্র ১৩৪৫)।"

অধ্যাপক খোদাবক্স বলেছেন—"এদেশের মুসলমানদিগের মনে একটা সংস্কার আছে যে, তাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়া এদেশে বাস করিতেছেন,—এই সংস্কার ভ্রান্ত ; ইতিহাস দ্বারা এই সংস্কার সমর্থন করা যায় না।" ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন যখন দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া সংসদের অধ্যক্ষ তখন তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সামনে বলেছিলেন—"ভারতের ভবিষ্যৎভাগ্য নিয়ন্ত্রণে কে অংশ গ্রহণ করিবে? তাহারা কি পৃথিবীব্যাপী এই জাতীয় আন্দোলনের দিনে ভারতের স্বদেশ ও স্বভূমিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল বাহিরের মুস্লিম দেশগুলির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে? ভারতবর্ষকে "বিদেশ" বলিয়া চিন্তা করার অনিষ্টকর মনোবৃত্তি ইদানীং মুসলমান সমাজে বৃদ্ধি পাইতেছে। * * * ভারতবর্ষ মুসলমানেরও স্বদেশ, সে এখানে বিদেশী নহে এবং বিদেশী হইয়া থাকিবার জন্যও সে জন্মে নাই, (আনন্দবাজার পত্রিকা, মঙ্গলবার, ১৩ই কার্ত্তিক ১৩৪১ সাল)।

কলকাতার প্রাক্তন মেয়র জ্যাকেরিয়া বলেছিলেন—"সকল সময় মনে রাখা কর্ত্তব্য—আমরা এখানে ভারতবাসী পরে হিন্দু বা মুসলমান। আগে দেশ পরে কর্ম্মের বিচার, ভারতে সকলে একজাতি (দৈনিক বসুমতি, ১৮ই শ্রাবণ ১৩৪৫ সাল)।

তিন্নভেলী জেলা মুসলিম সম্মেলনের সভাপতি মৌলানা ইযাকুব হাসান সাহেব মুসলমানগণকে স্বদেশ-প্রীতিসম্পন্ন ও জাতীয়তাবাদী হওয়ার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—"জাতি হিসাবে হিন্দুরাও যতখানি হিন্দু—ভারতীয়

মুসলমানেরাও ততখানি হিন্দু এবং কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভারতীয় সকলেরই জন্মভূমি এবং স্বদেশ ভারতবর্ষ।"

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-বংশজাত ডাক্তার স্যার মহম্মদ ইক্‌বাল তাঁর "বঙ্গে ইন্দরা" নামক চয়নিকা পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত গান "নয়া শিওআলা" অর্থাৎ 'নূতন শিবালয়'এ লিখেছেন—

"পাথর-কী মূরতোঁ মে সম্‌ঝা হৈ তু খুদা হৈ ;
খাক্-এ ও অতন কা মুঝ্‌কো হর্ জর্‌রা দেওতা হৈ ॥"

'তুই ভেবেছিস, পাথরের মূর্তিতে ঈশ্বর আছেন ; কিন্তু আমার কাছে মাতৃভূমির প্রতি রেণুই দেবতা।' জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য এসকল মুসলমান মণীষীর সংস্কারমুক্ত মনের বক্তব্যগুলি সত্যই আজও বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য।

॥ ১৭ ॥

গান্ধীজী জাতিভেদ ও হিন্দু মুসলমানের বিভেদকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। সমাজে উঁচু জাতের চোখে যারা পতিত, অচ্ছুত সেই মুচি, মেথর, ডোম প্রভৃতিদের তিনি "হরিজন" (অর্থাৎ ভগবানের আপনজন) বলতেন। গান্ধীজী হিন্দু মুসলমানগণের বিভেদ দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি বলতেন—সাম্প্রদায়িকতা একটি সামাজিক কুষ্ঠ। ভগবানকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলতেন—'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' অর্থাৎ তোমার নাম ঈশ্বর আর আল্লা। —'সবকো সুমতি দে ভগবান' অর্থাৎ হে ভগবান তুমি সবাইকে সুমতি দাও। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও হিন্দু মুসলমান মিলনের চেষ্টা করে গেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—হিন্দু মুসলমানের একতাই ভারতকে শক্তিশালী করতে পারবে। দেশবন্ধুর শিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হিন্দু মুসলমানের বিভেদকে ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছেন—"স্বাধীনতার মানে কেবল রাজনৈতিক নাগপাশ হতে মুক্তি নয়। ইহার মানে—অর্থের সমবণ্টন, জাতিভেদ প্রথা ও সামাজিক অসাম্যতা বিলোপ এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অসহনশীলতা দূরীকরণ।" ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, হুমায়ন কবীর ও খাদ্যমন্ত্রী রফি

আহম্মদ কিদোয়াই প্রমুখ ভারত মায়ের অনেক খ্যাতনামা মুসলমান সন্তান হিন্দু মুসলমানের প্রীতি চেয়েছিলেন। তাই ভারতবিভাগের পরও তাঁরা জন্মভূমি ভারত ভূমি ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যান নি। ভারতকে ভাল-বেসে ভারতের বুকেই তাঁদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পেরেছেন। পাক ভারত বিরোধের সময় অনেক বীর মুসলমান সন্তান ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করেছেন। এ বিষয়ে আবদুল হামিদের নাম বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। ভারতবাসীরা এই শহীদের স্মরণে কর্ম চঞ্চল ডালহাউসী (বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) অঞ্চলের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের নামকরণ করেছেন আবদুল হামিদ স্ট্রীট।

শহীদ হামিদ ভারতের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর গভীর আস্থা পোষণ করতেন। ধর্ম নয়, পবিত্র দেশপ্রেমই মাতৃভূমির জন্য তাঁর আত্মোৎসর্গের প্রেরণা জুগিয়েছিল। যে লক্ষ লক্ষ দীপশিখা আজ ভারত ভূমিকে এশিয়া খণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শে আলোকিত করে রেখেছে আবদুল হামিদ সেই দীপশিখারই একটি হয়ে ভারতবাসীর মনের মনিকোঠায় যুগ যুগ ধরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকবেন। এ ছাড়াও প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধে পাকিস্তান যখন একটি অংশ নিয়ে নিল তখনও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহু সৈন্য দেশমাতৃকার জন্য আত্মবিসর্জন করেছেন। এই যুদ্ধও স্মরণ করিয়ে দেয় বীর শহীদ বিগ্রেডিয়ার মহম্মদ ওসমানির কথা।

ভারত এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যা মানুষের ধর্মকেই বড় করে দেখেছে। এখানকার সেনাবাহিনীতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে যোগ্যতার মর্যাদাই সর্বাগ্রে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। এদেশের কোনো সৈনিকের সঙ্গে দেখা হলে তিনি নিজেকে বাঙালী, পাঞ্জাবী, রাজপুত না বলে বলেন ভারতীয় এবং হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান না বলে বলেন সৈনিক। তাই হয়তো ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অখণ্ড ঐক্যবোধ বজায় আছে। এবং এই কারণেই একদিকে যখন সংকীর্ণমনা ধর্মান্ধ আয়ুব খাঁ গোপনে ভারত আক্রমণ করে ধর্মকে কাজে লাগাবার জন্য রব তুললেন—ইসলাম বিপন্ন, ঠিক সেই সময়ই ভারতের বীর সন্তান আব্দুল হামিদ মাতৃভূমি ভারত ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন করে সাহসিকতার জন্য প্রদত্ত সর্বোচ্চ সম্মান পরম বীর চক্রে ভূষিত হলেন।

॥ দশ ॥

বিশাল এই বিশ্বের বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থা যুগের পর যুগ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংঘাত-মিলনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে নব হতে নবতর আদর্শের অভিব্যক্তির দিকে। প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিশ্বের বিস্ময় এই ভারতবর্ষ এক মহামিলনের সুরের সাধনা করে আসছে। তাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের কৃষ্টির বিশিষ্টতা সত্ত্বেও সেই শাশ্বত সুরের সঙ্গে তাদের নিজেদের সুর মাধুরী যোজনা করে এক মহা ঐকতানের সৃষ্টি করেছে। সেই ঐকতানের সুর আজও ভারতের আকাশে বাতাসে অনুরণিত হচ্ছে। এবং ভাষা, সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস, শিল্প, সাধনা, সঙ্গীতকলা, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও আনন্দ উৎসবে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীরা লক্ষ্য রেখেছে মানবতার পূর্ণ বিকাশ ও মহামিলনের দিকে। তাই বোধ হয়—ভারতের তপস্যা বহুর মধ্যে সমন্বয়ের গৌরবে চিরভাস্বর। এই সমন্বয়বাদই ভারত ধর্ম যা ভারত-সংস্কৃতিকে রেখেছে চির প্রাণবন্ত। যদিও ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অতি প্রাচীন, তবুও সেই প্রাচীনত্বই ভারতকে দিয়েছে এক অপরিসীম ধৈর্য, অসাধারণ স্নিগ্ধতা ও আত্মসমীক্ষার এক অপূর্ব ক্ষমতা। আবার ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতা যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান তাই তা চির নবীন, এবং হাজার হাজার বছরের পুরাতন পথরেখা ধরে ভারত আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে, এবং এই চলার পথে কতনা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বয়ে গেছে এর বুকের ওপর দিয়ে, নানা জাতি ও স্বার্থের সংঘাত ঘটেছে যুগের পর যুগ, তবু ও ভারত অনাদি অনন্ত কাল ধরে বিভেদের মাঝে ঐক্য স্থাপনের সেই সুমহান ঐতিহ্যের শিখাটি চির অনির্বাণ রেখেছে। ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী, মুসলমান, খ্রীষ্টান সাধক ও মণীষীবৃন্দ সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রয়াস করেছেন ও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং উদার মানবিকতা অর্থাৎ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে ভালবাসার আদর্শ শিখিয়েছেন, জাতীয় জীবনে দিয়েছেন বিশ্বজনীনতার ছাপ। সমাজতন্ত্রের মৌলিক চিন্তাধারা ভারতবর্ষের কাছে আজ নতুন নয়। ভারতবর্ষের মাটিতে সর্ব প্রথম উপলব্ধি করা হয়েছিল মানব জাতির সামগ্রিক মঙ্গলচিন্তা, ঐক্যবোধ ও

একাত্মতা। ভারতই প্রথম মানুষকে অমৃতের সন্তান রূপে কল্পনা করেছে এবং মানবতাকে ভারত অখণ্ড ভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছে।

ভারত বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক স্বভাবজাত ধর্মই মানুষের লৌকিক জীবনে অপরিসীম কল্যাণ সাধনে সক্ষম। তাই ভারতের পূণ্যভূমিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সকল ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর এক মহামিলন ঘটেছে এবং ভারত আজও সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে দীপ্ত। ধর্মীয় সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে ভারত ওপলব্ধি করেছে চির অনন্তকে, সন্ধান পেয়েছে সীমার মাঝে অসীমের।

সমুদ্র পারের বনিকদল শাসক দলে অর্থাৎ বণিকের মান দণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিলে এবং ভারত তাদের কাছে আত্মসমর্পন করলেও সে তার ঐতিহ্য কখনও বিনষ্ট হতে দেয়নি। তাই দীর্ঘ দুশোবছরের পরাধীনতার গ্লানি স্বাধীনতার পূজারী ভারত মায়ের বহু শহীদ সন্তানের পবিত্র রক্তে এবং আত্মবলিদানে মুছে গেলে ভারতবর্ষ আবার জেগে উঠেছে। ভারতের অস্তমিত স্বাধীনতা সূর্যের সুপ্তশিখা পুনরায় তার প্রভাতকালীন রক্তিমাভা নিয়ে চিরভাস্বর হয়ে উঠেছে। পরাধীন মায়ের গ্লানি মোচনে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, বাঘাযতীন, মাতঙ্গিনী হাজরা, বিনয়, বাদল, দীনেশ, আসফাকউল্লা প্রমুখের আত্মবলিদান বিফলে যায়নি।

ভারতের স্তব্ধ স্বর এক দিন গর্জে উঠেছিল রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, নেতাজী, লালা লাজপত রায়, গোখলে, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখের অমর কণ্ঠে এবং ভারত আত্মার মূর্তপ্রতীক ঋষি অরবিন্দ ও জ্ঞানতপস্বী রবীন্দ্রনাথের ধ্যানোপলব্ধি ও ঐকান্তিক সাধনায়। ওই মহান সাধকগণের এক একটি বাণী স্ফুলিঙ্গের মতো বিশ্বব্যাপী একদিন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষের সামাজিক চেতনা, মানবতাবোধ যখন পশুশক্তির কাছে অবদমিত হতে যাচ্ছিল তখন সেই অধঃপতনের হাত থেকে ভারতকে রক্ষার নিমিত্ত রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বেদজ্ঞ পণ্ডিত রামমোহন রায়, দয়ার সাগর মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর প্রমুখ অনেকে। তাঁরা তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরাধীন সমাজের কাছে দেখা দিয়েছিলেন আলোকবর্তিকা ও তদানীন্তন সমাজের পথ নির্দেশকরূপে। যুগাবতার রামকৃষ্ণের সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ সুপ্ত মানব চেতনাকে জাগ্রত

করে উদাত্ত কণ্ঠে জগৎজনসমক্ষে ঘোষণা করেছিলেন—দীন, দরিদ্র, মুচি, মেথর সবাই মানুষ, সবার মধ্যেই ভগবানের অনন্তশক্তি বিরাজমান, সকলেই পরস্পরের ভাই। তাই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হল—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

বস্তুবাদ বলে—আত্মা বিনশ্বর, কিন্তু ভারত দর্শনের মতে আত্মা অবিনশ্বর। তাই আজও যেন শুনতে পাওয়া যায়—ওই দূর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে সুভাষের পদধ্বনি—'কদম কদম বাড়ায়ে যা'। ভারতমাতার বুকে আজও শোনা যায় "বন্দেমাতরম"-এর পবিত্র ধ্বনি।

॥ ২ ॥

ভারতের ধর্ম হল—সকল ধর্মের লোককে ভালবাসা, আপন জনের মতো বিপদে তাদের আশ্রয় দেওয়া। তাই ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে সকল ধর্মাবলম্বী লোকদের বুকে টেনে ধর্মনিরপেক্ষতার এক মহান জয়গান গেয়ে চলেছে। বিদেশী হলেও ভারত আশ্রয় দিয়েছিল ইরান থেকে আগত মজদীয় ধর্মে আস্থাশীল এক দল লোককে যখন তারা আরবীয়দের দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ভয়ে নৌ-পথে ভারতে পালিয়ে এসেছিল। সুদূর অতীতে রোমীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাচীন ইহুদী সম্প্রদায়ের অনেকেই ভারতে আশ্রয় প্রার্থী হলে ভারত তাদের সাদরে আশ্রয় দিয়েছিল। আশ্রয় দিয়েছিল জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক জুনতার হাতে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আগত লক্ষ লক্ষ আশ্রয়হীন বিপন্ন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধগণকে। ভারত চিরকালই পরম সহিষ্ণু এবং পরধর্মে শ্রদ্ধাশীল। অন্য দেশের বিপন্ন লোকদের জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বিপদে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে ভারতবর্ষ চিরকালই উদার। তাই কবি নজরুল লিখেছেন—

উদার ভারত! সকল মানবে দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।
পার্শী-জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু-খ্রীষ্টান-শিখ-মুসলমান ॥
তুমি পারাবার, তোমাতে আসিয়া মিলেছে সকল ধর্ম জাতি,
আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা সকল দেশের করেছ জ্ঞাতি ;
নিজেরে নিঃস্ব করিয়া হয়েছ বিশ্ব-মানব-পীঠস্থান ॥

নিজ সন্তানে রাখি নিরন্ন অন্য সবারে অন্ন দাও,
তোমার স্বর্ণ রৌপ্য মাণিকে বিশ্বের ভাণ্ডার ভরাও ;

শিকাগোর বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারত যে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলকে ভালবাসে সে কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, সকল ধর্মের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের শাশ্বত বাণীর কথা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে বিশ্বজনসমক্ষে ভারতের সুপ্ত মর্যাদাকে উদ্দীপিত করে তুলেছিলেন।

॥ ৩ ॥

জোট নিরপেক্ষতার মানে --কোনো জোটেই না থাকা, কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষতার মানে--নিরপেক্ষভাবে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়া। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান কাজ---সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোক যাতে ধর্ম পালনের সঙ্গে আর্থিক, সামাজিক, ভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধে ভোগ করতে পারে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ আজকের নয়, তা অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। কারণ রাজা চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর কাছে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সমান সম্মান পেত। হর্ষবর্ধন কৌলিক দেবতা আদিত্য ও শিবের উপাসক হয়েও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর সময়েই বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। অশোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বাংলার বৌদ্ধ পাল-রাজাদের সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম পাশাপাশি অবস্থান করত। রাজা গোপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও ব্রাহ্মণ্য ও অপরাপর ধর্মের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাতেন। পরবর্তীকালে আকবর ও দারাশিকোর হিন্দু ও হিন্দুধর্মে প্রীতি একজন গোঁড়া হিন্দুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিজাপুরের সুলতান ইউসুফ আদিলশাহ হিন্দুদের বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদিনও হিন্দু প্রজাদের বিশেষ ভালবাসতেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ কর্তৃক বিধ্বস্ত অনেক হিন্দু মন্দির পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছেন। বাংলার সুলতান হোসেন শাহ কোনো বাধা দেননি বলেই বোধ হয় চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সমর্থ হয়েছিলেন। হুসেনশাহ ও বরবাক শাহের আমলে ধর্মনিরপেক্ষতায় অনেক

পরিচয় পাওয়া গেছে। মোগল ও সুলতানী আমলে অনেক সম্রাট ও সুলতান সকল ধর্মের লোককে সমান অধিকার ভোগের সুযোগ দিতেন। তখন বহু হিন্দু বহু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অপর দিকে শিবাজী একজন গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরাণকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং মুসলমান রমণীদের মাতৃজ্ঞানে সম্মান দেখাতেন। মুসলমান পীর সন্ন্যাসীদের প্রতিও শিবাজী অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রায়গড় দুর্গে তিনি নিজ অর্থে মসজিদ গড়ে দিয়েছিলেন।

॥ ৪ ॥

যবন হরিদাস যেমন মুসলমান হয়েও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, আবার মৌলানা গিরিশ সেন হিন্দু হয়ে মুসলমান ধর্মপ্রচার ও মুসলমান ধর্ম সম্পর্কীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। 'সতী ময়নামতীর' লেখক দৌলত কাজী ছিলেন সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত মুসলমান কবি। এছাড়া ওই সময়ে কবি আলাওল হিন্দু পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি পদ্মাবতী নামে একখানি সুন্দর কাব্য লিখেছিলেন। রাজা রামমোহন যেমন আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করে কোরাণ শরীফের সুন্দর ব্যাখ্যা করতে পারতেন, তেমন ডঃ শহীদুল্লাহ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে হিন্দুদের বেদ ও ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। অপর দিকে পরমহংসদেব সুফী গোবিন্দের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মসজিদে নমাজ পড়েছিলেন। এণ্টনী ফিরিঙ্গী খ্রীষ্টান হয়েও কালী সাধনা করেছিলেন। অহিন্দু বাঙালি দরাফ খাঁ রচনা করেছিলেন গঙ্গাস্তোত্র। জনাব আলি, নজরুল গেয়েছিলেন শ্যামা সঙ্গীত এবং সৈয়দ মুর্ত্তজা রচনা করেছিলেন পদাবলী—'শ্যামবধূ আমার পরাণ তুমি'। পীর, ফকির ও গাজীদের কাছে মাথা নোয়ায় শত সহস্র হিন্দু আবার তারকেশ্বরের শিব মন্দিরে চেরাগ জ্বালায় মুসলমান। যবন হরিদাস বাঙালির কাছে হলেন ব্রহ্ম হরিদাস এবং প্রাণ বিয়োগের পর তাঁর মরদেহ বুকে জড়িয়ে কাঁদলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য আর ব্রাহ্মণোত্তম অদ্বৈত আচার্য করলেন রীতিসিদ্ধ পিণ্ডদান। শোনা যায়—কেরলে হিন্দু রাজাদের অর্থানুকুল্যেই ভারতের প্রথম মসজিদ ও গীর্জা নির্মিত হয়েছিল।

ঠাকুর পরিবারে হিন্দুয়ানার চেয়ে নবাবীয়ানাই বেশি ছিল। সেই জন্য

তাঁদের পীরালি (পীর এবং আলি) বলা হত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বইয়ের প্রচ্ছদ পটে আরবী রূপ দেওয়ার প্রয়াস করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—হিন্দুদের সঙ্গে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানেরা যাতে সমান তালে এগুতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে দরকার হলে মুসলমানদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধে দেওয়া উচিত। এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মনিপরেক্ষ মনোভাবের পরিচয় মেলে।

॥ ৫ ॥

ধর্মক্ষেত্রেও কোনো জাতিভেদ বা পতিতভেদ দেখা যায়নি এই ভারত-ভূমিতে। তাই বোধ হয় রামচন্দ্র প্রেমভরে আলিঙ্গন করেছিলেন গুহকচণ্ডালকে আর বুদ্ধদেব উদ্ধার করেছিলেন দস্যু অঙ্গুলিমালকে এবং নর্তকী হলেও দূরে সরিয়ে রাখেন নি অম্রপালিকে। আধুনিক যুগে নটী বিনোদিনীও পরমহংস-দেবের কৃপা লাভে বঞ্চিত হয়নি।

মধ্য যুগের ধর্মসাধনায় দেখা গেছে—হিন্দু সাধকদের মুসলমান শিষ্য এবং মুসলমান সাধকদের হিন্দু শিষ্য। ভক্তি আন্দোলনের সময়ে রামানন্দ, দাদু, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রমুখেরা ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানকে এক চোখে দেখতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

এখনও গ্রাম বাংলায় প্রথম গাই বিয়োলে হিন্দু রমণী প্রথম দুধটুকু গাঁয়ের পীর সাহেবের দরগায় দিতে ভুল করেন না। অনুরূপভাবে কলেরা বা বসন্ত দেখা দিলে মুসলমান রমণী গাঁয়ের শীতলা মন্দিরে পুজো পাঠাতে দ্বিধাবোধ করেন না। আগে ঈদ নমাজে কোনো হিন্দু অংশ গ্রহণ করলে অনেক গোঁড়া মুসলমান তাতে আপত্তি করতেন। কিন্তু ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের মুসলমানগণ আজ আর আপত্তি করেন না। তাই ঈদ মোবারকে বাংলার প্রাক্তন ও বর্তমান হিন্দু মুখ্য মন্ত্রীদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। রাজনীতিবিদ স্বর্গীয় হেমন্ত বসুর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করে হিন্দু পুরোহিত, মুসলমান মোল্লা ও খ্রীষ্টান পাদ্রী প্রমুখদের একাশনে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে দেখা গেছে। ঈশ্বর সাধনায় বিভিন্ন ধর্মের লোক যতই সমবেতভাবে অংশগ্রহণ করবে ততই ধর্মান্ধতা কাটবে। আর যত দূরে থাকবে ততই ধর্মান্ধতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

আসল ধর্ম হল—মানবিকধর্ম, শুভবুদ্ধি ও বিবেকের বিকাশ। মানুষের জন্য ও মানুষের কল্যাণের জন্য চরম নিরপেক্ষতা বজায় রেখে মানব ধর্ম পালন করাই হল প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা।

॥ ৬ ॥

পরাধীন ভারতও তার ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছে নানাভাবে। তুরস্কের সুলতান ছিলেন সমগ্র মুসলিম সমাজের খলিফা বা ধর্মগুরু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজেরা তুরস্কের খলিফাকে গদিচ্যুত করায় ভারতে সৌকৎআলি, মহম্মদ আলি ও আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় উক্ত খলিফার পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যে আন্দোলন হয়েছিল গান্ধীজির নেতৃত্বে হিন্দুগণও ওই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। খলিফার ওপর সেদিনের অপমান ভারত সহ্য করতে পারেনি বলেই ভারতের হিন্দুগণও মুসলমানদের সঙ্গে দলে দলে ওই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেই তুরস্ক আজ সত্যই একটি খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেখানে ধর্মের গোঁড়ামি সর্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সরকারের ধর্ম নিরপেক্ষ মনোভাবের কথা কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন—উক্ত সরকার গীতার যে অনুবাদ প্রকাশ করেছেন তার ভূমিকা লিখেছেন প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্ত, ডি. এ. নাসুতিয়ান এবং ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক সইফুদ্দীন জহুরী। বিবেকানন্দের রচনাবলীও সেখানে প্রকাশিত হয়েছে যার মুখবন্ধ লিখেছেন ডঃ সুকর্ণ। এর দ্বারা ইন্দোনেশিয-সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ ৭ ॥

কোনো ধর্মই উদার ও অসাম্প্রদায়িক হতে এবং হৃদয়বোধের মহত্ত্বলাভে বাধা দেয় না। তাই বোধ হয়—নানক, চৈতন্য, কবীর, রামানন্দ, দাদু নিজামুদ্দীন আউলিয়া, মুইন-উদ্দীন চিশতী, শাহজালাল, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সাধকগণকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঘৃণ্য ব্যাধি স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। সকল ধর্মবেত্তাগণই শিখিয়েছেন—যা ন্যায় ও সত্য তা-ই ধর্ম এবং যা অন্যায় ও মিথ্যা তা-ই অধর্ম। কোনো দেশেই চিরকাল দুই ধর্মের

লোক, যেমন—মুসলমান ও খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান ও ইহুদী, হিন্দু ও মুসলমান এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভৃতি পাশাপাশি থাকতে পারেনি। তবে একমাত্র ভারতবর্ষেই বহু ধর্মীয় লোক মাঝে মাঝে দু একটি সংঘর্ষ হলেও তারা যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি সহাবস্থান করে আসছে তাদের নিজ নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা বজায় রেখে যা অন্য বহু দেশেই চরম ভাবে ব্যাহত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিদেশী হয়ে যাঁরা ভারতজন ও ভারতীয় সংস্কৃতি ভালবেসেছেন তাঁদের ভারত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে কার্পণ্য করেনি। তাই ভারত এখনও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে—দীনবন্ধু এণ্ডরুজ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখকে। ভারতজনদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ডেভিড হেয়ারের অবদানও ভারতবাসী কোনো দিন ভুলবে না। ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষা যদি নিতে হয় তবে ইতিহাস থেকেই নিতে হবে—তত্ত্ব থেকে নয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকায় ভিন্নধর্ম দূরে থাক একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেও যথেষ্ট সংঘর্ষ হয়েছে। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব গঠন করতে হলে অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর করতে হবে। পক্ষান্তরে ধর্মবোধ যে সর্বদাই ঔদার্য, মহত্ত্ব ও অসাম্প্রদায়িকতার প্রেরণা দান করে" তা ঠিক নয়। কারণ ধর্ম যেমন একদিকে মানবতা বোধকে জাগ্রত করে হৃদয়ের ঔদার্য বাড়িয়েছে আবার অপর দিকে এই ধর্মই মানবতাবোধকে সংকুচিত করে মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে।

পণ্ডিতগণ একদিকে বলছেন—মানুষকে ভালবাস ; মানুষকে ভালবাসা মানে ভগবানকে ভালবাসা। কারণ নরই (মানুষ) নারায়ণ (দেবতা)। আবার অপর দিকে বলছেন—সাবধান ও নীচু জাত, ওকে মন্দিরে যেতে দিও না, তাহলে মন্দির অপবিত্র হবে। ও ম্লেচ্ছ, ওকে ছুঁয়ো না, তাহলে স্নান করতে হবে। তবে মোল্লার দরগায় শিরনি চড়াচ্ছ—তা চড়াও, ওটাতো এক ছিটে চিনি বা দুখানা বাতাসা বই আর কিছুই নয়। কিন্তু ভুলো না—ওরা যবন, ওরা ম্লেচ্ছ। অপর দিকে মোল্লা এসে চুপি চুপি বললেন—ওর কথায় কান দিও না, ও কাফের, ও না-পাক। ওদের জন্য বেহেস্তের দরজা বন্ধ। রোজ কেয়ামতের দিনে খোদা ওদের জন্য দোজখের দরজা খুলে দেবেন। ধর্মের বিপনিকারদের এই কথায় শিউরে ওঠে সাধারণ মানুষ। বড্ড নিরীহ মানুষ ওরা। তাই থতমত খায়। অবাক হয়ে ভাবে। চুপ করে

থাকে কিছুক্ষণ। ভুলে যায় ধর্মের কথা—সব মানুষই এক, ঈশ্বর জগতের পিতা, আর সকল মানুষ একে অপরের ভাই। ভুলে যায়—হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের আগুন। সাধারণ মানুষের ঘর-সংসার পোড়ে। নষ্ট হয় জাতীয় সম্পদ ও একতা। মানুষের অমানুষিক হিংসা দেখে তখন বুঝি বনের পশুও ভয় পায়। শিউরে ওঠে মন্দিরের দেবতা, আর মসজিদের খোদা।

এ বিভেদ নিরীহ মানুষের বিভেদ নয়, এ বিভেদ হিন্দু মুসলমানের বিভেদ নয়। এ হল গোঁড়া ধর্মীয় পণ্ডিত ও মোল্লাদের বিভেদ। ধর্মীয় পণ্ডিতেরা শুধু যে অপর ধর্মের সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করেন তাই নয়, এঁরা নিজ নিজ ধর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও হানাহানি বাঁধান। যার ফলে খ্রীষ্টানদের প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক শাখা, হিন্দুদের শৈব ও বৈষ্ণব এবং মুসলমানদের শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সময় অনেক বিরোধ হয়েছে। ওই ধর্মীয় বিপনিকারেরা হিন্দু-মুসলমানের প্রেম দেখলেই শিউরে ওঠেন। ভাবেন—তাঁদের একচেটে অধিকার বুঝি সাধারণ মানুষের সম্পত্তি হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া এঁদের সঙ্গে যোগ দেয় একদল সমাজ-বিরোধী ও অর্থলোভী ধনী যারা না বোঝে নিজের ধর্ম, না বোঝে অপরের ধর্ম। তারা বোঝে শুধু নিজেদের স্বার্থ, নিজেদের সুখ। এরাই হল হিন্দু মুসলমান সমাজের, সাধারণ নিরীহ কোটি কোটি মানুষের পরম দুশমন। এই দুশমনেরা মানুষের গোঁফ-দাড়ি বা পোশাক-আশাক যা মানব শিশু জন্মাবার সময় কখনও সঙ্গে করে নিয়ে আসে না, তা দেখেই ধরে নেয় কে হিন্দু আর কে মুসলমান এবং দাঙ্গা বাঁধায়। আর দাঙ্গার সময় গোঁফ দাড়ি ও লুঙ্গি, ধুতি দেখে হিন্দু মুসলমান ঠাওরে তাদের হত্যা করে।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এ ধরণের ঘটনা যখন ধর্মের নামে করা হয়, যাতে হাজার হাজার নিরপরাধ হিন্দু মুসলমান নিহত হন, তখন কিন্তু মন্দির বা মসজিদের একখানা ইটও খুলে পড়ে না। অথবা যখন মন্দির বা মসজিদ ধ্বংস করা হয় তখনও কিন্তু মন্দিরের দেবতা বা মসজিদের খোদা কেউই ছুটে আসে না অপরাধীকে শায়েস্তা করার জন্য। তাহলে মন্দির ও মসজিদ নিয়ে এত বিভেদ কেন? অথচ কে মন্দিরে গোমাংস ছুঁড়েছে, কে মসজিদের কাছ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে গেল—এ নিয়ে একদল ধর্মীয় পণ্ডিত ও মোল্লা এবং তাঁর সঙ্গে কিছু অর্থলোভী ধনী ও সমাজ-বিরোধী লুটেরা হাজার

হাজার নিরপরাধ মানুষকে খুন করে তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে লুঠতরাজ চালায়। অনেক সময় এদের মধ্যে কিছু বিদেশী চরও থাকে। তাই এদের চিনতে হবে এবং হিন্দু-মুসলমান সকলকে মনে রাখতে হবে—

"মোরা হিন্দু মুসলমান ভাই-ভাই
মোদের মাঝে দাঙ্গাবাজদের নেই ঠাঁই।"

শুধু গোলমালকারীদের কঠোর সাজা দিলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। এতে সাময়িক সমাধান হতে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য সমাধান হবে না। এর সমাধানের জন্য সমাজের মধ্যে একে অপরকে ঘৃণা করার যে পাপ আছে সেই পাপকে দূর করতে হবে। এই পাপবুদ্ধি যতদিন থাকবে ততদিন সমাজের দুশমনেরা এর সুযোগ নিয়ে হিন্দু মুসলমানের গোলমাল বাঁধিয়ে নিজেরা মজা লুটবে। তাই বিভেদের পাপকে বেশী করে ধিক্কার দিতে হবে। এক যোগে সকল রাজনৈতিক কর্মী, সকল ধর্মের সকল শান্তিকামী লোকের কাছে ধর্মের বিভেদের চেয়ে মিলনের দিকটা বেশী করে তুলে ধরতে হবে। তাছাড়া কোনো ধর্মের একজন বা একদল লোক কোনো সামাজিক অপরাধ করলে তার জন্য সেই ধর্মের সকল লোককে দোষী মনে করলে ভুল করা হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু অপরাধীকেই সাজা দিতে হবে। তা সে যে ধর্মের লোকই হোক না কেন।

একথা ভুললে চলবে না যে, ভারতের সংখ্যা-লঘুদের সকলপ্রকার নিরাপত্তা বিধান ও অধিকার রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব আজ সংখ্যাগুরুদের। কারণ তাঁরাও ভারত মাতার সন্তান। আবার সংখ্যালঘুদের ও উচিত হবে কোনো-রকম গুজবে কান না দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা। কারণ দেশের দুশমনদের কাজ হল—অকারণে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর দোষারোপ ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে সংখ্যালঘুদের বিপদে ফেলা।

অনুষ্ঠানিক ধর্মের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে এবং কোনো মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে না দেখে তাকে (সে যে কোনো ধর্মের লোকই হোক না কেন) মানুষ হিসেবে দেখতে পারলেই সকল ভেদবুদ্ধি ঘুচতে পারে।

॥ ৮ ॥

একথা আগেও বলা হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িকতা যা ধর্মনিরপেক্ষতার পরম শত্রু তা কিন্তু সর্বদা কেবল ধর্মকে ভিত্তি করেই প্রকট হয়ে ওঠে না বা

বেঁচে থাকে না। মানব সমাজের এই ঘৃণ্য ব্যাধিটি কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণকে কেন্দ্র করেও প্রকট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা তখন কিন্তু শোষণের নামে সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে বাজিমাৎ করতে চায়। এবং তাদের সঙ্গে তখন অপরাধপ্রবণ মন নিয়ে একদল সমাজবিরোধী লোক হাত মেলায়। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষিত বিত্তবান হিন্দুগণ বেশি সুযোগ সুবিধে ভোগ করেছিলেন আর মুসলমানেরা শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে পড়ায় অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—দরকার হলে মুসলমানদের একটু বেশি সুযোগ দিয়ে অর্থনীতিক দিক দিয়ে তাদেরও হিন্দুদের সমপর্যায় আনতে হবে। পাক-আমলে বাংলাদেশে এককালে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে বেশি সুযোগ সুবিধে ভোগ করায় তাঁদের অনেকেই হয় চরম অসন্তুষ্ট হয়ে সেখানে বসবাস করেছেন, না হয় ভারতবর্ষে চলে এসেছেন।

ধর্মীয় কারণে যখন এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা বেশি সুযোগ সুবিধে ভোগ করে তখনই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদবুদ্ধি জেগে ওঠে। ধর্মান্ধ সুযোগ-সন্ধানীরা ও সমাজ বিরোধীরা তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাবার সুযোগ পায়। এবং এক সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করে। তখন ব্যক্তি হিসেবে যোগ্যতার মাপকাঠিতে নয়, অযোগ্য হলেও সম্প্রদায় হিসেবে নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার প্রয়াস করে। এবং সম্মিলিতভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্বার্থের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। অনেকটা এই কারণেই মুসলিম লীগের জন্ম হয়ে অখণ্ড ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা না থাকায়, ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষিত হওয়ায় এককালে কতিপয় মুসলিম সুলতান ও সম্রাটগণের বিরুদ্ধে দেশীয় হিন্দুগণ যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। আবার ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকায় এবং উচ্চ রাজপদে ও সামরিক পদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে রাজপুত হিন্দুগণ আকবরের সময়ে জীবন দিয়েও সম্রাটের মান মর্যাদা রক্ষা করেছেন। এমন কি সম্রাটের প্রতিপত্তি রক্ষার নিমিত্ত তাঁরা হিন্দু হয়েও হিন্দুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি, যার জন্য আকবর দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ফিরোজশাহ ও ঔরঙ্গজেব প্রমুখের সময় হিন্দুরা

অনেক ক্ষেত্রে শুধু যে ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়েছিলেন এমন নয়, তাঁরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ছিলেন বঞ্চিত এবং নিজদেশে তাঁরা ছিলেন পরবাসী। এই কারণেই ওই ধরণের সুলতান ও সম্রাটগণের বিরুদ্ধে হিন্দুদের চরম অসন্তোষ ছিল। অতীতকালেও যখন ধর্মভিত্তিক শোষণ ও শাসন শুরু হয় তখন বৌদ্ধরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে এবং হিন্দুরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়---ভারতীয় খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে হিন্দু বা মুসলমানদের কোনো বড় অভিযোগ নেই। তার কারণ সম্প্রদায় হিসেবে দেশীয় খ্রীষ্টানগণ উল্লেখযোগ্য কোনো প্রকার শোষণের সুযোগ পাননি। ভারতীয় বৌদ্ধগণের অস্তিত্ব সম্পর্কেও ভারতীয় হিন্দু মুসলমানগণ আপাত অসচেতন।

ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি হৃদয়ের উদারতা ও মানবতা বোধকে সংকীর্ণ করে তোলে এবং তার সঙ্গে যদি আবার অর্থনৈতিক শোষণ মিলিত হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। আবার অনেক সময় ধর্মীয় একতা থাকা সত্ত্বেও যদি অর্থনৈতিক শোষণ চলে তাহলে ধর্মীয় একতা-বোধ ব্যাহত হয়। হাল আমলে বাংলাদেশে এক মুসলমান ধর্মের লোক হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমী মুসলমানগণ যখন বাংলাদেশের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ চালান এবং সেখানকার প্রচলিত ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্তব্ধ করতে চাইল তখন বাঙালিরা পশ্চিমী অপশোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশকে অর্থনৈতিক শোষণ এবং ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত করলেন অনেক শহীদের পবিত্র রক্তের বিনিময়ে। শুধু ধর্ম এক হলেই চলে না, ভাষা ও সংস্কৃতিও কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের সহায়ক। কারণ ধর্ম এক হয়ে যদি ভাষা এবং সংস্কৃতি আলাদা হয় তবে এক ধর্মের লোক হলেও সম্প্রীতি বজায় থাকে না, বরং ধর্ম এক না হয়েও যদি ভাষা ও সংস্কৃতিতে মিল থাকে তাহলে ভিন্ন ধর্মের লোক হলেও সম্প্রীতি ব্যাহত হয়না যা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু মুসলমানদের বেলায় অনেকটা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ধর্মীয় বিভেদ ও অর্থনৈতিক শোষণ বা অসাম্যকে যদি পাশাপাশি রেখে বিচার করা হয় তবে অর্থনৈতিক শোষণ ধর্মীয় বিভেদকে হার মানিয়ে দেবে। কাজেই অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের ভিত্তিতেই কেবল সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটানো সম্ভব। তাই বোধ হয়, অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ বা রাজনৈতিক দার্শনিক না হয়েও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুল

ইসলাম বলেছেন—হিন্দু মুসলমানের বিবাদ মেটাতে পারে একমাত্র অর্থনৈতিক সাম্য। তাঁরা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সামাজিক সাম্যের মুখে ধর্মীয় সংকীর্ণতা বিলুপ্ত হতে বাধ্য। এবং অর্থনৈতিক সাম্যের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করা সম্ভব। কারণ কোটি কোটি মানুষের মধ্যে রামানন্দ, নানক, কবীর, চৈতন্য, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, মুইনুদ্দীন চিশতি, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের দল ছড়িয়ে নেই যে তাঁরা চিরকাল অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গঠন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করবেন।

॥ ৯ ॥

আজও পশ্চিম বাংলায় অনেক হিন্দু, মুসলমান ও দেশীয় খ্রীষ্টান পাশাপাশি ভাই-ভাইয়ের মতো বাস করছেন। সেখানে কে হিন্দু, কে মুসলমান বা কে খ্রীষ্টান তা বুঝতে পারা যায় না। কারণ তাঁদের আচার ব্যবহার, চাল-চলন, পোশাক-আশাক ও কথাবার্তায় একটা অসাধারণ মিল আছে। মিল আছে তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসেও। বিবাহে গায়ে হলুদ দেওয়ার প্রচলনও আছে এদেশীয় খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে। অনেক খ্রীষ্টান ও মুসলমান রমণী শাঁখা-সিঁদুর ব্যবহার করেন। আবার কিছু কিছু হিন্দু বিবাহিতা রমণীকে শাঁখাতো পরতেই দেখা যায় না, এমনকি সিঁধুরও খুব কম ব্যবহার করেন বা অনেক সময় ব্যবহার করেন না। অনেক হিন্দু আবার মুসলমান গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন এবং অনেকে লুঙ্গি পরতে ও গোঁফ দাড়ি রাখতে ভালবাসেন। মেয়েরা ভালবাসেন সালওয়ার কামিজ পরতে। আবার কম মুসলমান রমণীকেই বোরখা পরতে দেখা যায়। অনেক মুসলমান গোঁফদাড়ি রাখেন না এবং ধুতি পরেন।

বিজয়া দশমীর দিনে হিন্দু মুসলমান একে অপরকে আলিঙ্গন করে প্রীতি ভালবাসা জানান। অনেক হিন্দুকে আবার মুসলমানগণের তাজিয়া বহনে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, মহরমেও যোগদান করেন অনেক হিন্দু। তাঁরা ধর্মভীরু মুসলমানদের মতোই হাসান হোসেনের নামে ভক্তিভরে মাথা নীচু করেন। এবং মহরমের দিনে সন্তান হলে অনেক হিন্দু হাসান-হোসেনের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের নাম রাখেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে শান্তির দূত যীশুর জন্মদিনে বহু হিন্দু মুসলমানকে আনন্দ করে কেক্ খেতে দেখা যায়। আবার পল্লীগ্রামের অনেক বাঙালী খ্রীষ্টান শিবের গাজন ও

বাবাঠাকুরের পূজায় অংশ গ্রহণ করেন। আজও মুসলমান দরগায় শিরনি মানত করতে দেখা যায় ব্রাহ্মণ কন্যাকে। জলপাইগুড়িতে অনেক হিন্দু মুসলমান বুড়ি পুজায় একসঙ্গে মিলিত হন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে প্রগতিশীল মতবাদ গড়ে ওঠার ফলে মৃত আত্মার শান্তি কামনায় অনেক ধর্মের প্রতিনিধিকে সমবেতভাবে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। মনে পড়ে ২৭ পরগণা জেলার ঘুটিয়ারী শরিফের পীরসাহেব ও ধপ্ধপীর বাবাঠাকুরের কথা, যাদের কাছে হিন্দু মুসলমান অনেকেই মানত করেন, পুজা দেন। অথচ মুসলমানদের মানত করা বা পূজো দেওয়ার অনুমোদন ইসলামধর্মে নেই। এখনো কালীপুজার রাতে অনেক মুসলমান জননী উপবাস করেন সন্তানদের মঙ্গল কামনায়। আবার অনেক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে দেখা যায় মুসলমান দরগায় শিরনি মানত করতে। গরুর বাচ্চা হলে গাঁয়ের হিন্দু মেয়েরা শুদ্ধ হবার জন্য প্রথম দুধটুকু পাঠিয়ে দেন মুসলমান দরগায়। বাৎসরিক উৎসবে গাঁয়ের পীরসাহেবের দরগায় গোঁড়া ব্রাহ্মণও ভুল করেন না শিরনি পাঠাতে। হিন্দু সমাজের মতো ভারতীয় মুসলমান সমাজেও বেহারা, চুরি-হার, দেওয়ান, ধোবা, ভাট, গাইন, হাজাম, কুমার, নাট্‌, পোনার এমন আরও অনেক জাতি বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া মল্লিক, চৌধুরী, নস্কর, মজুমদার, হালদার, খাঁ, বিশ্বাস, বক্সী, মণ্ডল এবং সরকার প্রভৃতি অনেক পদবী হিন্দু মুসলমান ও এদেশীয় খ্রীষ্টানগণকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এদেশীয় মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ ভূতনাথ, পরাণ, ফটিক, সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ' গৌরী, নিলীমা প্রভৃতি অনেক হিন্দুনাম ব্যবহার করেন। এর দ্বারা হিন্দু, মুসলমান ও এদেশীয় খ্রীষ্টানগণের মধ্যে সামাজিক ভাবনা চিন্তায় মিলের একটা অসাধারণ ধারা পরিলক্ষিত হয়।

॥ ১০ ॥

ইতিহাসকে অস্বীকার করে পাকিস্তান স্রষ্টারা ভেবেছিলেন—হিন্দু-মুসলমানেরা কখনও একসঙ্গে থাকতে পারবে না, তাই তাঁরা পাকিস্তানকে ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, শুধু ইসলামিক ঐক্যের কথা বলে। সমগ্র বিশ্বের নয়, একমাত্র ভারতের সমস্ত মুসলমানের জন্য। মুসলমান এক জাতি—এটাই ছিল জিন্না ও তাঁর অনুগামী মুসলিম লীগের দাবী। ফলে এক অখণ্ড ভারত ভেঙে হল—দুই। ভারত আর পাকিস্তান। কিন্তু পরবর্তীকালে

ধর্মান্ধ পাক নেতারা দেখলেন পাকিস্তানের এক খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোকের ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা। তখন তাঁরা ভাবলেন—এ দুটি জনগোষ্ঠি একত্র থাকতে পারে একমাত্র প্রভু ভৃত্য হিসেবে, অন্যথায় নয়। কাজেই তাঁরা বাঙালী মুসলমানদের ওপর চালালেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ। এবং সেই সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতিগত বিকাশের পথও রুদ্ধ করতে চাইলেন। এছাড়া পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনভূমি যে ভারত যেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ ও জোরাষ্ট্রিয়ান প্রভৃতি ধর্মের লোকেরা সমান অধিকার ভোগ করতে পারেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে যেখানে 'শক-হুণ-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন' সেই ভারতকে বাংলাদেশের লোকদের কাছে শত্রুর দেশ বলেই বারবার প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু বাংলা দেশের মুসলমানগণ যখন বুঝতে পারলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান শাসকগণ তাঁদের সর্বপ্রকারে শোষণ করছেন, তখন সেই শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালীগণ স্বায়ত্ত শাসন দাবি করলেন। তখন জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়ার প্ররোচনায় লক্ষ লক্ষ লোককে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। ইয়াহিয়া খাঁর বীভৎসতা চেঙ্গিস, তৈমুর ও হিটলারের নারকীয় নিধন যজ্ঞকে ম্লান করে দিল। জঙ্গীশাহীর সামরিক জুনতা অসংখ্য মুসলমান এবং মন্দিরের সঙ্গে বহু মসজিদও ধ্বংস করল। তখন কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়েও মুসলমানগণ মুসলমানদের হাত থেকে রেহাই পেল না। এবং একে কেউ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বলতে পারলেন না। এতে পাকিস্তান স্রষ্টা জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের অবসান ঘটল। এবং প্রমাণিত হল—অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যই প্রকৃতপক্ষে অনেক দাঙ্গার আসল কারণ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধে যখন একটি মানব গোষ্ঠি অপর মানব গোষ্ঠীর চেয়ে বেশী ভোগ করেন তখন একই ধর্মভুক্ত হলেও পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য যে বিক্ষোভ দেখা দেয় তা ধর্মের দোহাই দিয়ে দমন করা যায় না। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশে যখন বীভৎস তাণ্ডবলীলা চলছিল তখন কিন্তু ভারত জঙ্গীশাহীর বর্বর আক্রমণের হাত থেকে অত্যাচার জর্জরিত একটি জাতিকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসে। এবং লক্ষ লক্ষ লোককে বিপদের সময় নিজদেশের শত দারিদ্র সত্ত্বেও শরণার্থী হিসেবে বুকে আশ্রয় দেয় পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম বর্বরতার এক জলন্ত সাক্ষী

হিসেবে। তখন বাংলাদেশের লোকেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন তাঁদের আসল বন্ধু কারা? ক্রমে ওই শোষিত জনগোষ্ঠী ধর্মান্ধ পাক অপশোষণের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে। ভারতীয় মিত্র শক্তির সাহায্যে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। ফলে যে অখণ্ড ভারত ভেঙে প্রথমে হয়েছিল—দুই, পরে হয়—তিন অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। এবং পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র আর এর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না। বাংলাদেশ সুতরাং আজ একটি বাস্তব সত্য; একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের প্রধান বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান শুধু বাংলাদেশের বন্ধু নন; তিনি সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয়, স্বাধীনতাকামী মানুষের বন্ধু, মানব বন্ধু। তিনি বলেছেন—বাংলাদেশের সকল মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবেন। তা তাঁরা যে ধর্মের লোকই হোন না কেন। ধর্মান্ধ পাকিস্তানের জঙ্গীশাসকদের বিরুদ্ধে কি মহান ধারণা! কি মহৎ চিন্তা! এ বিষয়ে তিনি বিংশ শতাব্দীর আকবর। কারণ আকবর সকল ধর্মের লোকদের সমানভাবে ভালবাসতেন এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করেছিলেন। মুজিবর রহমানকে উদ্দেশ্য করে বাংলাদেশের হিন্দু কবি তাই লিখেছেন—

"ভাই রহমান,
আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান—
বাংলা মায়ের দুই সন্তান,
মোরা সবাই সমান॥

বাংলা মা বিংশ শতকের শেষভাগে আবার নতুন করে জন্ম দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। তিনি দেখিয়ে দিলেন তাঁর মুসলমান সন্তানেরাও কত দেশপ্রেমী। কারণ এই রহমানই পাকিস্তানের জঙ্গীশাসকের শোষণের হাত থেকে বাংলা দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হিসেবে সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতে পা দিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট করে বলেছিলেন—

"রিক্ত আমি সিক্ত আমি
দেওয়ার কিছু নাই।
আছে কেবল ভালবাসা
দিলাম আমি তাই।"

বঙ্গবন্ধু নেতাজীকে তাঁর একজন রাজনৈতিক গুরু বলে স্বীকার করেছেন। জঙ্গীসাহীর শোষণের বিরুদ্ধে এবং বাংলা দেশের স্বায়ত্বশাসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নেতাজী বলেছিলেন—"তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" অপুরূপভাবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন—রক্ত যত লাগে দিব, কিন্তু বাংলা দেশকে স্বাধীন করে ছাড়ব। এই দুই উক্তির সঙ্গে একটি অদ্ভুত আত্মিক মিল আছে। লক্ষ লক্ষ বাঙালী বঙ্গবন্ধুর আবেদনে সাড়া দিয়ে সত্যই বুকের অনেক রক্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে রক্ত বিফলে যায়নি। তাঁরা বাংলামাকে স্বাধীন করে ছেড়েছেন। গান্ধীজী ও নেতাজীর ভাবধারার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ধারায় এক সক্রিয় সমাবেশ ঘটেছে। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দাঁড়িয়ে যেমন মনে পড়ে বিংশ শতকের প্রথম ভাগের শহীদ—কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর নাম তেমনি মনে পড়ে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের শহীদ সাফিক, জব্বার, বরকত প্রমুখকে। আজ বাংলা দেশের মানুষ আর পাকিস্তানী নন। তাঁদের প্রধান পরিচয় হল তাঁরা বাঙালী, তাঁরা বাংলা মায়ের সন্তান। বাংলা দেশের লোকেরা তাঁদের পাকিস্তানী পরিচয় শুধু ঘৃণার সঙ্গেই পরিত্যাগ করেননি, তার সঙ্গে তাঁরা পাকিস্তানের স্রষ্টা ধর্মান্ধ জিন্না ও তার অনুগামী বিশেষ করে জল্লাদ ইয়াহিয়া খাঁকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছেন। বিশেষ করে ইয়াহিয়া প্রমুখ মুসলমান শাসকগণ ধর্মের মিথ্যে বাঁধনে সোনার বাংলার সাড়ে সাত কোটি স্বাধীনতাকামী মানুষের ন্যায্য গণতান্ত্রিক দাবী পদদলিত করে তাঁদের ওপর অর্থ নৈতিক শোষণ চালাচ্ছিলেন দীর্ঘ দিন ধরে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের পথও রুদ্ধ করতে চাইছিলেন।

ভারতবর্ষ যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে চলেছে বাংলা দেশের অভ্যুদয় তারই সার্থকতা নতুন করে প্রমাণ করল। বাংলাদেশ সরকার বলেছেন—বাংলাদেশের সকল ধর্মের লোক সমান অধিকার ভোগ করবেন। ওই সরকার আরও ঘোষণা করছেন—শিক্ষাক্ষেত্রে সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি নিষিদ্ধ হবে। এবং জঙ্গীশাহী যে সকল মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা ভেঙ্গে দিয়েছে তা মেরামত হবে। এটা বাংলা দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ফলশ্রুতি। বাংলাদেশের এই নীতি কয়েক বছর আগের কাশ্মীরের সুলতান

জয়নুল আবেদীনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সুলতানের ধর্মান্ধ পূর্ব-পুরুষ অনেক হিন্দুকে কাশ্মীর হতে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই মহান ধর্মনিরপেক্ষ সুলতান আবেদীন বিতাড়িত হিন্দুদের দেশে ফিরিয়ে আনেন যেমন বাংলা দেশের সরকার শরনার্থীদের ভারত হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়েছেন। বাংলা দেশ ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষতা ও শান্তি পূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। এছাড়া পৃথিবীতে এই প্রথম একজন কবির (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের) লেখা দুটো সংগীত দুটো দেশের জাতীয় সংগীত হল। ভারতের জাতীয় সংগীত হল—'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা' এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হল—'আমার সোনার-বাংলা—আমি তোমায় ভালবাসি', অথচ ধর্মান্ধ সংকীর্ণমনা পাক শাসকেরা এক কালে বাংলাদেশে রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সেই রবীন্দ্র সঙ্গীতই জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেল। বাংলা দেশ যে ধর্মান্ধ নয় এর দ্বারা তার পরিচয় মেলে। ভারত ও বাংলা দেশের সম্পর্কের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সেতুবন্ধ হলেন রবীন্দ্রনাথ—'একথা বলেছিলেন বাংলাদের শিক্ষা-মন্ত্রী। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যিনি গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সহাবস্থান ও ধর্মনিরপেক্ষতার একান্ত পূজারিনী তিনি মুজিবের মুক্তির জন্য ও বিশ্ববিবেক জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের অনেক দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর বীর জোয়ানরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রেমী মুক্তি যোদ্ধাদের মিত্রশক্তি হিসেবে সহায়তা করে বাংলা দেশের লোকদের স্বাধীনতা পেতে সাহায্য করেছেন। তাই বঙ্গবন্ধু পাক কারাগারে এক নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে ভারতে এসে প্রথমেই বলেছিলেন—"ভারতের প্রধানমন্ত্রী শুধু তাঁর দেশেরই নেত্রী নন, তিনি সমগ্র মানবজাতির নেত্রী। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আমার মুক্তির জন্য, আমাকে বাঁচাবার জন্য যা করলেন তার তুলনা নেই"। বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত যে সাহায্য করেছে তার জন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর দেশের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে অত্যন্ত উদার মানবতার পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতার ময়দানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি বলেছেন—ভারত আমার দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে বিপদের সময়ে আশ্রয় দিয়েছে। সেজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেছিলেন—তিনি রিক্তহস্ত, শুধু ভালবাসা ছাড়া তাঁর দেওয়ার মতো কিছুই নেই।

বিংশ শতকের প্রথম দিকের শহীদ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, বিনয়, বাদল, দীনেশ, আসফাক উল্লা, সূর্য সেন, যতীন দাস, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, মাতঙ্গিনী হাজরা, ভগৎ সিং, আব্দুল করিম প্রমুখ আরও অনেকে মনে করিয়ে দেন বিংশ শতকের শেষভাগের বাংলাদেশের শহীদ আজিজ, অশোক, রমজান, রণি রহমান, রোশেনরা, কুলসুম, রহিম প্রমুখ অনেকের কথা। প্রথম দল ভারত মাতাকে ইংরেজ শাসকদের ঔপনিবেশিক শোষণ হতে মুক্ত করার জন্য প্রাণবলি দিয়ে আর দ্বিতীয় দল ধর্মান্ধ পাক শাসকের ঔপনিবেশিক শোষণের হাত হতে বাংলামাকে রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করে স্বর্ণাক্ষরে নিজেদের নাম লিখে গেলেন ইতিহাসের পাতায়। সে এক অপূর্ব মিলনের নিদর্শন।

বাংলা মাতা যেমন জন্ম দিয়েছেন—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখকে, তেমন জন্ম দিয়েছেন—বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখকেও।

ভারতের মতো বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো চারিটি স্তম্ভ অর্থাৎ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ও ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। এ বিষয়ে ভারতের সঙ্গে নবজাতক বাংলাদেশের এক অপূর্ব রাজনৈতিক মিলন ঘটল।

॥ ১১ ॥

"সর্বধর্ম সম্ভব"—এই প্রাচীন হিন্দু মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে। সম্রাট অশোক হতে আরম্ভ করে মহামতি আকবর পর্যন্ত অনেকেই সকলধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখার মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এছাড়া অনেক ভারতীয় সাধকও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানব জাতির কল্যাণের নিমিত্ত নিজেদের মতবাদ প্রচার করেছেন। পরাধীন ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঘৃণা সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দ্বিজাতিতত্ত্বকে ভারত ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করার প্রয়াস করেছে

এবং নানান জটিলতা ও বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতবিভাগের পর খণ্ডিতভারত তার সেই অখণ্ডিত সময়কার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সার কথা হল—সকল ধর্মীয় লোকদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করা এবং তাদের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি চর্চা ও ধর্মালোচনার পূর্ণ অধিকার দেওয়া। ভারত প্রাচীন কাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তার ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সুমহান ঐতিহ্যকে এতটুকুও ম্লান হতে দেয়নি।

বর্তমান কালে ভারতের সংবিধানের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে তার ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা। ভারতের গণতন্ত্র জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে দিয়েছে সমান অধিকার ভোগের সুযোগ। ভারতীয় সংবিধানের চোখে কোনো জাতি বা ধর্মই কোনো অংশে ছোট নয়। এখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় সকল সুবিধে সমান ভাবে ভোগ করতে পারেন। ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনীতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর সম্প্রদায়ের অবদানও কম নয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টানগণ জাতিগঠনের কাজে সমান ভাবে আগ্রহশীল।

ভারতের বৈদেশিক দূত ও বিভিন্ন উচ্চ সরকারী পদে অনেক মুসলমান নিযুক্ত আছেন। নিম্ন আয়ের মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শুধু তাই নয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এমন সব ব্যবস্থা এদেশে আছে যাতে তাঁরা কোনো প্রকারেই মনে না করেন যে, সংখ্যাগুরুদের চেয়ে তাঁরা কোনো অধিকার ও সুযোগ-সুবিধে কম ভোগ করছেন। এটাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও আছেন বহু জ্ঞানী ও গুণী মুসলমান ভারত সন্তান। এবং লোকসভায় ও বিধানসভায় বহু মুসলমান সদস্য আছেন।

মোটের ওপর ভারতীয় সংবিধান জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমমর্যাদা ও সর্ব বিষয়ে সমসুযোগ ভোগের স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় স্থান রক্ষার নিমিত্ত ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা রক্ষা করার পূর্ণ দায়িত্ব সংখ্যাগুরু হিন্দুদের যারা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ এবং তাদের পরেই মুসলমানদের যারা সমগ্র জন সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ।

ভারতীয় সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। এতে ভারতীয় নাগরিকদের জাতি, ধর্ম, নারী, পুরুষ এবং জন্মস্থান নির্বিশেষে চাকরিতে সমান অধিকার, বাক স্বাধীনতা, পেশায় ও ধর্ম প্রচারে ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বতোভাবে স্বীকৃত। এবং সর্বোপরি সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম প্রচার, শিক্ষা গ্রহণ ও ইচ্ছেমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের স্বাধীনতা এই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে সর্বপ্রকারে গ্রাহ্য হয়েছে। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, আলিগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, বহু মাদ্রাসা, খ্রীষ্টান মিশনারীর শিক্ষা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠান এবং মুসলীম লীগের মতো ধর্ম নির্দেশক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হিন্দু মহাসভার মতো ধর্ম নির্দেশক রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি অবস্থান ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধানের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত যেমন হিন্দু ধর্মপ্রচারক, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও অন্যান্য মহামানবদের জন্য গর্বিত তেমন গর্বিত ওই শ্রেণীর মুসলমান ও খ্রীষ্টান মনীষিদের জন্য।

এখানে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আরবী, ফারসী সমান আসনে অধিষ্ঠিত। এবং প্রত্যেক ভাষার পণ্ডিতগণই তাঁদের বিশেষ পাণ্ডিত্যের জন্য সমানভাবে জাতীয় সম্মানে পুরস্কৃত। তাই আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী ও কাজী সাজ্জাত হোসেন আরবী ও ফারসী ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, রাজনীতি, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, সমরবিদ্যা প্রভৃতিতে বহু শিখ, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টানকে নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ সম্মান যেমন—ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, সাহিত্য একাদেমী পুরস্কার ও পরম বীরচক্র প্রভৃতি প্রদান করা হয়েছে। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের বাদ দিয়ে ভারতের মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ ও পার্শী সম্প্রদায়ের কয়েকজন কৃতী সন্তানের কথা উল্লেখ করা যাক। যাঁদের জন্য ভারত সত্যই বিশেষভাবে গর্বিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক ডঃ জাকির হোসেন, ফকরুদ্দীন আলি আমেদ ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে ও বিচারক হেদায়তুল্লা ভারতের প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

ডঃ জাকির হোসেন শ্রেষ্ঠ সম্মান ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। প্রখ্যাত হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম ও কিরপাল সিং পেয়েছেন উচ্চ আর্থিকমানের ভারতীয় পদ্মবিভূষন উপাধি। পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন বিখ্যাত

যন্ত্রশিল্পী ও সানাই বাদক বিসমিল্লা খান ও সরোদ বাদক আলি আকবর খান। বিলায়েত খান, বেগম আখতার ও দগ্‌গার ভাইগণের নাম আজ ঘরে ঘরে সসম্মানে পরিচিত। মোটের ওপর বাদ্যশিল্প জগতে ভারতীয় মুসলমানগণ উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। ভারতের গৌরব বড়ে গোলাম আলি খান বাদ্যযন্ত্রবাদক হিসেবে আজ বিশ্ববিশ্রুত ও সুরকার জোসেফ হেরলড সামরিক সংগীত রচনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। চিত্র জগতের বিশেষ আকর্ষণ—মুসলমান চিত্র তারকা দিলীপ কুমার, ওয়াহিদা রহমান, মীনাকুমারী, সায়রাবানু ও নার্গিশের নাম সর্বজন বিদিত। আলি সর্দার জাফরি একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। এছাড়া, সঙ্গীত জগতে বিখ্যাত গায়ক তালাত মাহমুদ ও মহম্মদ রফি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের নাদেশ্বরম বাদক শেখ চিন্না মৌলানা সাহেবও অতিশয় জনপ্রিয়। শিল্প জগতে ভারতের মুসলমান কৃতী সন্তান এম, এফ, হুসেন আজ তাঁর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের জন্য বিশ্বজন বিশ্রুত। সাহিত্য জগতে কোয়ারাতুল আইন হায়দর সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক পুরস্কৃত।

ভারতীয় সামরিকক্ষেত্রে সংখ্যালঘু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কিলার ভাইগণ এবং শিখ সম্প্রদায়ের যশবীর সিংএর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান পরমবীরচক্র এগারো বারের মধ্যে পাঁচ বারই দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের। কোম্পানী কোয়াটার মাষ্টার হাবিলদার আবদুল মজিত ও পার্শী লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারাপুর মরণোত্তর বীরচক্রে সম্মানিত হয়েছেন—পাকভারত যুদ্ধে তাঁরা জন্মভূমি ভারতভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন তারই সম্মানস্বরূপ। শিখ সম্প্রদায়ের অর্জুন সিং ও পার্শী ইঞ্জিনীয়ার যথাক্রমে এয়ার চিফ মার্সাল ও এয়ার মার্শাল, পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। হকি খেলোয়াড়দের মধ্যে পৃথ্বিপাল সিং, গুরুবক্স সিং ও জে. পিটার, ফুটবল খেলোয়াড় ইউসুফ খান এবং ক্রিকেট খেলোয়াড় পাতাউদীর নবাব এবং আরও অনেক মুসলমান খেলোয়াড়দের জন্য ভারত বিশেষভাবে গর্বিত।

বিজ্ঞান ও আনবিক শক্তির ক্ষেত্রেও ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবদান কম নয়। এক্ষেত্রে আনবিক বৈজ্ঞানিক ডঃ হোমি ভাবা, সৈয়দ ফারিদুদ্দীন ও ভারতীয় কৃষিগবেষণা সংস্থার বেঞ্জামিন পেয়ারী পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ

যোগ্য। এছাড়া ব্যবসার ক্ষেত্রে পার্শী টাটা, জৈন, ইসমাইলিস, খোজা এবং পশ্চিম তীরের বোহ্‌রা এবং দক্ষিণের খ্রীষ্টান নাদারদের নামও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

বিশ্ব সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ভারতের গৌরব যাঁরা বৃদ্ধি করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। এক্ষেত্রে পার্শী সম্প্রদায়ের মেহের মিস্ত্রি, পার্শী খাম্বাট্টা ও যশমিন দর্জি, মুসলমান সম্প্রদায়ের লক্ষ্ণৌর নাযারা মীর্জা, হাবদারাবাদের অঞ্জুমান মমতাজবেগ এবং গোয়ার ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের রিতা ফরিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

আলিগড়ের মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় যা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয় সেখানে সংস্কৃত ও পালি শেখানো হয়। অনুরূপভাবে বর্তমানে হিন্দু স্কুল এবং বেথুন স্কুল ও কলেজে খ্রীষ্টান মুসলমান ও হিন্দুদের একই সঙ্গে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুল-কলেজেও মুসলমান ছাত্রদের পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মোটের ওপর এটা খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান, খেলাধুলা, শিল্প, সঙ্গীতকলা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে যেতে ও সমান মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে যাতে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য যদি দরকার হয় তবে তাঁদের কিছু কিছু বেশি সুবিধে দিতে হবে। কারণ তাঁরা যদি সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকে তবে তা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর না হয়ে বরং অকল্যাণকরই হবে। যাহোক ভারতের সংবিধান কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই যুক্তির পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতিই তার উজ্জ্বল ও বাস্তব দৃষ্টান্ত।

ভারত যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে গর্বিত তাঁর কৃতী হিন্দু মুসলমান সন্তানদের জন্য অনুরূপভাবে গর্বিত ভারতীয় কৃতী খ্রীষ্টান সন্তানদের জন্য। স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের বহু প্রদেশের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্য ও বিধানসভার সদস্য ও বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নিযুক্ত ছিলেন ও আছেন। ভারতের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি, উচ্চ প্রশাসক ও

প্রতিরক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে অনেক ভারতীয় খ্রীষ্টানকে নিয়োগ করা হয়েছে। নাগাভূমির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পি. শিলো আউ. ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এম. থোমাস, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান ভায়লেট আলভা, লোকসভার সদস্য ফ্রাঙ্ক এ্যান্থনী, প্রাক্তন এয়ার মার্শাল. ডব্লু. পিণ্টো, বিগ্রেডিয়ার আর, এস্, নরোণহাব, প্রাক্তন বিচারপতি বিভিয়ান বোস, কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামুয়েল মাথাই, ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জন মাথাই, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, এস, কে, রুদ্র, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি, কেন্দ্রীয় প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রমুখ সকলেই সংখ্যালঘু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। এছাড়া রাজনীতি, দর্শন, কাব্যক্ষেত্রেও অনেক প্রখ্যাত ভারতীয় খ্রীষ্টান ভারতের বিশেষ গৌরবের বস্তু। ভারতের প্রথম মহিলা বিচারপতি কেরালার একটি খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পানিনি প্রদ্যোতম-এর লেখক এবং একাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত পণ্ডিত এল, সি, চাকো ছিলেন ভারতীয় খ্রীষ্টান। শুধু তা-ই নয়, ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগী যোশেফ মুণ্ডেশরী, ডঃ শ্রীমতী পুন্নান পোকাস, অধ্যাপক পুথন কাবিল এবং মাথু ভার্জিস প্রমুখ ভারতীয় খ্রীষ্টানগণের সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য অনেকেই বিশেষ গর্বিত। বাংলার বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদনও ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী।

এছাড়া ভারতের বহু জায়গায় খ্রীষ্টান গীর্জাগুলি, মন্দির ও মসজিদের চেয়ে কম মনোরম নয়। খ্রীষ্টান স্কুলগুলোও বহু নগর ও শহরের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। এসকল দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, ভারত তার ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবধারার শুধুই পুঁথিগত স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি, এই ভাবধারা বিস্তারিত করেছে তার বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে যা শুধু ভারতীয়দের কেন সমগ্র বিশ্ববাসীদের কাছেই অনুসরণযোগ্য। এবং এসকল দৃষ্টান্তই ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের ফলশ্রুতি।

॥ ১২ ॥

একথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে—একমাত্র ধর্মই কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদকে জিইয়ে রাখে না এবং এই বিভেদের মূল কারণ নয়। অর্থনৈতিক সামাজিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধে যখন একটি সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি ভোগ করেন তখনই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মের

নামে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জেগে ওঠে। এবং এক সম্প্রদায়ের লোকেরা অপর সম্প্রদায়ের লোকদের অবিশ্বাসের চোখে দেখতে শুরু করেন ফলে এঁরা ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিতে নিজেদের শক্তিশালী করে তুলতে চান। তখনই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হবে—সকল সম্প্রদায়ের সকল লোক যাতে ধর্মের সঙ্গে আর্থিক, সামাজিক ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধে ভোগ করতে পারেন সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান যে ধর্মই হোক না কেন, কোনো ধর্মের নামে কোনো রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংঘ না থাকাই কি ভাল নয়? কারণ-উদ্দেশ্য মহৎ হলেও অনেক সময় জনসাধারণের মধ্যে নিরপেক্ষ মত গড়ে ওঠার পথে ওগুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে মুসলীম লীগ ও জামাত-ই-ইসলামের মতো ধর্মনির্দেশক রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ভারত ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এখানে ধর্মনির্দেশক রাজনৈতিক দল এবং সংস্থা যেমন মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, জামাত-ই-ইসলাম, হিন্দু স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলীম মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বিদ্যমান। অবশ্য এ বিষয়ে ভারতের চিন্তাধারা হল—যেহেতু ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সুতরাং সকল ধর্মের রাজনৈতিক দল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অবস্থানের দ্বারা প্রতি ধর্মের লোকই যে এখানে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবেন তাই প্রমাণিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে যেহেতু ভারত পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেহেতু ভারতের জনগণই ঠিক করবে যে, ধর্মনির্দেশক দল বা সংস্থা থাকবে কি না।

ভারতীয়দের মনে রাখতে হবে—সাম্প্রদায়িকতা একটি সামাজিক ব্যাধি। কাজেই সমাজকে এ ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয়দের শপথ গ্রহণ করে কবি নজরুলের কথায় বলতে হবে—

"হিন্দু না ওরা মুসলিম? ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।"

আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে ভারতজনদের একমাত্র পরিচয় হবে—তাঁরা ভারতবাসী, ভারতমায়ের সন্তান এবং জীবনধারণের জন্য সকলেই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধে সমানভাবে ভোগ করার অধিকারী।

পরিশিষ্ট (ক)

॥ ভারতীয়দের নৃতাত্বিক সম্পর্ক ॥

নৃতাত্বিক পণ্ডিতগণ ভারতবাসীকে যে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল, এবং যে যে দেশের লোকদের সঙ্গে এই শ্রেণীভুক্ত লোকদের মিল আছে তাদের বিষয়ও উল্লেখ করা হল, যেমন—(১) নিগ্রিটো জাতি—এদের গায়ের রং কালো, নাক চেপটা চুল কোঁকড়ানো, মাথা লম্বা থেকে চওড়া, ঠোট পুরু, শরীরের গঠন বেঁটে। অবশ্য নৃতাত্বিক ডঃ বি,এস গুহের মতে এরা ভারতের সবচেয়ে আদি অধিবাসী। এবং কাদার, ইরুল, পুনীয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ও রাজমহল পাহাড়ের আদি-বাসীদের মধ্যে নেগ্রিটো দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই জাতীয় লোকেরা ভারতবর্ষ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। তবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই শ্রেণীর লোক এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এদের দৈহিক গড়নের সঙ্গে মিল আছে তাহলে—নিউগিনি, মেলানেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়ার কিছু অংশ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জের মধ্যে—দক্ষিণ পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি, মালয় উপদ্বীপের মধ্যাংশ, পূর্ব সুমাত্রা, ফিলিপাইন প্রভৃতি এবং আফ্রিকার অনেকাংশের লোকের সঙ্গে।

(২) প্রটো অষ্ট্রালয়েড জাতি। এরা ভারতের দ্বিতীয় আদিবাসী। এদের গায়ের রং কালো, তামাটে বা পিঙগল অর্থাৎ প্রায় কালো, নাক চেপটা, দৈহিক গড়ন—বেঁটে থেকে মাঝারি এবং চুল ঢেউ তোলা অথবা কোঁকড়ানো। সাধারণতঃ লম্বা মাথা। এদের দৈহিক আকৃতি অনেকটা অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের মতো। সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, ভীল, ভেন্দা. ওরাঁও, কুর্ম্, বাদাগাম, চেঞ্চু প্রভৃতি এদের বংশধর। সিংহল, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এই শ্রেণীর লোক বসবাস করে। মোটের ওপর ভারতের দাক্ষিণাত্যের অরণ্য অঞ্চল, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে ছোটনাগপুরের আদিবাসী এবং সিংহল, মালয় উপদ্বীপ, পূর্বসুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য দেখতে

পাওয়া যায়। সম্প্রতি হেভেশি ভিলমোশ বা উইলিয়াম হেভেসি নামে এক জন হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত ভারতীয় কোলদের সঙ্গে রুশ, সাইবেরিয়া ও উত্তর ইউরোপের আদিমবাসী ফিন্নো উগ্রীয় জাতির সঙ্গে মিল আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

(৩) মঙ্গোলীয় জাতি—এদের শরীরের গঠন বেশ শক্ত, নাক মাঝারি থেকে চেপ্টা, ললাট প্রশস্ত, চুল খাড়া, দেহে স্বল্পলোম, গায়ের রং তামাটে, দেহের গড়ন বেঁটে থেকে মাঝারি, চোখ ছোট ও চোখের পাতা দিয়ে প্রায় ঢাকা, হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে, নেপালে, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এই শ্রেণীর লোকদের বসবাস করতে দেখা যায়। গুর্খা, ভুটিয়া, নাগা, মণিপুরী, কুকী ও খাসিয়াগণ মঙ্গোলীয় জাতির লোক। এদের সঙ্গে যে সকল দেশের লোকদের মিল আছে তা হল—তিব্বত, ইন্দোচীন, চীন, ফরমোসা, মালয়, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব রাশিয়া, মঙ্গোল, জাপান, কোরিয়া, পূর্ব সাইবেরিয়া, মাদাগাস্কার, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশীয়া, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি।

(৪) দ্রাবিড় জাতি—গায়ের রং কালো, মাথার চুল সাধারণতঃ ঢেউতোলা, আবার কিছু কিছু কোঁকড়ানো, নাক চেপটা, দেহের গড়ন—বেঁটে থেকে মাঝারি। মাথা লম্বা। ভারতের দক্ষিণাংশে প্রধানতঃ দ্রাবিড় জাতির বাস। এরা তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালয়লাম প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। সিংহল হতে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত বিশেষ করে মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, মালাবার উপকূলে, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দ্রাবিড় জাতির লোকদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কোনো কোনো মানব গোষ্ঠীর মিল পরিলক্ষিত হয়। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বেলুচিস্থানের লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করেন তার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষাগুলির কিছু মিল আছে। একারণে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন - দ্রাবিড়গণ বেলুচিস্থানের পথে ভারতে এসেছিলেন।

(৫) আর্যজাতি—এরা গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট। আর্যরা যে ভাষায় কথা বলত তা থেকেই পরবর্তীকালে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং তারপরে বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার জন্ম হয়েছে। আর্যদের ভাষার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসী, ইটালি ও ইংরেজি প্রভৃতি ভাষাগুলির মিল আছে। এদের চেহারার সঙ্গে মিল আছে—ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, ইরাক, ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে।

এছাড়াও আছে—(ক) টারকো-ইরানীয়ান গোষ্ঠী—যাদের চওড়া মাথা, সরু থেকে মাঝারি নাক, ফর্সা রং, গালপাট্টা দাড়ি। এরা হল—বালুচি, ব্রাহুই ও আফগান প্রভৃতি (খ) ইন্দো-এরিয়ান—এদের লম্বামাথা, সরু থেকে মাঝারি নাক, ফর্সা রং গালপাট্টা দাড়ি। এরা হল—পাঞ্জাবী, রাজপুত, জাঠ এবং কাশ্মীর উপত্যকার ক্ষত্রীগণ।

(গ) স্কীথো-দ্রাভিডিয়ান—এদের ফর্সা রং, মাঝারি থেকে চওড়া মাথা, মাঝারি নাক, মুখে স্বল্প লোম বিশিষ্ট মারাঠা ব্রাহ্মণ, পশ্চিম ভারতের কুর্গগণ। এরা গুজরাট হতে কুর্গের মধ্যে বিস্তৃত।

(ঘ) এরিও দ্রাভিডিয়ান অথবা হিন্দুস্থানী—এদের মাথা লম্বা থেকে চওড়া, নাক চেপটা বা মাঝারি ধরণের, হালকা তামাটে থেকে কালো রং। যুক্ত প্রদেশ, রাজপুতনা ও বিহারে এই শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায়।

(ঙ) মঙ্গোলো-দ্রাভিডিয়ান অথবা বাঙালী ধরণ—এদের রং কালো, প্রচুর দাড়ি, মাথা চওড়া থেকে মাঝারি, নাক সরু থেকে চেপটা। এই ধরণের লোক পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও ওড়িশায় দেখতে পাওয়া যায়।

নৃতাত্ত্বিক ডঃ বি. এস. গুহের মতে এ সকল শ্রেণীর লোকছাড়াও ভারতীয়দের মধ্যে আছে (১) ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর লোক—যাদের মাথা লম্বা, সরু থেকে লম্বা চেহারা, দেহের রং ক্যালো থেকে বাদামি। এদের কারও দেহে ও মুখে প্রচুর লোম, কারও বা কম। ভূমধ্যসাগরের উপত্যকাভূমি ছাড়া ও উত্তরে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে সাহারা, ভারত, আরব, আফগানিস্থান এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোকদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের নিদর্শন রয়েছে।

ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেই আবার আছে (ক) আলপিনয়েড—যাদের মাথা চওড়া, গোল মুখ, উন্নত নাসিকা, মাঝারি গড়ন, শ্যামবর্ণ, মুখে ও দেহে প্রচুর লোম (খ) ডিনারিক—যাদের চওড়া মাথা, উন্নত নাসিকা, লম্বা মুখ, উচ্চ গড়ন ও দেহের রং সামান্য কালো (গ) আরমেনয়েড—এরা চওড়া মাথা, সরু নাক, ফর্সা রং, বেঁটে থেকে মাঝারি উচ্চতাবিশিষ্ট শ্রেণীর লোক। আরও আছে নরডিক শ্রেণীর লোক—যাদের মাথা লম্বা, উন্নত নাসিকা, লম্বা মুখ, রং লালচে সাদা, দেহ মাঝারি থেকে লম্বা। এরা সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়ার স্তেপ অঞ্চল, তুরস্ক ও তার পশ্চিমাংশ হতে উত্তর পশ্চিম পথ দিয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে বসতি আরম্ভ করে।

বিশ্বমানব গোষ্ঠীর অর্ধাংশ মঙ্গোলয়েড, এক তৃতীয়াংশ ককেশয়েড ও এক দশমাংশ নিগ্রোয়েড শ্রেণীর লোক। আর বাকি জনসাধারণ হল মিশ্রশ্রেণীর লোক। ককেশয়েড বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাওয়া যায় প্রধানতঃ ইউরোপীয় ও তাদের বংশধরগণের মধ্যে। মঙ্গোলয়েড শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায় এশিয়া ও ইন্দোনেশীয়ায়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার লোকদের মধ্যেও এই শ্রেণীর লোকদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আফ্রিকা, মেলানেশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র হতে যারা ক্রীতদাস হিসেবে এসেছিল তাদের মধ্যে নিগ্রোয়েড বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। ককেশয়েড, মঙ্গোলয়েড ও নিগ্রোয়েড শ্রেণীর লোকদের দৈহিক বৈশিষ্টের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আছে প্রাচীন ককেশয়েড শ্রেণীর লোক যাদের মধ্যে আদিম মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কিছু কিছু ককেশয়েড দৈহিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে। অষ্ট্রালয়েডগণ অষ্ট্রেলিয়াকে এবং দ্রাভিডিয়ানগণ দক্ষিণ ও মধ্যভারত এবং ভেদ্দাগণ সিংহলকে (শ্রীলঙ্কা) কেন্দ্রীভূত করে বর্তমান। অষ্ট্রালয়েড, দ্রাভিডিয়ান ও ভেদ্দাগণের মধ্যে সাধারণতঃ নিগ্রোয়েড দৈহিক বৈশিষ্ট্য যেমন—চেপটা নাক ও দেহের কালো রং ইত্যাদি বর্তমান। এর দ্বারা নৃতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন—অতি প্রাচীনকালে নিগ্রোদের সঙ্গে অষ্ট্রালয়েড, দ্রাভিডিয়ান ও ভেদ্দাদের মিলন ও মিশ্রণ ঘটেছে।

পরিশিষ্ট (খ)

বিশ্বের মাতৃ-পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও বিবাহ পদ্ধতি

প্রথম অবস্থায় গ্রাম্য সভ্যতা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এতে মাতৃকুলের নিয়মে এবং মাতৃকুলের পদবী অনুসারে সন্তানদের পদবী হত। ভারতীয় সভ্যতার আদিম অবস্থায় মাতৃতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। সুমেরীয় ও ইলামীয় সংস্কৃতির আদি অবস্থায়ও এই মাতৃতন্ত্রেরই প্রচলন ছিল। সিন্ধু সংস্কৃতি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। নানা দেবী, কামাখ্যা দেবী প্রভৃতি ভারতের একান্নটি পীঠের মাতৃদেবতাগণ সিন্ধুযুগের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিদর্শন। হরপ্পার শীলমোহরে মাতৃদেবতার নিকট বলি প্রদানের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। নানীমাই সিন্ধু সভ্যতারই গ্রাম্য-সংস্কৃতির পরিচয়। ইরানী সমাজের আদিম অবস্থায়ও মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মাতৃবংশক্রমে উত্তরাধিকারী নিরূপণের যে প্রথা ইলাম ও মিশরের প্রাচীন সমাজে দেখা যায় তা সম্ভবতঃ ইরানেই প্রথম সৃষ্টি হয়। সুমেরে, ব্যাবিলোনীয়া ও ইহুদীদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।

ভারতবর্ষের বৈদিক সংস্কৃতি ছিল পিতৃতান্ত্রিক। এতে পিতৃকুলের পদবী অনুসারে সন্তানদের পদবী হত। বর্তমানেও ভারতের প্রায় সকল হিন্দু সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। তবে আদিমতম অবস্থায় বৈদিক সংস্কৃতি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এবং বৈদিক সভ্যতার পূর্বে যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল তার পরিচয় বেদেই রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক বৈদিক সমাজ আদি মাতৃতান্ত্রিক সিন্ধু সমাজেরই ক্রমবিকাশ মাত্র। হিন্দুদের পূর্বপুরুষ পূজার অনুষ্ঠানে অর্থাৎ শ্রাদ্ধে মাতৃগতকুলের প্রয়োজন হওয়াটাও মাতৃতান্ত্রিকতার লক্ষণ বলেই মনে হয়।

দেবর বিবাহ ও পাণ্ডবগণের পঞ্চপতিত্ব মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিচয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এপ্রথা অচল। অবশ্য কোনো কোনো বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সমাজে ঘরজামাই প্রথা দেখতে পাওয়া যায় যা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার লক্ষণ। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামী থাকা বা না থাকা স্ত্রীর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ভারতের নায়ারগণ মাতৃতান্ত্রিক প্রথা ও বহুস্বামী গ্রহণে বিশ্বাসী।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সঙ্গে ছোট ভাইদের ও ভগ্নীপতির সঙ্গে শ্যালিকাদের

অবাধ ঠাট্টা-রহস্য করার প্রথা থেকে মনে হয়—বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে আদিম দলগত বিবাহ বা এক স্ত্রীর বহু স্বামীত্ব প্রথা লুক্কায়িত আছে। বড় বোনের সঙ্গে বিবাহের পর ছোট বোনদের সঙ্গে বিবাহের দৃষ্টান্ত যে হিন্দু সমাজে নেই তা নয়। ওড়িশায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের প্রচলন আছে। দ্বিবর অর্থাৎ দ্বিতীয় বর থেকেই দেবর শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীনকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে ভগ্নী বিবাহ প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যেও ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের কাহিনী আছে। আধুনিক কালে মুসলমান সমাজেও জেঠতুতো ও খুড়তুতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ প্রথা দেখতে পাওয়া যায়।

বিবাহ সভ্য মানব গোষ্ঠীর সমাজ বন্ধনের একটি প্রধান সূত্র। এবিষয়ে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটা অসাধারণ মিল পরিলক্ষিত হয়।

একজন পুরুষের সঙ্গে কেবল একজন স্ত্রীলোকের বিয়ে হলে তাকে বলা হয় একবিবাহ। এ ব্যবস্থা খ্রীষ্টান ও হিন্দু সমাজে প্রচলিত। এই বিবাহ ব্যবস্থা আন্দামানী, মুণ্ডা, ওরাঁও, সাঁওতাল, গারো প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায়। সিংহলের ভেদ্দা, ফিলিপাইনের নেগ্রিটো এবং আফ্রিকার কতিপয় পিগমীও এক বিবাহে বিশ্বাসী।

একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক মহিলার বিবাহকে বলা হয় বহুবিবাহ প্রথা। আফ্রিকায় এধরণের বিবাহ সবচেয়ে বেশি হত। জানা গেছে—রাজা বেনিনের ছশত স্ত্রী ও উগাণ্ডার রাজা টেসার সাত হাজার স্ত্রী ছিলেন। ভারতেও পুরাকালে রাজা মহারাজাদের বহু পত্নী থাকতেন। রামায়ণে রাজা দশরথের তিন স্ত্রী থাকাই বহুপত্নীমূলক বিবাহের দৃষ্টান্ত।

ভারতের সর্বত্র এককালে এই বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণ ও বুনা, কোম ও ভাইফী কুকীদের মধ্যে এধরণের বিবাহ প্রচলিত ছিল। এখন ভারতে আইনের দ্বারা বহুবিবাহ বন্ধ করে দেওয়া হলেও ভারতীয় মুসলমানগণ এ আইনের আওতায় পড়েননি, ফলে তাঁরা বহু বিবাহ করতে পারেন। আসামে নাগা উপজাতি সমাজেও বহুপত্নীমূলক বিবাহ প্রথা দেখা যায়। এককালে কৃষিজীবী সমাজে এ ধরণের বিবাহ বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিল। এছাড়া নারীর তুলনায় বিবাহযোগ্য পুরুষের অভাবই না কি এই ধরণের বিবাহের প্রধান কারণ।

একজন স্ত্রীলোকের একাধিক পুরুষকে বিবাহ করাকে বলা হয় বহুপতি-মূলক বিবাহ। এ বিবাহ দু ধরণের, যেমন—পতিরা যখন পরস্পর ভাই হয় তখন তাকে বলা হয় স্বভ্রাতৃমূলক বিবাহ এবং পরস্পর ভাই না হলে বলা হয় অভ্রাতৃমূলক বিবাহ। মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী বহুপতিমূলক বিবাহের দৃষ্টান্ত। বহুপতিমূলক বিবাহ নায়ার, টোডা ও খাসা উপজাতি এবং তিব্বতীদের সমাজে ও লাদাক অঞ্চলের অনেক অধিবাসীর মধ্যে দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ান ও এসকিমোদের মধ্যে এধরণের বিবাহ হয়। এছাড়া অষ্ট্রেলিয়ার খাদ্য সংগ্রহকারী আদিবাসী সমাজে এধরণের বিবাহ প্রচলিত আছে। শিকারে যাবার সময় বাড়ীতে স্ত্রীকে একা রেখে যাওয়ায় অসুবিধার জন্য এরা অন্য স্বামীর সাহায্য অনুমোদন করে থাকে বলে এদের সমাজে বহুপতি-মূলক বিবাহ প্রচলিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের অভাব ও অতিরিক্ত কনেপণই নাকি এধরণের বিবাহের প্রধান কারণ।

দুভাইয়ের এবং দুবোনের পুত্রকন্যাদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহকে জ্ঞাতিবিবাহ বলা হয়। এ ধরণের বিবাহ টোডা, আসামের মিকির, ভাইফী কুকী, বীরহোর, সিংহলের ভেদ্দা, হটেনটট এবং আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের অনেক অধিবাসীর মধ্যে প্রচলিত আছে। মাতুল কন্যা ও পিসীমার কন্যাকে বিবাহের ধারা দক্ষিণ ভারতের অনেক হিন্দুর মধ্যেও প্রচলিত আছে। অন্ধ্রপ্রদেশের কোমতি ও কুরুব জাতির মধ্যে মাসতুতো বোনের সঙ্গে বিবাহ হয়। কর্ণাটক দেশের দশস্থ ব্রাহ্মণরাও মামাতো বোনকে বিয়ে করেন। মুসলমানদের মধ্যে জেঠতুতো ও খুড়তুতো ভাইবোনের মধ্যে যে বিবাহ হয় তাও জ্ঞাতিবিবাহ দৃষ্টান্ত।

মৃত স্বামীর ভাইয়ের সঙ্গে যে বিয়ে হয় তাকে দেবরবরণ বলে। এটা ছিল হিব্রু প্রথা। ছোট ভায়ের সঙ্গে এরূপ বিয়ে হলে তাকে কণিষ্ঠ দেবরবরণ বলে। ভারতের বহু উপজাতি যেমন লোধা ও সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে এরূপ বিবাহের প্রচলন আছে। এরূপ বিবাহ যদি মৃত স্বামীর বড় ভাইয়ের সঙ্গে হয় তবে তাকে জ্যেষ্ঠ দেবরবরণ বলা হয়। আসামের কুকী, ওড়িশার ভূমিজা, সেরাই কেলার হো, বঙ্গদেশের বুনা, কিরগীজ, পানিয়ান, পরায়ণ এবং সাইবেরিয়ার চুকচি প্রভৃতিদের মধ্যে এধরণের বিবাহের ব্যবস্থা চালু আছে।

স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করাকে বলা হয় শালীবরণ। এরূপ বিবাহ আন্দামানীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। বড় বোনকে বিয়ে করলে ছোট বোনেরাও স্ত্রীরূপে

পরিগণিত হওয়ার বিশেষ নিয়ম উত্তর আমেরিকার রক্চাইল্ডেদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে স্ত্রী মরে গেলে উপযুক্ত ছোটবোনকে বিয়ে করার এমনকি স্ত্রী জীবিত থাকতেও ছোট বোনকে বিয়ে করার দৃষ্টান্ত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেও যে দেখা যায় না তা নয়, অবশ্য হিন্দুদের মধ্যে একবিবাহ অনুসারে স্ত্রী জীবিত থাকতে তার বোনকে বিয়ে করা আইন সিদ্ধ নয়।

বিবাহ সম্পর্কীয় উক্ত প্রথাগুলি ছাড়া আরও অনেক প্রকার বিবাহ প্রথায়ও বহু জাতির মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। যেমন—রাক্ষস বিবাহ—পণপ্রথায় বিবাহ—বিনিময়ে বিবাহ—শ্রম বিনিময়ে বিবাহ—প্রজাপত্য বিবাহ—গান্ধর্ব বিবাহ—অনাহুত বিবাহ—শক্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বিবাহ—সম্পত্তির লোভে বিবাহ—অসুর বিবাহ - পৈশাচ বিবাহ এবং দলবদ্ধ বিবাহ।

রাক্ষস প্রথায় বিবাহ—কনে এবং তার অভিভাবকের মতের বিরুদ্ধে জোর করে বিবাহ করাকে রাক্ষস প্রথায় বিবাহ বলে। বিশ্বের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল। অতীতে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এধরণের বিবাহ চালু ছিল। মহাভারত থেকে জানা যায়—অর্জুন জোর করে সুভদ্রাকে বিয়ে করেছিলেন। বর্তমানে ভীল ও গণ্ড উপজাতির লোকেরাও বাঞ্ছিত নারীকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। সাঁওতাল যুবকেরা তাদের মনমতো পাত্রীকে জোর করে কপালে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে বিয়ে করে। কারণ এদের সমাজে সিঁদুর মাখানোর পরই পাত্রী পাত্রের স্ত্রী বলে গণ্য হয়। টেরাডেল ফিউগোতে ইয়গান ও ওনা, সাইবেরিয়ার চুক্চি, ওড়িশার ভুঁইয়া এবং বঙ্গদেশের হোদের মধ্যে যুবতীকে জোর করে ধরে নিয়ে বিয়ে করার পদ্ধতি প্রচলিত।

পণপ্রথায় বিবাহ—এ প্রথায় সাধারণতঃ কনের অভিভাবককে বরের অভিভাবককে পণ বা টাকা দিতে হয়। ভারত সরকার এই বরপণের মতো একটি কুপ্রথাকে বন্ধ করার প্রচেষ্টা করছেন।

পৈশাচ বিবাহ - যে ক্ষেত্রে মেয়েকে অজ্ঞান বা অচৈতন্য অবস্থায় হরণ করে এনে প্রবঞ্চনা অথবা ছলনার দ্বারা বিবাহ করা হয় তাকে বলা হয় পৈশাচ বিবাহ। এধরণের বিবাহ উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায়।

বিনিময়ে বিবাহ—এই বিবাহ কনেপণের মাধ্যমে বিবাহ পদ্ধতির রূপান্তরিত রূপ। এতে ছেলের বিয়ের জন্য কন্যাপক্ষকে পণ বা টাকা না দিয়ে

বরপক্ষ থেকে বিবাহযোগ্য কোনো কন্যাকে কনে পক্ষেরবিবাহযোগ্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কনেপণ পূরণ করে দেওয়া হয়। আলমোড়ার ভাটিয়া ও মধ্যভারতের ৎকুরকুদের মধ্যে এই বিবাহ চালু আছে। বরপণ বেশী হওয়ায় কোনো কোনো হিন্দু পরিবারকেও এরূপ বিবাহের ব্যবস্থা করতে দেখা যায়।

শ্রম বিনিময়ে বিবাহ—এই প্রথায় বরকে ভাবী শ্বশুরালয় একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করতে হয় তার কন্যাকে স্ত্রী রূপে পাওয়ার নিমিত্ত। এই প্রথা বাংলা দেশের বুনা, ভাইফেয়ী কুকী, এসকিমো, ও জাপানের আইনু প্রভৃতিদের সমাজে প্রচলিত।

প্রজাপত্য বিবাহ—এই প্রথা অনুসারে বিবাহ হলে বরের হাতে মেয়েকে দেওয়ার সময় এই উপদেশ দেওয়া হয় যে—'তোমরা দুজনে ধর্মাচারণ কর'। এই বিবাহ শাস্ত্র মতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে এই বিবাহ প্রথাই বেশি গ্রাহ্য এবং এর একটা কৌলিন্য আছে বলে অনেক হিন্দু মনে করেন।

গান্ধর্ব বিবাহ—মহাভারতের যুগে উচ্চবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্ম ও গান্ধর্ব এই দুরকমের বিবাহই সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হত। নির্জনে আলাপের পর সেখানে স্বেচ্ছায় মালা বদল করে যে বিবাহ হয় তাকে গান্ধর্ব প্রথায় বিবাহ বলে। ক্ষত্রিয়গণ গান্ধর্ব বিবাহকেই প্রশস্ত বলে মনে করতেন। এবং মহাভারতের নায়কদের মধ্যে অনেকেই গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেছিলেন। যেমন—গঙ্গার সঙ্গে শান্তনুর, ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার, অর্জুনের সঙ্গে উলুপী ও চিত্রাঙ্গদার, দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় পরীক্ষিতের সঙ্গে সুশোভনার বিবাহ গান্ধর্ব মতেই সম্পন্ন হয়েছিল।

অনাহুত বিবাহ—অনেক সময় বিবাহ যোগ্যা কন্যা বিবাহে ইচ্ছুক কোনো যুবকের বাড়ীতে এসে জোর করে থাকে এবং ওই যুবকের সঙ্গে মেলামেশাও করে। এমনকি লঙ্কা পুড়িয়ে তার ঝাঁজালো গন্ধ নাকের কাছে ধরে নানাপ্রকার শারীরিক নির্যাতন করলেও যখন সে যায় না, তখন বরপক্ষ বাধ্য হয়ে বিবাহ দেয়। এধরণের বিবাহ কোনো কোনো উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

শক্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বিবাহ—অনেক সময় বিবাহযোগ্যা কন্যাকে উপযুক্ত

বরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কন্যার পিতা যদি বরের শক্তি পরীক্ষা করে তুষ্ট হন তবেই বিবাহ হয়ে থাকে। যেমন—জনক রাজার কন্যা সীতাকে বিবাহ করার জন্য হরধনু ভঙ্গ করে শক্তি পরীক্ষা দিয়ে তবে রামচন্দ্র সীতাকে বিয়ে করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সম্পত্তির লোভে বিবাহ—এধরণের বিবাহ বিশ্বের প্রায় সকল জাতির মধ্যেই কিছু না কিছু দেখা যায়। এতে অনেক সময় কম বয়সের বিদ্বান ও ভাল চাকুরে ছেলেও ভাবী শ্বশুরের সম্পত্তি পাওয়ার লোভে বিশেষ করে যখন তার একটি বা দুটি মেয়ে এবং প্রচুর সম্পত্তি থাক তখন বেশি বয়সের কুৎসীত ও অশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করে। এ প্রথা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। সম্পত্তির লোভে আসামের গারো জাতির লোকেরা বিধবা শাশুড়ীকে পর্যন্ত বিবাহ করে থাকে।

অসুর প্রথায় বিবাহ—এই প্রথা অনুসারে পয়সা দিয়ে মেয়ে কেনা হয় অর্থাৎ কন্যাপণ দিতে হয়। জোর করে ধরে নিয়ে বিয়ে করার পদ্ধতিই পরবর্তীকালে কনে ক্রয় করে বিবাহের পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এতে ছেলের বাবা বা অভিভাবককে মেয়ের জন্য পণ বা মূল্য দিতে হয়। একে অন্য কথায় কনে পণ প্রথায় বিবাহ বলে। ভারতের প্রায় সকল আদিবাসী সমাজে কনেপণ প্রথায় বিবাহ বহুল পরিমাণে প্রচলিত। সাঁওতাল, হো, ওরাঁও, নাগা প্রভৃতিদের মধ্যে এধরণেই বিবাহ প্রথা চালু আছে। এছাড়া হিন্দু সমাজের অনেক তফসিলী সম্প্রদায়ের যেমন বাগদী, বাউরী, নমঃশূদ্র, জেলে প্রভৃতিদের মধ্যে এরূপ কনেপণ প্রথায় বিয়ে হয়। মুসলমানদের মধ্যে বিয়েতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয় অর্থকে দেন মোহর বলা হয়। বৈদিক যুগেও কনে পণপ্রথা অর্থাৎ কনে ক্রয়ের মাধ্যমে বিবাহ হত। মহাভারত থেকে জানা যায়—রাজা পাণ্ডু মদ্রের রাজার ভগ্নীকে বিয়ের জন্য সোনা ও বহু মূল্যবান ধাতু, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি প্রদান করেছিলেন। মণিপুরে ভাইপী কুকীদের মধ্যেও বিবাহে কনেপণ প্রথার চালু আছে।

দলবদ্ধ বিবাহ—একদল লোক একদল রমণীকে বিয়ে করলে তাকে দলবদ্ধ বিবাহ বলে। এতে স্ত্রীগণে অধিকার থাকে সকলে। তিব্বত, ভুটান ও সিকিমে এ প্রথা দেখা যায়।

পরিশিষ্ট (গ)

প্রাচীন সংস্কৃতি

মনুসংহিতায় আছে—ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ হওয়ার দরুণ পৌণ্ড্র, ওড্র দ্রাবিড়, কম্বোজ (ক্যাম্বোডিয়া), যবন (আইওনিয়া), পার্শ্বয়া (পার্শ), শক (সিথিয়া), পারদ (পার্থিয়া), পহ্লব (পারস্য), চীন (ইন্দোচীন), কিরাত (হিমালয়), দরদ (দর্দিস্থান), ও খস (হিমাচল) প্রভৃতি দেশের ক্ষত্রিয়েরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ বেদাচারহীন বাহ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যদি একবার বাহ্যজাতিতে পরিণত হয় তবে তারা আর্য অথবা ম্লেচ্ছ ভাষী যাই হোক না কেন, দস্যু বলে অভিহিত হয়।

আর্যদের যে শাখা পারস্যে গিয়েছিল তারাই ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে উত্তরকুরু বা উত্তরমদ্র নামে অভিহিত হয়েছে। এদের রাজাদের মধ্যে কুরু (সাইরাস) নাম দেখতে পাওয়া যায়। তারা যে স্তোত্র রচনা করেছিল তা আবেস্তা নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বেদের মতো আবেস্তাও চারভাগে বিভক্ত।

ঋগ্বেদে (১০/১৪) যম ও মনুকে বিবস্বানের পুত্র বলা হয়েছে। কাজেই ইরাণীদের পূর্বপুরুষ যম এবং হিন্দুদের পূর্বপুরুষ মনু পরস্পর ভ্রাতা। ভারতীয় আর্যদের বৈদিক যজ্ঞের ন্যায় ইরাণীদের যজ্ঞপ্রথা ছিল। অগ্নি যজ্ঞের প্রধান সামগ্রী। এছাড়া আছে পুরোহিত। জরথুস্ত্র ধর্মের উৎপত্তি থেকেই ইরাণীদের মধ্যে পুরোহিত প্রথা চলে আসছে।

বৈদিকদের সোম যাগের সঙ্গে জরথুস্ত্র ধর্মের হওম যাগের মিল আছে। বৈদিক যজ্ঞের আহুতি পুরোডাশের সঙ্গে পার্শীদের দারুণ নামে পবিত্র রুটী ও পশুমাংস অর্পণের মিল আছে। পার্শীরা মৃতদেহ দাহ না করে পৃথক জায়গায় রেখে দেয় যাতে পাখীরা আহার করতে পারে। এ বিষয়ের সঙ্গে এখনো অনেক ভারতীয়ের মৃতদেহ সৎকারের মিল আছে। পার্শীগণের নওজোত সংস্কার ভারতীয় আর্যগণের উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে তুলনীয়। ভারতে উপনয়নের পর যেমন বালকের দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ বালক দ্বিজ হয়, সেরূপ জরথুস্ত্রীয় বালকের এই সংস্কারের সময় নওজোত (নবজাত

অর্থাৎ নবজন্ম হয়। স্মৃতি গ্রন্থে দ্বিজাতিকে যে মৌলী বন্ধনের কথা আছে তা তিনটি পাক দিয়ে ধারণ করতে হয়। অনুরূপভাবে পার্শীদেরও মৌলী বন্ধনের মতো কশতী তিনটি পাক দিয়ে ধারণ করতে হয়। এই তিনটি পাকে—সৎবাক্য, সদ্‌চিন্তা ও সৎকর্ম—ধর্মের এই তিনটি মূল কথা নিহিত।

বৈদিক সাহিত্য ও পুরাণে উল্লেখ আছে—পরশু, মেদ প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে বৈদিকদের স্থলপথেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। মৃৎপাত্রের গঠন ও খোদিত চিত্রের নমুনা থেকে এরূপ ধারণা করা হয়েছে—দাক্ষিণাত্যের চেয়ে উত্তরাপথের সংস্কৃতির সঙ্গে ওই সকল স্থানের সম্পর্ক ছিল বেশি। সুমের ও মহেঞ্জোদড়োতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু দ্রাবিড়গণ ছিলেন মাতৃতান্ত্রিক। বৈদিক যুগ, সুমের ও মহেঞ্জোদড়োর যুগের পরবর্তী কালের সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার জন্মদাতা হল মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা। সুমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু সভ্যতার শাখা এবং বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতারই ক্রমবিকাশ। মৃতপাত্রে শবের সমাধি দেওয়ার প্রথা দাক্ষিণাত্যের মতো বৈদিক সভ্যতাতেও বিদ্যমান। পণ্ডিতগণ মনে করেন—সুমেরীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতারই অঙ্গ। সুমেরীয় অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে যে ধরনের বর্ণমালা খোদিত শীলমোহর পাওয়া গেছে, সিন্ধু-সভ্যতার উপত্যকাঞ্চল খননের ফলেও ঠিক সেই একই ধরনের শীলমোহর ও খোদিত লিপি আবিষ্কার হয়েছে। এতে সুমেরীয় সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতা যে অভিন্ন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। এ ছাড়া যে জাতি সিন্ধু সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল তাদেরই একটি শাখা সুমের দেশে গিয়ে নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল।

হিকশোস্, মিটান্নি, কাসসাইট, মিদিস, পারসী প্রভৃতি বৈদিক কৃষ্টিধারী জাতি মেসোপেটিমিয়া, ব্যাবিলন, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানে বসবাস করছিলেন। এঁরা বৈদিক আর্যদের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা আবিষ্কারের পর এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন; এবং সুমের সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে পণ্ডিতগণের অনেকেরই ধারণা- সুমের সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা অভিন্ন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সুমের ও সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে যে সব জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সঙ্গে একটি বিস্ময়কর মিল রয়েছে। এ ছাড়া বৈদিক নাবিকগণ বহুকাল

ইউফ্রেটিস উপত্যকা শাসনের অধিকার পেয়েছিল এবং এই অঞ্চলে হিন্দু রাজত্বগুলি প্রচলিত রেখেছিল। মোটেরওপর অতি প্রাচীন কালে যখন সমগ্র জগৎ বিনিদ্রিত ছিল তখন একমাত্র ভারতবাসীই জাগ্রত ছিলেন। তাঁরা বিদেশে বাণিজ্য স্থাপনের মাধ্যমে সেখানে তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতেন এবং শাসন ব্যবস্থা চালু করতেন।

মিশরের অসিরিস সংস্কৃতি সিরিয়া থেকে আনা এবং মিশরের আসিরিসের সঙ্গে বৈদিক শিবের মিল আছে। আসিরিসের রূপ, কল্পনা এবং অর্চনা—যা পরবর্তীকালে গৃহীত হয়েছে তা ভারতবর্ষ হতে নেওয়া হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন। বিশ্বকোষে আছে—"শিব ও অসিরিস উভয়েরই শিরোভূষণ সর্প। আইসিস দেবী দুর্গার মতো পৃথিবীরূপা। অসিরিসও ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত। তাহার প্রিয় বৃক্ষ বিল্ববৃক্ষের মতই ত্রিপত্রিকা। অসিরিস কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মহাকাল নামক শিবমূর্তিও কৃষ্ণবর্ণ (তন্ত্রসার)। শিব যেমন সৃষ্টিশক্তির বিজ্ঞাপক—মিশরীয় পণ্ডিতগণ অসিরিস সম্বন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন। ইহাকে ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন বলা যায়।" বৈদিক ধর্মকে অনুসরণ করেই মিশরের একেশ্বরবাদ গড়ে উঠেছিল।

প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পোকক ভারতের সঙ্গে মিশরের অনেক বিষয়ে মিল দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন—প্রাচীন মিশরের বহু প্রদেশের নদনদী এবং নগরের নাম ভারতের অনেক প্রদেশ, নদনদী ও নগরের নামের সঙ্গে মিল আছে। সেখানকার শাসকদের নাম যেমন রামেশ বা রমিশীসের সঙ্গেও ভারতের নামের মিল আছে। এ ছাড়াও সমাধি-ক্রিয়ার উপকরণাদি ও ভাষার সঙ্গে ভারতের অনেক মিল আছে। কর্ণেল টড বলেছেন—মিশরের সঙ্গে ভারতবর্ষের বহু নগর ও গ্রামের নামের মিল আছে। গাম্বীয়া ও সেনীগাল নদীর মোহনায় যে সকল নগর আছে তাদের মধ্যে অনেকেরই হিন্দুনাম, যেমন—তাম্বকুণ্ড, কুণ্ড ইত্যাদি।

সিন্ধু সভ্যতার উপত্যকা খনন করে যে সকল শীলমোহর এবং খোদিত লিপি পাওয়া গেছে ওইগুলি সিন্ধুসভ্যতার শীলমোহর বলেই প্রমাণিত হয়েছে। সুমেরীয় শীলমোহর সিন্ধু সভ্যতায় আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে হল সাহেব মন্তব্য করেছেন—সুমের সভ্যতা যে সিন্ধু উপত্যকার নিজস্ব তা প্রবলতর হয়েছে এবং সুমেরীয়গণ যে ভারত থেকে ইউক্রেতীয় উপত্যকায় গিয়ে বসবাস করেছিলেন

তা একটি বাস্তব ঘটনা। এর দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, ভারতীয়রাই ভারতের বাইরের অর্থাৎ সুমের সভ্যতার স্রষ্টা এবং ভারতই সভ্যতার জননী।

পাণিনির সময়ে শিবের লিঙ্গপূজা ছিল না। এমনকি বৌদ্ধযুগের প্রথম দিকেও ভারতে শিবলিঙ্গ পূজার প্রবর্তন হয়নি। লিঙ্গপূজার প্রবর্তন প্রথমে হয় ব্যাবিলনে এবং সেখান থেকে যায় মিশরে। ভারতে লিঙ্গপূজা প্রবর্তিত হয় সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে। মাতৃদেবতার মূর্তি পাওয়া গেছে মহেঞ্জদড়োতে, যার নিকট সাদৃশ্য রয়েছে ক্রীট ও সিরিয়ায়। সুমের ও মিশরের মাতৃদেবতা পরবর্তীকালে ব্যাবিলনে পাওয়া গেছে। মাতৃমূর্তি মেসোপোতেমিয়া, এশিয়া মাইনর, গ্রীক দেশ ও উত্তর ইরাণেও দেখা গেছে।

খ্রীষ্ট পূর্ব ৪র্থ সহস্রে সিরিয়া, উত্তর মেসোপোতেমিয়া, ইরাণীয় উপত্যকা, পূর্ব ইরাণীয় সীমান্ত ও ভারতের সীমান্ত অংশগুলিতে যে গ্রাম্য সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে অনেক আর্থিক ও সামাজিক মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও মৃৎপাত্রের কৌশল, শীলমোহর, মাদুলী নির্মাণ পদ্ধতি, বাসনপত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, জমির উর্বরতা শক্তিবৃদ্ধি ও মাতৃদেবতার অর্চনা প্রভৃতিতে মিল রয়েছে।

বেদ ও আবেস্তার মধ্যে বিশেষ মিল আছে। এ ছাড়া পারস্য দেশের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের অনুরূপ ইতিহাসের বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয়। ভারতের ধর্মগ্রন্থ ও পারস্যের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা মূলতঃ অভিন্ন। বৈদিক দেবতা এবং আবেস্তার দেবতাও মূলতঃ এক। পারস্য দেশেও ভারতের মতো বহু দেববাদ প্রচলিত আছে। এবং বিভিন্ন নাম হলেও সকল দেবতাকেই পরমেশ্বরের বিভূতি বা প্রকাশরূপে মনে করা হয়। ভারতবর্ষে এই পরমেশ্বরবাদই ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে ভারত সীমান্ত হতে একদল ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ভারতের বাইরে পন্ড', পার্থিয়া, সিরিয়া, মদ্র, এশিযামাইনর, গ্রীস ও ইথিওপিয়া প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে বসবাস শুরু করেন। এই সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অন্যান্য কারণে ভারতীয়েরা অন্যস্থানে যেমন—শ্যাম, ব্রহ্ম, মালয়, যব, বলি ও সিংহল দ্বীপে বসতি বিস্তার করেন। ঔপনিবেশিকরা যে দেশেই উপনিবিষ্ট হয়েছেন সেই দেশেই নিজেদের অনেক কিছু তাদের দিয়েছেন এবং নিজেরাও অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। এই

ভাবে তাদের মূলপ্রথার আদান-প্রদানের মাধ্যমে এক নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে।

মহাদেবের প্রভাব সিন্ধু সংস্কৃতিতে ছিল অসীম। শুধু তাই নয়, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, গান্ধার, কম্বোজ, পাঞ্জাব, বাহ্লিক, কাশ্মীর, মিটান্নী, উরারতু, ইলাম, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ফিনিসিয়া, গ্রীস প্রভৃতি সর্বত্রই মহাদেবের সংস্কৃতির ধারা বিরাজিত ছিল। শিবসংস্কৃতিই সিন্ধুর প্রধান নিদর্শন। ব্যাবিলন ও আসীরিয়াতে শিব অন্য নামে বিরাজমান। শিব অরফিউস সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রীসে প্রচলিত হয়েছে এবং মিশরের আসিরিসও শিবেরই রূপান্তরমাত্র। মোটের ওপর যেখানেই শিব সংস্কৃতি গিয়েছে সেখানেই সিন্ধু সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে।

সিন্ধুর শিব যোগাসনে আসীন পশুপতি। এঁর উৎসবে নেশার মত্ততা, বলিদান এবং হল্লা হয়। সিরিয়ান শিবের মূর্তি বৃষবাহন ত্রিশূলধারী এবং বজ্রধারী। এই শিবের মূর্তি পাহাড়ে খোদাই অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই শিবের বর্ণনার সঙ্গে সিন্ধুর শিবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বৈদিক রুদ্রের যজ্ঞে যেমন সোমপান, বলিদান ও হল্লা হত গ্রীসে অরফিউস উৎসবেও সেরূপ হত। ইহা আদি ও সিন্ধু শিবের উৎসবের পরিচয় বহন করে। পশ্চিমবঙ্গে চৈত্রমাসে শিবের গাজন-উৎসব হয় তাতে সঙ্গীত, বাদ্য, নেশা ও বলিদান প্রভৃতি হয়। এই সময়ে কোনো কোনো স্থানে হাজরা গাছের তলায় বিপুল সংখ্যায় মেষ ও ছাগ বলিদান করা হয়ে থাকে। ভক্তগণ নাচ ও বাজনার সঙ্গে ঘরে শিবপার্বতীর বিবাহ বিষয়ক গান গেয়ে থাকেন। এর সঙ্গেও সিন্ধুর প্রাচীন শিব উৎসবের মিল আছে। প্যালেস্টাইনে মহাকালের মন্দির আছে। ইহুদীরা আর্ক নামে একটি জিনিস দেবতার প্রতীকরূপে পূজো করত। হিটাইটদের মন্দিরেও এরূপ প্রতীক থাকত।

শিবের উৎসব অব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, শিব সংস্কৃতি বর্ণাশ্রম প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে প্রাক বৈদিক সংস্কৃতি এবং বৈদিক যাজ্ঞিক সংস্কৃতির পূর্বে শিব সংস্কৃতির ফল্গুধারা ভারত ও ভারতের বাইরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এবং বৈদিক সংস্কৃতির বিরাট প্লাবনেও সিন্ধু সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য শিব সংস্কৃতি এতটুকুও ম্লান না হয়ে বরং আরও বিকশিত হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন সংস্কৃতির বহু ধারাই বর্তমান

ভারতীয় এবং প্রাচীন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে বিদ্যমান। ননা বা নানা মাই-এর সংস্কৃতি খুব প্রাচীন সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতার বহুকাল পূর্ব থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত সিন্ধু অঞ্চলে বিদ্যমান আছে। এই সংস্কৃতির মাধ্যমেও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক জড়িত। বেলুচিস্তানের লাসবেলা ষ্টেটে সমুদ্রের নিকট ননাদেবীর মন্দির অবস্থিত। বেলুচিস্তানের লাসবেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, মধ্য এশিয়া থেকে প্রাগৈতিহাসিক বাণিজ্য-পথের পাশে হিঙ্গুলা নদীর ধারে হিংলাজ তীর্থ-ক্ষেত্র অবস্থিত। এটি ইউফ্রেটিস থেকে গঙ্গা পর্যন্ত বিখ্যাত। হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই দেবীর আশীর্বাদের জন্য আসেন। এই নানা দেবী কলডিয়ানদের কাছেও পূজিতা ছিলেন। মুসলমানদের কাছে এই দেবী বিবি নানী রূপে পরিচিতা। প্রাচীন পার্শীয়ান ও ব্যাক্ট্রীয়ানদের মতো এই দেবীর নাম ননহিংরূপেই মুসলমানরা অভিহিত করে থাকেন।

পরিশিষ্ট (ঘ)

সংস্কৃত ভাষার বিশ্বজনীনতা

সংস্কৃত ভাষার বিশ্বজনীনতার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এ ভাষা জাতিধর্মনির্বিশেষে বহু জাতির মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বের বহু ভাষাই সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার হতে বহু শব্দ গ্রহণ করে পুষ্ট হয়েছে। কাজেই এক কথায় এ ভাষাকে জাতিধর্ম নিরপেক্ষ ভাষা বলা চলে। অবশ্য একশ্রেণীর সমালোচক সংস্কৃত ভাষার মধ্যে হিন্দুত্বের ছোঁয়াচ দেখতে পান। তাঁরা ভুলে যান যে, বিশ্বের অনেক বেদ বিরোধী এবং হিন্দুত্ব-বিরোধী সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বর্তমানের ইন্দোনেশিয়া হিন্দু রাষ্ট্র নয় এবং এ দেশটি মুসলমান রাষ্ট্ররূপে পরিচিত, যেহেতু সেখানকার শতকরা পঁচানব্বই জন লোকই মুসলমান। অথচ সেখানে হিন্দুদের পৌরাণিক গরুড়কে বিমান বাহিনীর প্রতীক করা হয়েছে এবং সংস্কৃত ভাষার বাণী যেমন "ভিন্নেতি তুঙগলঠক" (বহুর মধ্যে ঐক্য)-কে সামরিক প্রতিরক্ষার বাণী হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। উক্ত প্রতীক ও বাণী ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন সাহিত্য হতে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হিসেবেই। ইন্দোনেশিয়ার সামান্যসংখ্যক হিন্দুও ওই বাণী এবং প্রতীকের মধ্যে হিন্দুত্বের ছোঁয়াচ খোঁজেন না। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও ওই ভাষা হিন্দু ধর্মতত্ত্বের অধীন বা আশ্রিত বলে মনে করা অমূলক বা ভুল ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই সংস্কৃত ভাষা নিঃসন্দেহে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভাষা।

অতীত কালের শ্যাম দেশ বর্তমানের থাইল্যাণ্ড। উক্ত দেশের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক অতি সুপ্রাচীন কালের। তাই ওই দেশের রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘটনা ভারতীয়দের কাছে বিশেষ কৌতূহল উদ্দীপক। সাম্প্রতিককালে থাইল্যাণ্ডের বিদেশমন্ত্রী চরণপাথ ঈশ্বরগুণ বলেছেন—তাঁর বিশ্বাস ভারত কাউকেও আক্রমণ করবার জন্য নয়, নিজেরই নিরাপত্তার জন্য পরমাণু শক্তির অনুশীলনে ব্রতী হয়েছে। এখানে প্রজাধিপক, বিপুল সংগ্রাম, অমোঘকীর্তি ও চড়ালঙ্করণ ইত্যাদি ব্যক্তি-নাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ দেশে বহু সরকারী কর্মপদের নাম সংস্কৃত ভাষায় রচিত। যেমন—বারি সীমাধ্যক্ষ

(সেচ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার নাম), রথচারণ প্রত্যক্ষ (যানবাহন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার নাম) ইত্যাদি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সকল দেশেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতীয় নামের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডঃ সুকর্ণের মেয়ের নাম মঘবতী সুকর্ণপুত্রী।

সিংহলে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। অবশ্য সিংহলী ভাষা মূলতঃ আর্যভারতীয় ভাষা। তবে সিংহলী কৌলিক ও ব্যক্তি-নামের মধ্যে এখনও সংস্কৃতের প্রভাব যতটা পরিলক্ষিত হয় ভারতীয় ব্যক্তি-নামেও ততটা পরিলক্ষিত হয় না। যেমন—ভাণ্ডার নায়ক গুণবর্মন, সেনানায়ক ও জ্ঞানতিলক ইত্যাদি ব্যক্তি ও কৌলিক নাম সিংহলে প্রচলিত। এ সকলই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি বহির্ভারতের জনগণের প্রীতি ও মৈত্রীর একটি সুপ্রাচীন নিদর্শন বহন করে চলেছে যা গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতি প্রসারের তুলনায় আদৌও কম নয়।

সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবনে রাষ্ট্রপতির আহ্বান (আনন্দ বাজার পত্রিকা—২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬)—"রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ দেশে সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন—সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে।

অখিল ভারতীয় সংস্কৃত শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি আরও বলেন---সংস্কৃতের উন্নয়নে সম্মেলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তিনি জানান—সংস্কৃত শুধু সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই প্রভাব বিস্তার করেনি, বিশ্বের অন্যান্য প্রধান ভাষাতেও এর ছাপ সুস্পষ্ট। সংস্কৃতই হচ্ছে দেশের মূল ভাষা। যদি লোকে এই ভাষা ভুলে যায়, তাহলে তারা নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যই ভুলে যাবে।"

পরিশিষ্ট (ঙ)

ব্যাংককে ভারত সংস্কৃতি

ব্যাংককে থাইগণ প্রতি বছর দুর্গোৎসব করে থাকেন। ব্যাংককের মহামারী আম্মার মন্দিরে জাঁকজমকের সঙ্গে মহাদেবী দুর্গার পূজা বিধিসম্মত ভাবেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেবীর বোধন অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে মহালয়ার দিন থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত উক্ত মন্দিরে একটা বিপুল আনন্দের ঝড় বয়ে যায়। এতে যোগদান করেন থাই ও চীনারা। থাইল্যাণ্ড (শ্যামদেশ) বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের দেশ, কারণ এখানকার শতকরা ছিয়ানব্বই জনই হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ। কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, ওই থাই নর-নারীগণ ভক্তিসহকারে অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর পূজাও করে থাকেন। তাঁরা পূজার বিবিধ উপচার এবং নৈবেদ্য সাজিয়ে হিন্দু মন্দিরে গিয়ে তাঁদের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানান। থাই নরনারীগণ হিন্দুদের মতো দেবদেবীর বিগ্রহের সামনে নতজানু হয়ে করজোড়ে অঞ্জলি প্রদান করে থাকেন এবং হিন্দুদের মতোই প্রার্থনা শেষে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দেবদেবীকে প্রণাম করেন। অনেকে আবার নৈবেদ্যের ফলমূল না নিয়ে আধফোটা পদ্ম, মোমবাতি এবং গন্ধ ধূপের শলাকা নিয়ে গিয়ে দেব বিগ্রহের সামনে মোমবাতি আর ধূপকাঠি জ্বেলে দেন এবং পদ্মের কোরকটি বিগ্রহের পদমূলে রেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে চলে আসেন। সাত দিন ধরে উৎসব চলে, চলে মন্দির প্রাঙ্গনে ভক্ত স্ত্রী পুরুষের আনাগোনা।

এই দুর্গা প্রতিমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—এই বিগ্রহ এখানকার মতো দশভূজা দুর্গার সঙ্গে তাঁর পরিবারবর্গের প্রতিমা গড়ে পূজা করা হয় না। যা হয় তা হল—এখানকার লোকেরা মহাদেবী মারী আম্মাকেই মহাশক্তির অন্যতম প্রকাশ বলে কল্পনা করেন। এঁরা মনে করেন রামচন্দ্র মারী আম্মাকেই অকাল বোধন করে পুজো করেছিলেন।

এখানে শুধু পূজা অর্চনাই হয় না, নানা প্রকার আমোদ প্রমোদেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকে, যেমন—হিন্দী ছায়া চিত্র দেখানো, সঙ্গীতানুষ্ঠান,

নৃত্যানুষ্ঠান, থাই লোকনৃত্য, ম্যাজিক ইত্যাদি। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর অনুষ্ঠান হল—ভারতে চড়ক পুজার সময় যেমন ভক্তেরা বঁড়শি দিয়ে গাল, গলা ফুঁড়ে চড়কে উঠে চারদিকে পাক খায়, তেমন থাইদেশে বর্শা দিয়ে জিভ আর গাল এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবীর সামনে নৃত্য করা হয়। এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে অসংখ্য লোকের জমায়েত হয়।

থাইবাসীরা বৌদ্ধধর্মালম্বী বলে তাঁরা দেবী পুজায় পশুবলি দেন না। তার বদলে এখানকার অনেক বৈষ্ণবমতাবলম্বীদের মতো নিরামিষ অর্থাৎ—আঁখ, শশা, চালকুমড়ো, মানকচু ইত্যাদি বলি হয়।

বিজয়া দশমীর দিন দেবীকে সোনার খাটে বসিয়ে অসংখ্য ধূপবাতি জ্বালিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়। তারপর আবার শিলা-নির্মিত দেবীকে সস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এখানে বিসর্জনের কোনো রীতি নেই। শোভাযাত্রার সময় জিভে বর্শাবিদ্ধ হয়ে একটি লোক উদ্বাহু নৃত্য করে থাকে এবং যন্ত্রশিল্পিগণ ওই দেশের বাদ্যযন্ত্রে বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে পেছন পেছন অগ্রসর হতে থাকে। উৎসব শেষে দেবীকে মন্দিরে তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে পুরোহিত সমবেত দর্শকদের গায়ে শান্তিজল ছিটিয়ে দেন। হাজার হাজার ভারতীয়, থাই ও চীনা ভক্ত ভক্তিভরে নতজানু হয়ে মাটিতে বসে উক্ত শান্তি জল গ্রহণ করে তুষ্ট মনে যে যার গৃহে ফিরে যান।

পরিশিষ্ট (চ)

বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ও তাঁদের ধর্মবিশ্বাস

মৌর্যদের দ্বারা বঙ্গবিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে আর্য ভাষা ও সভ্যতার ছাপ পড়েনি বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন। সুতরাং মৌর্য বিজয়ের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তিন শতাব্দী হতে গুপ্ত বংশের রাজত্বকাল অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত আটশত বছর ধরে বঙ্গভাষা ও সভ্যতায় আর্যীকরণ চলে। ফলে এই সময়ে বাংলার অসট্রিক ও দ্রাবিড়-ভাষী আদি জনগোষ্ঠী নিজেদের অনার্য ভাষার বদলে আর্যভাষা অর্থাৎ মগধের প্রাকৃত গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। উত্তর ভারতের আর্য ধর্মবিশ্বাস ও সভ্যতার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর ভারতের আর্য ও অনার্য ইতিহাস ও পুরাণ বাংলাদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ করলেন। তারপর গৃহীত হল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমত। এই ভাবে অসট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের আর্য ও অনার্যদের মিশ্রণের ফলেই প্রকৃত পক্ষে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হল। মোটের ওপর তাত্ত্বিক বিচারে আদিম বাঙালী জাতি মুখ্যতঃ অনার্য ছিলেন। বাঙালী জাতি গঠনে যেটুকু আর্য রক্ত এসেছে বলে মনে হল সেটুকু রক্ত আবার উত্তর ভারতের আর্যদের সঙ্গে অনার্য মিশ্রণে ব্যয় হয়ে গেল। ফলে বাঙালী জাতির অসট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির ওপর আর্য মনের ছাপ পড়ল এবং এই ছাপটুকু প্রকৃতপক্ষে বাঙালী চরিত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিল। ফলে দেখা দিল বাঙালী পরিবারের এমনকি একই পিতা মাতার সন্তান-সন্ততীদের মধ্যে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা বা মাঝারি, কারও চুল কোঁকড়ানো, কারও বা ঢেউ তোলা, কারও নাক খড়্গা, কারও বা চেপ্‌টা ইত্যাদি। আবার ধর্মবিশ্বাসেও কেউ শাক্ত, কেউ বা বৈষ্ণব আবার কেউ বা খ্রীষ্টান, কেউ বা মুসলমান। রাজনৈতিক মতবাদেও ঠিক তাই—কেউ বা কংগ্রেস কেউ কমিউনিষ্ট, কেউ এস্ ইউ সি ইত্যাদি এবং হিন্দু হয়ে যেমন মুসলমান পীর সাধু সন্তদের ভক্তি করেন, সেরূপ অনেক মুসলমান এবং বাঙালী খ্রীষ্টানও আবার হিন্দু লৌকিক দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কার্পণ্য করেন না। একজন

বাঙালী হিন্দুর পূর্বপুরুষও যেমন অনার্য অসট্রিক ও দ্রাবিড় ছিলেন সেরূপ বাঙালী মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের বেলাতেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। কাজেই হিন্দু যেমন খাঁটি আর্য জাতির বংশধর বলে দাবী করতে পারেন না, একজন বাঙালী মুসলমান বা খ্রীষ্টানও তেমন খাঁটি আরবীয় মুসলমান বা ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের বংশধর বলে দাবী করতে পারবেন না। একজন হিন্দু একজন মুসলমান এবং একজন বাঙালী খ্রীষ্টানকে তাঁদের ধর্মনির্দেশক বিশেষ চিহ্ন বা পোশাক বাদ দিয়ে একই ধরণের সাধারণ পোশাক পরিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করালে বোঝা যাবে না কে হিন্দু, কে মুসললান কে খ্রীষ্টান অথবা একজন হিন্দু যদি মুসলমানি কায়দায় গোঁফদাড়ি রেখে লুঙ্গী পরে আর তাকে যদি একজন অনুরূপ বেশী মুসলমানের পাশে দাঁড় করানো যায় তবে হিন্দুকে আর হিন্দু বলে চেনা যাবে না অর্থাৎ মুহূর্তের মধ্যে তার হিন্দুত্ব যেন মুছে যাবে। অনুরূপ ভাবে একজন মুসলমান যদি তার গোঁফ দাড়ি বাদ দিয়ে ধুতি কাপড় পরে অনুরূপ-বেশী একজন হিন্দুর পাশে দাঁড়ায় তবে তাকে আর মুসলমান বলে চেনা যাবে না অর্থাৎ মুহূর্তের মধ্যে তার মুসলমাদের বৈশিষ্ট্য মুছে যাবে। যদি তাই হয়, তবে হিন্দু মুসলমান বলে মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ থাকা উচিত কি? পোশাক বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ নগ্নতা দূর করা, সেরূপ ধর্ম আলাদা হলেও সকল ধর্মের একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ একই ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ও ভক্তি করা। কাজেই কোনা কারণেই মানুষে মানুষে যেমন পার্থক্য থাকা উচিত নয় সেরূপ ধর্মে ধর্মেও পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

॥ ২ ॥

বাংলা দেশের পণ্ডিতগণ প্রথমে সংস্কৃত ভাষারই চর্চা করতেন। কিন্তু পাল রাজাদের রাজত্বের দু'শতকের মগধী-প্রাকৃত এবং বাংলা দেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ হতেই একটি স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে দেখা দেয় বাংলা ভাষা। প্রকৃতপক্ষে পাল ও সেন রাজাদের রাজত্ব কালেই বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হল; এর পর এসে হাজির হয় তুর্কী বিজয়ের ঝড় যা বাঙালী জাতীয় সৌধ যা প্রাচীন ও প্রাকমধ্য যুগের ভারত সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। এ ঝড় সুদূর কাবুল হতে বিহার পর্যন্ত সমগ্র হিন্দুস্থানের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল

যাকে বাঙালীরা প্রতিরোধ করতে পারেনি বটে, তবে তাতে বাঙালী-সত্ত্বা বা জাতীয়তা বোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এবং সে সত্ত্বা বা বাঙালীত্বকে যে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করা যায় না তা বিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জাতি তাদের ওপর জোর করে আরোপিত বিজাতীয় সংস্কৃতি ও শোষণকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শেষ বারের মতো প্রমাণ করে দিল এবং সেই সঙ্গে আর একটি জিনিস প্রমাণিত হল—মুসলমান হোক আর হিন্দুই হোক বাঙালী, বাঙালী-ই।

যাহোক, কিছুসংখ্যক তুর্কী বিজেতা ও তাঁদের পারসিক, পাঠান ও পাঞ্জাবী-মুসলমান অনুচর যাঁরা বাংলায় রয়ে গেলেন তাঁরা কিন্তু বাংলার জনসাধারণের সাহায্যেই বাংলায় এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন এবং তুর্কী ও অপরাপর বিদেশীগণও দু-চার পুরুষের মধ্যেই বাঙালী বনে গেলেন। এর একটি প্রধান কারণ—বাংলায় উপনিবিষ্ট বিদেশী মুসলমানগণ বাঙালী স্ত্রী গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের সন্তানেরা ভাষায় বাঙালী হয়ে গেলেন। তখনও এদেশে উর্দু ভাষার প্রচলন হয়নি। ফলে তুর্কী বিজয়ের পরে উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ভাঁটা পড়ল। তখন বাংলায় উপনিবিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী-মিশ্র মুসলমান এবং বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান আরম্ভ হল। এই সময় মুসলমান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের বিশেষ করে বাংলার বার হতে সুফী, দরবেশ, গাজী ও ফকীরগণ বাংলায় আসতে আরম্ভ করলেন। এবং তাঁদের প্রচার ও কিছু কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে মুগ্ধ হয়ে তদানীন্তন কঠোর জাতিভেদ প্রথার বলি একশ্রেণীর অজ্ঞাত হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙালি দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। এই ধর্ম খুবই সহজবোধ্য ধর্ম। এতে জাতিভেদের মূলতঃ কোনো স্থান নেই এবং রাজা প্রজা ও ধনী গরিব এক সঙ্গে আরাধনা করতে পারেন এবং একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সকলে সমবেতভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারেন। এ ধর্মে ধনীকে তার সম্পত্তির অংশ জাকাত নামে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার নিয়ম আছে। এছাড়া আছে রমজান মাসের উপবাস যা ধনী গরীব, রাজা প্রজা সকলকেই পালন করতে হয়। এর দ্বারা অর্ধাহার ও অনাহারের যে কী জ্বালা তা পূর্ণহারী ধনীরাও বুঝতে পারেন এবং তা বুঝে যাতে ধনীরা গরীবদের সাহায্য করেন—সেই উদ্দেশ্যই রমজানের মূলে নিহিত

রয়েছে। এ ধর্ম বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়েছে এই ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচারে দেশ, কাল ও বর্ণ কখনও প্রতিবন্ধক নয়। এ ধর্ম সমগ্র বিশ্বমানবকে এক জাতি অর্থাৎ মানুষ জাতি হিসেবেই গ্রহণ করেছে। তাই সমাজের চোখে ঘৃণিত ও অবহেলিত এক শ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণ ইসলাম ধর্মকে তাঁদের উদ্ধারকারী ধর্ম হিসেবেই গ্রহণ করলেন। তাঁদের কাছে—গণেশ হইলেন গাজী, কার্তিক কাজী, চণ্ডিকা দেবী হায়া বিবি, ও পদ্মাবতী বিবি নূর হইলেন (ডঃ মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ, পৃঃ ১৪৫)। অবশ্য প্রথম পর্যায়ে ধর্মোন্মত্ততার ফলে কতিপয় মুসলমান শাসক যে উচ্চ নীচ নির্বিশেষে বহু হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করে দেয়নি তা নয়। কিছুসংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু যাঁরা হিন্দুসমাজে সকলপ্রকার সুযোগ সুবিধে ভোগ করছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ জন ও ধনবল দিয়ে ধর্মান্তিকরণকে বাধা দিলেও একদল ধর্মান্তিকরণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে জাজনগর (ওড়িশা) ও কামরূপে (আসামে) পালিয়ে গিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজে যাঁরা ধন ও যশের কোনটিই ভোগ করতে পারছিলেন না এবং উচ্চ শ্রেণীর চোখে যাঁরা ছিলেন ঘৃণিত, সেই অবজ্ঞাত জনসাধারণ ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা দেশে খাঁটী শরিয়তী বা কোরাণ অনুসারী ইসলামের চেয়ে সুফীমতের ইসলামের প্রসারই বেশি হয়েছে এবং এই মতের সঙ্গে বাংলা-সংস্কৃতির মূল সুরের বিশেষ বিরোধ না হওয়ায় বাংলার প্রচলিত যোগ-মার্গ ও অপরাপর আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের সঙ্গে সুফী মতবাদের একটি আপস সম্ভব হয়েছিল। কারণ খাঁটী শরিয়তী মতের ইসলামে এক আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ উপাস্য তো নয়ই বরং এরূপ উপসনা গুনাহ। পক্ষান্তরে বাংলায় যেরূপ এক শ্রেণীর হিন্দু লোকদেবতা, যেমন—ওলাইচণ্ডী, শীতলা, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন ঠাকুর, ধরমঠাকুর এবং পদচিহ্ন ও পীর পূজা করেন, সেরূপ সুফীমতে বিশ্বাসী এক শ্রেণীর মুসলমান লোকদেবতা, যেমন—ওলাবিবি, বনবিবি, সাতবোন বিবি, পাঁচ পীর, বদর পীর, গাজীপীর ও পদ চিহ্ন প্রভৃতির কাছে পূজা দেন এবং পীর, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়াদের দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন। শুধু তাই নয়—অনেক সময় হিন্দুদের লোকদেবতাদের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাতে কার্পণ্য করেন না। সুফী মতের ইসলামই বাঙালীর পক্ষে সহজগ্রাহ্য হয়েছিল, যেহেতু এক শ্রেণীর বাঙালীর আদি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এর একটা বিশেষ মিল আছে বা ইহা সামঞ্জস্য বিধান

করে অবস্থান করছে। এ অবস্থা দেখে মনে হয়—বাংলা দেশে তথা ভারতের অনেক প্রদেশেই হিন্দু সাধকদের শিষ্য হয়েছেন মুসলমান এবং মুসলমান সাধকগণের শিষ্য হয়েছেন অনেক হিন্দু। হিন্দুগণ যেমন মুসলমানগণের লোকদেবতাদের শ্রদ্ধা করেন, পূজা দেন, এক শ্রেণীর মুসলমান আবার অনুরূপভাবে হিন্দুদের লোকদেবতাদের শ্রদ্ধা করেন। এইভাবে বাংলা তথা ভারতে প্রকৃতপক্ষে "মজম'-অল্-বহ্-রৈন্" অর্থাৎ দুটি সাগরের মিলন ঘটেছে।

এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে অর্থাৎ দেশে যখন ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা ছিলেন তখন দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ গ্রাম্য লোকধর্ম পালন করতেন, নানা প্রকার পূজা ও ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। সাধু-সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুগণ জনসাধারণকে ধর্মীয় উপদেশ দেওয়ার প্রয়াস করতেন। উচ্চ বর্ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা প্রকার পূজা-পার্বণে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যোগদান করতেন এবং নিজেরাও নানা প্রকার পর্ব-দিবস পালন ও গ্রাম্য লৌকিক দেবতার পূজা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কতিপয় মুসলমান শাসকের পৃষ্টপোষকতায় ইসলাম ধর্মপ্রচারকেরা ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্ম সহজ-বোধ্য হওয়ায় দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে তা আপতগ্রহণীয় হয়েছিল। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম তখন তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মতের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় ওই ধর্ম সাধারণের কাছে বর্জনীয় হয়ে উঠল, এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সজাগ হয়ে উঠলেন। মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার ফলেও বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ-লাভ ঘটতে থাকল বিশেষ করে বঙ্গদেশে। একদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর জাতিভেদ প্রথা অপরদিকে কতিপয় মুসলমান শাসকগণের বলপূর্বক ধর্মান্তিকরণের ফলে একদিকে যেমন এক শ্রেণীর হিন্দু হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন অপর দিকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্ম প্রচারের নীতি একশ্রেণীর মুসলমান যাঁরা ইসলামের সহনশীল নীতিতে বিশ্বাসী তাঁদের কাছে মনঃপূত হল না। তখন দলে দলে হিন্দু থেকে মুসলমান ধর্মগ্রহণে বাধা স্বষ্টি করার জন্য নানা সাধক সহজ-বোধ্য নাম-ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। এঁরা ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদ প্রথা মানলেন না। এঁদের মধ্যে ছিলেন রামানন্দ, দাদু, কবীর প্রমুখ উত্তর-ভারতের সন্তমার্গী সাধুগণ, পাঞ্জাবের গুরু নানক ও বঙ্গদেশের চৈতন্যদেব। অপর দিকে শরিয়তী মতের কঠোর ইসলাম ধর্মীয় মতবাদ যা একমাত্র আল্লাহ

ব্যতীত ব্যক্তি, পদচিহ্ন বা মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী, তা থেকে কিছুটা সরে এসে এক শ্রেণীর মুসলমান সাধক সুফীমতের ইসলাম ধর্ম প্রচারে প্রয়াসী হলেন। এতে ব্যক্তিপূজা, মূর্তিপূজা ও পদচিহ্ন পূজা স্থান পাওয়ায় এবং হিন্দুদের গ্রাম্য লোক-ধর্মের সঙ্গে আপস করে চলায় বহু লোক স্বেচ্ছায় তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই ভাবে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মিশ্র ধারা সমান্তরালভাবে পাশাপাশি সহাবস্থান করে চলল।

বাঙালী জাতির একটা বিরাট অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও উত্তর-ভারতীয় কোরাণ অনুসারী মুসলমান মনোভাব ও সভ্যতা, রীতিনীতি, চিন্তাধারা এবং আরবী, ফারসী বাঙালী মুসলমানদের জীবনে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। তাই সুফী মতবাদের ইসলামই বাঙালী মনোভাবের সঙ্গে একটা আপস করতে সমর্থ হয়েছিল। কতকগুলি বিশেষ স্থান ও বিশেষ পরিবার বা গোষ্ঠী ব্যতীত বাঙালী সাধারণ মুসলমান খাঁটী শরিয়তী বা কোরাণ অনুসারী মুসলমান সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। কতিপয় বাঙালী মুসলমান মৌলবী ও মোল্লা এবং উলেমাগণই কেবল আরবী ফারসী চর্চায় নিজেদের মগ্ন রাখতেন। এবং বাংলা ভাষার চর্চা বড় একটা বেশী না করায় আরবী ফারসী ঘেঁষা মুসলমান সংস্কৃতি সাধারণ বাঙালী মুসলমানগণের কাছে পৌঁছয়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য আরবী প্রার্থনা, মুসলমান স্মৃতি-শাস্ত্র ও ইতিহাস, কোরাণ কাহিনী বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বাঙালী মুসলমানগণ উত্তর ভারতে তথা ভারতের বাইরের মুসলমান সংস্কৃতির এবং সঙ্গে সঙ্গে কোরাণ অনুমোদিত ইসলামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানোর সুযোগ পান। কিন্তু বাঙালী সাধারণ মুসলমানগণ মনেপ্রাণে খাঁটী বাঙালী থাকায় বঙ্গ তথা ভারতবহির্ভূত মুসলমান সংস্কৃতি তাঁদের প্রাণের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা মেটাতে ব্যর্থ হয়। এবং উক্ত সংস্কৃতি কেবল মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে পরবর্তীকালে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান-গণের অনেকেই খাঁটী বাঙালী মুসলমান সংস্কৃতি গঠনে প্রয়াসী হন। সহজ কথায় বাঙালী মুসলমানগণ বাঙালী হিন্দুগণের মতোই বাংলার ঐতিহ্য এবং বাঙালীর সংস্কৃতির অংশীদার। শুধু তা-ই নয়, বাঙালী মুসলমানগণ সমগ্র-ভারতীয় সংস্কৃতিরও উত্তরাধিকারী।

উত্তর ভারতের সংস্কৃতি ও আরবী-ফারসী ভাষায় লিখিত খাঁটী কোরাণ অনুসারী সংস্কৃতি বাঙালী মুসলমানের কাছে অনেকটা বিদেশী। এবং উক্ত ভাষা-

ভাষী ও সংস্কৃতিপ্রেমী জনসাধারণ যখন বাঙালী মুসলমানগণকে শুধু মুসলমানের দোহাই দিয়ে এক করে না নিয়ে তাঁদের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ চালাল এবং তাঁদের ভাষা ও সাবলীল সংস্কৃতি-বিকাশকে স্তব্ধ করতে চেষ্টা করল তখন বাঙালী মুসলমানগণ তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে দলে দলে শহীদের মৃত্যুবরণ করে সৃষ্টি করলেন—স্বাধীন বাংলা দেশ। তাঁরা পশ্চিমী ভাষা, সংস্কৃতি ও শোষণের নাগপাশ হতে নিজেদের মুক্ত করলেন। এর দ্বারা শেষবারের মতো প্রমাণিত হল—বাইরে থেকে কোনো ভাষা বা সংস্কৃতি একটি ভিন্ন ভাষাভাষী বা ভিন্ন সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। বিদেশী ইংরেজী ভাষা, সংস্কৃতি ও শোষণের হাত থেকে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান সমবেত ভাবে মুক্ত হয়ে যেমন দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বিদেশী ভাষা, সংস্কৃতি ও শোষণের দ্বারা অন্য একটি জাতিকে নিষ্পেষিত করা যায় না, তেমনি বাংলাদেশের সাধারণ বাঙালীরাও তা প্রমাণ করে দিয়েছেন—বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মান দেওয়া যায় এবং জানাও যায়, কিন্তু স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিনিময়ে তা আত্মস্থ করা যায় না।

পরিশিষ্ট (ছ)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে ভারত ধর্ম

খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের উৎসস্থান ভারতের বাইরে যথাক্রমে জেরুসালেম ও আরব দেশে। কিন্তু বৌদ্ধ, জৈন শৈব, শাক্ত ও গাণপত্য যা বৃহত্তর অর্থে হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত তার উৎসস্থান হল ভারতবর্ষ। তাই হিন্দু ধর্মকে এক কথায় ভারত-ধর্ম বলা যেতে পারে।

বহির্ভারতে মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজে হিন্দু ধর্মের প্রভাব অতি আধুনিককালে ও পরিলক্ষিত হচ্ছে যার বিশেষ কারণ—বিশ্বের বহু জায়গা থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্রুত অবসান। বহু প্রগতিশীল মুসলমান রাষ্ট্র আজকাল আর ধর্মীয় সংকীর্ণতার শিকার নয় বা ধর্মীয় সংকীর্ণতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে শুধু ইন্দোনেশীয় সরকারের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সরকারের ধর্ম-বিষয়ক একটি বিশেষ বিভাগ আছে যেখান থেকে গীতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে যার মুখবন্ধ লিখেছেন তিনজন বিখ্যাত মুসলমান সন্তান। এঁরা হলেন—(১) রাষ্ট্রপতি জেনারেল সুহার্ত (২) জন-উপদেষ্ট পরিষদের সভাপতি ডঃ এ, এইচ্ নাসুতিয়ান এবং (৩) ধর্ম-মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক কে, এইচ্ সইফুদ্দীন জহুরি। এখানে বেদ এবং ধম্মেরও অনুবাদ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিবেকানন্দের জন্ম দ্বি-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিবেকানন্দের রচনাবলীর অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে যার মুখবন্ধ লিখেছেন ডঃ সুকর্ণ।

গীতার মুখবন্ধে জেনারেল সুহার্ত লিখেছেন—"আমরা ইন্দোনেশীয় জনগণ, আমাদের উচিত—বৈদিক ধর্মের আদর্শ অনুসরণ করা। তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে যাননি যে, যে কোনো জাতির পক্ষে হিন্দুধর্মের এই বিখ্যাত গ্রন্থখানি বিশেষ পথ নির্দেশক আদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অধ্যাপক জহুরি গীতার মুখবন্ধে লিখেছেন—"আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভাইগণের এই মূল্যবান অবদান আমাদের একান্ত দৃষ্টি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে এবং আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্মীয় মনোভাব ও চরিত্রগঠনে সহায়ক হয়েছে।" তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁদের দেশের ধর্মীয় নৈতিকতা ও উদারতা বোধ উক্ত কাশনের মাধ্যমে দিন দিন আরও প্রসারিত হওয়া উচিত। ঐ সকল

দৃষ্টান্তের দ্বারা ইন্দোনেশীয় সরকারের সর্বধর্মে শ্রদ্ধা ও ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

॥ ২ ॥

পাশ্চাত্ত্য দেশের ধর্মীয় সহনশীলতা ও ভিন্নধর্ম আত্মীকরণ উল্লেখ করতে হলে আমেরিকাবাসীদের স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা হিন্দু ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সর্বজন বিদিত ঘটনার পরেই এই বিংশ শতকের শেষার্ধে (১৯৭৬) স্বর্গীয় করুণার প্রতীক ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক পাশ্চাত্ত্য দেশে কৃষ্ণ-বিবেক জাগরণের কথা উল্লেখ্য। উক্ত বেদান্ত স্বামী ও তাঁর আমেরিকান শিষ্যগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ-বিবেক জাগরুক সমিতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত সমিতিতে বহু খ্রীষ্টান সাহেব-ভক্ত আছেন যাঁরা পারস্পরিক বোঝাপরার মাধ্যমে জীবনের মুক্তি অর্জনের পথ বেছে নিয়েছেন। পারস্পরিক প্রচেষ্টার দ্বারা সমগ্র সমিতি ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণের সাধনায় একাগ্রীভূত হয়েছে। দৈনন্দিন বিভিন্নকাজ এবং রান্না ও আহার প্রভৃতি নিজেদের হাতে করেও তারা শহরের পথে পথে কৃষ্ণনাম করে বেড়ান। কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ভক্তগণ প্রতি কেন্দ্রে (কেবল ভার্জিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের আশ্রমগৃহ, মন্দির, কৃষিশালা ও গবাদি পশুপালন ব্যতীত) শহুরে জীবন যাত্রার মধ্যে নিজেদের জন্ম, মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সর্বদা কৃষ্ণনামের দ্বারা চিরন্তন আনন্দলাভের জন্য মনোনিবেশ করে চলেছেন। উক্ত সমিতিতে দীক্ষিত শিষ্য হিসেবে বাস করতে হলে প্রত্যেককে চারটি নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন—(১) মাংসাহার বর্জন (২) অবৈধ যৌন সম্পর্ক পরিত্যাগ করা (৩) মদ্যপান বর্জন ও (৪) জুয়া বা পাশা খেলা বর্জন। শিষ্যদের ভক্তিমূলক কর্তব্য পালন, নামজপ ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ধারণা পোষণের মাধ্যমে বাঁধাধরা জীবন যাপন করতে হয়।

কৃষ্ণ বিবেক জাগরুক সমিতির প্রত্যেক শিষ্যের প্রধান কর্তব্য হল—সংকীর্তনে অংশ গ্রহণ করে হরে কৃষ্ণ মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে আত্মিক উন্নতিসাধন করা। উক্ত সমিতির ২৫টি কেন্দ্র আছে। সেগুলো নিউ ইয়র্ক, লস এ্যাঞ্জেলস্, বোষ্টন, স্যানফ্রানসিসকো, বার্কেল, ডেট্রয়েট, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন ডি. সি. হনুলোলু, লণ্ডন, হামুবর্গ, টোকিও প্রভৃতি জায়গায় অবস্থিত। এই কেন্দ্রগুলো আরও প্রসার লাভ করছে। প্রকৃতপক্ষে প্রভু চৈতন্যের যে দৈববাণী অর্থাৎ এককালে হরে কৃষ্ণ

নাম বিশ্বের সকল নগর ও গ্রাম থেকে শোনা যাবে”—এ যেন তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

পরস্পরের ধর্মের প্রতি বিরোধী মনোভাবের পরিবর্তে শ্রদ্ধার মনোভাবই প্রকৃত পক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেবে যেমন কৃষ্ণ-বিবেক জাগরুক সমিতির আন্দোলন হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যকার পার্থক্যকে অনেকটা দূরীভূত করে চলেছে।

উক্ত স্বামীধর্ম বা হরেকৃষ্ণ নামের মন্ত্র আমেরিকান খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবিত করেছে যেমন এককালে বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা আমেরিকাবাসী খ্রীষ্টানদের প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যদি ও গুরুদেবের পদমূলে যুবা বয়সের লোকেরাই বেশি জমায়েত হয়েছেন তথাপি বৃদ্ধরাও যে আকৃষ্ট হন নি তা নয়।

যাহোক, উক্ত ঘটনার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, ভারতে যেমন এক শ্রেণীর হিন্দু—মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তকরণ গ্রহণ করেছেন তেমনি ভারতের বাইরেও এক শ্রেণীর মুসলমান আবার হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং অনেকে খ্রীষ্টান হয়েও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। এককালে যে হিন্দুধর্ম হিন্দুদের অহিন্দু বিশেষ করে মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মগ্রহণে বিরোধিতা করত এমন কি হিন্দু থেকে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হওয়ার পরে তাঁদের স্বধর্মে তো ফিরতেই দেওয়া হতো না বরং সমাজচ্যুত করা হতো এর দ্বারা তারও পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা হিন্দুদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা-বোধ যে দূরীভূত হয়েছে তা প্রমাণিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে কোনো ধর্মের লোককেই যে ঘৃণা করা উচিত নয়—সেই মনোভাবও পরিস্ফুট হয়েছে।

পরিশিষ্ট (জ)

ধর্মনিরপেক্ষতা বিচারে ইতিহাস ও সাহিত্য

কোনো ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক যদি ইচ্ছে করেন তা হলে তিনি ইতিহাস বা সাহিত্যের পাতা থেকে যেমন চরম সাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ বের করতে পারবেন আবার ইচ্ছে করলে তা থেকেই প্রমাণ করতে পারবেন—ধর্মনিরপেক্ষতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে ঐতিহাসিক যদি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হন তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে অপরপক্ষের ওপর সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্যকলঙ্ক লেপন করার যথেষ্ট মালমসলা অতি অনায়াসেই ইতিহাস থেকে বের করতে পারবেন এবং তা করলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেয়ে বিরোধই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তাই এখানে কোনো পক্ষ সমর্থন না করে নিরপেক্ষভাবে কতকগুলো দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল যার দ্বারা অনেক মুসলমান শাসকের কার্যাবলী সম্পর্কে হিন্দুদের যে ভুল ধারণা তার যেমন অবসান ঘটবে সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু শাসকগণের সম্পর্কেও মুসলমানগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে। আগে হিন্দু ও মুসলমান শব্দ দুটির তাৎপর্য দেখা যাক—আসলে এ দুটি শব্দের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কাদের বোঝানো হত এবং কোথা থেকেই বা এ দুটি শব্দ এল? এরপরে দেখা হবে—ম্লেচ্ছ, যবন ও কাফের শব্দগুলোর তাৎপর্য কী? কারণ সাম্প্রদায়িক বিভেদে উস্কানি দেওয়ার জন্য এ শব্দগুলো একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী এককালে এমনকি সুযোগ পেলে এখনও ব্যবহার করে। এরপর যেটা কাজে লাগায় তা হল—কেবল হিন্দুরা মসজিদ অপবিত্র করে, তার কাছ দিয়ে জোর করে কীর্তন করতে করতে যায়। এবং মুসলমানেরা মন্দির ভাঙ্গে বা অপবিত্র করে তাতে গোমাংস ছুড়ে এবং হিন্দুদের ওপর জিজিয়াকর বসায় ইত্যাদি। তবে শেষ পর্যন্ত বিভেদের আগুনকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য যেটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ব্যবহার করে তা হল—গো-মাংস। কিন্তু ঐ শব্দ ও অপব্যাখ্যারগুলোর এখানে বর্ণিত তাৎপর্য জানতে পারলে বোধহয় ওগুলো ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার কাজে লাগাতে কিছুটা অনীহা জন্মাতে পারে।

হিন্দু শব্দটি কিন্তু হিন্দুদের নিজেদের সৃষ্ট নয়। এটি বিদেশীদের দেওয়া একটি শব্দ যা পরবর্তীকালে হিন্দুরা নিজেদের পরিচয় দিতে ব্যবহার করেন। আধুনিক

কালে যাঁরা হিন্দু বলে পরিচিত বা স্বীকৃত অতীতকালে তাঁদের এরূপ কোনো পরিচয়ই ছিল না। তদানীন্তনকালে হিন্দ্ (ইণ্ডিয়া) দেশে যাঁরা বাস করতেন বা সিন্ধুনদের তীরে ভারতের যে সকল অধিবাসীরা (আর্য ও অনার্য) বাস করতেন তাঁদের বর্ণনা করার জন্য প্রথমে আরবগণ পরে গ্রীকগণ বা অন্যান্যরা এই শব্দটি ব্যবহার করতেন। হিন্দু শব্দটির উন্মেষ ঘটে গুপ্ত যুগের পরে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সন থেকে ৩২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগকে হিন্দু যুগ বলা হয় তখন কিন্তু মৌর্য, ইন্দো-গ্রীসিয়, শক ও কুষাণ প্রভৃতি বহু রাজবংশই ভারতে রাজত্ব করতেন যাঁদের ধর্ম বর্তমানে যা হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত তা ছিল না। তাঁদের অনেকেই ছিলেন বৌদ্ধ। মোটের ওপর হিন্দু বলে কোনো বিশেষ জাতি বা ধর্ম নেই। ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা হল—বৌদ্ধ, জৈন, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি। এছাড়া প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক উপাদানগুলো পর্যালোচনা করলেও জানা যাবে—প্রাক-মুসলমান যুগে ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলো নিজেদের হিন্দু বলে মনে করতেন না।

"ঐতিহাসিকেরা যখন হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করতেন তখন তাঁরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী হিন্দু সমাজভুক্ত একটি বিশেষ গোষ্ঠীয় লোকদের কথাই বোঝাতেন। হিন্দু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অর্থে ধর্মীয় অর্থে নয়।

আধুনিক কালে সে যুগের ইতিহাস লেখার সময় আরব, তুর্কি ও পারসিক প্রভৃতি সকলকেই এককথায় মুসলমান বলে অভিহিত করা হয়। অথচ আকর গ্রন্থগুলিতে 'মুসলমান' শব্দের ব্যবহার বিরল। ওই গ্রন্থগুলিতে আরব, তুরস্ক ও পারস্যের অধিবাসীদের যথাক্রমে আরবীয়, তুর্কী ও পারসিক না বলে মুসলমান এই ধর্মীয় পরিভাষার দ্বারা চিহ্নিত করা হত। এবং পশ্চিম এশিয়া বা ভুমধ্য-সাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত আরবীয়, রোমীয় ও গ্রীক নির্বিশেষে সকলকেই যবন বলা হত।

সংস্কৃতে 'যবন' কথাটি প্রাকৃত যোনা থেকে গৃহীত। আর এই যোনা কথাটি এসেছে 'আয়োনিয়া' থেকে। এবং আয়োনীয় গ্রীকদের সঙ্গেই পশ্চিম এশীয়াবাসীদের সর্বপ্রথম ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তুর্কি, পারসিক ও আরবদের বিরুদ্ধে অনেকটা বিরূপ মনোভাব প্রকাশের জন্য

যবন ছাড়াও 'ম্লেচ্ছ' এই শব্দটি ব্যবহার করা হত। অদ্বৈত প্রকাশগ্রন্থে মুসলমান শব্দের বদলে ম্লেচ্ছ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন—

একদিন হরিদাস কহে প্রভুস্থানে
নিত্য ধর্ম নষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছগণে।

এ ছাড়া চৈতন্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে—

দেবতাব্রাহ্মণে হিংসা করে ম্লেচ্ছ জাতি,
শূদ্র জগৎ গুরু হবে ম্লেচ্ছ হবেন রাজা।

(চৈতন্যমঙ্গল)

আধুনিক বৈষ্ণবগ্রন্থ বৃহৎ সারাবলীতে আছে—

কলিকালে ক্ষিতি পতি হইবে যবন।
বাদসা বলিয়া নাম খ্যাত চরাচর॥

এইভাবে হিন্দু গ্রন্থগুলিতে হিন্দুরা মুসলমানদের ম্লেচ্ছ অথবা যবন আখ্যা দিয়ে হেয় বা অপবিত্র জ্ঞান করতেন। তাঁদের সঙ্গে আহার ও বৈবাহিক সম্পর্ক তো দূরের কথা তাঁদের স্পর্শও অশুচি বলে মনে করতেন, যেহেতু মুসলমানেরা হিন্দুর দেবমন্দির ভেঙ্গে তার স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং দেবমূর্তি চূর্ণ করে মসজিদের পাদপীঠে পরিণত করেছে যাতে মূর্তির ভগ্ন অংশগুলি মুসলমানদের পদ-দলিত হতে পারে। এছাড়া গো-মাংস ভক্ষণ, বিধবা বিবাহ, খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাই বোনদের মধ্যে বিবাহ এবং উর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া প্রভৃতি বিশিষ্ট সামাজিক প্রথা হিন্দুদের কাছে বিসদৃশ ছিল।

তুর্কি, পারসিক এবং আরবদের বর্ণনায় যে ম্লেচ্ছ শব্দটি ব্যবহার করা হত সেই শব্দটির উল্লেখ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ঋগ্‌বেদেই সর্বপ্রথম দেখতে পাওয়া যায়। এই শব্দটি ব্যবহার করা হত প্রধানতঃ তাঁদের সম্বন্ধে যাঁরা অনার্য ভাষাভাষী ছিলেন এবং আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ছিল না। সুতরাং উত্তর ও মধ্যভারতের বিভিন্ন অরণ্যের অনার্যভাষী উপজাতিগুলিই ছিল প্রথম 'ম্লেচ্ছ'। পরে শব্দার্থের প্রসার ঘটায় সব বিদেশীর সম্পর্কেই উক্ত শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। এবং সেক্ষেত্রেও কিন্তু ম্লেচ্ছ শব্দটি ধর্মীয় পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে বরং তা সাংস্কৃতিক অর্থে ব্যবহৃত হত। সুতরাং আরব, তুর্কী ও পারসিকদের ভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন লোক বোঝানোর জন্যই তাঁদের ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করা হত।

পক্ষান্তরে মুসলমানেরা হিন্দুদের কাফের বলে অভিহিত করতেন এবং তাঁদের

সর্বদা ঘৃণার চোখে দেখতেন। যেমন 'বাইশ কবি মনসা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে—মোল্লা গিয়ে কাজীর কাছে নালিশ করছে এই বলে যে—

কাফের হিন্দুরা পূজে, যাই আমি গোঠ-মাঠে,
দেখি করি হিন্দু পূজা মানা॥

কথিত আছে—হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বেচ্ছায় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্তন করে বেড়াতেন বলে স্বয়ং কাজী তাঁর বিরুদ্ধে মুলুকপতির কাছে অভিযোগ করেন—'যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।" তখন—

আপনে জিজ্ঞাসে তারে মুলুকেরপতি।
'কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত॥
জাতিধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার॥
পরলোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার॥

উপরের উক্তিকে শুধু যে মুসলমানেরা নিজেদের বড় মনে করতেন তাই নয়, হিন্দুরাও অনুরূপভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি তারই প্রমাণ যার দ্বারা ভক্তিরত্নাকরে রূপসনাতনের মনের অনুশোচনা প্রকাশ করা হয়েছে ঃ—

পিতা পিতামহাদির নৈহে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়॥
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এহেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান॥

রূপ সনাতনের পিতা শ্রীকুমার সম্বন্ধে ভক্তিরত্নকর বলেন ঃ—

যদি অকস্মাৎ কভু দেখয় যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ॥

শুধু যে মুসলমানেরাই হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতেন তা-ই নয়, হিন্দুরাও যে মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করতেন তারও দৃষ্টান্ত আছে। হিন্দুরা যেমন মনে করতেন জাতিধর্ম পরিত্যাগ করলে পরলোকে নিস্তার নেই মুসলমানেরাও একই কথা ভাবতেন। চৈতন্য ভাগবতের উক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শুধু মুসলমানদের মধ্যেই যে কেবল খুড়তুতো ও জ্যেঠতুতো ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ে হয় তাই-ই নয়, দক্ষিণ ভারতের অনেক হিন্দুর মধ্যেও মামাতো ও খুড়তুতো ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ে হয়। হিন্দুদের মধ্যেও বিধবাবিবাহ হয় এবং হচ্ছে। এছাড়া বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে ছোট ভাইয়ের বিবাহ অর্থাৎ দেবর বরণ ওড়িশায় হিন্দুদের মধ্যে বহু সংখ্যায় হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া আজকাল অনেক হিন্দুই আগের মতো যথাযথভাবে পালন করেন না।

প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আর্যরাও গোমাংস খেতেন। এবং যজ্ঞে কাবাব ব্যবহৃত হত। সুতরাং শুধু মুসলমানেরাই গো-মাংস খান বলে বলা চলে কী? তাছাড়া স্বয়ং হজরত মহম্মদ বলেছেন—গরু একটি উপকারী জন্তু, গো-মাংস দেহে ব্যাধি সৃষ্টি করে থাকে। এছাড়া অনেক মুসলমান গো-মাংস খেতেন না। যেমন, আইনী-আকবর থেকে জানা যায়—বাবর, হুমায়ুন, আকবর গো-হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন, মহীশূরে হায়দার আলি ঘোষণা করেছিলেন—গো-হত্যার শাস্তিস্বরূপ হাত কেটে ফেলা হবে (সুপ্রীম-কোর্ট-এর বিচার। এছাড়া কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীন ও বিজাপুরের সুলতান ইউসুফ আদিলশাহ গো-হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। বাহাদুর শাহ গো-হত্যার শাস্তিস্বরূপ মস্তকচ্ছেদনের আদেশ জারি করেছিলেন। কাজীদলনের সময় শ্রীচৈতন্য কাজীকে গো-হত্যা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন, যেহেতু গরুর দুধ খেয়ে মানবশিশু জীবনধারণ করে এবং বলদ গরু খাদ্যোৎপাদকে সাহায্য করে। তিনি মনে করতেন—গো-হত্যা পিতামাতা-হত্যার সমান। চৈতন্য চরিতামৃতে কাজীর সঙ্গে ধর্মালোচনাকালে মহাপ্রভু বলেছিলেন—

"প্রভু কহে—গো-দুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা॥

পিতামাতা মারি খাও এ কোন ধর্ম।
কোন বলে কর তুমি এ মত বিকর্ম॥

জানা গেছে—যখন মুনিগণ গো-হত্যা করে তাদের পুনরুজ্জীবিত করতে পারতেন তখনই কেবল গো-হত্যা করতেন। পরে তাঁরা সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে গো-হত্যা বন্ধ করে দেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে কাজীর সঙ্গে ধর্মালোচনা কালে মহাপ্রভু যে উক্তি করেছিলেন তা থেকে অনেকটা অনুমান করা যায়—তিনি কাজীকে বলেছিলেন—

তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্রসার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার॥

মুসলমান আমলে রাজায় প্রজায় মিলনে বাধা সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ ছিল গো-বধ। এর প্রমাণ চৈতন্য চরিতামৃত ছাড়া বৃহৎ সারাবলীতে আছে। এতে অভিরাম গোস্বামী কাজীকে বলেছিলেন—

তোমার কোরাণে যারে বলে পরমেশ্বর।
আমার পুরাণে তারে লিখয়ে ঈশ্বর॥
আমার পুরাণ আর তোমার কোরাণ।
এক ব্রহ্ম দুই নহে সেই ভগবান॥
রাম রহিম দোঁহে এক নাম জান।
আমাদের রাম তোমাদের রহিমান॥

এরূপ ধারণা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান মিলনে বাধা সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে অভিরাম গোস্বামী বলেছিলেন—

গরু বধি তোমরা যে নার বাঁচাইতে।
আর তার মাংস রাঁধি ভক্ষ উদরেতে॥
এই সব অনাচার তোমার যাজন।
তে কারণে জাতিভেদ হইল যবন॥

*　　　*　　　*

হিন্দু মুসলমান এই বিভেদ হইল।
এক মূলে যেন দুই বৃক্ষ উপজিল।

আধুনিককালে মহাত্মাগান্ধী, রফি আহমদ কিদোয়াই, স্যার সুলতান আহমদ সম্পূর্ণরূপে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। আফগানিস্তানে

গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরসহ ভারতের বহু প্রদেশ সম্প্রতি গো-হত্যা নিষিদ্ধ করেছে বা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার পেছনে অনেক মুসলমানেরও সমর্থন আছে।

অহিংসা শুধু হিন্দুদের একচেটে অধিকার নয়। ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের মতো খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মও অহিংস নীতির দ্বারা পরিপুষ্ট। এছাড়া হিংসায় শুধু মুসলমান আর খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাসী এবং ধর্মের নামে জেহাদ ঘোষণা ও যুদ্ধবিগ্রহে শুধু ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মীয় ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়—একথা বলা ঠিক হবে কী? কারণ ভারতীয় ঐতিহ্যের অনেক বড় বড় ঘটনাই হিংসার সঙ্গে জড়িত। মহাভারতের যুদ্ধ ও ভাগবত গীতা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ান আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি রাজা ও উপজাতীয় সর্দারদের একের পর এক পরাজিত ও উচ্ছেদ করেছিলেন বলে তাঁর যশোগান করা হয়েছে। প্রাচীন যুগে সিংহাসন দখল, রাজহত্যা এবং যুদ্ধ ইত্যাদি রাজনৈতিক বিরোধের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। আর্যদের সঙ্গেও তো দস্যু ও পাণিদের বিরোধ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ও চার্বাক্‌বাদীদের মধ্যে মত-পার্থক্যের ফলেই শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য দার্শনিক সাহিত্য থেকে চার্বাক্‌ চিন্তার সব মুছে ফেলা হয়েছিল। সমগ্র ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বণিক-সম্প্রদায় ও রাজপরিবারের মহিলারা এবং জৈনধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বণিকসম্প্রদায়ের লোকেরা।

অনেক হিন্দুর মতে মুসলমানেরা হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যেই কেবল মন্দির ধ্বংস করেছেন।

গজনীর সুলতান মাহমুদ মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংসকারীরূপেই পরিচিত, যেহেতু ইসলাম মূর্তিপূজার বিরোধী এবং মাহমুদ মুসলমান বলেই মন্দির ধ্বংস করেছেন। কিন্তু মন্দিরে প্রচুর ধনসম্পত্তিও যে মন্দির লুণ্ঠনের কারণ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা যে মন্দিরেই আশ্রয় নিত যার ফলে মন্দির আক্রান্ত হত—একথা কী অস্বীকার করা যাবে?

হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কারণ আর যাই হোক হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট করা নয়, তাঁরা নিশ্চয়ই একথা বুঝতে পারতেন যে মন্দির ধ্বংসের দ্বারা হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবেরই সৃষ্টি হবে। এছাড়া দেখা গেছে—শত্রু এলাকার মন্দিরগুলিই ধ্বংস করা হয়েছে। মন্দিরগুলো যদি বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে না দাঁড়াতো তাহলে (যেমন ঔরঙ্গজেবের আমলে হয়েছিল)

সুলতানদের নিজেদের এলাকার মধ্যেকার মন্দিরগুলো বোধহয় ধ্বংস করা হত না। এছাড়া মন্দিরগুলোতে যদি প্রচুর ধনসম্পত্তি লুক্কায়িত না থাকত এবং দেববিগ্রহ-গুলি যদি অনেকস্থলে অতি মূল্যবান ধাতু-নির্মিত না হত তা হলেও বোধ হয় মন্দির লুণ্ঠন বা ধ্বংস যে হারে হয়েছে সেই হারে হত না।

মন্দির লুণ্ঠন বা ধ্বংসের অপবাদ শুধু মুসলমানদের দিলেই চলবে না। মুসলমানদের আক্রমণের বহু আগেই অনেক হিন্দু শাসক তাঁদের শত্রুদের এলাকায় গিয়ে ঠিক একই কাজ করেছেন। যেমন—পারমার রাজা সুভাত বর্মণ (১১৯৩—১২১০ খ্রীঃ) গুজরাট আক্রমণ করে দাভয় ও কাম্বে অঞ্চলে বহু সংখ্যক জৈন মন্দির ধ্বংস করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এছাড়া কলহণের রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায়—কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষ তাঁর রাজভাণ্ডার ধন দৌলতে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের রাজত্বেই বহু মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন। তিনি দেবতাদের উৎপাটিত করার কাজে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁকে দেবোৎপাটননায়ক বলা হত। হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী কালাপাহাড়ও প্রথমজীবনে হিন্দু ছিলেন বলে জানা গেছে। আধুনিককালে এমনও দেখা গেছে যে, নিম্নশ্রেণীর কিছু হিন্দু জাতিভেদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজেরাই মন্দির ভেঙ্গে সেস্থানে গীর্জা তৈরী করেছেন।

মুসলমান আমলে ধর্মান্তরীকরণ হয়েছে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষেরা সুফীসন্তদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বা জাতিভেদ প্রথা থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এবং ধর্মান্তর গ্রহণের পর তাঁরা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন এবং অনেক হিন্দু আচার আচরণও পালন করতেন যার নিদর্শন এখনও মুসলমান সমাজে বিদ্যমান আছে। রাষ্ট্র কখনোও ধর্মান্তরীকরণের জন্য কোনো ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি। সে রকম কিছু করলে সে যুগের গোঁড়া মুসলমান ঐতিহাসিকেরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অতিরঞ্জিতভাবেই তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।

পক্ষান্তরে সম্রাট অশোক বরং বৌদ্ধধর্ম প্রচলন এবং জনসাধারণকে ধর্মান্তরিত করার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছিলেন, তবু আমরা তাঁকে মহান সম্রাট বলে থাকি। অবশ্য পার্থক্য যে একেবারে নেই তা নয়। কারণ অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন শান্তিপূর্ণভাবে, আর যে কতিপয় মুসলমান শাসক ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন তাঁরা অনেকেই এক হাতে রেখেছেন কোরাণ, আর অন্য হাতে রেখেছেন

তরবারি। তবে মধ্যযুগীয় ভারতে রাষ্ট্র কখনো ধর্মপ্রচারে কোনো ব্যাপক আগ্রহ দেখায় নি। দেখালে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা আরও বহুগুণ বেড়ে যেত। তবু জনমানসে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ধারণাটাই প্রকট হয়ে আছে। অবশ্য উক্ত ধারণার পেছনে আছে সুপ্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাব যা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিরোধিতা পোষণ করে এসেছে। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করা উচিত।

মহম্মদ তুঘলকের শাসনকালের 'আলি শাহ্ নাথুর বিদ্রোহ' থেকে জানা যায়—নাথু নামে এক খলজিকে কিছু জমি দেওয়া হলে নাথু তার কর আদায় করতে থাকেন। কিন্তু কিছু দিন পরে ভবন নামে এক হিন্দু সরকারের কাছে নাথুর বিরুদ্ধে রাজস্বের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ করলে নাথুর জমি ভরণকে দেওয়া হল। তখন নাথুও তার ভাইয়েরা একজন কাফেরকে তাঁদের ওপর বাসানোর বিরুদ্ধে সুলতানের কাছে অভিযোগ করলে সুলতান তা অগ্রাহ্য করেন। এর দ্বারা সুলতানের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় মেলে।

আলাউদ্দীন খল্জী যেমন হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে দমন নীতি প্রয়োগ করেছিলেন, তেমন মুসলমান ইক্তেদারদের দমন করতেও তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তাই জিয়াউদ্দীন বারনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন—আলাউদ্দীন তাঁর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এবং ব্যক্তিজীবনে ইসলামীয় ধর্মনীতি একটুও মেনে চলতেন না।

অনেকে মনে করেন—কতিপয় মুসলমান শাসক হিন্দুদের ওপর অন্যায়ভাবে জিজিয়া কর চাপিয়েছেন। কিন্তু মুসলমান হলে যে 'জাকাৎ' কর দিতে হত তা হিন্দুদের দিতে হত না সেকথা কী ভেবে দেখা হয়েছে ? ইবন্‌বতুতা বলেছেন—দক্ষিণভারতে এক হিন্দুবংশ (জামোরিণ) তাঁদের ইহুদি প্রজাদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' আদায় করতেন। এছাড়া এও জানা গেছে যে—ভারতের বাইরে মুসলমান শাসকেরা তাঁদের মুসলমান প্রজাদের ওপরেও জিজিয়া কর বসাতেন। ফিরোজ তুঘলকের শাসনকাল ছাড়া অন্য সকলের বেলায় জিজিয়া করের আওতা থেকে নারী, শিশু, পঙ্গু, ব্রাহ্মণ ও সৈন্যদের বাদ দেওয়া হত। যদিও ধরেই নেওয়া হয় যে, কিছু সংখ্যক হিন্দু জিজিয়া করের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মুসলমান হতেন। কিন্তু মুসলমান হলে তো তাঁরা আবার জাকাতের আওতায় পড়তেন। সুতরাং আর্থিক কারণে কর ফাঁকি দেওয়াই ধর্মান্তর গ্রহণের কারণ বলে

মনে করা ঠিক হবে কী? আর যদি ধরেই নেওয়া হয় যে কিছু টাকা বাঁচাবার জন্যই হিন্দুরা ধর্মান্তর গ্রহণ করতেন তাহলে মনে করতে হবে জিজিয়া কর বসানোর পেছনে ধর্মীয় কারণের চেয়ে অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান।

হিন্দুগণ যেমন মুসলমানদের ম্লেচ্ছ বা যবন বলে ঘৃণা করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে আহার ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা তো দূরের কথা তাঁদের অশুচি মনে করতেন তেমনি মুসলমানেরা তাঁদের গ্রন্থে হিন্দুদের কাফের বলে অভিহিত করে তাঁদের নিন্দার বা ঘৃণার পাত্র বলে মনে করতেন। অথচ কোরাণে কাফের শব্দটি কেবল তাদের বেলাতেই ব্যবহার করা হয় যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে হয় ঢেকে রাখতে অথবা অস্বীকার করতে চায়। এক কথায় যারা নাস্তিক। কিন্তু হিন্দুরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকারও করেন না বা তাঁরা নাস্তিক ও নন। সুতরাং হিন্দুমাত্রেই কাফের—একথা বলা ঠিক নয়, এবং তা কাফের শব্দের অপব্যাখ্যা মাত্র, যেমন ম্লেচ্ছ ও যবন শব্দের অপব্যাখ্যার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনেকের ধারণা—মুসলমান শাসকেরা মন্দির ভেঙ্গেছেন আর হিন্দু শাসকেরা মসজিদ অপবিত্র করেছেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন, আর শিবাজী সেতারার দুর্গে নিজ ব্যয়ে মসজিদ নির্মাণ করে দিয়েছেন। অনেক মুসলমান ভূম্যাধিকারী বহু হিন্দু দেবমন্দির নির্মাণ ও দেববিগ্রহের পূজা-অর্চনার ব্যয় নির্বাহের জন্য নিষ্কর দেবোত্তর সম্পত্তিদান করতে কার্পণ্য করেননি। পক্ষান্তরে হিন্দু ভূম্যাধিকারীগণ মুসলমানদিগের মসজিদ, কবরখানা প্রভৃতির জন্য দান করে গেছেন।

ত্রিপুরায় মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লা শহরে শাসুজার যে মসজিদ তৈরী করে দিয়েছেন তা কেবল ইতিহাস বিখ্যাতই নয়, ওই মসজিদটি হিন্দু মুসলমান প্রীতির নিদর্শন ঘোষণা করছে। অনুরূপভাবে নারায়ণপুরের মসজিদ-প্রাঙ্গণে মুজা হোসেন আলি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরটিও তেমনি হিন্দু-মুসলমান প্রীতি ও উদারতার নিদর্শন বহন করে চলেছে। আরুয়াইল আখড়ায় যেমন মুসলমানদের মধ্যে অনেকে কামনা করে মানত করেন তেমনি আখাউরার নিকটে খরমপুর দরগায় হিন্দুদের মধ্যে অনেকে সিন্নি দিয়ে থাকেন। এ সকল দৃষ্টান্ত হিন্দু-ও মুসলমানগণের ধর্মীয় উদারতা ও একের ধর্মে অন্যের শ্রদ্ধার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

মুসলমানেরা ভাবেন—হিন্দুরা ইসলামধর্ম বিরোধী। একথাও ঠিক নয়। কারণ অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ এবং মুসলমান রমণী বিয়ে

করেছেন। রাজা গণেশ মুসলমান রমণী বিয়ে করেছিলেন। তাঁর ছেলে যত্নসেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জলালুদ্দীন নামে পরিচিত হয়েছিলেন। আবার বিখ্যাত ভামিনীবিলাস রচয়িতার কবি জগন্নাথ মিশ্র মুসলমান কন্যা বিয়ে করেছিলেন। মুসলমান রমণী বিয়ে করেছিলেন কালাচাঁদ রায়, পরে তিনি কালাপাহাড় নামে পরিচিত হয়েছিলেন। আধুনিককালে গিরীশ সেন ইসলাম ধর্ম প্রচার করে মৌলানা গিরিশ সেন রূপে পরিচিত হয়েছিলেন এবং রাজা রামমোহন কোরাণের ভাল ব্যাখ্যা করতে পারতেন বলে তাঁকে জবরদস্তি মৌলভি বলা হত। তিনি মুসলমানদের জন্য মীরাৎ-উল-আকবর নামক একখানি উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

আবার অনেকে মুসলমান হয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু দেবদেবীর ওপর ভক্তি প্রদর্শন করেছেন। কবীর ও হরিদাসের নাম এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আধুনিক কালে নজরুল হিন্দু রমণী বিয়ে করেছেন এবং শ্যামা সঙ্গীত লিখেছেন। দরাফ খাঁ গাজী রচনা করেছেন সংস্কৃতে গঙ্গাস্তোত্র।

অনেক মুসলমান কবি বা লেখক নিজেদের ধর্মের মতোই হিন্দু ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের রচনাবলী ধর্মসমন্বয়ের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ঐ সকল উদারচেতা মুসলমান লেখকগণের মধ্যে কবি আলাওলের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর পদ্মাবতী কাব্যের সমস্ত লেখাই হিন্দুভাবাপন্ন। উক্ত কাব্যের ঈশ্বর স্তোত্র থেকে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥

* * *

সৃজিলেক পাতালমহী স্বর্গ নর্ক আর।
স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার॥
সৃজিলেক সপ্তমহী এসপ্ত ব্রহ্মাণ্ড।
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড॥

উক্ত পদ্মাবতী কাব্যে বর্ণিত মহাদেবের স্তোত্র—

আমরা সকল আগে দেহী হৈব ছাড়।
যদি আসি বৃষধ্বজ না করে নিস্তার॥

আর প্রভু মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় কায়া।
যদ্যপি পাষাণ তুমি হই তোমা ছায়া॥
শিরে গঙ্গা জটাধারী গলে অস্থিমালা।
অঙ্গে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাঘ্র ছালা॥

বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে প্রায় ১১ জন হলেন মুসলমান। এঁদের কয়েকজনের লেখার কিছু পংক্তি এখানে তুলে ধরা হল—

(১) আলিরাজা : যে শুনে তোমার বংশী
সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহবাস কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ
গুরুপদে আলিরাজা কয়॥

(২) নসীর মামুদ : বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি
বদনইন্দু জলদ কাঁতি
চারুচন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন ভাণরি।
আগম নিগম বেদসার
লীলায়ে করত গোঠ বিহার
নসীর মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানবি॥

(৩) চাঁদ কাজি : বাঁশী বাজান জানো না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি।

(৪) সৈয়দ মর্তজা : সৈয়দ মর্তজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়াপায়ে
জীবন-মরণ ভরি॥

দেখা গেছে—বহু পদেই আলীরাজা আপনাকে 'জন্মে জন্মে ভক্ত রাধা হরির চরণে' বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতেও

তিনি—'শিশু আলীরাজা ভণে শ্যাম কালিকা দাস' বলে ভণিতা দিয়ে গেছেন। এসকল দৃষ্টান্তের দ্বারা একদিকে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি আলী রাজার অচলা ভক্তি অন্যদিকে জ্ঞানসাগর প্রভৃতিতে তাঁর স্বধর্মানুরাগের পরিচয় মেলে। জ্ঞানসাগরের কবি যে শুধু হিন্দু সাধকের পরিচিত জ্ঞানমার্গের সুন্দর বর্ণনা করেছেন তাই নয়, হিন্দু দেবদেবী ও পয়গম্বরগণের সন্নিবেশ করে তুলনা করেছেন। ডঃ এণামুল হক ও সাহিত্য সাগর আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয়—'আরাকাণ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে মুসলমান রচিত বহু মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ থেকে দেখিয়েছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সমাজে অনেক হিন্দু অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, যেমন—রমণীর কপালে সিঁদুর, বিবাহে ঘৃতের দীপ, ধানদূর্বা, কলাগাছ ইত্যাদি দ্বারা বর বরণ, ও কনে বরণ মঙ্গলঘট, অধিবাস, শুভাশুভ (জলপূর্ণ কুম্ভ, আম্রডাল, দধি) অন্নপ্রাশন, প্রণাম ইত্যাদি।

সত্যপীরের সাহিত্যেও হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয়েব চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়। সত্যপীরের পূজা সম্পর্কীয় যে সকল পুস্তক আছে সেগুলোর আখ্যানভাগ মোটামুটি এক রকমের। যেমন—কোনো এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দারিদ্রের কষাঘাতে যখন জর্জরিত তখন একদিন একজন মুসলমান ফকির উক্ত ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়ে বললেন—'আমার পূজো কর, তাহলে তোমার সব দুঃখ দারিদ্র্য দূর হবে।' তখন সে ব্রাহ্মণ হয়ে কি করে মুসলমান ফকিরের পূজো করবে তা জানতে চাইলে ফকির ব্রাহ্মণকে উপদেশ দেন যে, ঈশ্বরের কাছে হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদ নেই এবং রাম রহিম এক ইত্যাদি। আবার কোনো গল্পে মুসলমান পোষাক পরা ফকির শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ রূপে দেখা দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে যে কোনো বিভেদ নেই এবং দুই ধর্মের মূল কথাই যে এক তা বুঝিয়ে দিলেন। সমস্ত সত্যপীর পুঁথিতেই গল্পটি এই ধরণের কেবল ২২৫ বছর পূর্বে রচিত শ্রীকবি বল্লভের সত্যনারায়ণের পুঁথিতে মুসলমান ফকির বলেছেন—'আমি শিব।' যাহোক, গল্পের বাকি অংশটুকু এই—ফকির নিজেই পূজোর বিধান এবং কি কি জিনিস (যেমন ময়দা ইত্যাদি) দিয়ে পূজো করতে হবে তাও বলে দেন। ফকিরের নির্দেশমত পূজো ও সিন্নি হলে উক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর হয় এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরও অনেকে সত্যপীরের পূজো করতে থাকে। এখান সত্যপীরের পুঁথি থেকে হিন্দু মুসলমান ধর্মসমন্বয়ের উক্তি উদ্ধৃত করে দেওয়া হল দৃষ্টান্তস্বরূপ। যেমন—

শ্রীকবিবল্লভ (১) খোদায় কহেন যে একীদার কর তুমি।
জার পূজা কর তুমি সেই শিব আমি॥
হরহরি এক তণু বেদে ইহা কয়।
ফকির কহেন আমি সেই মৃত্যুঞ্জয়॥

(২) রাম বলে রহিমান হিন্দু আর মুসলমান
জার গুণে কোরাণ পুরাণ।
এক আত্মা নহে দুই পয়দা কারণ সেই
হুকুমে জমিন আসমান॥
হাসিয়া হাসিয়া তবে কহেন ফকির।
হাজির নাজির সত্যপীর দস্তগীর॥
জাহা জেই মনে করে তাঁহা সত্যপীর।
নাহি তফউত হিন্দু মোছাল্মন কাফির॥
(কবি বিদ্যাপতি রচিত সত্যপীরের অপ্রকাশিত পুঁথি)

পীর বুঝাইলেন ঃ—
জিহোঁ রহমান তিহোঁ রাম গুণধাম।
যে জন (প্রভেদ) করে বিধি তারে বাম॥

* * *

দেবতা দ্বিতীয় নাই জান্য এক ব্রহ্মা॥
তবে কহে সত্যপীর আমি নারায়ণ।
ধর্‍্যাছি ফকির বেশ দেখিয়া জবন॥
(কবি গঙ্গারাম বিরচিত সত্যপীরের অপ্রকাশিত পুস্তক)

(৪) গণেশাদি রূপহর বন্দপ্রভু স্মরহর
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥

* * *

দ্বিজ বলে হরি বিনে পুজি নাই অন্য জনে
কি বলে ফকির দুরাচারী।

ফকিরের অঙ্গে চায়　　　অদ্ভুত দেখিতে পায়
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ॥
(সত্যপীরের কথা, ভারতচন্দ্র)

(৫)　দেওয়ান কহেন শুনো গেয়ান কি বাত।
রাম রহিম দোয় নাম ধরে এক নাথ ॥
অভেদ তুমকো কহা শাস্ত্রকি সার।
তুমে ভেদ ভলা নাহি করো ত একত্যার ॥

*　　*　　*

বিধি বড় ভাই মোর মহেশ অনুজ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ ॥
কংশ কেশী মথনে কেশব মোর নাম।
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম ॥
(সত্যপীরের কথা—রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য)

ভারতচন্দ্রের মতে সত্যপীরের উৎপত্তির কারণ ঃ—

দ্বিজ-ক্ষত্রি-বৈশ্য-শূদ্র　　　কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান্।
ফকির শরীর ধরি　　　হরি হৈলা অবতরি
এক বৃক্ষ তলে কৈলা স্থান ॥

অনেক হিন্দু উপাসক মুসলমান ভাবাপন্ন ছিলেন। আউল, বাউল, নেড়া ও দরবেশ নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমান ফকিরদের মতো তস্‌বিমালা ব্যবহার করেন। তাঁদের মতে ঃ—

কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
মিল্ জুলকে কর সাঁইজীকা কাম ॥

রামবল্লভী সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বশাস্ত্রকে সমান ও সর্বশাস্ত্রোক্ত দেবতাগণকে অভিন্ন মনে করেন। তাঁরা উৎসবের সময় ভগবদ্গীতা, কোরাণ, বাইবেল পাঠ করেন। এমনও শোনা যায় যে, তাঁরা খিচুরি ও গোমাংস ইত্যাদি সকল দ্রব্য দিয়েই ভোগ দেন। এবং যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয়।

এই সম্প্রদায়ের গান—

কালীকৃষ্ণ গাড্ খোদা কোন নামে নাহি বাধা,
বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলো রে।
মন কালীকৃষ্ণ গাড্ খোদা বল রে॥

অনেক সাধারণ হিন্দুর মধ্যে মুসলমানদের গোরস্থান ও পীর পূজার প্রচলন আছে। বাংলা তথা ভারতের বহু গ্রামে ও শহরে এরূপ অসংখ্য পূজাস্থান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হল—মেদিনীপুরের মৈনান ও গোপালপুর গ্রামের পীরস্থান, বেলুড় ও সুখচরের শাফরিদ শাফকির, হুগলীর সৈদচাঁদ, কলকাতার শাজুর্ম, ত্রিবেণীব দরাফ খাঁ গাজি, হাবড়ার ফতেয়ালী গ্রামের ফতে আলী, বারাসতের বালেণ্ডা গ্রামের গোরাচাঁদ ফকির—এসকল মুসলমান পীরস্থান ও মৃত পীরগণ হিন্দুগণের পূজা পেয়ে থাকেন। এছাড়াও আছে পেঁড়ো ও গয়েশপুরের পীর পুষ্করিণী—বালি গ্রামের দেওয়ান গাজি পীরের আস্তানা।

মেডিক্যাল কলেজের কাছে ছোট মসজিদের সামনে সন্ধ্যার সময় অনেক হিন্দু রমণীকে মোল্লার জলপড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। এছাড়া এলগিন রোডের উত্তরে চৌরঙ্গী রোডের ওপরে পোড়া বাজারের দরগায় ও কালীঘাটের বাজারের কাছে সত্যপীরের স্থানে অনেক হিন্দুকে পয়সা ও দুধ দিতে দেখা যেত। এর দ্বারা হিন্দুদের ধর্মীয় উদারতার ও অন্য ধর্মে বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া গেছে ভক্ত হরিদাস, কবীর ও আরও অনেক মুসলমান সাধকের হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁদের অগাধ শ্রদ্ধার দ্বারা।

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৬ পরিচ্ছেদে আছে—উড়িষ্যার সীমান্তে তদানীন্তন বঙ্গদেশের অন্তর্গত ম্লেচ্ছরাজ্যের শাসনকর্তা চৈতন্যের নিকট এসে অত্যন্ত দীনতা ও অনুতাপ প্রকাশ করে দণ্ডবৎ হয়ে বলেছিলেন—

অধম যবনকুলে কেনে জন্মাইলে।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইলে।
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ সন্নিধান
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ।

*　　*　　*

গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হিংসা কর‍্যাছি অপার।
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার॥

উক্ত উদ্ধৃতির দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, অনেক মুসলমান শাসনকর্তা প্রথম দিকে হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকলেও পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে অনুতাপ প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেন নি।

পরিশিষ্ট (ছ)-তে সাহেব বৈষ্ণবদের কথা বলা হয়েছে। এবার পাঠান বৈষ্ণব এবং যাঁরা মুসলমান হয়েও হিন্দুধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে আরও কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক।

শ্রীচৈতন্যদেবের উদার ধর্মমতানুসারে হিন্দু অহিন্দু সকলেই 'হরিনাম' দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হতে পারতেন। মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করে অনেকেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলায় বর্ণিত পাঠান বৈষ্ণবদের ঘটনা থেকে জানা যায়—একবার চৈতন্যদেব বৃন্দাবন থেকে চারজন অনুচর সঙ্গে করে পথ চলতে চলতে এক বৃক্ষতলায় বিশ্রামের জন্য উপবেশন করলেন। নিকটেই রাখাল বালকদের গোচারণ দেখে মহাপ্রভুর মনে ব্রজলীলার কথা মনে হল। ঠিক তখনই এক রাখাল বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করলে চৈতন্য ঐ বাঁশীর বাজনা শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এমন সময় ঐ পথ দিয়ে দশজন অশ্বারোহী পাঠান এসে উপস্থিত হল। তারা ভাবল—চারজন বাটপাড় একজন পথিককে ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে তার অর্থ অপহরণ করছে। তখন তারা ঐ চারজন সঙ্গীকে বেঁধে ফেলল। তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন বাঙালী, একজন মাথুর ব্রাহ্মণ আর অপরজন কৃষ্ণদাস রাজপুত। বাঙালী দুজন ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস ও মাথুরবিপ্র পাঠানদের সঙ্গে তর্ক করতে লাগলেন। এমন সময় মহাপ্রভুর চেতনা ফিরে এলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উঠে হরি হরি বলে উর্দ্ধবাহু হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। তখন প্রভুর প্রেমাবেশের চীৎকার পাঠানদের হৃদয়ে শেলের মতো বিঁধতে লাগল। ফলে ভয় পেয়ে তারা চৈতন্যদেবের উক্ত চারজন সঙ্গীকে বন্ধনমুক্ত করে দিল এবং চৈতন্যদেবের চরণ বন্দনা করে বলল—তারা মনে করেছিল চারজন ঠক তাকে ধুতুরা খাইয়ে অজ্ঞান করে তার সর্বস্ব চুরি করছিল। তখন মহাপ্রভু বললেন—ঐ চারজন তার সঙ্গী, আর তিনি একজন সন্ন্যাসী। তাঁর সঙ্গে কোনো টাকাকড়ি নেই, মাঝে মাঝে মৃগী রোগে অচৈতন্য হয়ে পড়লে ঐ চারজন দয়া করে তাঁকে পালন করেন। উক্ত পাঠানদলের একজন ছিলেন পীর। তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধর্মালোচনা করে হার মানলেন এবং কৃষ্ণ নাম বলতে লাগলেন—

তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণ নাম।
'আমি বড় জ্ঞানী' এই গেল অভিমান॥

তখন মহাপ্রভু তাঁকে কৃপা করলেন—

প্রভু কহে—উঠ, কৃষ্ণ নাম তুমি লইলা।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলা॥

কৃষ্ণ নাম দীক্ষা দিয়ে তাঁদের মহাপ্রভু হিন্দু নাম দিলেন—

কৃষ্ণ কহ—কৃষ্ণ কহ—কৈলা উপদেশ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ॥
'রামদাস' বলি প্রভু তাঁর কৈল নাম।
আর এক পাঠান, তাঁর নাম বিজলী খাঁন॥
অল্প বয়স তাঁর, রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাঁহার॥
'কৃষ্ণ' বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায়॥

তখন ঐ সকল পাঠান বৈরাগী হয়ে পাঠান বৈষ্ণব নামে পরিচিত হলেন। চৈতন্য চরিতামৃত অনুসারে:—

তাঁ সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥
'পাঠান বৈষ্ণব' বলি হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্তি॥
সেই বিজলী খাঁন হইতে 'মহাভাগবত'।
সর্ব তীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
'পশ্চিমে' আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য॥

ভক্তমাল গ্রন্থ অনুসারে কবীর মুসলমান ঘরে জন্মেছেন। তাতে আছে—

কবীরজীর জন্ম পূর্ব যবনের ঘরে।
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা যাহার উপরে॥

কথিত আছে—কবীরজী কারও কাছে দীক্ষা নেবার আগেই নিজ হতে রামভক্ত হয়ে পড়লেন—

রামধ্যান রামজ্ঞান রামমাত্র সার।
অনন্য চিন্তায় দিবানিশি করে পার॥

শ্রীরামচন্দ্র কবীরের ধ্যানে তুষ্ট হয়ে তাঁকে আকাশবাণীর দ্বারা আদেশ দিয়ে রামানন্দের কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নিতে বললেন। তখন কবীর ভাবলেন—তিনি মুসলমান। কাজেই রামানন্দ কি তাকে দীক্ষা দিবেন? যাহোক, তখন তিনি এক কৌশল অবলম্বন করে মণিকর্ণিকার যে ঘাটে রামানন্দ অতি প্রত্যুষে স্নান করেন সেই ঘাটে প্রত্যুষের আগেই গিয়ে ঘাটের নীচের দিকে সিঁড়িতে শুইয়ে রইলেন। রামানন্দ সিঁড়ি দিয়ে স্নানের জন্য নামার সময় কবীরের গায়ে পা লাগলে বলে উঠলেন—'রাম কহ'। অবশ্য অন্ধকারে দেখতে পেলেন না কার গায়ে তাঁর পা লাগল। কিন্তু তাতেই কবীরের মন্ত্র-দীক্ষা হয়ে গেল। তারপর কবীর রাম সাধনায় আরও মগ্ন হলেন। তবে স্বধর্ম ছেড়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করায় কবীরের ওপর গঞ্জনা হতে লাগল ঃ—

আপন ইমান ছাড়ি লৈলি হিন্দু ধর্ম।
কে তোরে শিখাল করিবারে হেন কর্ম্ম॥

তখন কবীরজী বললেন—তিনি রামানন্দের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন। রামানন্দ তাঁর গুরু এবং তিনি তাঁর দাস। কবীরের মা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে রামানন্দের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন—তিনি কবীরকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন কী না? রামানন্দ বললেন—তিনি কবীরকে চেনেন না। তখন কবীর মণিকর্ণিকার ঘাটের ঘটনা বললে রামানন্দ প্রেমাবিষ্ট হয়ে কবীরকে আলিঙ্গন করে বললেন—

তুমি মোর যবন নহ বিপ্র হইতে শ্রেষ্ঠ।
যাথে রাম নামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ॥
তারপর— পুন স্বামী তাঁরে কণ্ঠি তিলক যে দিল।
শুদ্ধ জানি বৈষ্ণবের পঙ্গতে লইল॥

একজন মুসলমান হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে কিরূপে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহীত হলেন সে সম্পর্কে ভক্তমাল রচয়িতা কৃষ্ণদাস বাবাজী বলেছেন—

যদি বল যবন কেমতে হৈল গ্রাহ্য।
ত্রৈলোক্য পাবন রাম নাম মহাবীর্য্য॥

হাড়ি ডোম যবন কি ম্লেচ্ছ কেহ হয়।
যেই লয়ে হয়ে অর্হ কৃষ্ণের বিষয় ।।

*   *   *

অতএব সত্য সত্য বেদের বচন।
হরিভক্ত যবন ত্রৈলোক্যপাবন ।।

কিন্তু ব্রাহ্মণগণ বাদশার কাছে কবীরের হিন্দু ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে নালিশ করলে বাদশা কবীরকে ডেকে পাঠালেন। কবীর বাদশার সামনে হাজির হলে তাঁকে বাদশাকে সেলাম করতে বলা হল। তিনি বললেন—তাঁর কাছে রামচন্দ্র ছাড়া কেউ সেলামের যোগ্য নয়। ফলে কবীরকে শিকলে বেঁধে প্রথমে নদীর জলে পরে আগুনে এবং শেষে তোপের মুখে নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু তাতে কবীরের কিছু হল না দেখে বাদশা বুঝতে পারলেন—কবীর ঈশ্বরের কৃপাপাত্র, তখন তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখালেন। কবীর হিন্দু-মুসলমানদের সমানভাবে দেখতেন। একজন মুসলমান হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়ে হিন্দু বৈষ্ণব সমাজে যে সম্মান পেয়েছেন তার দ্বারা মধ্যযুগের হিন্দু তথা বৈষ্ণব সমাজের ধর্মীয় উদারতার পরিচয় মেলে।

ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী নামক একজন ভক্ত বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ও অনুগ্রহ লাভ করেন। তারপর মুলতান, গুজরাট, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।

পাঞ্জাবের পশ্চিমেতে সিন্ধু নামে দেশ।
উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ ।।
হিন্দুত যতেক ছিলা বৈষ্ণব করিলা।
মোছলমান যত ছিল হরিভক্ত হৈলা ।।

*   *   *

বৈষ্ণব আচার করে নাম সংকীর্তন।
অদ্যাবধি সেই রাজ্যে মোছলমানগণ ।।

প্রেমবিলাস থেকে জানা যায়—ঠাকুর শ্যামানন্দ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নানা স্থানে হরিসংকীর্তন করে বেড়াতেন। কথিত আছে—একবার তিনি তাঁর সংকীর্তন দল নিয়ে গাইতে গাইতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সেরখাঁ নামে এক পাঠান রাজপ্রতিনিধি সংকীর্তন শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে তা বন্ধ করতে বললেও শ্যামানন্দ তার নিষেধে কর্ণপাত করলেন না। ফলে সেরখাঁ তাঁদের খোল করতাল ভেঙ্গে

ফেলল। তখন শ্যামানন্দ অলৌকিক শক্তির দ্বারা সেরখাঁকে শাস্তি দিলেন। তার দাড়ি গোঁপ পুড়ে গেল। রক্ত বমি হয়ে সে অবসন্ন হয়ে পড়ল। শ্যামানন্দ বাড়ি চলে গিয়ে পরদিন আরও দলবল নিয়ে নানাস্থান দিয়ে কীর্তন করতে করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় সেরখাঁ এসে রামানন্দের পদে প্রণাম করে কৃপাভিক্ষা করলেন এবং তিনি যে অদ্ভুত ভীতিজনক স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তা বর্ণনা করলেন :—

ওহে শ্যামানন্দ প্রভু কর মোরে দয়া।
কৈনু অপরাধ মোরে দেহ পদ ছায়া॥
সংকীর্তন ভঙ্গ করি যে দশা হইল।
সংক্ষেপে করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
দাড়ি পুড়িল রক্ত গেল নাক মুখ দিয়া।
স্বপনের কথা কহিতে কান্দে মোর হিয়া॥
পহিলা দেখিনু এক রূপ ভয়ঙ্কর।
চড় মারি কহে ওরে যবণ পামর॥
আমি তোর আল্লা হই আহ্লাদ স্বরূপ।
এত বলি দেখাইলা গৌরবর্ণ রূপ॥
মোর নাম শ্রীচৈতন্য সবার আশ্রয়।
শ্যামানন্দ হয় মোর ভক্ত অতিশয়॥
তার স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র কররে গ্রহণ।
নইলে হইবে তোর নরক গমন॥

প্রেমবিলাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়—রসিকানন্দ ঠাকুর ও রূপরাম অনেক মুসলমানকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ থেকে জানা যায়—সাধক হরিদাস শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। তিনি মুসলমান কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁকে 'যবণ হরিদাস' বলা হত। তিনি ব্রহ্ম হরিদাস নামেও খ্যাত ছিলেন। এছাড়া আরও অনেক ঘটনা আছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে—অনেক হিন্দু যেমন পীর গাজিদের অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন, তেমনি অনেক মুসলমানও হিন্দু সাধকদের অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। এর দ্বারা উভয় ধর্মের লোকদের উদারতার পরিচয় মেলে।

দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মপুরাণ থেকে জানা যায়—হাসান হোসেনের নেতৃত্বে যখন মুসলমানগণ রাখালদের মনসাপূজা ভেঙে দেবার জন্য উদ্যত হল, তখন তাদের মধ্যে একজন সকলকে রাখলদের পূজোয় বাঁধা দিতে নিষেধ করে বললেন—

এক ঈশ্বর দুই হিন্দু মুসলমানে।
যার যেই কর্ম করে ধর্মের কারণে॥
সকল লোকাচার সৃজিল গোঁসাই।
পাষণ্ডি হইল তাতে কুশল কার নাই॥

ভারতচন্দ্রের মানসিংহ গ্রন্থে আছে—মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্য বিজয়ের পর, মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে নিয়ে দিল্লীতে গিয়ে ভবানন্দকে পুরস্কার দেবার সুপারিশ করলে, বাদশাহ জাহাঙ্গীর হিন্দু ধর্মের নিন্দা আরম্ভ করলেন। তখন—

মজুমদার কহে জাঁহাপণা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত।
হিন্দু মুসলমান আদি জীবজন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥

সমশের গাজির পুঁথি থেকে জানা যায়—গাজি ত্রিপুরার হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করলে একদিন দেবী স্বপ্নে তাঁর পূজো দিতে আদেশ দিলেন। প্রথমে গাজি গ্রাহ্য করলেন না। পরে আবার একদিন স্বপ্ন হল। তখন গাজি বললেন—

আমি হই মুসলমান আপনি ঈশ্বরী।
কেমনে হিন্দুর কাজ বল আমি করি॥
দেবী বলে সবই বিধাতার হাত।
যখন যাহারে চাহে করেছে নিপাত॥
তাহার নিকটে জান সকলি সমান।
নাহিক প্রভেদ কিছু হিন্দু মুসলমান॥
স্বহস্তে না দেও পূজা ডাকহ ব্রাহ্মণে।
নতুবা জিনিতে তুমি না পারিবে রণে॥

তখন গাজি ব্রাহ্মণ ডেকে দেবীর পূজো দিয়ে ত্রিপুরা রাজার রাজধানী জয় করলেন। এর দ্বারা মুসলমানের প্রতি হিন্দু দেবীর প্রীতির পরিচয় মেলে যা ধর্মীয় উদারতারও একটি দৃষ্টান্ত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র-পত্রিকা

[সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট বন্ধনীর মধ্যেকার উদ্ধৃতিগুলো সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ও পত্রপত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে]

ভারত সংস্কৃতি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।

সভ্যতা ও ধর্মের ক্রমবিকাশ—দুর্গাকিঙ্কর।

ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ।

মহাভারত-আদিপর্ব—৭৫-১৩/৮৫-৩৪/৩৫—শান্তিপর্ব ৬৫-১৩/১৪, অনুশাসনপর্ব—৩৩—২১/২২/২৩।

মনুসংহিতা ১০ম অঃ ৪৩/৪৪ শ্লোক।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২২।

মহাভারত মঞ্জরী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

বলি দ্বীপে হিন্দু সভ্যতা—অধ্যাপক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু মিশন—কার্তিক ১৩৩১।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)—ত্রিদণ্ডিস্বামিনা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত-গোস্বামি-মহারাজেন সম্পাদিতা।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ।

শ্রীগীতাসাধ—বরদাচরণ সেন।

উপনিষৎ সংকলন (১ম খণ্ড), রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, কলি-৫৬।

লঘুভারত ১ম খণ্ড।

পবিত্র কোর্‌আন—কাজী আবদুল ওদুদ।

হজরত মোহম্মদ ও ইস্‌লাম—কাজী আবদুল ওদুদ।

উম্‌দাতুল ইস্‌লাম—মোহম্মদ কোরবান আলী।

হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি—শেখ আবদার রহিম।

'মহর্‌-রম্‌-উল-হরাম'—প্রবন্ধ, প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৩৩—শ্রীঅমৃতলাল শীল

মহম্মদের জীবন চরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র, সম্পাদক, সঞ্জীবনী পত্রিকা।

আদর্শ সাহিত্য—জসীম উদ্দীন।

ঋগ্বেদ সংহিতা, মুখবন্ধ।

চৈতন্যভাগবত।

শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
অনুবাদ—মনুসংহিতা—১২৭ দ্বাদশ অধ্যায়।
শ্রীমদ্ভাগবত—১১শ স্কন্ধ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—প্রকৃতি খণ্ড, ৬৪ অধ্যায়।
মাসিক মহাম্মদী, পৌষ সংখ্যা, ১৩৩৯।
আর্য্য গৌরব—আর্য্য সমাজের মুখপত্র—শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত।
অমৃতবাজার পত্রিকা পূজা নং ১০,*১১, ১৯৩৬, পৃঃ ৩৮ ঐ নং ১ পৃঃ ৩৩৯-৩৪০।
ভারতবর্ষ, কার্তিক সংখ্যা, ১৩৩১।
ধম্মপদ পৃঃ ১৩০।
মহাভারত—অনুশাসন পর্ব ১৩শ অধ্যায় ও মনুসংহিতা ১২—৭৭াং ৭।
ঐ বনপর্ব ১৮৭ অধ্যায়।
বৌদ্ধধর্ম পৃ০ ২১৩।
যীশুর অজ্ঞাত জীবন (Unknown life of Jesus Christ)—নিকোলাচ-নটোভিচ।
যীশুখ্রীষ্ট কে ছিলেন ?—শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী, আর্য গৌরব—১ম বর্ষ, মাঘ ১৩৩৮, ১০ম সংখ্যা।
রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা—২৭শে মাঘ, ১৩৪১।
আনন্দবাজার পত্রিকা—শান্তিনিকেতন নওরোজ উৎসব, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৩৯।
ধর্ম পরিচয়—শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র লাহিড়ী।
জগতের ধর্মগুরু—স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ।
পঞ্চপ্রদীপ—শ্রীকরুণাময় ঘোষ।
পৌরাণিক অভিধান—শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার সংকলিত।
বিবেকানন্দের ইতিহাস চেতনা—অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন।
ভারতের মুসলমান হিন্দুমার সন্তান—শ্রীদীগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য।
সংস্কৃতির কথা—মোতাহের হোসেন চৌধুরী।
বাংলার ইতিহাস (মধ্যযুগ)—মজুমদার।
বাংলা ইতিহাসের দু'শো বছর-স্বাধীন সুলতানদের আমল—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়।

শতবর্ষের বাংলা—সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল।
হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয়—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র লাহিড়ী।
এছলাম ও বিশ্ববাণী, ২য় খণ্ড।
জাতিভেদ পুস্তিকা—আচার্য্য পি. সি. রায়।
মুক্তির সন্ধানে ভারত—শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম—সুখময় মুখোপাধ্যায়।
মৃত্যুহীন— বিপ্লবী নিকেতন।
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।
হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন।
যুগবাণী—কাজী নজরুল ইসলাম।
সঞ্চিতা— ঐ
রুদ্রমঙ্গল— ঐ
রবীন্দ্র রচনাবলী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বাংলা দেশ—সম্পাদক রঘুবীর চক্রবর্তী।
প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান—প্রমথ চৌধুরী।
দীনবন্ধু এণ্ডরুজ—মিঃ এথ এণ্ডরুজ শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত।
ভারতবর্ষের প্রাথমিক ইতিহাস—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
ভারতবর্ষের সহজ ইতিহাস—শ্রীমন্মথ মোহন বসু।
ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি—হাসান মুরশিদ।
জয় বাংলা—মোহিত রায়।
সমতট পত্রিকা।
বৃহৎবঙ্গ—দীনেশ চন্দ্র সেন।
বাংলার বাউল ও বাউল গান—অধ্যাপক উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য।
ভারতের বিবাহের ইতিহাস—ডঃ অতুল সুর।
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান—শ্রীরমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত-ইতিহাস রচনা—রমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপনচন্দ্র।
দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা—২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।
মোহম্মদী—৮ই মাঘ, ১৩৩২।

প্রবাসী মাসিক পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৩১ সাল।

কলিকাতা টাউন হলে ১৩ই আশ্বিন (১৩৪৩) প্রদত্ত খাঁ আবদুল গফুর খাঁর (সীমান্ত নেতার) বক্তৃতা, ১৫ই আশ্বিন আনন্দবাজার পত্রিকা।

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪শে ভাদ্র, ১৩৪৫।

ঐ মফঃস্বল সংস্করণ ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৩০ ফ্রিপ্রেস।

১৫ই বৈশাখ ১৩৪৪, ৬ই বৈশাখ ১৩৪৩, ২০শে চৈত্র ১৩৪৫, ১৩ই কার্তিক ১৩৪১, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬।

দৈনিক যুগান্তর ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫।

মাসিক হিন্দুমিশন পত্রিকার ১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

বঙ্গবাণী, ২৪শে বৈশাখ, ১৩২৯।

সাপ্তাহিক হিতবাদী, ২৪ পৌষ, ১৩৩২।

বসুমতী—২০শে চৈত্র, ১৩৪৪।

মাসিক পত্রিকা গৃহস্থ, বৈশাখ, ১৩২৩।

দুর্গোৎসব ও মুসলমান—শ্রীআনন্দম্ হিন্দু মিশন পাক্ষিক ২য়, ৩য় সংখ্যা কার্ত্তিক, ১৩৩৫।

বাঙালী মুসলমানেরা কি অহিন্দু?—শ্রীফণীভূষণ ঘোষ হিন্দু মিশন ফাল্গুন, ১৩৪০।

বাংলার মুসলমান কোথা হইতে আসিল—শ্রীশিবশঙ্কর দত্ত কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হিন্দু মিশন পত্রিকা—ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যা, ১৩৪২।

A Brief History of India by R. C. Majumdar.
Early History of India—V. D. Mahajan.
History of India—Jayswal K. P. (150—350 A.D.)
Ancient India—Mukherjee R.P.
Cambridge History of India Vol. I—Rapson E. J.
The Indus Civilization, 1905—Mackhay E. J. H.
Aryanisation of India—Dutt N. K.
The Vedic Age—Majumdar R. C.
The Ramayana and Mahabharata—Dutt R. C.
Cast in India 1952—Hutton J. H.
The Relegion of Islam—Maulana Muhammad Ali.
Civilization in Ancient India P I & II.
Elphinstone's History of India.
Early History of India—Smith V. A.
History of the World (Translation)—D. D. Lahiri.

Ancient History—E. J. Rapson.
History of British India.
India, What can it teaches us ?
India in Grece—Mr. Pococke.
Original Abode of Mankind (Translation)—K. C. Bidyaratna.
Theogony of the Hindus—Count Bjorstjerna.
Heeren's Historical Research (Translation).
Hindu Superiority (Translation) D. D. Lahiri.
Rajasthan, I. P.
Modern Review, June, 1915.
Theosophist, March, 1881.
Historical Researches II
Asiatic Researches—Sir Willium Jone.
Essays on the Parsees
Bible in India
Ancient Geography of India—Cunninghum.
Comparative Philology, P. II
Archaeological Survey of India Reports, 1862.
Cultural Felloship in India.
Amrita Bazarpatrika 9 2.24 Dak & 23.4.1936 Dac.
Six System of Indian Philosophy.
The Gospel of Buddha. The Creed of Buddha, Buddha & Budhaism.
Her (Ane Besant) Lecture at Calcutta on 15.1.1906.
Science of Language.
Works 1 P. Asiatic Researches. 1 P.
Islam and the Psýchology of the Musalman—Andre Servier.
Asiatic Thought and its place in History.
Essays, Indian and Islamic—Khoda Baksh
Arabic thought and its place in History—O' Leary.
Islam—Ross.
Comperative Philosophy
History of Aurangazib, Vol. III—Sir Jadunath Sarkar.
Bengal Census Report, 1921.
Literary History of Persia Vol. I & II—Browne.
Persia—Sykes.
The Expansion of Islam—Cash.
Persian Literature—Ievy.
A History of the Persian Language and Ltierature of Mughal Court Vol II.
Heart of Hiddusthan—Dr. Sir Radhakrishnan.
Muslim Rule in India—V. D. Mahajan.
The Caste System of Northern India—E. A. H. Blunt.
An Introduction to Anthropology—R. K. Mandal and M. N. Basu.